পালি সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান রসবাহিনী এবং অন্যান্য গ্রন্থ

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

পালি সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান
রসবাহিনী ও অন্যান্য গ্রন্থ

পালি সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান
রসবাহিনী ও অন্যান্য গ্রন্থ

ড. দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া

বাংলা একাডেমী ঢাকা

www.pathagar.com

প্রথম প্রকাশ
আষাঢ় ১৪১৪/জুন ২০০৭

বাএ ৪৫৯৪
[অর্থবর্ষ ২০০৬ – ২০০৭ পাঠ্যপুস্তক : মাসাআবা উপবিভাগ : ২৪]

মুদ্রণ সংখ্যা : ১২৫০

পাণ্ডুলিপি প্রণয়ন ও মুদ্রণ তত্ত্বাবধান
মানবিকীবিদ্যা, সামাজিকবিজ্ঞান, আইন ও বাণিজ্য উপবিভাগ

প্রকাশক
ড. আবদুল ওয়াহাব
পরিচালক (ভারপ্রাপ্ত)
পাঠ্যপুস্তক বিভাগ
বাংলা একাডেমী, ঢাকা

মুদ্রাকর
মোবারক হোসেন
ব্যবস্থাপক
বাংলা একাডেমী প্রেস, ঢাকা

প্রচ্ছদ
মামুন কায়সার

মূল্য
একশত পঞ্চাশ টাকা

Pali Sahitye Bouddha Upakkhyan : Rasbahini O Anyanya Grantha (Buddhist Legends in Pali Literature : Rasbahini and others) by Dr. Dipankar Srijnan Barua. Published by Dr. Abdul Wahab, Director Incharge, Textbook Division, Bangla Academy, Dhaka, Bangladesh. First published : June 2007. Price : Taka 150.00 only

ISBN 984-07-4603-0

www.pathagar.com

উৎসর্গ

আমার জ্ঞান-চর্চায় যাঁদের অবদান অতুলনীয়
বিদর্শনাচার্য গুণানন্দ মহাস্থবির
বুদ্ধপ্রিয় স্থবির
অধ্যাপক ভিক্ষু শীলাচার শাস্ত্রী
এবং
শিক্ষাগুরুদের করকমলে

www.pathagar.com

www.pathagar.com

মুখবন্ধ

মধ্যভারতীয় আর্যভাষাসমূহের মধ্যে পালি ভাষা প্রাচীনতম। খ্রি.পূ. ৬ষ্ঠ শতক থেকে বর্তমানকাল পর্যন্ত এ ভাষায় পবিত্র বুদ্ধবাণী **ত্রিপিটক** ছাড়াও রচিত হয়েছে অট্‌ঠকথা, অত্থবণ্ণনা, টীকা, অণুটীকা, ইতিহাসাশ্রয়ী বংস সাহিত্য, সার সংগ্রহ (Manuals), সংকলন গ্রন্থ (Compendium), ব্যাকরণ, অভিধান, ছন্দ-শাস্ত্র, অলংকার শাস্ত্র ইত্যাদি। এসব রচনা পালি ভাষা ও সাহিত্যকে নিঃসন্দেহে সমৃদ্ধ করেছে। পিটক গ্রন্থসহ পরবর্তীকালে রচিত পিটক বহির্ভূত (Non-Canonical Texts) বহু গ্রন্থে ধর্মরস সংমিশ্রণে রচিত হয়েছে অসংখ্য গল্প, উপাখ্যান, রূপকথা ইত্যাদি। এসব কাহিনীর অনেকটির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে স্বয়ং বুদ্ধকে সম্পৃক্ত করা হয়েছে। অর্থাৎ এভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, বুদ্ধ স্বয়ং উপদেশ দেবার সময় এসব কাহিনীর অবতারণা করেছেন কিংবা তাঁর ভাষিত কোনো উপদেশবাণী অথবা তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যদের জীবন ও কর্ম সম্পর্কে বলতে গিয়ে কাহিনীগুলো বিবৃত করেছেন।

আলোচ্য 'পালি সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান ঃ রসবাহিনী ও অন্যান্য গ্রন্থ' শীর্ষক গ্রন্থটি মূলত শ্রীলংকায় চতুর্দশ শতকে পালি ভাষায় সংকলিত ও সম্পাদিত 'রসবাহিনী' নামক উপাদেয় গ্রন্থ অবলম্বনে রচিত গবেষণা অভিসন্দর্ভ। পালি সাহিত্য ভাণ্ডারে রসবাহিনী একটি স্বতন্ত্র প্রকৃতির গ্রন্থ। কারণ এতে বর্ণিত কাহিনী বা উপাখ্যানসমূহের কয়েকটি মাত্র বাদ দিয়ে বাকি প্রায় সব কাহিনীই বর্তমান জীবনকে নিয়ে লিখিত ছোটগল্প আকৃতির। কিন্তু শুধু বর্তমান জীবনকে নিয়ে কোনো জীবন-কাহিনী কিংবা উপাখ্যান গ্রন্থ পালি সাহিত্যে নেই বললেই চলে। পালি সাহিত্যের অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় এটাও পদ্যে-গদ্যে রচিত হলেও পদ্যাংশ গদ্যাংশের চেয়ে বিস্তৃত। এটার আর একটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে--এতে সংকলিত কাহিনীগুলোতে ধর্মরসের পাশাপাশি তৎকালীন সময়ের সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থাও পরিবেশিত হয়েছে। এছাড়াও এর প্রতিটি কাহিনী স্বয়ংসম্পূর্ণ ও স্বতন্ত্র। এ জাতীয় গ্রন্থ পালি সাহিত্যে দ্বিতীয়টি দৃষ্ট হয় না। এদিক থেকে বলা যায়- রসবাহিনী পালি সাহিত্যে স্বতন্ত্র ধারায় রচিত একটি নতুন সংযোজন। বস্তুত রসবাহিনীর সংকলিত কাহিনীগুলো পরস্পর বিচ্ছিন্ন ছোটগল্পের ঢঙে লেখা উপাখ্যান শ্রেণীভুক্ত।

রসবাহিনী এখনো শ্রীলংকা, মিয়ানমার প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে পরম শ্রদ্ধাভরে পঠন-পাঠন হয়ে থাকে। এটার সর্বশেষ পালি ভাষায় সিংহলী অক্ষরে সম্পাদনা করেন পণ্ডিত *কে. ঞাণবিমল মহাথের* ১৯৬১ সনে। কিন্তু এ পর্যন্ত এহেন গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থের কোনো

www.pathagar.com

আলোচনা কিংবা গবেষণা হয়নি, এমনকি কোনো ভাষান্তরও হয়নি। কাজেই এটির বিশ্লেষণমূলক গবেষণার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। আমার গবেষণাকর্মের প্রধান লক্ষ্য হলো-- রসবাহিনীতে বর্ণিত কাহিনীগুলোর মাধ্যমে যে প্রাচীন ভারতবর্ষ ও শ্রীলংকার ধর্মীয় পরিবেশ, সামাজিক ও রাজনৈতিক অবস্থা বিরাজ করছিল তা পর্যালোচনা করে যথার্থ অবস্থা উদ্ঘাটন করা।

আলোচ্য গ্রন্থটিকে পাঁচটি অধ্যায়ে ভাগ করা হয়েছে। এর প্রথম অধ্যায়ে 'রসবাহিনী' গ্রন্থের নামকরণের তাৎপর্য মূল্যায়ন করা হয়েছে এবং এটার রচনাকাল ও গ্রন্থকার বা সংগ্রাহক সম্বন্ধে তথ্যপূর্ণ আলোচনা করে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূলত রসবাহিনী গ্রন্থের ১০৩টি কাহিনীর মধ্যে কয়েকটি বুদ্ধ সমসাময়িক এবং অন্যগুলো তাঁর পরবর্তী দ্বাদশ-ত্রয়োদশ শতকের মধ্যে ভারতবর্ষ ও শ্রীলংকার ভাব-পরিবেশে উৎপন্ন। কাহিনীগুলো প্রথমে তঙ্গুত্তবঙ্গ পরিবেয়ের *রট্‌ঠপাল থের* নামক জনৈক শ্রীলংকান ভিক্ষু পালি ভাষায় সংকলন করেন। তাঁর সংকলনে ভাষা ও ব্যাকরণগত ত্রুটি ছিল বিধায় প্রখ্যাত পালি বৈয়াকরণ ও কবি শ্রীলংকার পরিতাজ পরিবেণের অধ্যক্ষ *বেদেহ থের* এ সংকলনটি ত্রুটিমুক্ত করে মার্জিতরূপে 'রসবাহিনী' নাম দিয়ে সম্পাদনা করেন। এছাড়াও এ অধ্যায়ে পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের প্রেক্ষাপটে এ গ্রন্থের গুরুত্ব কতটুকু তাও পর্যালোচনা করা হয়েছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়ে পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি দেওয়া হয়েছে। সাধারণ মানুষের নিকট জটিল ধর্মতত্ত্ব নিতান্ত নীরস ও দুর্বোধ্য মনে হয়, আর গল্প-কাহিনী সরস, সহজবোধ্য ও হৃদয়গ্রাহী হয়, ফলে অধিকতর গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। বুদ্ধ ও তাঁর শিষ্য-প্রশিষ্যগণ গল্প-কাহিনী ও আখ্যান-উপাখ্যানের মাধ্যমে ধর্মরস পরিবেশন করার পদ্ধতি অনুসরণ করতেন। ফলে পালি ভাষায় রচিত হয়েছে বিপুল সংখ্যক ধর্মকথার সংমিশ্রণে আখ্যান-উপাখ্যান। এগুলোকে দু'ভাগে ভাগ করা যায়। 'প্রাচীনকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান' ও 'পরবর্তীকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান।' এখানে প্রথমোক্ত উপ-অধ্যায়ে পিটকান্তর্গত গ্রন্থ যেমন- উদান, পেতবত্থু, বিমানবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, জাতক প্রভৃতিতে বুদ্ধ ও বুদ্ধের শিষ্য-প্রশিষ্য কর্তৃক দেশিত কিছু উপাখ্যানের এবং দ্বিতীয়োক্ত উপ-অধ্যায়ে পরবর্তীকালে রচিত গ্রন্থ যেমন-- ধম্মপদট্‌ঠকথা, পরমত্থজ্যোতিকা, সুমঙ্গল বিলাসিনী, সারত্থপ্পকাসনী, মনোরথপূরণী, বংস সাহিত্য প্রভৃতি গ্রন্থে বর্ণিত কিছু কিছু কাহিনী সংক্ষিপ্ত আকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

তৃতীয় অধ্যায়ে গ্রন্থের বিষয়বস্তু সংক্ষেপে বর্ণিত হয়েছে। এতে বর্ণিত কাহিনীগুলো দু'ভাগে বিভক্ত ; যথা--জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষ) উৎপন্ন ও সিংহলে (শ্রীলংকা) উৎপন্ন কাহিনী। জম্বুদ্বীপে উৎপন্ন কাহিনীর সংখ্যা ৪০টি এবং এগুলো ভারতবর্ষের ভাব-পরিবেশ

www.pathagar.com

নিয়ে রচিত আর সিংহলে উৎপন্ন কাহিনীর সংখ্যা ৬৩টি এবং এগুলো শ্রীলংকার ভাব-পরিবেশ নিয়ে রচিত। প্রথম ভাগের ৪০টি গল্প চারটি বর্গে বিভক্ত এবং প্রতি বর্গে ১০টি করে গল্প সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্গগুলো যথাক্রমে (১) ধর্মশোণ্ডিক, (২) নন্দিরাজ, (৩) যক্ষবঞ্চিত ও (৪) মহাসেন বর্গ। শ্রীলংকায় উৎপন্ন কাহিনীগুলোর শেষ তিনটি গল্পকে কোনো বর্গভুক্ত করা হয়নি। গল্পগুলো যথাক্রমে বৃদ্ধ মহিলার কথা (১১-১), পঞ্চশত ভিক্ষুর কথা (১১-২) ও দন্তটুকুম্বিকের কথা (১১-৩)। অবশিষ্ট ৬০টি কাহিনীকে প্রতিবর্গে দশটি করে ছয়টি বর্গে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্গগুলো হচ্ছে--(৫) মৃগপোতক, (৬) উত্তরোলীয়, (৭) যোদ্ধা, (৮) দ্বিতীয় যোদ্ধা, (৯) সীলোত্ত ও (১০) চুলগল্প বর্গ।

সপ্তম ও অষ্টম বর্গ ব্যতীত সবগুলো বর্গের নাম বর্গের প্রথম গল্পের শিরোনামে করা হয়েছে; সম্ভবত সপ্তম ও অষ্টম বর্গের নামকরণ বর্ণিত কাহিনীগুলোর বিষয় অনুসারে করা হয়েছে।

এখানে বর্ণিত অধিকাংশ কাহিনী ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে রচিত। গল্পের মাধ্যমে ধর্মের আদর্শ ও নীতিসমূহ সাধারণ মানুষের মধ্যে সহজবোধ্য ও আকর্ষণীয় করে প্রচার করা বুদ্ধের ধর্ম দেশনার একটি অন্যতম অনুসৃত পন্থা ছিল। আলোচ্য রসবাহিনী গ্রন্থের গল্পগুলোও একই উদ্দেশ্য রচিত। সাধারণ মানুষের মধ্যে দানে উদ্বুদ্ধ করা, শীল পালনে উৎসাহিত করা এবং কর্ম ও কর্মফলে বিশ্বাস স্থাপন করা, সর্বোপরি নৈতিক আদর্শ অনুশীলনে অনুপ্রাণিত করাই গল্পকারের প্রধান লক্ষ্য। গল্পের শেষে একটি করে উপদেশ বাণী সংযোজন করায় গল্পের গ্রহণযোগ্যতা অধিকতর বৃদ্ধি পেয়েছে। যেমন, শ্রদ্ধাচিত্তে দান দাও, দানে দুর্গতি নিবারিত হয় এবং দুঃখ থেকে মুক্তি পাওয়া যায় (গল্প নং ৫৯)। সুখ ও সুগতি লাভের জন্য শীল পালন ও শরণ গ্রহণ কর (গল্প নং ৩৩১); দানে কখনো প্রমাদগ্রস্থ হবে না (গল্প নং ৪,৬) ; কর্মফল পরবর্তী জীবনে অব্যশই ভোগ করতে হয় (গল্প নং ১, ১০); ধর্মাচারণই স্বর্গমোক্ষ লাভের উপায়। সুতরাং অপ্রমত্তভাবে ধর্মাচরণ কর (গল্প নং ৫, ৩) মিত্রদ্রোহী হবে না, কৃতজ্ঞ হবে, কুশল কর্ম সম্পাদন করে অনিন্দিত হও (গল্প নং ৮, ৯) ইত্যাদি।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, *রসবাহিনীর* গল্পগুলোতে দান, শীল, ভাবনা, কর্ম ও কর্মফল, শরণ গ্রহণের ফল ইত্যাদি বৌদ্ধধর্মের প্রাথমিক অথচ অতি গুরুত্বপূর্ণ আরচাণীয় বিষয়সমূহের প্রচার ও প্রসার ঘটানোই মূল লক্ষ্য হলেও ঘটনা বর্ণনায় তৎকালীন ভারতবর্ষ ও শ্রীলংকার সামাজিক ও রাজনৈতিক ভাব-পরিবেশও গল্পগুলোতে প্রতিফলিত হয়েছে। গল্পের সামাজিক ও ঐতিহাসিক দিকগুলো নিঃসন্দেহে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এ প্রসঙ্গে G.P. Malalasekera মন্তব্য করেছেন :

www.pathagar.com

"... They (the stories) are useful to us, in that they throw new and interesting light on the manners, customs and social conditions in ancient India and Ceylon. Perhaps some contain materials of historical importance hidden in their half-mythical tales (*The Pali Literature of Ceylon,* P. 225)". মূলত গল্পগুলোর প্রধান আলোচ্য বিষয় দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা, কোনো দার্শনিক জটিল বিষয়ের অবতারণা করে গল্পের বর্ণিত বিষয়কে দুর্বোধ্য করা হয়নি। এখানে বাস্তবমুখী চরিত্র যেমন রয়েছে, তেমনি অতি প্রাকৃত চরিত্রের সন্নিবেশও করা হয়েছে। কোনো কোনো চরিত্র অতি স্বাভাবিক ও বাস্তব, আবার কোনো কোনোটি অতিভৌতিক ও অবিশ্বাস্য।

চতুর্থ অধ্যায়ে আলোচ্য রসবাহিনীর পটভূমিকায় ভারত ও শ্রীলংকার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে। এ গ্রন্থে বিধৃত কাহিনীগুলোর মূল উপজীব্য বিষয়--দান, শীল, দানের ফল এবং কর্ম ও কর্মের ফল সম্পর্কিত হলেও প্রসঙ্গক্রমে প্রাচীন ভারত-শ্রীলংকার সমাজ, ধর্ম ও রাজনীতির বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলোচিত হয়েছে। কোনো কোনো কাহিনী ঐতিহাসিক দিক থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এছাড়া কাহিনীগুলোতে ধর্মীয় কার্যকলাপের সঙ্গে সঙ্গে কিভাবে আচার আনুষ্ঠানিকতা বৌদ্ধদের মধ্যে স্থান লাভ করেছে তাও আলোচিত হয়েছে এ অধ্যায়ে। ফলে এ অধ্যায়কে তিনটি উপশিরোনামে উপস্থাপন করা হয়েছে ; (১) প্রাচীন ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা, (২) প্রাচীন শ্রীলংকার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং (৩) পরিত্তদেশনার উৎপত্তি ও বিকাশ।

পঞ্চম অধ্যায়ে আলোচিত হয়েছে রসবাহিনীর গুরুত্ব এবং এর সাহিত্যিক ও ভাষাগত রচনাশৈলী। এর ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের প্রয়োগ খুব একটা দৃষ্ট হয় না। গাথা বা পদ্যাংশের ভাষা ও ভাব সবখানে এক রূপ নয়, ভাষা কোথাও নির্দোষ, সরল, চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী আবার কোথাও ভাব ও ভাষার দৈন্য লক্ষ্য করা যায়। কোনো কোনো পদ্যাংশের ভাষা, ভাব, ছন্দ, উপমা, রূপক, প্রবচন ও রচনা বেশ উৎকৃষ্টমানের। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নমানের। তবে সর্বসাকুল্যে বলা যায় যে, এটা পালি সাহিত্যে একটি অনুপম সৃষ্টি।

গ্রন্থের বিষয় গদ্যে ও পদ্যে উপস্থাপিত করা হয়েছে। গদ্যের চেয়ে পদ্যের ভাব-পরিকল্পনা উৎকৃষ্টতর। কাহিনীর সাথে সংযোজিত পদ্যাংশগুলোতে যে কাব্যিক সৌন্দর্য্য চিত্রায়িত হয়েছে তা আধুনিক কবিতার সাথে তুলনা করা যেতে পারে। কাজেই রসবাহিনী মূলত উপাখ্যান বা গল্পগ্রন্থ হলেও এটাকে সাহিত্য-কাব্যের সমন্বয়ে একটি অনবদ্য ও অপূর্ব সাহিত্যকর্ম হিসেবে অভিহিত করা যায়।

www.pathagar.com

এতে সংকলিত ১০৩টি কাহিনীর মধ্যে মাত্র দু'একটি আকারে খুব ছোট আবার দু'একটি খুব দীর্ঘ; প্রায় সবক'টি কাহিনী নাতিদীর্ঘ, ছোট গল্পের আকারে। ফলে গল্প কথক, পাঠক বা শ্রোতা ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন না। এতে ছোটখাট কিছু ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলেও সামগ্রিকভাবে এটা একটি সার্থক উপাদেয় গল্প বা উপাখ্যান সংকলন। দু'একটা কাহিনী সাধারণ ও সাদামাটা। অধিকাংশ কাহিনী ধর্মরস ও কর্মরসে সমৃদ্ধ এবং কাহিনীর বিষয়বস্তুর গভীরতা যেমন রয়েছে সাহিত্যের গুণগত মানও রয়েছে। পালি সাহিত্য ভাণ্ডারে এটা একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রম ধারায় রচিত নিঃসন্দেহে অতি মূল্যবান গ্রন্থ।

তারিখ: ৬ জুন ২০০৭ইং

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বড়ুয়া
প্রাচ্যভাষা (পালি ও সংস্কৃত) বিভাগ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম
৫ জুন, ২০০৭; ২৫৫০ বুদ্ধবর্ষ।

www.pathagar.com

www.pathagar.com

সূচিপত্র

মুখবন্ধ [নয়]

প্রথম অধ্যায় ঃ ভূমিকা **১-১৭**

১. রসবাহিনী ঃ নামকরণের তাৎপর্য ১

২. রসবাহিনীর রচনাকাল ও গ্রন্থকার ২

৩. পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের প্রেক্ষাপটে রসবাহিনীর গুরুত্ব ৭

দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের পরিচিতি **১৮-১৩৬**

১. প্রাচীনকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান ১৮

২. পরবর্তীকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান ৮২

তৃতীয় অধ্যায় ঃ রসবাহিনীতে বর্ণিত কাহিনীগুলোর সারসংক্ষেপ **১৩৭-২৩৪**

চতুর্থ অধ্যায় ঃ প্রাচীন ভারত ও শ্রীলংকার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে পরিত্তদেশনার উৎপত্তি **২৩৫-২৭০**

১. প্রাচীন ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা ২৩৫

২. প্রাচীন শ্রীলংকার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা ২৪০

৩. পরিত্ত (পরিত্রাণ বা সুত্ত) দেশনার উৎপত্তি ও বিকাশ ২৫৩

পঞ্চম অধ্যায় ঃ উপসংহার **২৭১-২৮৪**

১. রসবাহিনী বর্ণনার গুরুত্ব ২৭১

২. রসবাহিনীর সাহিত্যিক ও ভাষাগত রচনাশৈলী ২৭৭

গ্রন্থপঞ্জি ২৮৮

www.pathagar.com

www.pathagar.com

প্রথম অধ্যায়

ভূমিকা

১. রসবাহিনী ঃ নামকরণের তাৎপর্য

প্রত্যেক সাহিত্য কর্মের একটি যুক্তিসঙ্গত শিরোনামে নামকরণ করা হয়। লেখক সাধারণত বিশেষ কয়েকটি দিক বিচার-বিবেচনা করে তাঁর সাহিত্যকর্মের একটি গ্রহণযোগ্য ও যুক্তিযুক্ত নামকরণ করে থাকেন। বিশেষ কয়েকটি দিকের মধ্যে প্রধানত সাহিত্যকর্মে বর্ণিত বা আলোচিত বিষয়বস্তুর দিকটি অন্যতম। বিষয়বস্তুর ভাবগাম্ভীর্যের প্রতি লক্ষ্য রেখে এ শ্রেণীর গ্রন্থের নামকরণ করা হয়। যেমন- বিমুত্তিমগ্‌গ, বিসুদ্ধিমগ্‌গ, অভিধম্মত্থসংগহ, সদ্ধম্মোপায়ন ইত্যাদি। আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে ব্যক্তি বা ব্যক্তিবর্গ এবং বস্তুকে কেন্দ্র করে সাহিত্য রচনা করা হয়। তখন ব্যক্তি চরিত্র বা বস্তুর মাহাত্ম্য সাহিত্য কর্মে অধিকভাবে প্রস্ফুটিত হয়, যেমন– বুদ্ধবংস, জিনচরিত, জিনালংকার, বুদ্ধ-চরিত, সারিপুত্তপ্‌পকরণ, দাঠাবংস, থূপবংস, ছকেসধাতুবংস ইত্যাদি এ শ্রেণীর রচনা।

পালি সাহিত্যের পিটকান্তর্গত কিংবা পিটকবহির্ভূত গ্রন্থগুলোর শিরোনাম পর্যালোচনা করলে দেখা যায় প্রতিটি গ্রন্থের নামকরণে লেখক বা সংকলক সযত্ন দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখেছেন। গ্রন্থে নামকরণের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ না থাকলেও বিষয়বস্তুর আলোকে নামকরণের তাৎপর্য খুঁজে নেওয়া অথবা যৌক্তিকতা উপলব্ধি করা কঠিন নয়। যেমন– 'ধম্মপদ' ধম্ম ও পদ এই দুই শব্দের সহযোগে হয়েছে ধম্মপদ। ধম্ম বা ধর্ম শব্দের অর্থ নীতিতত্ত্ব, শীল, সত্য, প্রকৃত, স্বাভাবিক ইত্যাদি এবং পদ শব্দের অর্থ পথ, সোপান, উপায় বা গাথাংশ। সুতরাং ধম্মপদ (ধর্মপদ) এই যৌগিক শব্দের অর্থ করা যায় ধর্ম সম্পর্কীয় গাথা, ধর্মের পথ বা সোপান, ধর্মের উক্তি বা নীতিগাথা অথবা নীতিসম্পর্কীয় উক্তি বা গাথা সংগ্রহ। গ্রন্থের বিষয়বস্তু বিশ্লেষণেও এ গ্রন্থের ধম্মপদ নামকরণ যথার্থ প্রমাণিত হয়। অনুরূপভাবে 'জিন-চরিত' গ্রন্থের নামকরণও 'জিন' ও 'চরিত' দুটি শব্দযোগে গঠিত। 'জিন' শব্দের অর্থ যিনি জয়ী হয়েছেন অর্থাৎ ত্রিলোক জয়ী, মারজয়ী বুদ্ধ, আর 'চরিত' শব্দে জীবনী বা জীবন কথাকে বোঝায়। অতএব, 'জিন-চরিত' যৌগিক শব্দ দ্বারা বুদ্ধের জীবন কাহিনীকে বোঝায়, যা নামকরণের সঙ্গে বিষয়বস্তুর সামঞ্জস্য রয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গল্প সংকলন 'রসবাহিনী'[১] উপরোল্লেখিত প্রথম শ্রেণীর নামকরণ। 'রসবাহিনী'– রস ও বাহিনী এ দু'শব্দে গঠিত একটি যৌগিক শব্দ। 'রস'

www.pathagar.com

শব্দের অর্থ স্বাদ (Taste), আস্বাদ, রসেন্দ্রিয়গ্রাহ্য মাধুর্যাদি গুণ, কাব্যশাস্ত্রের সারভূত মন ঃ প্রীতি, মজা, আনন্দ, যে গুণে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, অনুরাগ, অভিপ্রায়, সম্ভোগ, আস্বাদ্য যে কোনো বস্তু বা বিষয়, ভোগ্যবস্তু ইত্যাদি বোঝায়। 'বাহিনী' শব্দে বহনকর্ত্রী, বহনকারিণী, যা বহন করে ইত্যাদি বোঝায়। সুতরাং রসবাহিনীর অর্থ হয় আস্বাদ বহনকারিণী, আনন্দবহনকারিণী কাব্যশাস্ত্রের সারভূত মনঃপ্রীতিবহনকারিণী অনুরাগ বা অভিপ্রায় বহনকারিণী। এর শাব্দিক অর্থ রসের প্রবাহ (The flow of Tastes)। এখানে লেখক যে অর্থে 'রস' শব্দ ব্যবহার করেছেন তার অন্তর্নিহিত অর্থ হচ্ছে– সদ্ধর্মের নিগূঢ় তত্ত্বরস, যে রস একান্ত মধুর, যে রস অমৃততুল্য স্বাদযুক্ত, যে রস সকল প্রকার রসের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।[২] লেখক স্বয়ং রসবাহিনীকে 'ধর্মামৃতরস'[৩] বলে অভিহিত করেছেন।

অতএব, 'রসবাহিনী' শব্দের অর্থ করা যায়– রসের প্রবাহ, সুমধুর ধর্মামৃতরূপ রস বহনকারিণী,[৪] সদ্ধর্মরূপ অমৃতরসের স্রোতধারা বা স্রোতস্বিনী অথবা হৃদয়গ্রাহী আনন্দজনক রস সঞ্চারিণী।

রসবাহিনী মূলত একটি সংকলন গ্রন্থ। এতে ১০৩টি বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক এবং বৌদ্ধধর্মের প্রেক্ষাপটে রচিত কাহিনী সংকলিত হয়েছে। কাহিনীগুলোর প্রধান উপজীব্য ধর্মামৃত রস পরিবেশন। কাহিনীগুলোর সবকয়টিতেই ধর্মরসের প্রবাহ সৃষ্টি হয়েছে, রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত কাহিনীগুলোও সদ্ধর্মের পরশে রসাপ্লুত। এ কারণে এর 'রসবাহিনী' নামকরণ যথার্থ ও স্বার্থক হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, শ্রীলংকায় 'রসবাহিনী' একটি অতি জনপ্রিয় গ্রন্থ। Dr. G.P. Malalasekera বলেন, "The book (Rasavahini) is very widely used as elementary Pali reader in temple-schools even to this day. The free and easy flow of language makes its pleasant reading, while the wealth of its descriptions furnishes the student with the copious vocabulary".[৪] কারণ এ গ্রন্থের কাহিনীগুলো পাঠ করে পাঠক সমাজ এক অনবদ্য ধর্মরসে আপ্লুত হন। লেখক নিজেও অবতরণিকায় 'সুমধুর রসবাহিনী বিবৃত'[৫] করার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। গল্পগুলোর বিষয়বস্তু বিশ্লেষণ করলে লেখকের উপরোক্ত উক্তি সঠিক প্রমাণিত হয়। অতএব, নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, 'রসবাহিনী' একটি চমৎকার ও আকর্ষণীয় নাম এবং প্রতিটি কাহিনী ধর্মামৃতরসে সমৃদ্ধ বলে উক্ত নামকরণ যথার্থভাবে প্রযুক্ত হয়েছে।

২. রসবাহিনীর রচনাকাল ও গ্রন্থকার

রসবাহিনী সহজ-সরল পালি গদ্য ও পদ্যে লিখিত একটি গল্প সংকলন। এতে জম্বুদ্বীপ বিষয়ক ৪০টি এবং লঙ্কা (বর্তমান শ্রীলংকা) বিষয়ক ৬৩টি গল্প সংকলন করা হয়েছে। গল্পগুলো মূলত বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক উপদেশমূলক। বেশ কিছু সংখ্যক গল্প ঐতিহাসিক তথ্যপূর্ণ। এ গল্পগুলো ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ।

www.pathagar.com

রসবাহিনীর উপক্রমণিকায় বলা হয়েছে যে, গল্পগুলোর সঙ্গে প্রাচীন অর্হৎগণ সম্পৃক্ত ছিলেন। অর্থাৎ গল্পগুলোর উৎপত্তির মূলে প্রাচীন অর্হৎগণ এবং তাঁদের কেন্দ্র করে কিংবা গল্পে বর্ণিত ঘটনাকে কেন্দ্র করে প্রাচীন অর্হৎগণ কর্তৃক কাহিনীর সূত্রপাত হয়। কালক্রমে ঘটনাসমূহ পূর্ণাঙ্গ কাহিনীর রূপ নেয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায়– সিংহলরাজ কল্যাণতিষ্যের (খ্রি.পূ. ৩০৬ – ৩০৭) উত্তিয় নামে এক ভ্রাতা ছিলেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে উত্তিয়কুমারকে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করা হয়। রাজ মহিষীর সঙ্গে উত্তিয়কুমারের গোপন প্রণয় গড়ে ওঠে। রাজা কল্যাণলতিষ্য এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে উত্তিয়কে বন্দি করার নির্দেশ দেন। কিন্তু উত্তিয় পূর্বাহ্নে রাজাজ্ঞা অবহিত হয়ে অজ্ঞাতবেশে অন্যত্র পলায়ণ করেন। অন্যত্র অজ্ঞাতবাস করলেও রাণীর জন্য তাঁর অন্তর ছটফট করত। একদা তিনি রাণীর জন্য একখানা প্রেমপত্র লিখে এক যুবকের হাতে দিয়ে ভিক্ষুবেশে রাজপ্রাসাদে প্রেরণ করলেন। প্রাসাদে প্রতিদিন কল্যাণীয় স্থবির নামে এক শীলাচারসম্পন্ন ভিক্ষু মধ্যাহ্নভোজন করতেন। রাজা ও রাণী পরম শ্রদ্ধাসহকারে তাঁকে ভোজন করাতেন। ছদ্মবেশী ভিক্ষুটিও একদিন সুযোগ বুঝে স্থবিরের পিছনে পিছনে রাজপ্রাসাদে প্রবেশ করল। স্থবির মনে করলেন– হয়ত তিনি প্রাসাদে নিমন্ত্রিত ভিক্ষু। আর রাজকর্মচারীরা মনে করলেন–হয়ত তিনি স্থবিরের অন্তেবাসিক। রাজা ও রাণী উভয় ভিক্ষুকে উত্তমরূপে ভোজন করালেন। আহারান্তে অনুমোদন করে প্রত্যাবর্তনকালে উক্ত ছদ্মবেশী ভিক্ষু পত্রখানা যাতে করে রাণীর দৃষ্টিগোচ সেই ভাবে মেঝেতে ফেলে দিল। পত্রের পতন শব্দ শুনে রাজা পত্রখানা দেখতে পেলেন। তিনি পত্রখানা হাতে নিয়ে দেখতে পান যে, হস্তাক্ষর অবিকল স্থবিরের হাতের লেখার মত। তিনি স্থির সিদ্ধান্ত নেন যে, কল্যাণীয় স্থবিরই তাঁর স্ত্রীকে প্রেমপত্র লিখেছেন। তিনি রাগে অগ্নিশর্মা হয়ে নির্দেশ দিলেন স্থবিরকে উত্তপ্ত তৈলাধারে জীবন্ত নিক্ষেপ করতে। তৎক্ষণাৎ রাজাজ্ঞা প্রতিপালন করা হল। স্থবিরকে নিক্ষেপ করা হল ফুটন্ত বৃহৎ তৈলাধারে। সেই সময়ে স্থবির ছিলেন ধ্যানমগ্ন সমাহিত চিত্ত। তৈলাধারে নিক্ষিপ্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি অর্হত্ত্ব ফলে উন্নীত হলেন। তপ্ত তৈল তাঁর নিকট শীতল জলের মত অনুভূত হল। তিনি টগবগে ফুটন্ত তৈলের উপর পদ্মাসনে উপবেশন করে অনিত্য সম্পর্কে উপদেশ দিলেন। দেবগণ রাজার এরূপ ব্যবহারে রুষ্ট হয়ে প্রবল বন্যার সৃষ্টি করলেন। রাজা কল্যাণতিষ্য দেবগণের তুষ্টির জন্য স্বীয় দ্বাদশ বর্ষীয় বিহারদেবী নামক রূপসী কন্যাকে একটি পাত্রে রেখে 'কল্যাণতিষ্যের কন্যা' এই বাক্য লিখে ভাসিয়ে দিলেন। সেই পাত্র কোট্ঠাল তীরে স্থির হলে জনগণ কাকবর্ণতিষ্য রাজাকে অবহিত করেন এবং রাজা তাঁকে গ্রহণ করে প্রধান মহিষীরূপে অভিষিক্ত করেন।[৭]

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে দুটি কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে একটি কাকবর্ণতিষ্য মহারাজ কথা[৮] এবং অপরটি দুট্ঠগামণি অভয়মহারাজ কথা।[৯] এছাড়া একই কাহিনীকে কেন্দ্র করে রচিত হয়েছে 'তেলকটাহগাঁথা'[১০] নামে একটি উৎকৃষ্ট কাব্য। এভাবে প্রাচীন ভারতবর্ষে (জম্বুদ্বীপে) ও লঙ্কায় সংঘটিত ছোট বড় ঘটনাসমূহ পরবর্তীতে ধীরে ধীরে কাহিনীর আকারে রূপ নেয়।

www.pathagar.com

তখন কাহিনীগুলো সেই সেই স্থানে[১১] (অর্থাৎ জম্মুদ্বীপ ও লঙ্কার বিভিন্ন স্থানে) বিক্ষিপ্তভাবে প্রচলিত ছিল এবং কাহিনীগুলো ছিল সিংহলী ভাষাতেই[১২]। অর্হৎ ভিক্ষুগণ এবং ধর্ম বিনয়ে পারদর্শী পণ্ডিত ভিক্ষুগণ যখন যেখানে যেতেন, সেখানে সাধারণ ভক্তদের নৈতিক উন্নতিবিধান ও ধর্মচক্ষু উৎপাদনের নিমিত্ত এসব কাহিনী বিবৃত করতেন।[১৩] এভাবে ক্রমান্বয়ে কাহিনীগুলো সর্বসাধারণের কাছে প্রসার ঘটে এবং জনপ্রিয়তা লাভ করে। পরবর্তীতে প্রাচীনেরা কাহিনীগুলো সিংহলী ভাষায় একত্রে সংকলন করেন।[১৪] তারও পরে শ্রীলঙ্কায় মহাবিহারের [১৫] তঙ্গুঁত্তবঙ্ক পরিবেণস্থ রট্ঠপাল নামক জনৈক স্থবির সর্বপ্রথম এই গল্পগুলো পালি ভাষায় অনুবাদ করেন।[১৬] রট্ঠপাল স্থবির সম্বন্ধে এর অধিক কিছু জানা যায়নি। রট্ঠপাল স্থবিরের এই অনুবাদ ছিল পুনরুক্তি দোষে প্রদুষ্ট। এটার ভুল সংশোধন ও পুনরুক্তিদোষ মুক্ত করে[১৭] দক্ষিণ শ্রীলংকার পরতিরাজ-পরিবেণের প্রধান বেদেহ মহাস্থবির 'রসবাহিনী' নাম দিয়ে বর্তমান আকারে রূপ দেন।[১৮]

Dr. G.P. Malalasekera[১৯] মনে করেন যে, রট্ঠপাল এ গল্পগুলো প্রাচীন সহস্সবত্থু অট্ঠকথা[২০] থেকে অনুবাদ করেছেন। বিষয়টি মহাবংস টীকায়[২১] কমপক্ষে চারবার উল্লেখ করা হয়েছে। এটা দেখে গাইগার (Geiger)[২২] সাহেব সিদ্ধান্তে আসেন যে, এটা পৌরাণিক কাহিনী ও লোককথার (Legends and folk tales) সংগ্রহ বা সংকলন। কিন্তু 'সহস্সবত্থু অট্ঠকথা' বা সহস্সবত্থুপ্পকরণ[২৩] অনুযায়ী এর রচয়িতা রট্ঠপাল। Rev. Walpola Rahula *'History of Buddhism in Ceylon'*[২৪] গ্রন্থে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, সহস্সবত্থু গ্রন্থখানি রট্ঠপালের রচনা। Rev. A.P. Buddhadatta Thero মহোদয়ও সহস্সবত্থুপ্পকরণের[২৫] ভূমিকায় (Introduction) বলেছেন, "The author's name of the Sahassavatthu is not given in the text; but the author of the Rasavahini, Ven. Vedaha, states that it is a work of Ven. Ratthapala of the Guttavanka parivena, at Anuradhapura'. সুতরাং রট্ঠপাল যে সহস্সবত্থুর গ্রন্থকার–এ অভিমত যদি গ্রহণ করা হয় তাহলে ড. জি.পি. মললসেকরের মত গ্রহণ করা যায় না।

'সহস্সবত্থু' এবং 'রসবাহিনী' শিরোনাম দুটো প্রায় সমার্থবোধক। প্রথম শব্দের অর্থ করা যায় 'আনন্দজনক গল্প' (Book of Delightful Stories) এবং দ্বিতীয়টির অর্থ 'রসের প্রবাহ' (Flow of Tastes) দুই গ্রন্থের কাহিনীগুলো প্রায় একই। এছাড়া রসবাহিনীর বহু বাক্য এবং গাথা (Verses) সহস্সবত্থুর সঙ্গে হুবহু মিল। এসব কারণে পণ্ডিতগণ মনে করেন যে, রসবাহিনীর প্রধান ভিত্তি সহস্সবত্থু।[২৬] Rev. Walpola Rahula-এর মত পণ্ডিতগণ ধারণা করেন যে, রসবাহিনীর ভূমিকা অনুযায়ী রট্ঠপালের কাজ সহস্সবত্থুর মত একই।[২৭] ReV. W. Rahula-এর ভাষায়, "Vedeha says that Ratthapala merely translates into pali the stories related in Sinhalese by arahants. The Author of the Sahassavatthu admits that his work is based on the Sihalatthakatha and the tradition of the teachers.[২৮] Now the

www.pathagar.com

Sihalatthakathas are generally regarded as the works of arahants in Sinhalese. Therefore the statement in the Rasavahini that Ratthapala translated into pali stories related in Sinhalese by arahants of old may be taken as referring to our Sahassavatthu'. Dr. G.P. Malalasekera[২৯]-ও একই মত পোষণ করেন।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকে ধম্মকীত্তি নামে গোড়লাদেনী বিহারের জনৈক ভিক্ষু ভারত ও সিংহলের বৌদ্ধ কাহিন সম্বলিত একটি সিংহলী সংকলন তৈরি করেন। এই সংকলনের নাম 'সদ্ধম্মালঙ্কার'। এ গ্রন্থের চব্বিশটি গল্পের মধ্যে একুশটি গল্পই রসবাহিনী থেকে নেওয়া, যদিও ধম্মকীত্তি একথা তাঁর গ্রন্থে কোথাও উল্লেখ করেননি।[৩০] সিংহল সম্পর্কিত গল্পগুলোর সময়ে পৃথকভাবে সংকলিত গ্রন্থ 'সীহল-দীপবত্থু' নামে পরিচিত।[৩১] আবার বার্মায় এটা 'মধুর রসবাহিনী[৩২] নামে অভিহিত। সম্ভবত গ্রন্থের উপসংহারে গ্রন্থকারের 'বক্খামি'হং সুমধুরং রসবাহিনিন্তং' বাক্যটিকে প্রাধান্য দিয়ে এ নামে অভিহিত করা হয়ে থাকবে।

রসবাহিনীর সঠিক রচনাকাল বা সংকলনকাল নির্ণয় করা কঠিন। গ্রন্থকার (সংকলক বা সম্পাদক বলাই যুক্তিযুক্ত) বেদেহ স্থবির উপসংহারে যে বক্তব্য দিয়েছেন তাতে এর সংকলনকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধ বলে সিদ্ধান্ত নেওয়া যায়। গ্রন্থের উপসংহারে বর্ণিত নিম্নোক্ত গাঁথাসমূহ হতে লেখক ও তাঁর কর্ম সম্পর্কে মোটামুটি কিছু তথ্য জানা যায় :

"সমত্তান্তরা যেন যথা'যং রসবাহিনী,
তথা সিজ্ঝন্তু সঙ্কপ্পা জন্তূনং সাধু-সম্মতা।
ধম্মামত রসং লোকে বহন্তি রসবাহিনী,
পঞ্চবস্স সহস্সাপবত্তত্থু অনিন্দিতা।
দ্বত্তিংসভাণবারেহি নিট্‌ঠিতা রসবাহিনী,
করোতু সব্বসত্তানং ইচ্ছিতং সব্বদা সুভং।
কালিঙ্গবেহা মহাথেরো যস্সোপজ্ঝাযতং গতো,
মঙ্গলব্‌হা মহাথেরো খণ্ডসীমা পতী যতী।
যস্স আচরিযো আসি সব্ব সত্থ-বিসারদো,
অরঞ্ঞাযতনানন্দ-মহাথেরো মহাগণী
গরুত্তম আগতো যস্স সত্থ-সাগর-পারগূ।
যো বিপ্পগাম-বংসেক-কেতুভূতো তিসীহলে,
যো'কা সীহলভাসায সীহলং সদ্দলক্খণং।
যো চ সমন্তকূটস্স বণ্ণনং বণ্ণয়ি সুভং,
তেন বেদহ-থেরেন কতা'যং রসবাহিনী।"

www.pathagar.com

"কোনরূপ বাঁধা ব্যতীত রসবাহিনী যেভাবে সমাপ্ত হয়েছে তেমনিভাবে জনসাধারণেরও অধিকতর শুভ হোক। রসবাহিনী পাঁচ সহস্র বছর পর্যন্ত সমগ্র বিশ্বে অনিন্দিতভাবে ধর্মামৃত রস প্রবাহিত করুক।

"বত্রিশ ভাণবারে সমাপ্ত রসবাহিনী সকল সত্ত্বগণের সর্বদা ভাল করুন। এই রসবাহিনী বেদেহ স্থবির কর্তৃক সংকলিত (কৃত) হয়েছে, যিনি অপূর্ব সমন্ত-কূট-বণ্ণনা এবং সিংহলী ভাষায় সিংহলশব্দ লক্ষণ (বিখ্যাত ব্যাকরণ সিদত-সঙ্গরা) গ্রন্থের গ্রন্থকার এবং তিনি ছিলেন ব্রাহ্মণ বংশোদ্ভূত এবং সিংহল দ্বীপের তিন অংশের আদর্শ।[৩৩] তাঁর গুরু ছিলেন অরণ্যবাসী আনন্দ মহাথের। তাঁর বহু সুযোগ্য অনুসারী ছিলেন এবং তিনি বিজ্ঞানরূপ সমুদ্র উত্তীর্ণ হয়েছিলেন। সর্বাবিধ শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, প্রধান সীমান্ত অধিকর্তা মঙ্গল মহাথের তাঁর আচার্য[৩৪] এবং কলিঙ্গ মহাথের তাঁর উপাধ্যায়।"[৩৫]

উপরোক্ত গ্রন্থ ও গ্রন্থকার পরিচিতি (Colophon) থেকে প্রমাণ হয় যে, রসবাহিনীর সংকলক বা সম্পাদক অরঞ্ঞবাসী নিকায়ের বেদেহ স্থবির। তিনি *সমন্ত কূট-বণ্ণনা*[৩৬] এবং *সীহল সদ্দলক্খণ* নামে সিংহলী ব্যাকরণ যা বর্তমানে 'সিদত্সঙ্গরা' নামে পরিচিত গ্রন্থেরও গ্রন্থকার। Dr. G.P. Malalasekera মনে করেন যে, বেদেহ স্থবির ত্রয়োদশ শতকে জীবিত ছিলেন।[৩৭] M. Winternitz মনে করেন যে, রট্ঠপাল কৃত গল্প সংকলনটি বেদেহ স্থবির ১৩২০ - ১৩৪৭ খ্রি. এর মধ্যে পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও সংশোধন করে 'রসবাহিনী' নাম দিয়ে পুনঃসংকলন করেন।[৩৮] Dr. B.C. Law[৩৯] মনে করেন, রসবাহিনীর রচনাকাল খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতক।

সিংহলে বৌদ্ধধর্মের প্রচারকাল খ্রি. পূ. ৩য় শতক বলে ঐতিতহাসিকগণ মনে করেন। মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোক খ্রি. পূ. ৩য় শতাব্দিতে তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করার জন্য সিংহলে প্রেরণ করেন। তখন সিংহলের রাজা ছিলেন দেবপ্রিয়তিষ্য।[৪০] মৌর্য সম্রাট অশোক ও সিংহলরাজ তিষ্য সমসাময়িক ছিলেন এবং উভয়ের মধ্যে গভীর বন্ধুত্ব ছিল। আমাদের আলোচ্য রসবাহিনী সংকলন গ্রন্থে মৌর্য সম্রাট বিন্দুসার, তাঁর পুত্র সম্রাট অশোক, তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রা এবং কুলগুরু মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবির এবং সিংহলরাজ দেবপ্রিয়তিষ্য মহারাজ সকলেই খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকের ঐতিহাসিক ব্যক্তিত্বরূপে চিহ্নিত। তাঁদের জীবন কাহিনী নিয়ে পালি সাহিত্যে বহু ঐতিহাসিক উপাখ্যান গড়ে উঠেছে।[৪১] রসবাহিনীতেও তাঁদের জীবন নিয়ে রচিত হয়েছে চমৎকার উপাখ্যান। এছাড়া সিংহলরাজ দুট্ঠগামণি[৪২] (১০১ - ৭৭ খ্রি. পূ.) সদ্ধাতিস্স[৪৩] (৭৭ - ৫৯ খ্রি.পূ.) গোঠাভয়[৪৪] (৪র্থ শতাব্দি) প্রভৃতি ঐতিহাসিক রাজন্যবর্গকে নিয়ে রচিত কাহিনীও রসবাহিনীতে স্থান লাভ করেছে। এসব কাহিনীর বহু উপাদান লেখক খুব সম্ভব দীপবংস, মহাবংস, অট্ঠকথা-সাহিত্য প্রভৃতি থেকে গ্রহণ করেছেন। কারণ রসবাহিনীর বহু গল্প এসব পালি সাহিত্যে বিকৃত বা অবিকৃতভাবে দৃষ্ট হয়।

www.pathagar.com

উপরোক্ত আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে রসবাহিনীর রচনাকাল এবং রচয়িতা সম্পর্কে একটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়। এখানে বর্ণিত ঐতিহাসিক গল্পগুলোর ঘটনাকাল খ্রি. পূ. ৩য় শতক থেকে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতক পর্যন্ত। এসময়েই ভারতে ও সিংহলে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রসার ঘটে। তাছাড়া এসময়ে মহাযানী বৌদ্ধধর্মও চরম বিকাশ লাভ করে। রসবাহিনীর কোনো কোনো গল্পে অতি অলৌকিক ঘটনার বিবরণ সম্ভবত মহাযানী ধর্মমতের প্রভাব। এসব কারণে সঙ্গতভাবেই ধরে নেওয়া যায় যে, কিছু কিছু কাহিনীর সূত্রপাত খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে এবং পূর্ণতা প্রাপ্তি পঞ্চম বা ষষ্ঠ শতকের মধ্যে। এই দীর্ঘ সময় সিংহলে যখন বৌদ্ধধর্মের জয়জয়কার, তখন বিজ্ঞ পণ্ডিত ধর্মদেশক ভিক্ষুগণ বিভিন্ন সমাগমে স্থান-কাল-পাত্র অনুযায়ী ধর্মদেশনাচ্ছলে ঘটনাসমূহ উপাখ্যান আকারে বর্ণনা করতেন। কাহিনীগুলো সাধারণের মধ্যে খুব জনপ্রিয়তা লাভ করে। কাহিনীগুলো ভিন্ন ভিন্ন পটভূমিকায় বিভিন্ন সময়ে রচতি হয়েছে বলে এদের মধ্যে পারস্পরিক ধারাবাহিকতা নেই, প্রায় প্রতিটি কাহিনীই স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ। উল্লেখ্য যে, ধারণা করা হয়– প্রথমাবস্থায় কাহিনীগুলো সিংহলী ভাষায় প্রচলিত ছিল এবং কোন সিংহলী কাহিনীকার একত্রে সিংহলীভাষায় সংকলন করেন। পরে রট্ঠপাল নামে মহাবিহারস্থ জনৈক ভিক্ষু অবিকলভাবে পালি ভাষায় রূপান্তর করেন।[৪৫] রট্ঠপালের সংকলন ও ভাষান্তরের সময়কাল ত্রয়োদশ শতকের পরে নয়। কারণ পণ্ডিতদের অভিমত অনুযায়ী অরঞ্ঞবাসী নিকায়ের বেদেহ স্থবির খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতকের প্রথমার্ধে (১৩২০ - ১৩৪৭ খ্রি.) রট্ঠপাল রচিত পালি গল্প সংকলনটির পুনরুক্তি ও ভাষাগত দোষমুক্ত করে 'রসবাহিনী' নাম দিয়ে সংস্কার ও সংকলন করেন।[৪৬] রসবাহিনীর গ্রন্থকার হিসেবে বেদেহ স্থবিরের নাম বহুল প্রচলিত হলেও এ গ্রন্থের মূল লেখক বা সংকলক রট্ঠপাল স্থবির। সুতরাং রসবাহিনীর মূল গ্রন্থকারের কৃতিত্ব রট্ঠপাল স্থবিরের। অবশ্য 'রসবাহিনী' নামকরণ এবং রসবাহিনীতে বিধৃত কাহিনীগুলোর সাহিত্যিক রূপদান বিখ্যাত কবি ও বৈয়াকরণ বেদেহ স্থবিরের অনবদ্য কৃতিত্ব। তাঁর শিল্পী মনের চিন্তা রসবাহিনীকে একটি রসসমৃদ্ধ উৎকৃষ্ট শ্রেণীর উপাখ্যান গ্রন্থে উন্নীত করেছে।

৩. পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের প্রেক্ষাপটে রসবাহিনীর গুরুত্ব ঃ

ঐতিহাসিক উপাখ্যান (Historical Legends) বলতে ইতিহাস আশ্রয়ী আখ্যান, গল্প, লোককথা ইত্যাদিকে বোঝায়। এ জাতীয় উপাখ্যান ইতিহাসের চুলচেরা নিয়ম অনুসরণ করে না। এগুলো মূলত রূপকথার মত আকর্ষণীয় কাহিনী বটে, কিন্তু কাহিনীর ভিত্তি বা প্রেক্ষাপট ঐতিহাসিক হওয়া বাঞ্ছনীয়। ঐতিহাসিক কোনো ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কাহিনী সৃষ্টি হয় তা-ই ঐতিহাসিক উপাখ্যান। তবে সব চরিত্র বা ঘটনা ইতিহাস-ভিত্তিক নিরেট সত্যের উপর নির্ভর করবে না। পালি সাহিত্যে এ জাতীয় অসংখ্য উপাখ্যান সৃষ্টি হয়েছে। পালি সাহিত্যে উপাখ্যান ও কথাসাহিত্য প্রধানত মহামানব গৌতম বুদ্ধ,

www.pathagar.com

তাঁর অনুসারী শিষ্য-প্রশিষ্য, শ্রেষ্ঠী, রাজন্যবর্গ প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে। এ জাতীয় ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলো পিটকান্তর্গত ও পিটকবহির্ভূত পালি সাহিত্যে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে রয়েছে। আমরা বর্তমান নিবন্ধে বিশেষ কয়েকটি পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের নমুনা উপস্থাপন করে পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের প্রেক্ষাপটে রসবাহিনীর ভূমিকা পর্যালোচনা করব।

মগধরাজ বিম্বিসার ও তাঁর পুত্র অজাতশত্রু গৌতমবুদ্ধের সমসাময়িক ছিলেন। এদিক থেকে অজাতশত্রু (খ্রি.পূ. ৪৯৩ - ৪৬২) একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি[৪৭]। দীর্ঘ নিকায়ের অট্‌ঠকথা (অর্থকথা) সুমঙ্গলবিলাসিনী[৪৮] গ্রন্থে মহাচার্য বুদ্ধঘোষ অজাতশত্রু সম্পর্কে একটি কাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। এখানে উল্লেখ করা হয়েছে যে, অজাতশত্রু যখন তাঁর মাতৃগর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন তখন থেকে তিনি পিতা বিম্বিসারের সঙ্গে শত্রুতা শুরু করেন। অজাতশত্রু গর্ভে অবস্থানকালে রাজ মহিষী বৈদেহীর ইচ্ছা হয় রাজা বিম্বিসারের দক্ষিণ বাহুর রক্ত পান করতে। তিনি এরূপ অমানবিক ইচ্ছা প্রকাশ করার সাহস পাচ্ছিলেন না। ফলে ক্রমশ তিনি ক্ষীণতর হতে লাগলেন। রাজা রাণীর কাছে তাঁর শারীরিক অবনতির কারণ জানতে চাইলেন। অবশেষে মহিষী তাঁর ঐরূপ খারাপ প্রবৃত্তি জাগ্রত হওয়ার বিষয় রাজাকে অবহিত করলেন। রাজা শৈল্যবিদকে আহ্বান করে দক্ষিণবাহু কেটে রক্ত দিলেন। সেই রক্ত জলমিশ্রিত করে রাণীকে পান করানো হল। দৈবজ্ঞদের কাছে রাণীর এরূপ ইচ্ছা জাগার কারণ জানতে চাওয়া হলে তাঁরা বললেন, এ সন্তান বড় হয়ে পিতার সঙ্গে শত্রুতা করবে এবং পিতৃ-হন্তা হবে। মহিষী এই ভয়ঙ্কর কথা শুনে গর্ভপাত করার সিদ্ধান্ত নিলেন। কিন্তু রাজা বিম্বিসার তাঁকে এই বলে নিরস্ত করলেন যে, যদি এই পাপকর্ম করা হয়, তাহলে সমগ্র জম্বুদ্বীপের জনগণ তাঁদের নিন্দা ও ঘৃণা করবে। তাছাড়া স্বেচ্ছায় গর্ভপাত ভারতের জাতীয় ঐতিহ্যের পরিপন্থী। তবুও রাণী প্রসবের পর সন্তানকে মেরে ফেলার চিন্তা করেছিলেন, কিন্তু পরিচারিকারা সন্তান গর্ভ হতে নিষ্ক্রান্ত হবার সঙ্গে সঙ্গে বাইরে নিয়ে যায়। শিশু ক্রমে বড় হতে লাগল, সঙ্গে সঙ্গে রাণীর মাতৃস্নেহও পুত্রের প্রতি বাড়তে লাগল, ফলে তাঁকে মেরে ফেলার চিন্তা বেশিদিন স্থায়ী হলো না। তিনি বড় হয়ে উঠলে পিতা বিম্বিসার তাঁকে বিভিন্ন রাজকীয় কাজের ভার অর্পণ করেন।[৪৯] অজাতশত্রু এ সুযোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁর পিতাকে তপ্ত ও অন্ধকার গৃহে বন্দি করে রাখেন। সেই বন্দিশালায় মহিষী ব্যতীত কারো প্রবেশাধিকার ছিল না। মহিষী প্রতিদিন কিছু খাবার নিয়ে যেতেন। কিছুদনি পর খাবার নেওয়াও নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। তবুও রাণী গোপনে খাদ্য নিয়ে রাজাকে খাওয়াতেন। অজাতশত্রু এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে কোন প্রকার খাদ্য নিয়ে প্রবেশ নিষেধ করে দেন। অবশেষে রাণী ঘি, মাখন, তৈল ইত্যাদি তাঁর অঙ্গে মেখে বন্দিশালায় গিয়ে রাজাকে লেহন করে খাওয়াতেন। এভাবে রাজা বিম্বিসার অতি কষ্টে জীবনধারণ করছিলেন। অজাতশত্রু রাণীকে এভাবে দেখা করাও নিষেধ করে দিলেন। আদেশ দিলেন, কারাগারের ভিতরে প্রবেশ করা যাবে না, বাহির থেকেই দেখতে হবে। রাণী বিম্বিসারকে স্মরণ করিয়ে দিলেন যে, তিনি অজাতশত্রু গর্ভাবস্থায় গর্ভপাত করতে বলেছিলেন। তিনি আরও জানালেন যে, তিনি

www.pathagar.com

সেদিন শেষবারের মত তাঁর সঙ্গে দেখা করার সুযোগ পেয়েছে। তিনি সেদিন রাজার নিকট শেষ বারের মত ক্ষমা নিয়ে প্রস্থান করেছিলেন।[৫০]

রাজা বিম্বিসার তখন থেকে অনাহারে দিন কাটাতে লাগলেন। তিনি কারাগারে পায়চারি (চক্রমণ) করতেন, তাঁর স্বর্ণময় দেহকান্তি আরও উজ্জ্বলতর হয়েছিল। অজাতশত্রু জানতে পারলেন, পিতা চঙ্ক্রমণ করে বেঁচে আছেন। তাঁর অমানবিক বর্বতা আরও বেড়ে গেল। তিনি বললেন, তাঁর চঙ্ক্রমণ বন্ধ করতে হবে। ক্ষৌরকারকে নির্দেশ দিলেন, রাজা বিম্বিসারের পায়ের তলা কেটে তার উপর লবণ আর তৈলের প্রলেপ দেওয়ার জন্য। ক্ষৌরকার তার সঙ্গী নিয়ে কারাগারে প্রবেশ করলে রাজা বিম্বিসার ভাবলেন যে, তাঁর পুত্র সম্ভবত তাঁর মুর্খতা সম্বন্ধে উপলব্ধি করতে পেরেছে এবং তাঁর প্রতি দয়ার্দ্র হয়ে মুক্তি দেওয়ার জন্য তাদের প্রেরণ করেছে। তিনি মুক্তির আশায় ক্ষৌরকার ও তার সঙ্গীদের আগমণের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। ক্ষৌরকার উচ্চস্বরে কেঁদে রাজা অজাতশত্রুর নির্দেশের কথা বিম্বিসারকে জানাল। ক্ষৌরকার রাজাজ্ঞা পালন করল। রাজা বিম্বিসার প্রাণ ত্যাগ করলেন শেষবাক্য উচ্চারণ করে 'বুদ্ধ-ধর্ম-সংঘ'-মৃত্যুর পর তিনি 'চতুর্মহারাজিক' স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।[৫১]

যেদিন বিম্বিসারের মৃত্যু হয় ঠিক সেদিনই অজাতশত্রুর এক পুত্রসন্তান জন্ম গ্রহণ করে। তাঁর পিতার মৃত্যু এবং সন্তানের জন্ম সংবাদ দুটো একই সঙ্গে অমাত্যদের নিকট পৌছে। অমাত্যগণ প্রথমে সন্তান জন্ম গ্রহণের সংবাদ অজাতশত্রুকে অবহিত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মন সন্তান বাৎসল্যে পূর্ণ হয়ে উঠল এবং একই সঙ্গে তাঁর পিতার সকল গুণ তাঁর মানসপটে ভেসে উঠল ; তিনি বুঝতে পারলেন যে, তিনি যেদিন জন্ম গ্রহণ করেছিলেন সেদিন তাঁর পিতারও অনুরূপ সন্তানস্নেহ উৎপন্ন হয়েছিল। অজাতশত্রু তাৎক্ষণাৎ পিতাকে মুক্তি দিতে নির্দেশ দিলেন। কিন্তু ততক্ষণে অনেক বিলম্ব হয়ে গেছে। পিতার মৃত্যু সংবাদ শুনে তিনি কেঁদে উঠলেন। মায়ের নিকট গিয়ে জানতে চাইলেন, তাঁর পিতা তাঁকে কিরকম স্নেহ করতেন। মাতা বললেন, 'তুমি যখন শিশু তখন তোমার হাতের আঙ্গুলে একটি বিষাক্ত ফোঁড়া হয়েছিল। যন্ত্রণায় তুমি ভীষণভাবে কান্নাকাটি করছিলে। তোমাকে কেউ শান্ত করতে পারছিল না, অবশেষে বিচারালয়ে বিচার কার্যে রত তোমার পিতার নিকট তোমাকে নেওয়া হল। তিনি তোমাকে কোলে নিলেন এবং স্নেহের আতিশয্যে তোমার ফোঁড়াযুক্ত আঙ্গুলটি মুখে নিয়ে চুষতে লাগলেন। বিষাক্ত ফোঁড়া তাঁর মুখে ভেঙ্গে (burst) গেল। তিনি বিষাক্ত রক্তমিশ্রিত পুঁজ বাইরে ফেলে দিতে পারতেন কিন্তু স্নেহাধিক্যের কারণে গলাধঃকরণ করে ফেলেন।[৫২] অজাতশত্রু ইহা শুনে অতীব ব্যথিত হলেন এবং অশ্রুসম্বরণ করতে পারলেন না। তাঁর পিতার মরদেহ যথাযোগ্য মর্যাদায় দাহ করা হল।[৫৩] কাহিনীটি ঐতিহাসিক, কিন্তু নিখুঁত ইতিহাস নয়। ঘটনা ঐতিহাসিক বটে, কিন্তু লেখক কল্পনার তুলি দিয়ে ঘটনাকে কাহিনীতে রূপান্তরিত করেছেন। এখানে ঐতিহাসিক গন্ধ থাকবে, কিন্তু প্রাধান্য পাবে কাহিনীর। কল্পনায় কাহিনীটি অতিব রসগ্রাহী হয়ে উঠেছে। এটাকে ঐতিহাসিক উপাখ্যান বলা হয়।

www.pathagar.com

সুমঙ্গলবিলাসিনী[৫৪] গ্রন্থে শাক্যবংশের উৎপত্তি সম্পর্কে চমৎকার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। এতে বলা হয়েছে, শাক্য বংশের আদি পুরুষ ওক্কাক বা ইক্ষ্বাকুর পাঁচজন রাণী ছিলেন। পাঠরাণীর চার পুত্র ও পাঁচ কন্যা ছিল। পাঠরাণীর মৃত্যুর পর তিনি অপর এক কম বয়স্ক মহিলাকে পাঠরাণী করেন এবং তিনি তাঁর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হন যে, তাঁর পুত্রকে সিংহাসন প্রদান করবেন। অনন্তর রাজা তাঁর পুত্রদের রাজ্য ত্যাগ করতে অনুরোধ করলেন। কুমারগণ তাঁদের বোনদের নিয়ে হিমালয়ের সন্নিকটে গভীর বনে প্রবেশ করলেন এবং তাঁদের বসবাসের জন্য স্থান অন্বেষণ করতে লাগলেন। সেই সময়ে কপিল নামে মুনির সঙ্গে তাঁদের সাক্ষাৎ হয়। মুনি অনুরোধ করলেন যে, তিনি যেখানে বাস করেন সেখানে তাঁদের বাসস্থান– গড়ে তোলার জন্য। কুমারগণ সেখানেই গড়ে তুললেন তাঁদের বাসস্থান শহর এবং নামকরণ করলেন 'কপিলবস্তু'[৫৫]। যথাসময়ে রাজকুমার বড় বোন ব্যতীত চার বোনকে এক একজনে বিয়ে করলেন। একারণে তাঁরা 'শাক্য' নামে অভিহিত হন।[৫৬]

শাক্য বংশের উৎপত্তি সম্পর্কে এরূপ কল্পনা-প্রসূত অবতারণা করার কারণ মনে হয় ইক্ষ্বাকু রাজা থেকে তাঁদের বংশোদ্ভবের ঐতিহ্য সৃষ্টি করা। বুদ্ধঘোষের ভাষ্যগ্রন্থসমূহে দেখা যায়, যে কোনো ঐতিহাসিক বা ঐতিহ্যগত অধিবিদ্যামূলক বিভ্রান্তির অবসান ঘটিয়ে তিনি অত্যন্ত সহজ ও বিশ্বস্তরূপে ঘটনাটি উপস্থাপন করেছেন। এখানে তিনি আদিম রীতিকে পরম সত্যরূপে গ্রহণ করেছেন, যদিও এটা একটি অপ্রমাণিত কাহিনী। ভগ্নি বিবাহের প্রথা প্রাচীন ভারতে অনুমোদিত নয়। আমরা দেখতে পাই যে, প্রাচীন ঋগ্‌বেদে যমযমী গল্পে এরূপ একটি কাহিনীর উল্লেখ রয়েছে।[৫৭] এটা প্রাচীন ভারতে ঋগ্‌বেদের সময়ে এক প্রকার বিপ্লব। বুদ্ধঘোষের রচনায় শাক্য ও লিচ্ছবিদের মধ্যে ভাইবোনের বিবাহ সংঘটনের কাহিনী বিবৃত করে বংশের বিশুদ্ধতা রক্ষা করার প্রয়াস পেয়েছেন।[৫৮] সিংহলী ইতিহাস আশ্রয়ী কাব্য মহাবংশেও অনুরূপ কাহিনীর সমর্থন পাওয়া যায়। এসব কাহিনী ঐতিহাসিক উপাখ্যান হিসেবে বিবেচ্য।

কোশল রাজ প্রসেনজিতের (খ্রি. পূ. ৬ষ্ঠ শতক) পুরোহিত ভগ্‌গব[৫৯] ব্রাহ্মণের এক পুত্র জন্মগ্রহণ করে। কথিত আছে তার জন্মক্ষণে রাজার অস্ত্রাগারের সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র এবং রাজার শয়নকক্ষে রক্ষিত মঙ্গলায়ুধ হতে জ্বলজ্বল করে জ্যোতি বের হয়েছিল। রাজা ইহা দেখে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়লেন এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করলেন। প্রভাতে পুরোহিত দরবারে উপস্থিত হলে রাজা মঙ্গলায়ুধ জ্বলে উঠার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। পুরোহিত বললেন, 'মহারাজ, ভয় করবেন না, চোর-নক্ষত্রযোগে আমার এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছে, তার প্রভাবেই এরূপ হয়েছে।' রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "সে কি দলবদ্ধভাবে চুরি করবে, না কি একাকী করবে?" পুরোহিত বললেন, 'মহারাজ, একচর চোর হবে।' 'তাহলে তাকে প্রতিপালন করুন।'

তার জন্মক্ষণে রাজার মনে কষ্ট দিয়েছে বলে তার নাম রাখা হয়- 'হিংসক'। পূর্বজন্মের সুকৃতির ফলে তার দেহে সপ্তহস্তীর শক্তি উৎপন্ন হয়। তার ব্যবহার ছিল অত্যন্ত

www.pathagar.com

চমৎকার। তাই সদাচার গুণে তার নাম 'অহিংসক' রূপে প্রকাশ পেল। অহিংসক কুমার শৈশবে তক্ষশিলায় গমন করে এক প্রখ্যাত আচার্যের নিকট বিবিধ শিল্প শিক্ষা করতে লাগল। সে আচার্য ও আচার্য-পত্নীকে অতি যত্ন সহকারে সেবা করত। আচার্য-পত্নী তার প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে তাকে খুব স্নেহ করতেন এবং ভাল ভাল খাবার খেতে দিতেন। অন্য ছাত্রদের তা সহ্য হল না। তারা নানা মিথ্যা অভিযোগ এনে আচার্যের মন বিষয়ে তুলল। আচার্যও ছাত্রদের কথা বিশ্বাস করে অহিংসককে কৌশলে মেরে ফেলার সিদ্ধান্ত নিলেন। একদিন আচার্য বললেন, "অহিংসক, তোমার বিদ্যাশিক্ষা সমাপ্ত, তুমি গুরুদক্ষিণা দিয়ে বিদায় গ্রহণ কর।" সে বলল, "উত্তম প্রভু, তবে আপনাকে কিরূপ দক্ষিণা প্রদান করব বলুন।" আচার্য বললেন, "মনুষ্যের দক্ষিণ হস্তের একসহস্র তর্জনী।" আচার্য মনে করেছিলেন অহিংসক অঙ্গুলির জন্য নরহত্যায় প্রবৃত্ত হলে তাকে কেউ না কেউ মেরে ফেলবে। অহিংসক অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কোশল রাজ্যের জালিনি নামক এক বনখণ্ডে আশ্রয় গ্রহণ করল। পাশে পর্বতোপরে বসে সে লোকজনের গমণাগমন প্রত্যক্ষ করত এবং দেখামাত্র ভীমপরাক্রমে ধাবিত হয়ে হত্যা করে তর্জনী কেটে আনত এবং বৃক্ষাগ্রে ঝুলিয়ে রাখত। ঐ কর্তিত অঙ্গুলি কাক, গৃধ্রেরা খেয়ে ফেলত এবং কিছু কিছু পঁচে যেত। বহুদিন অতীত হল, সে সহস্র অঙ্গুলি পূর্ণ করতে পারে না। অতঃপর কার্তিত আঙ্গুল মালাকারে গেঁথে যজ্ঞোপবীতের ন্যায় গলায় ঝুলিয়ে রাখত। তখন থেকে তার নাম হল অঙ্গুলিমাল। তার ভয়ে সদর রাস্তা দিয়ে পথিকের যাতায়াত বন্ধ হল। সে রাস্তায় মানুষ না পেয়ে এবার গ্রাম্য রাস্তার ধারে এসে লুকিয়ে থাকত। এখানেও বহু নরহত্যা করে সে সন্ত্রাসের সৃষ্টি করে। গ্রামবাসীরা তার ভয়ে অনত্র পলায়ণ করল। এখন তার সহস্র অঙ্গুলি পূর্ণ করতে আর মাত্র একটি বাকি।

তখন তার উপদ্রবের বিষয় সমস্ত দেশে প্রকাশ হয়ে পড়ল। রাজা প্রসেনজিতও এ সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে তাকে বন্দি করার জন্য সসৈন্যে যাত্রা করলেন। এদিকে অঙ্গুলিমালের মাতা মন্তানিদেবী পুত্রস্নেহের বশবর্তী হয়ে পুত্রকে রাজরোষ থেকে বাঁচানোর জন্য গৃহ থেকে জালিনিবন যাত্রা করলেন। তথাগত বুদ্ধ দিব্যনেত্রে দেখলেন, "অঙ্গুলিমালের মাতা আজ পুত্রকে আনয়ন করার ইচ্ছায় যাচ্ছে, যদি সে যায়, অঙ্গুলিমাল তাকে হত্যা করে সহস্র অঙ্গুলি নিশ্চয় পূর্ণ করে নেবে। এই কারণে সে আজ মাতৃহত্যা করে তার মার্গফলের অন্তরায় ঘটাবে। যদি আমি গমন না করি তাহলে তার মহাপরিহানি হবে।" বুদ্ধ উক্ত বিষয় জ্ঞাত হয়ে অপরাহ্নে পাত্রচীবর গ্রহণপূর্বক অঙ্গুলিমালের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জালিনি বন শ্রাবস্তী হতে ত্রিশ যোজন দূরে অবস্থিত। বুদ্ধ পদব্রজে জালিনি বনের সন্নিকটে উপনীত হলেন। এদিকে মন্তানিদেবীও জালিনি বনে উপস্থিত হলেন। অঙ্গুলিমাল মাতাকে দেখে ভাবল, "আজ মাতৃহত্যা করেই অবশিষ্ট আঙ্গুলটি পূর্ণ করে নেব।" সে অসি উত্তোলন করে সবেগে ধাবিত হল। অঙ্গুলিমাল ও মন্তানিদেবীর দূরত্ব আর মাত্র সামান্য। ঠিক সে সময়ে বুদ্ধ তাদের উভয়ের মাঝখানে দেখা দিলেন। তখন অঙ্গুলিমাল ভাবল, "আর মাতৃহত্যা করব কেন, এই শ্রমণকে হত্যা করে আঙ্গুলটি নিয়ে সহস্র পূর্ণ করব।" সে উন্মুক্ত অসি নিয়ে বুদ্ধকে তাড়া করতে লাগল। বুদ্ধ এমন ঋদ্ধি প্রয়োগ করলেন, যেন

www.pathagar.com

তিনি ধীরে ধীরে পথ চলছেন, অথচ অঙ্গুলিমাল সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করেও বুদ্ধের নিকট আসতে না পারে। সে অবশ হয়ে পড়ল, সমস্ত শরীর ঘর্মাক্ত হল, পদচালনে অসমর্থ হল, স্থাণুবৎ দাঁড়িয়ে বুদ্ধকে বলল, "দাঁড়াও শ্রমণ।" বুদ্ধ হাঁটতে হাঁটতে বললেন, "অঙ্গুলিমাল, আমি স্থিত আছি, তুমি দাঁড়াও।" তখন অঙ্গুলিমাল ভাবল, "এই শাক্যপুত্রীয় শ্রমণগণ সত্যবাদী, অথচ তিনি পথ চলতে চলতে আমাকে বলছেন, "অঙ্গুলিমাল, আমি স্থিত আছি, তুমি দাঁড়াও।" তখন অঙ্গুলিমাল এই উক্তির রহস্য ব্যাখ্যা করে বলার জন্য বুদ্ধকে অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ বললেন, "অঙ্গুলিমাল, আমি সর্বদা সমস্ত প্রাণিদের প্রতি দণ্ডদান নিবারণ করে স্থিত আছি, তুমি প্রাণিদের প্রতি অসংযম আচরণ করছ, সেই করণে আমি পথ চললেও স্থিত, তুমি দাঁড়িয়ে থাকলেও অস্থিত আছ।[৬০] বুদ্ধবাণী শোনার সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গুলিমালের সৎজ্ঞানের উদয় হল। সে অস্ত্র-শস্ত্র প্রপাতে নিক্ষেপ করে বুদ্ধের চরণে প্রণাম করে প্রব্রজ্যা প্রার্থনা করল। বুদ্ধ "এহি ভিক্খু (এস ভিক্ষু)" বলে তাকে প্রব্রজ্যা-উপসম্পদা প্রদান করলেন। পরবর্তী সময়ে অঙ্গুলিমাল বিদর্শন সাধনা বলে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।

এখানেও ঘটনাটি নিঃসন্দেহে ঐতিহাসিক, কিন্তু বিবরণ ধর্মীয় আবরণে সুসজ্জিত, তাই এগুলো ঐতিহাসিক উপাখ্যান। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, কোন ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্থান বা ঘটনাকে কেন্দ্র করে যে কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে তা-ই ঐতিহাসিক উপাখ্যান। বলা বাহুল্য, বৌদ্ধধর্ম একটি সুপ্রাচীন ধর্ম, স্বাভাবিকভাবে বৌদ্ধ সাহিত্যে বহু ঐতিহাসিক ব্যক্তি, স্থান কিংবা ঘটনাকে কেন্দ্র করে অসংখ্য কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে।

আমাদের আলোচ্য গল্প সংকলন রসবাহিনীতে ঐতিহাসিক উপাখ্যান (Historical Legends) এবং ধর্মীয় উপাখ্যান (Religious Legends) এই দ্বিবিধ কাহিনী স্থান লাভ করেছে। তাই ঐতিহাসিক এবং ধর্মীয় উভয় দিক দিয়ে সংকলনটি নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ।

বিষমলোম কুমার[৬১] মৌর্য সম্রাট অশোকের পুত্র। তাঁর দৈহিক শক্তি ও সাহস দেখে সম্রাট স্বীয় জীবন সম্পর্কে উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন। তাই তিনি নিজ পুত্রকে হত্যা করার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য পরবর্তীসময়ে তাঁর বীরত্ব দেখে তাঁকে উপরাজপদে বৃত করেছিলেন। দেবপুত্র নগরে[৬২] বাস করতেন ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির। তিনি ছিলেন শীলবান ও পণ্ডিত। পাটালিপুত্র নগরে সম্রাট অশোক ইহা অবগত হয়ে তাঁকে মহাসমারোহে আনয়ন করেন এবং ধর্মাশোক মহাবিহার নির্মাণ করে ভিক্ষুসঙ্ঘকে দান করেন।

মধুবণিক তিন ভ্রাতার[৬৩] কাহিনীটি একটি ঐতিহাসিক দলিল বিশেষ। এ কাহিনীতে মৌর্য সম্রাট অশোকের রাজ্যাভিষেক, বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ও পৃষ্ঠপোষকতা, সঙ্ঘবিশোধন, ধাতু নিধান, চুরাশি সহস্র বিহার নির্মাণ, তৃতীয় সঙ্গীতি অনুষ্ঠান, বিভিন্ন দেশে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ ইত্যাদ ঐতিহাসিক তথ্যসমূহ বর্ণিত হয়েছে। এছাড়া সিংহলের রাজা দেবপ্রিয় তিষ্য ও অশোকের মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপন, সিংহলে অশোকের পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে প্রেরণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার ইত্যাদি সম্পর্কেও বিশদ জ্ঞাত হওয়া যায় এ কাহিনীর মাধ্যমে।

www.pathagar.com

সিংহলে রচিত বিভিন্ন ইতিহাস আশ্রয়ী বংস সাহিত্যে তথাগত বুদ্ধ নাগদ্বীপে উপস্থিত হয়ে চুলোদর ও মহোদর নামক দু'জন নাগের বিবাদ মীমাংসা ও রাজায়তন বৃক্ষ রোপন এবং নাগগণ কর্তৃক রাজায়তন চৈত্য প্রতিষ্ঠার কাহিনী বর্ণিত আছে, অনুরূপ কাহিনী রসবাহিনীতেও বর্ণিত হয়েছে।[৬৪] কল্যাণতিষ্য রাজার ভ্রাতা উত্তিয়ের সঙ্গে রাজমহিষীর প্রণয় এবং তার পরিণতিতে পূত-পবিত্র জীবনের অধিকারী কল্যাণতিষ্য স্থবিরকে তপ্ত তৈলাধারে নিক্ষেপ, স্থবির তৈলাধারে উপবেশন করে অর্হত্ত্বফল লাভ ও গাথায় উপদেশ প্রদান এক ঐতিহাসিক রোমাঞ্চ বলা যায়।[৬৫] এটা একটি অতি চমৎকার ঐতিহাসিক উপাখ্যান।

দুট্ঠগামণি অভয় মহারাজের[৬৬] কাহিনীটিও একটি ঐতিহাসিক আখ্যান। এই আখ্যানটি বিভিন্ন কারণে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। তখন তামিলগণ সিংহল আক্রমণ করে বৌদ্ধধর্মের সমূহ ক্ষতি সাধন করছিল। দুট্ঠগামণি কৌশলে তামিলদের দমন করে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম কিভাবে প্রতিষ্ঠা করেছেন তার ইতিবৃত্ত বর্ণিত হয়েছে এই কাহিনীতে। এছাড়া নন্দিমিত্ত কথা,[৬৭] সুরর্নিল কথা,[৬৮] মহাসোন কথা,[৬৯] গোঠইম্বর কথা,[৭০] থেরপুত্রাভয়কথা,[৭১] ভরণ কথা,[৭২] বেলুসুমন কথা,[৭৩] খঞ্জদেব কথা,[৭৪] ফুষ্যদেব কথা,[৭৫] লভিয় বসভ কথা,[৭৬] দাঠাসেন কথা,[৭৭] মহাতেল কথা[৭৮] সালিরাজকুমার কথা,[৭৯] প্রভৃতি উপাখ্যানে সিংহলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। বৌদ্ধধর্ম সংরক্ষণ ও প্রতিষ্ঠার জন্য এসব আখ্যানে বিভিন্ন রাজা ও সৈনিকদের আত্মত্যাগ অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। তবে সৈনিকদের বীরত্ব অতি মানবীয়ভাবে প্রকাশ পেয়েছে। এক কথায় বলা যায় উপরোক্ত কাহিনীগুলো সর্বৈবভাবে ঐতিহাসিক উপাখ্যান।

উপসংহারে বলা যায় যে, রসবাহিনীর বহু আখ্যান ঐতিহাসিক উপাদানে সমৃদ্ধ। পালিভাষায় রচিত অন্যান্য ইতিহাস আশ্রয়ী গ্রন্থ, যেমন- দীপবংস, মহাবংস, চূলবংস, সদ্ধর্ম সংগ্রহ, থূপবংস ইত্যাদি গ্রন্থের ন্যায় রসবাহিনীও সমগুরুত্বপূর্ণ। তবে রসবাহিনী একই সঙ্গে দ্বিবিধ উপাদানে সমৃদ্ধ, প্রথমতঃ ঐতিহাসিক উপাদান, দ্বিতীয়তঃ ধর্মীয় উপাদান- যা পূর্বে উক্ত হয়েছে। ঐতিহাসিক উপাখ্যানগুলোর জন্য এ সংকলন গ্রন্থের গুরুত্ব অনস্বীকার্য। উপরন্তু, ধর্মীয় কাহিনী (Religious Legends) গুলোর জন্যেও এর গুরুত্ব কম নয়। কাজেই এটাকে পালিসাহিত্যে একটি অনবদ্য ঐতিহাসিক ধর্মীয় গল্প সংকলন বা ঐতিহাসিক ধর্মীয় উপাখ্যান সংকলন হিসেবে অভিহিত করা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. Selected stories have been edited and translated into Germany F. Spiegel, "Anecdota Palica", Leipzig 1845; sten konow in ZDMG 43, 1889, 297 ff, the second decade by Magdalene and W. Geiger in SBayA 1918, into Danish by D. Anderson, Kopenhagen 1891, into Italian by E. Pavolini in GSAI 8, 1894, P. 179 ff, 1896, P. 175 ff, into English (Legends Asoka)

www.pathagar.com

by Lakshmana Sastri (with a "Prefatory note" by H.C. Norman) in JASB - 1910, P 57 ff, cf, Gooneratne in P.T.S. 1884, P. 50f, Pavolini in GASI 11, 1897, P. 35 ff.

Fasavahini, ed. in Sinhalese script, by Mahathera, K. Nanavimala, Colombo, 1961.

২. সব্বদানং ধম্মদানং জিনাতি
সব্বং রসং ধম্মরসো জিনাতি,
সব্ব রতিং ধম্মরতী জিনাতি। - ধম্মপদ, ২৪ : ২১।

৩. রসবাহিনী (সীহলী সংস্করণ), সম্পাদিত, মহাস্থবির, পণ্ডিত কে. ঞাণবিমল, ১৯৬১, পৃ. ২৯১। -ধম্মামত রসং লোকে বহন্তি রসবাহিনী ...।

৪. The Pali Literature of Ceylon, Reprinted, Colombo, 1958, First published 1928, P. 225.

৫. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১।
- ব্রক্খামি অহং সুমধুরং রসবাহিনিং তং।

৬. তত্থ জম্বুদ্বীপে তালিস, সীহলদীপে তেসট্ঠি। (রসবাহিনী, পৃ. ২)।

৭. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত পৃ. ১৫৭ - ১৬৩।

৮. কাকবণ্ণতিস্স মহারঞ্ঞো বত্থু, প্রাগুক্ত।

৯. দুটঠ্গামনি অভয় মহারঞ্ঞোবত্থু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩ - ১৮৪।

১০. Edited by E.R. Gooneratne in JPTS 1884, 49 ff.

১১. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, তত্থ তত্থুপ্পন্নানি বত্থুনি, পৃ. ১।

১২. প্রাগুক্ত, অরহা পুরে অভাসং দীপভাসায, পৃ. ১।

১৩. Rahula, W. History of Buddhism in Ceylon, 2nd edition, Int P. XI.

১৪. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত পৃ. ১; ঠপেসুং তং পুরাতনা।

১৫. মহাবিহার সিংহলের অনুরাধাপুরে অবস্থিত। সিংহলরাজ দেবানমপিয় তিস্স কর্তৃক মহিন্দ স্থবিরের বাসের জন্য এটা নির্মিত হয়। কথিত আছে রাজা নিজেই লাঙ্গল দ্বারা চিহ্নিত করে এর সীমা ঠিক করে দিয়েছিলেন। মহাবোধিবংসে এই বিহারের অন্তর্গত স্থানগুলোর একটি তালিকা আছে। এই বিহার অনেক প্রাসাদ ও বত্রিশ মালকে সজ্জিত ছিল। এর অন্তর্গত প্রধান স্থানগুলোর নাম ঃ বোধিমণ্ডপ, থূপারাম, মহাথূপ, উপাট্ঠানসালা, ভোজনসালা, চঙ্কমন কুটি, সন্থাগার, নহানসালা ইত্যাদি। রাজা বট্টগামণির আমলে ভিক্ষুসঙ্ঘ দু'ভাগে বিভক্ত হয়েছিল, একদল অভয়গিরি বিহারে এবং অপরদল মহাবিহারে বাস করতেন। শতাব্দির পর শতাব্দি ধরে বিহার দুটোর মধ্যে প্রতিযোগীতা বর্তমান ছিল। রাজা, শ্রেষ্ঠী ও অন্যান্য ধনবান ব্যক্তিবর্গ সময় সময় এই বিহারের পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করতেন। একবার মহাবিহার ও

www.pathagar.com

অভয়গিরি বিহারের ভিক্ষুদের মধ্যে বিনয় গঠিত ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ার সূত্রপাত হয়। তাঁরা বৈপুল্যবাদ নামক এক প্রকার ধর্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়। এজন্য তাঁদিগকে ঐ বিহার হতে বিতাড়িত করা হয়। বহিস্কৃত ভিক্ষুগণ চোলদেশীয় ভিক্ষু সঙ্ঘমিত্তের সাহায্যে রাজা গোটাভয়ের অনুগ্রহ লাভে সমর্থ হন। ভিক্ষু সঙ্ঘমিত্ত রাজার এককালীন গৃহশিক্ষক ছিলেন। তাঁর পরামর্শে রাজা মহাবিহারবাসী ভিক্ষুদিগকে ভিক্ষা দিতে নিষেধ করেন। এরপর মহাবিহারের বহু সম্পত্তি নষ্ট করা হয়। কিন্তু অল্পদিন পর রাজমন্ত্রী বিদ্রোহ করে সঙ্ঘমিত্তকে বিতাড়িত করেন। কথিত আছে স্বয়ং রাজরাণীই এই সঙ্ঘমিত্তকে হত্যা করেছিলেন। এরপর রাজা মেঘবণ্ণাভয় মহাবিহারের সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেন।

শ্রী মেঘবণ্ণের রাজত্বকালেই মহাবিহারের চরম উন্নতি হয়েছিল। এই সময় লৌহপ্রাসাদ ও অন্যান্য প্রাসাদগুলোর নির্মাণকার্য সমাপ্ত হয়। মহাবিহার থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। এখানে রক্ষিত 'অট্ঠকথা মহাবংসে'র উপর ভিত্তি করে মহাবংস, দীপবংস প্রভৃতি সিংহলী ঐতিহাসিক গ্রন্থগুলো রচিত হয়। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকে এই বিহারে বসে মহাচার্য বুদ্ধঘোষ তাঁর অমূল্য রচনাগুলো সম্পাদন করেন। ধাতুসেন এই বিহারের প্রাসাদসমূহ বিভিন্ন বর্ণে রঞ্জিত করিয়েছিলেন। চোল ও পাণ্ডবদের আক্রমণের সময় এই বিহারের বহু সম্পত্তি নষ্ট হয়। প্রথম পরাক্রমবাহু রাজা হয়ে এর কিছু কিছু সংস্কার ও পুনর্নির্মাণ করেছিলেন, কতগুলো দুষ্ট প্রকৃতির লোকের জন্য তিনি তা সম্পূর্ণ করতে পারেননি। পুলত্তিপুরে রাজধানী স্থানান্তরিত হবার পর মহাবিহারের উপযোগিতা ও প্রাধান্য বহুল পরিমাণে কমে যায়।

১৬. প্রাগুক্ত।
মহাবিহারে তঙ্গুত্তবঙ্ক পরিবেণবাসিকো,
রট্ঠপালোতি নামেন সীলাচারগুণাকরো।
হিতায় পরিবত্তেসি পজানং পালি ভাসাতো।

১৭. প্রাগুক্ত,
পুনরুত্তাদি-দোসেহি তম আসি সব্বং আকুলং
অনাকুলং করিস্‌সামি তং সুনাথ সমাহিতা।

১৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৯৯;
তেন বেদেহ থেরেন কতা'যং রসবাহিনী।

১৯. The Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 225.

২০. A hand written copy of MSS. in the Bernard Free Library, Rangoon, Burma (Burmese Script).

২১. i.e. Vamsatthappakasini, P.P. 451, 452, 607. এর রচনাকাল আনুমানিক ৯ম শতাব্দি।

২২. Dipavamsa and Mahavamsa, P. 48.

www.pathagar.com

২৩. British Museum or, 4674
২৪. Introduction pp. XXIX - XXXV.
২৫. P. XXIV, (Edited by him in Sinhalese Script, 1959).
২৬. E.G. Hugh Nevill's statement in 'British Museum, Cat. No. 115, Collected by him.
২৭. History of Buddhism in Ceylon, 2nd edition, Intro P. XXXVI.
২৮. সহস্সবত্থুং ভাসিস্সং সীহলট্ঠকথানযং
গন্থিত্বাচরিযবাদঞ্চ তং সুনাথ সমাহিতা
– সহস্সবত্থু, গাথা নং - ২।
২৯. The Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 225.
৩০. Ibid.
৩১. Ibid.
৩২. Ibid; বৌদ্ধসাহিত্য, ডঃ বিনয়েন্দ্রনাথ চৌধুরী, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ১৬৩।
৩৩. সিংহল দ্বীপ তখন তিনটি প্রধান অংশে বিভক্ত ছিল। যথা- রোহন, মলয় এবং পিহিত। ইহা পণ্ডুকাভয় রাজা কর্তৃক করা হয়েছিল।
৩৪. Baddhasamapati -------- a priest in whome were vested special powers to supervise the laying of boundaries in "Upasatha Sala", in which the priests Confessed (Kammacariyas).
৩৫. JPTS. 1884. P. 52
৩৬. A description of the Adam's peak, published in the Journed of the Buddhist Text Society, May 1893.
৩৭. Malalasekera, G.P., Dictionary of Pali Proper Names, Part II, P. 923.
৩৮. A History of Indian Literature, Vol. II, Matilal Banarasidas Delhi- 110007, (Reprint, 1993) P. 216.
৩৯. Law, B.C. A History of Pali Literature, Vol. II, Bharatiya Publishing House, Varanasi, 1974, P. 625.
৪০. হালদার (দে), মণিকুন্তলা ; বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, মহাবোধি বুক এজেন্সি, ১৯৯৫, কলিকাতা- ৭৩, পৃ. ৩৬৩ - ৬৭।
৪১. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, তেভাতিক মধুবাণিজকানং বত্থু, পৃ. ৮৯ - ১০০।
৪২. প্রাগুক্ত; চূলতিস্স বত্থু, পৃ. ১৩৩ - ১৩৫।
৪৩. প্রাগুক্ত; সদ্ধাতিস্সামচ্চস্স বত্থু, পৃ. ১৩৩ - ১১৫; তম্বসুমনেত্থরস্স বত্থু, পৃ. ১২৮ - ১৩০; তিস্সায বত্থু, পৃ. ১৩৩ - ১৩৫
৪৪. প্রাগুক্ত থেরপুত্তাভযস্স বত্থু, পৃ. ১৯৭ - ২০০, কাকবণ্ণতিস্স মহারঞ্ঞো বত্থু, পৃ. ১৫৭ - ১৬৩।
৪৫. The Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 225.
৪৬. Ibid, P.P. 224 - 225.
৪৭. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫।

www.pathagar.com

৪৮. Edited by T.W. Rhys Davids and Estlin Charpentier 1, London, P.T.S. 1886.
৪৯. Sumangalavilasini, Pt. 1. P. 134.
৫০. Sumangalavilasini, Pt. 1. PP. 135 - 136.
৫১. Ibid, Pt. 1. P. 137
৫২. Law, B.C. ;A History of Pali Literature, ibid P.P. 428 ff
৫৩. Hazra, K.L. Studies on Pali Commentaries, Delhi, 1991. PP. 291 - 293.
৫৪. Sumangalavilasini, ibid, Pt. 1. PP. 258 - 260.
৫৫. A History of Pali Literature, ibid Vol. II, PP. 426 ff.
৫৬. Sumangalavilasini, Pt. 1. PP. 258 - 260.
৫৭. A History of Pali Literature, op. cit, Vol. II, P. 427
৫৮. Ibid, P. 427.
৫৯. থেরগাথা, অনু.স্থবির, রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৫, পৃ. ৪২৮ - ৪৩৮।
Psalms of the Brethren, London, PTS. 1909, 1913.
৬০. ঠিতো অহং অঙ্গুলিমাল সব্বদা
সব্বেসু ভূতেসু নিধায দণ্ডং
ত্বঞ্চ পাণেসু অসঞ্‌ঞতোসি
তস্মা তিঠো'হং ত্বমট্‌ঠিতোসী'তি।
৬১. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, বিসমলোম কুমারস্‌স বত্থু, পৃ. ৩২ - ৩৪
৬২. প্রাগুক্ত, ইন্দগুত্তথেরস্‌স বত্থু, পৃ. ৮০ - ৮৩।
৬৩. প্রাগুক্ত তেভাতিক মধুবাণিজকানং বত্থু, পৃ. ৮৯-১০০।
৬৪. প্রাগুক্ত, নাগায বত্থু, পৃ. ১২০ - ১২৩।
৬৫. প্রাগুক্ত, কাকবণ্ণতিস্‌সমহারঞ্‌ঞো বত্থু, পৃ. ১৫৭ - ১৬৩।
৬৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৩ - ১৮২।
৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮২ - ১৮৫।
৬৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫ - ১৯০।
৬৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯০ - ১৯১।
৭০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯১ - ১৯৭।
৭১. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৭ - ২০০।
৭২. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০০ - ২০১।
৭৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১ - ২০৩।
৭৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৩ - ২০৪।
৭৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪ - ২০৬।
৭৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৬ - ২০৮।
৭৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৮ - ২১৫।
৭৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৫ - ২১৮।
৭৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৮ - ২২৬।

www.pathagar.com

দ্বিতীয় অধ্যায়
পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যানের পরিচিতি

পালি সাহিত্যে শত শত আখ্যান, উপাখ্যান, উপকথা ও রূপকথা রয়েছে যেগুলো পাঠে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, ধর্মীয়, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ভৌগোলিক ইত্যাদি বহু ঐতিহাসিক তথ্য অবগত হওয়া যায়। এ গল্পগুলো ধর্মকথার আবরণে সহজভাবে পরিবেশিত। গল্পের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া কিংবা ধর্মদেশনা করা ধর্মপ্রচারকদের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বৌদ্ধধর্ম তো এর ব্যতিক্রম নয়ই বরঞ্চ বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যগণ এ পদ্ধতি অধিক ব্যবহার করেছেন। কারণ গল্প-কাহিনী সর্বসাধারণের কাছে সমভাবে সমাদৃত, দার্শনিক জটিল তত্ত্ব নিঃরস ও সাধারণের কাছে বোধগম্য নয়। তাই বুদ্ধ আখ্যান উপাখ্যানের মাধ্যমে ধর্মের বিষয়গুলো সহজভাবে মানুষের মাঝে প্রকাশ করতেন। এসব গল্প কাহিনীতে সমাজের বিভিন্ন স্তরের মানুষ যেমন স্থান পেয়েছে তেমনি ইতরপ্রাণী কিংবা তির্যক প্রাণীও স্থান পেয়েছে। এসব গল্প উপাখ্যানের মাধ্যমে বিভিন্ন মানুষের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য তৎসঙ্গে প্রাচীন ভারতের বহু তথ্য উন্মোচিত হয়েছে। পিটকান্তর্গত ও পিটক বহির্ভূত বহু পালি গ্রন্থে অসংখ্য উপাখ্যান রয়েছে। আলোচনার সুবিধার্থে এগুলোকে 'প্রাচীন কালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান' ও 'পরবর্তীকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান'- এই শিরোনামে উপস্থাপন করা হলো।

১. প্রাচীনকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান

প্রাচীনকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান বলতে পিটকান্তর্গত গ্রন্থে সংকলিত উপাখ্যান, গল্প, কাহিনী ইত্যাদিকে বোঝানো হয়েছে। ধর্মোপদেশ প্রদানের সময় বুদ্ধ স্বয়ং এসব গল্প কাহিনী বা উপাখ্যান ব্যক্ত করতেন। এছাড়া তাঁর ঘনিষ্ঠ শিষ্যদের মধ্যেও কেউ কেউ এসব কাহিনীর সঙ্গে সক্রিয়ভাবে সম্পৃক্ত থাকতে দেখা যায়। এ শ্রেণীর উপাখ্যানগুলো জাতক, উদান, বিমানবত্থু, পেতবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত হয়েছে। এ জাতীয় অসংখ্য গল্প কাহিনীর কিছু কিছু নমুনা নিম্নে সংক্ষিপ্তাকারে উপস্থাপন করা হলো ঃ

জাতক

'জাতক'[১] শব্দ দ্বারা বৌদ্ধ সাহিত্যে এক বিশেষ সাহিত্যকর্মকে নির্দেশ করে। বৌদ্ধদের মতে সম্বোধি লাভের পূর্বে বুদ্ধত্ব লাভের জন্য গৌতমকে জন্ম জন্মান্তর ধরে দশটি পারমী[২] পূরণ করতে হয়েছে। দীপঙ্কর বুদ্ধের সময়ে বুদ্ধত্ব লাভের প্রার্থনা ও প্রতিজ্ঞা গ্রহণ থেকে

www.pathagar.com

আরম্ভ করে উরুবিল্বের বোধিতরুমূলে বুদ্ধত্ব লাভ পর্যন্ত সিদ্ধার্থ গৌতমকে অসংখ্যবার জন্ম গ্রহণ করতে হয়েছে। এই জীবন-কাহিনীসমূহ জাতক এবং বুদ্ধ তখন বোধিসত্ত্ব বা বুদ্ধাঙ্কুর নামে অভিহিত। সুতরাং জাতক বলতে বুদ্ধের পূর্ব জন্মের আখ্যানকে নির্দেশ করে।

বর্তমান ফৌসবল সম্পাদিত জাতকত্থবণ্ণনায় পদ্য মিশ্রিত যে জাতককাহিনী স্থান পেয়েছে সাধারণত তাকে মূল জাতক বলে গ্রহণ করা হয় না।[৩] বৌদ্ধ সাহিত্যে বিজ্ঞ ব্যক্তিদের অভিমত অনুযায়ী খুদ্দকনিকায়ের অন্তর্গত জাতক গ্রন্থ কেবল গাথার দ্বারা গল্পের ধারাবাহিকতা রক্ষা করা যায় না, গল্প সুস্পষ্টতাও লাভ করে না। এ জন্য গদ্যে আখ্যান রচনার প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। ধর্মপ্রচারকেরা গাথা আবৃত্তির সাথে সাথে আখ্যানগুলোও বলে যেতেন। এভাবেই জাতকত্থবণ্ণনার উৎপত্তি ও ক্রমবিকাশ ঘটে। প্রাচীন জাতকট্‌ঠকথার পুনর্গঠিত ছাঁচে ঢালা রূপ হচ্ছে বর্তমান জাতকত্থবণ্ণনা। পরবর্তীকালে তার গদ্যাংশ গাথাংশের মতো পালি ভাষাতেই নিবদ্ধ হয়েছে। মহাচার্য বুদ্ধঘোষ খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দিতে সিংহলে জাতকের অনুসন্ধান করেন এবং সিংহলী পুঁথির সন্ধান প্রাপ্ত হন। অনেকের মতে বুদ্ধঘোষই বর্তমান জাতকের রূপকার।[৪] তবে জাতক বহু প্রাচীনকাল থেকে প্রচলিত ছিল বলে অনুমান করা হয়। এ প্রসঙ্গে ঈশাণচন্দ্র ঘোষের সুচিন্তিত অভিমত হল, "পৃথিবীর নানা দেশীয় প্রচলিত কথাকোষের মধ্যে ইহা সর্বাপেক্ষা বৃহৎ ও প্রাচীন।"[৫]

অধ্যাপক ফৌসবল সম্পাদিত জাতকত্থবণ্ণনায় জাতকের সংখ্যা ৪৪৭টি। প্রতিটি জাতকে পাঁচটি অংশ থাকে– (১) প্রত্যুৎপন্নবস্তু বা বর্তমান কাহিনী অর্থাৎ কাহিনী প্রারম্ভে মুখবন্ধরূপে বর্ণিত বুদ্ধ কখন, কোথায়, কোন ব্যক্তি বা কোন ঘটনা প্রসঙ্গে জাতক-কাহিনী বিবৃত করেছেন এরই নাম প্রত্যুৎপন্নবস্তু। (২) অতীতবস্তু বা অতীত কথা। গৌতমবুদ্ধের অতীত জীবনকাহিনী এই অংশে বিবৃত। (৩) গাথা–গদ্যপদ্যে মিশ্রিত পদ্যাংশকে গাথা বলে। (৪) গাথার অব্যবহিত পরে ব্যাখ্যা থাকে, তাকে ব্যাকরণ বলে। আর (৫) সর্বশেষে পচ্চুপ্পন্নবত্থুতে উল্লিখিত চরিত্রগুলোর সঙ্গে অতীতবত্থুর চরিত্রগুলোর অভিন্নতা বা সনাক্তকরণ গদ্যে বর্ণিত হয়। এই অংশের নাম সমোধান বা সমাবধান।

গদ্যে-পদ্যে মিশ্রিত বোধিসত্ত্বের অতীত জীবনের চমকপ্রদ কাহিনী ও বর্তমান কাহিনীর সঙ্গে তার যোগসূত্র জাতক সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কাহিনীর নায়ক স্বয়ং বোধিসত্ত্ব, তাঁর চরিত্র নানা বৈচিত্রমণ্ডিত। তিনি কখনও রাজা, কখনও শ্রেষ্ঠী, অমাত্য, সাধারণ মানুষ থেকে আরম্ভ করে পশুপক্ষি, সর্প ইত্যাদি তির্যক প্রাণীরূপেও আবির্ভূত। প্রতিটি জন্মে তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে প্রশংসনীয় স্থানে উন্নীত হয়েছেন।

জাতকের প্রধান উদ্দেশ্য যদিও উপদেশ দান, কিন্তু যে জাতকটি সার্থক রচনার গৌরব দাবী করে তা পাঠ করার পর জাতককারের মনের বাসনা বা বক্তব্যটি কি তা কারো অবিদিত থাকে না। পৃথক করে গল্প শেষে উপদেশ দিতে গেলে রসভঙ্গের ভয় থাকে। জাতককার তা সচেতনভাবে বর্জন করার প্রয়াস পেয়েছেন। জাতকে রোমান্স, রূপকথা,

www.pathagar.com

লোককথা, উপকথা, নীতিকথা এবং পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনের অগণিত সমস্যার সমাধানমূলক কাহিনী সন্নিবিষ্ট হয়েছে।[৬] জাতকে বিবৃত উপাখ্যান শ্রেণীর কয়েকটি কাহিনীর সংক্ষিপ্ত নমুনা আমরা এখানে উপস্থাপিত করব।

ন্যাগ্রোধ জাতক[৭] কাহিনীটি নিম্নরূপ ঃ এক শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী ছিল বন্ধ্যা, বাড়ির সকলে বলাবলি করতে লাগল, 'ঘরে বন্ধ্যা বৌ, বংশরক্ষা হল না।" শ্রেষ্ঠীর স্ত্রী তাদের বঞ্চিত করার অভিপ্রায়ে গর্ভিনী সাজল। দশমাস পূর্ণ হল। সে বলল, 'আমি বাপের বাড়ি যাব।' পথে এক বণিকবধু একটি পুত্র প্রসব করে ন্যাগ্রোধবৃক্ষের মূলে রেখে চলে গিয়েছিল। শ্রেষ্ঠী-বধু বাপের বাড়ি যাবার পথে নবজাত শিশুটিকে দেখে গ্রহণ করল এবং বাড়িতে সংবাদ পাঠাল– 'আমি একটি পুত্র সন্তান প্রসব করেছি।' শ্বশুর-শাশুড়ী শিশু পুত্রসহ বধূকে সাড়ম্বরে গৃহে আনয়ন করলেন। শিশুটির নাম হল ন্যগ্রোধ কুমার। সেই একই দিনে সেই রাজ্যে অপর কোন ব্যক্তির এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেছিল। শাখা নিম্নে জন্ম হয়েছিল বলে তার নাম রাখা হল শাখ কুমার। সেদিন শ্রেষ্ঠীর আশ্রিত দর্জিরও একটি পুত্র হল। তার নাম পোত্তিক। ন্যগ্রোধকুমারের সঙ্গে এরাও বড় হতে লাগল। ক্রমে তিনজনের মধ্যে গভীর হৃদ্যতা হল। এদিকে বারাণসীরাজের মৃত্যু হল। কিন্তু তাঁর কোন উত্তরাধিকারী ছিল না। উত্তরাধিকারী নির্বাচনের জন্য পুষ্পরথ প্রস্তুত হল। ভেরী বাদন করে সমগ্র রাজ্যে ঘোষণা করা হল– 'আগামীকল্য রাজসিংহাসনের যোগ্য ব্যক্তি নির্বাচন করা হবে।' সেইসময়ে তিন বন্ধু ন্যগ্রোধকুমার, শাখকুমার ও পোত্তিক একটি গাছের নীচে ঘুমোচ্ছিল। গাছের উপর তখন দুটি কুক্কুট বলাবলি করছে, 'এই, আমার গায়ে কি ফেলেছিস'? 'রাগ কর না ভাই, ভুলে পড়েছে'। -'জানিস, আমার কত ক্ষমতা'? -'কি'? - 'যে ব্যক্তি আমাকে মেরে স্থূল মাংস খাবে সে কাল রাজা হবে, যে মধ্যম মাংস খাবে সে কাল মন্ত্রী হবে, আর যে অস্থি-সংলগ্ন মাংস খাবে সে কাল ভাণ্ডাগারিক হবে'। পোত্তিক গাছের নীচ থেকে সব শুনল। সে গাছে উঠে কুক্কুটটিকে নামিয়ে আনল। তাকে যথারীতি আগুনে পুড়িয়ে তিন বন্ধু মিলে আহার করল। আহারান্তে পোত্তিক বলল, 'ন্যগ্রোধকুমার, তুমি কাল রাজা হবে, শাখকুমার, তুমি কাল মন্ত্রী হবে, আর আমি কাল ভাণ্ডাগারিক হব'। পরের দিন ন্যাগ্রোধকুমার এক শিলাখণ্ডে শয়ন করে নিদ্রা যাচ্ছিলেন এমন সময় চতুরঙ্গিনী সেনা পরিবৃত এক মনোরম পুষ্পরথ এসে থামল। রথে ছত্র, উষ্ণীষ, পাদুকা ও চামরাদি রাজচিহ্নাবলি। পুরোহিত ঘুমন্ত কুমারের দেহ-লক্ষণ পরীক্ষা করে বললেন, 'বারাণসী তো তুচ্ছ, সমগ্র জম্বুদ্বীপের তিনি অধীশ্বর হতে পারেন।' এমন সময় ন্যাগ্রোধ কুমারের নিদ্রা ভাঙ্গল। পুরোহিত বললেন, 'প্রভু, বারাণসীর রাজলক্ষ্মী আপনাকে বরণ করেছে। রাজধানীতে চলুন'। ন্যাগ্রোধকুমার বারাণসীর রাজা হলেন। বন্ধু শাখ কুমারকে করলেন মন্ত্রী আর পোত্তিককে করলেন তাঁর ভাণ্ডাগারিক। এখানে বোধিসত্ত্বের ভূমিকা নিতান্ত নগণ্য। কিন্তু গল্পে প্রাকৃত ও অতিপ্রাকৃত পরিবেশ মিলে এটিকে রূপকথার পর্যায়ে ফেলা যায়।[৮]

অভ্যন্তর জাতকে[৯] রাজমহিষীর একান্ত আকাঙ্ক্ষা হল অভ্যন্তর-আম্রফল ভোজনের। এই আম্র ভক্ষণ করলে তিনি রাজচক্রবর্তী পুত্র লাভ করবেন। উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য মহিষী

www.pathagar.com

রাজাকে বললেন, 'যদি অভ্যন্তর আম খেতে পাই তবেই আমি বাঁচব, নাহলে আমি আর বাঁচব না।' দুটি গাছের মধ্যবর্তী আম্রই হল অভ্যন্তর আম্র। রাজা অভ্যন্তর আম্র অন্বেষণের ত্রুটি করলেন না, কিন্তু কোথাও এরূপ অভিনব আম্র পাওয়া গেল না। পরিশেষে ব্রাহ্মণেরা বললেন, "মহারাজ, অভ্যন্তর আম্র দেবভোগ্য। হিমালয়ের কাঞ্চন গুহার অভ্যন্তরে এই গাছ জন্মে। মানুষের পক্ষে সেখানে যাওয়া অসম্ভব। একটি শুক-শাবককে প্রেরণ করুন।" কথামত একটি শুক শাবক নিযুক্ত করা হল। আকাশপথে উত্থিত হয়ে সে মনুষ্য পথ অতিক্রম করল। পরে প্রথম পর্বত, দ্বিতীয় পর্বত করে ক্রমান্বয়ে সপ্তম পর্বতে উপনীত হল। সেখানকার শুকেরা বলল, "কাঞ্চন পর্বতে এরূপ ফল পাওয়া যায়। এ ফল বৈশ্রবণের ভোগ্য। এ বৃক্ষ মূল হতে শাখা পল্লব পর্যন্ত সাতটি লৌহজালে বেষ্টিত। সহস্রকোটি রাক্ষস প্রতিনিয়ত তা রক্ষা করার দায়িত্বে নিয়োজিত। সেস্থান প্রলয়াগ্নি সদৃশ ভয়ঙ্কর, অতীতের ন্যায় বিভীষিকাপূর্ণ। সেখানে যেয়ো না।" শুক বলল, "আমাকে যেতেই হবে, পথ বলে দাও।" পথনির্দেশ পেয়ে শুক শাবক গভীর রাতে সেখানে গিয়ে পৌঁছল। কিন্তু বৃক্ষে আরোহণ করার সময় ধরা পড়ল। রাক্ষসেরা মহা উৎসাহে কেউ বলল, "এ পাখিটিকে মুখে দিয়ে গিলে ফেলি।" কেউ বলল, "একে দু'হাতে পিষে তাল পাকিয়ে তিল তিল করে ছড়িয়ে দিই।" কেউ বলল, "একে দু'ফাড়া করে চিরে আগুনে পুড়ে খাই।" শুক শাবক সব শুনল কিন্তু বিন্দুমাত্র ভীত হল না। জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কার ভৃত্য?" তারা বলল, "আমরা বৈশ্রবণ মহারাজের ভৃত্য।" শুক শাবক বলল, "তোমরা রাজার ভৃত্য, আমিও বারাণসী রাজার ভৃত্য। তাঁর আদেশে এখানে এসেছি। আজ তাঁর কাজে জীবন উৎসর্গ করে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করব।" রাক্ষসেরা শুক শাবককে মারতে পারল না, মুক্তি দিল। শুক বলল, "আম্রফল আমাকে পেতেই হবে, বল কিভাবে পেতে পারি?" তারা পথ নির্দেশ দিল। শুক শাবক কাঞ্চন পর্বতমালার এক দুর্গম অংশে জ্যোতিরস নামে এক তাপসের পর্ণশালায় উপস্থিত হল। এই তাপস হলেন বৈশ্রবণের গুরু। বৈশ্রবণ প্রতিদিন গুরুর জন্য চারটি করে আম্রফল প্রেরণ করেন। শুক শাবক তাপসকে তুষ্ট করে সেই আম্রফল লাভ করল। রাণীর সাধ পূর্ণ হল। জাতকে কল্পনার বৈচিত্র্যময় রূপ কাহিনীকে প্রাণবন্ত করে তুলেছে। গল্পকার যেন অভিজ্ঞতার নানা পুঁজিকে সেজে গুছে নতুনত্বের সৃষ্টি করেছেন। এরূপ উপাখ্যান অতি অভিনব ও নতুন স্বাদে উপভোগ্য।

সাম জাতকটি[১০] অতীব হৃদয়গ্রাহী মর্মন্তুদ উপাখ্যান। সাম ছিলেন অতি ধার্মিক অন্ধ পিতামাতার একমাত্র সন্তান। তিনি তাঁর অন্ধ পিতামাতাকে নিয়ে গভীর বনে বাস করতেন। সারাক্ষণ পিতামাতার সেবায় তিনি নিজেকে নিয়োজিত রাখতেন। একদিন তিনি তাঁদের জন্য জল অন্বেষণ করতে গেলেন, সেই সময়ে বারণসীরাজ পিলিয়ক্খ কর্তৃক শিকারের উদ্দেশ্যে নিক্ষিপ্ত বিষাক্ত শর তার দেহে বিদ্ধ হল। কোন মন্দবাক্য বালকের মুখ হতে বের হল না। শুধু মনে মনে আক্ষেপ করে ভাবতে লাগলেন, সেই দীন পিতামাতার নিষ্ঠুর পরিণতির কথা, যাঁদের একমাত্র আশ্রয় ছিলেন তিনি। রাজা তাঁর কৃতকর্মের জন্য গভীরভাবে মর্মাহত হলেন এবং তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে তাঁর মাতা-পিতার দায়িত্ব গ্রহণ করার

www.pathagar.com

প্রতিশ্রুতি প্রদান করলেন। সাম যে পর্ণকুটিরে তাঁর পিতা-মাতা থাকেন তার পথ নির্দেশ দিলেন এবং তাঁর প্রতি ধন্যবাদ জ্ঞাপন করার পর পরই সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়লেন। তখন রাজার তীব্র মনোবেদনা অনুভূত হতে লাগল। ঠিক সেই সময়ে এক বনদেবতা সান্ত্বনা দিয়ে বললেন যে, সে তার পাপ থেকে মুক্তি পাবে যদি সে সামের পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হয় এবং স্বীয় পুত্রের ন্যায় তাদের দেখাশুনা করে। রাজা এক মগ জল নিয়ে সেই পর্ণকুঠিতে সামের পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হলেন। রাজার পদ শব্দ শুনে বৃদ্ধ পিতা বুঝতে পারলেন যে, ইহা তাঁর পুত্রের পদশব্দ নয়। রাজা তাঁর পরিচয় প্রদান করলে অন্ধ বৃদ্ধ পিতা তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং জল ও ফল দিয়ে আপ্যায়ন করলেন। রাজা জিজ্ঞেস করলেন, তাঁরা এসব ফল কোথায় প্রাপ্ত হন? তিনি উত্তর করলেন, "আমাদের অতি প্রিয়, সুন্দর ও তরুণ এক পুত্র আছে। সে-ই আমাদের জন্য জল ও ফল আহরণ করে।" অনন্তর রাজা সমস্ত ঘটনা বিবৃত করলেন, "আপনাদের প্রিয় পুত্র এখন মৃত, আমিই তাকে হত্যা করেছি।" পিতার শান্ত অথচ বেদনাময় আক্ষেপ মুখ থেকে ধ্বনিত হল। কিন্তু মায়ের বুক ফেটে আর্ত চীৎকার বেরুল। রাজা পিতা-মাতাকে সান্ত্বনা দিলেন এবং অনুরোধ করলেন, সামের মত তাঁকে পুত্ররূপে মনে করতে, তিনি অঙ্গীকার করলেন সামের ন্যায় তাঁদের যত্ন নেবেন। কিন্তু পিতা-মাতা তাঁকে শুধু অনুরোধ করলেন, তাঁদেরকে সন্তানের মৃতুদেহের নিকট নিয়ে যেতে। রাজা অনিচ্ছাসত্ত্বেও তাঁদেরকে সামের মৃতদেহের কাছে নিয়ে গেলেন। মা সত্যক্রিয়া করলেন, "যদি সাম সর্বদা ধর্মত জীবন যাপন করে থাকে তাহলে বিষ অপসৃত হবে এবং সে আমাদের সামনে জীবিত হয়ে দাঁড়াবে।" পিতাও অনুরূপ সত্যক্রিয়া করলেন। বন দেবতাও সত্যক্রিয়া করলেন। তৎপর পিতা-মাতার সামনে সতেজ স্বাস্থ্যবান সাম জেগে উঠলেন, তাঁদের সামনে দাঁড়ালেন এবং হতবাক রাজাকে স্বাগত জানালেন। তিনি বললেন, যিনি পিতা-মাতার সেবা করেন তাঁকে দেবগণ রক্ষা করেন এবং মৃত্যুর পরও স্বর্গারোহণ করেন।[১১] পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের সেবা মনোভাব ভারতীয় ঐতিহ্যের বহিঃপ্রকাশ উপাখ্যানের বিষয়বস্তু। আর সেই পিতা-মাতাগত প্রাণ পুত্রের জীবন সত্যক্রিয়ার প্রভাবে পুনঃ লাভ করলেও এতে পাঠকের মনে কোন সন্দেহের উদ্রেক করে না, বরঞ্চ এটা সমীচীন বলে মনে হয়। নিঃসন্দেহে এটা রূপকথার মত একটি চমৎকার কাহিনী।

এক সময় লোককথার উপর ভিত্তি করে রচিত হয়েছিল বলে জাতককে ভারতীয় লোককথার প্রাচীন উৎস বলা হয়। হয়ত জাতকের একটি সহজ প্রাণবন্ত ধারা পরবর্তীকালে গুণাঢ্যের বৃহৎকথা, সোমদেবের কথাসরিৎসাগর ইত্যাদির মধ্য দিয়ে অগ্রসর হয়ে আধুনিক ভারতীয় লোককথার রাজ্যে এসে পৌঁছেছে। বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় অনেক আধুনিক প্রচলিত রূপকথা ও উপাখ্যান জাতক কাহিনী হতে প্রাণরস সংগ্রহ করে নিয়েছে। কালের বিবর্তনে জাতকের ধর্মীয় অংশ বিলুপ্ত হয়ে সাহিত্যগুণ সমৃদ্ধ হয়েছে। বোধিসত্ত্বের বিশেষ ভূমিকা বাদ দিলে অনেক জাতককে নির্দ্বিধায় রূপকথা বা উপকথা পর্যায়ে ফেলা যায়। জাতকের একটি সার্বজনীন আবেদনও ছিল। এই জন্য জাতকের রূপকথা ও উপকথার যে প্রাণবন্ত মৌখিক ধারা ছিল তা কোনো ধর্মীয় পরিমণ্ডলে

www.pathagar.com

মৃত্যুবরণ করেনি। ভারতীয় রূপকথা ও উপকথার কল্পলোকে এসে ক্রমবিকাশের মাধ্যমে এ ধারাটাই মুক্তি লাভ করেছে।[১২]

ইল্লীশ জাতক[১৩] কৃপণের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য প্রকাশক কাহিনী। কৃপণেরা স্বভাবতই লোভী হয়। তারা সম্পত্তি নিজেও ভোগ করে না অপরকেও দান করে না। ইল্লীশ খঞ্জ, কুব্জ, কৃপণ ; এতই কৃপণ যে দান করা দূরে থাক, কপর্দকও ভোগ করেত পারত না। ইল্লীশের একদিন সাধ হল সুরা পান করার। কিন্তু মনে হল, যদি আমি সুরা পান করি বাড়ির অন্যরাও তা করতে চাইবে, এতে বহু অর্থের অপচয় হবে। সে মনের অদম্য সাধ মনে চেপে রাখল, কিন্তু দিন দিন শীর্ণ হতে লাগল। অবশেষে স্ত্রীর অনুরোধে অনেক ভেবেচিন্তে শুঁড়ির দোকান থেকে এক পাত্র সুরা নিয়ে রাজপথের বহু দূরে এক নদীতীরে লতাপাতার আড়ালে নির্জন স্থানে উপবেশন করল। এদিকে ইন্দ্র ইল্লীশের রূপ ধারণ করে রাজসভায় উপস্থিত হয়ে বললেন, "মহারাজ, আমার চুরাশি কোটি সুবর্ণ আছে, আপনি তা রাজভাণ্ডারে নিয়ে আসুন অথবা আপনি আদেশ করুন আমি তা দান করে দিই।" রাজা বললেন, "তথাস্তু মহাশ্রেষ্ঠী।" ইল্লীশ শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে রথগুলো রত্নে সজ্জিত করল। ইল্লীশ রূপী ইন্দ্র রাশি রাশি ধন দান করতে লাগলেন, লোকজন রথে রত্ন বোঝাই করে পথে বের হল। চারদিকে ইল্লীশ শ্রেষ্ঠীর জয়জয়কার ধ্বনি উঠল। সেই উল্লাসধ্বনি ইল্লীশ শ্রেষ্ঠীর কানেও পৌছল, নিমেষে তাঁর সুরার নেশা কেটে গেল। সে চীৎকার করে উঠল "আরে এ রথ আমার, এ গরু আমার, এ সম্পত্তি আমার। এগুলো নিয়ে কোথায় যাচ্ছ?" লোকেরা বলল, "আমাদের প্রভু ইল্লীশ শ্রেষ্ঠী এসব দান করেছেন। তুমি বলার কে?" ইল্লীশের মাথায় এক চড় মেরে চালক রথ চালিয়ে দিল। ইল্লীশ উঠে আবার রথ ধরল, আবার চড় খেল। এবার বাড়ির পথ ধরল। বাড়ির ভৃত্যেরা তাকে বেদম প্রহার করে বের করে দিল। নিরুপায় ইল্লীশ রাজদরবারে নালিশ জানাল। রাজা শ্রেষ্ঠীরূপী ইল্লীশকে ডাকালেন। দুজনে রাজদরবারে উপস্থিত। রাজা, অমাত্য, ইল্লীশের স্ত্রী, পুত্রকন্যা, দাসদাসী কেউই প্রকৃত ইল্লীশকে চিনতে পারল না। ইল্লীশ বলল, "নাপিত জানে– আমার মস্তকে একটি আঁচিল আছে।" নাপিত দেখল দুজনের মাথায় একই স্থানে সমান আঁচিল। প্রকৃত ইল্লীশ শোকে দুঃখে মুর্ছিত হয়ে পড়ল। ইন্দ্র এবার নিজের পরিচয় দিলেন। ইল্লীশকে শিক্ষা দিলেন দান দিয়ে। ইল্লীশ দানে রমিত হল। কৃপণ হল দাতা। দানের মহত্ত্বতা প্রকাশ পেল। রূপকথার আবরণে কার্পণ্য ত্যাগের শিক্ষা দেওয়া হল আলোচ্য জাতক কাহিনীতে।

অনেক জাতক আখ্যানে যাদুবিদ্যা ও ঐন্দ্রজালিক এবং মন্ত্রশক্তির কলাকৌশল প্রবেশ করেছে। ভারতীয় আদিম সমাজ ব্যবস্থায় যাদুবিদ্যা ও ঐন্দ্রজালিক প্রক্রিয়ার বিশেষ প্রভাব লক্ষ্য করা যায়। এই প্রক্রিয়ার অনুষ্ঠাতৃগণ ছিলেন সমাজের নায়ক। তাঁদের অনুষ্ঠিত ক্রিয়াকর্মের দ্বারা সমাজ-জীবন পরিচালিত ও নিয়ন্ত্রিত হত। জনগণও যাদুবিদ্যায় গভীর আস্থাশীল ও নিষ্ঠাবান ছিল। ভারতীয় অন্যান্য প্রাচীন সাহিত্যের ন্যায় জাতক সাহিত্যেও এরূপ কাহিনী জনগণকে মোহিত করেছে। এ প্রসঙ্গে দধিবাহন জাতকটি[১৪] উল্লেখযোগ্য।

www.pathagar.com

কাহিনীতে আছে– তপস্যা বলে জ্যেষ্ঠভ্রাতা দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। পরে কনিষ্ঠ তিন ভ্রাতার আকর্ষণে মর্ত্যে অবতরণ করে মধ্যম ভ্রাতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি চাও?" সে ছিল পাণ্ডুরোগী। বলল, "আমি আগুন চাই।" দেবতা তাকে একখানা কুঠার দিয়ে বললেন, "তোমার যদি আগুনের দরকার হয় তবে একে বলবে– 'কাষ্ঠ সংগ্রহ কর এবং অগ্নি প্রজ্বলিত কর। কুঠার তোমাকে আগুন প্রস্তুত করে দেবে।" তারপর সেজ ভাইকে জিজ্ঞেস করলেন, "তোমার কি চাই?" তার বাসস্থানের পাশ দিয়ে হস্তী চলাচলের পথ ছিল। সে বলল, "এদের তাড়াবার ব্যবস্থা চাই।" দেবতা তাকে একটি ভেরী দিয়ে বললেন, "এর একদিকে আঘাত করলে শত্রু পলায়ন করবে, অন্যদিকে আঘাত করলে শত্রু মিত্র হবে, আর চতুরঙ্গ সেনায় পরিণত হয়ে তোমাকে বেষ্টন করে থাকবে।" অতঃপর কনিষ্ঠের নিকট গিয়ে দেবতা জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কি চাও?" সেও ছিল পাণ্ডুরোগী। বলল, "আমি দধি চাই।" দেবতা তাকে একটি দধি ভাণ্ড দিয়ে বললেন, "এটি উল্টিয়ে ধরলে এর থেকে দধির মহানদী প্রবাহিত হবে, তুমি এর দ্বারা সাম্রাজ্যও লাভ করতে পারবে।"

এক বরাহের একটি মণি ছিল। মণিটি মুখে তুলে নিলে আকাশে উঠা যেত। বরাহ এ মণির সাহায্যে সমুদ্রগর্ভের একটি দ্বীপের এক উড়ম্বর বৃক্ষে বাস করত। একদিন বরাহ গাছের নিচে ঘুমিয়ে পড়ল। তার পাশে ছিল মণিটি। সেই রাজ্যের এক অকর্মণ্য ঘুমন্ত বরাহের পাশ থেকে মণিটি চুরি করল। মণি নিয়ে সে মধ্যম ভ্রাতার নিকট উপনীত হল আর কুঠারের গুণ জ্ঞাত হয়ে মণির সঙ্গে তা বদল করল। একইভাবে ভেরী ও দধি ভাণ্ডটিও তার হস্তগত হল। এবার সে রাজার নিকট চরম পত্র প্রেরণ করল– "হয় রাজ্য দাও, না হয় যুদ্ধ কর।" রাজা যুদ্ধে অকর্মার নিকট পরাজিত ও নিহত হলেন। এবার অকর্মা হল রাজ্যের রাজা, নাম হল দধিবাহন।[১৫] কাহিনীটি চমৎকার, ঐন্দ্রজালিক বা যাদুবিদ্যা ও অকর্মার বুদ্ধিমত্তার পরিচয় বহন করে।

এরূপ বহু অলৌকিক কাহিনী জাতকে স্থান পেয়েছে। পরন্তপ জাতকে[১৬] বোধিসত্ত্ব চণ্ডালরূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি এমন একটি মন্ত্র জানতেন যার দ্বারা অকালে আম্রফল সংগ্রহ করা যেত। তিনি আম্রবৃক্ষের সপ্তপদ দূরে অবস্থান করে জলে মন্ত্র জপ করতেন। সেই মন্ত্রপূত জল মাটিতে পতিত হওয়া মাত্র বৃক্ষের পত্র খসে পড়ত, নব কিশলয় উদ্গম হত, মুকুল দেখা দিত, সঙ্গে সঙ্গে আম্রফল মুহূর্তের মধ্যে পেকে যেত এবং বৃক্ষ হতে মাটিতে ঝরে পড়ত। এই ফল ছিল অতি সুস্বাদু ও রসাল, যেন দেবভোগ্য। পঞ্চায়ুধ জাতকে[১৭] বোধিসত্ত্ব পঞ্চায়ুধ কুমার খড়্গ, শক্তি, ধনু; পরশু, চর্ম এই পঞ্চবিধ আয়ুধধারী। বনে তিনি শ্লেষলোম যক্ষ কর্তৃক আক্রান্ত হন। যক্ষের শরীর ছিল তালবৃক্ষের ন্যায়, মস্তকটি ছিল যেন চিলাকোঠা, চোখ দুটো বড় বড় গামলার মত, সামনের দাঁত দুটো যেন বড় বড় মূলা, মুখ বাজপাখির মত আর হাত পা নীলবর্ণ। পঞ্চায়ুধ শ্লেষলোমের দিকে পঞ্চাশটি বিষবাণ নিক্ষেপ করলেন। যক্ষের দেহে ছিল অসংখ্য লম্বা লোমের কঠিন ঐন্দ্রজালিক আবরণ। সে একবার গা ঝাড়া দিতেই সমস্ত শর মাটিতে পড়ে গেল। পরে রাজপুত্র আরও শক্তিশালী শর নিক্ষেপ করলেন, কিন্তু সব চেষ্টা ব্যর্থ হল, তাঁর নিক্ষিপ্ত

www.pathagar.com

সমস্ত শর যক্ষের লোমে আবদ্ধ হয়ে রইল। এবার কুমার ডানহস্ত, বামহস্ত, ডান পদ, বাম পদ দিয়ে সজোরে যক্ষকে আঘাত করলেন, অবশেষে মস্তক দিয়ে আঘাত করলেন। কুমারের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ যক্ষের লোমে আবদ্ধ হয়ে রইল, তিনি যক্ষ দেহে ঝুলতে লাগলেন। যক্ষ বলল, "এবার তোমার মৃত্যু আসন্ন।" কুমার বললেন, "আমার মৃত্যু তোমারও মৃত্যুর কারণ হবে। কারণ আমাকে হজম করলেও আমার পঞ্চায়ুধকে তুমি হজম করতে পারবে না।" যক্ষ ভয় পেল, সে রাজকুমারকে ছেড়ে দিল। রাজকুমারের দুর্দম সাহসিকতার চমৎকার দৃষ্টান্ত উপাখ্যানটি।

অন্যন্যসাধারণ গুণের অধিকারী রাজা কুশ।[১৮] রাজা ইক্ষাকুর পুত্র কুশ ছিলেন অত্যন্ত কদাকার কিন্তু সুচতুর ও জ্ঞানী। তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেয়া হলে তিনি একটি সোনার প্রতিমা তৈরি করে বললেন, "এই প্রতিমার ন্যায় সুন্দরী কন্যা পাওয়া গেলে তবেই বিয়ে করব।" পাত্রী খুঁজতে গিয়ে প্রতিমাটিকে শহর থেকে শহরান্তরে নেওয়া হল। অবশেষে প্রতিমা অপেক্ষা রূপসী মদ্র দেশীয় রাজকন্যা প্রভাবতীকে পাওয়া গেল। প্রভাবতী কুশ কুমারের স্ত্রী হতে সম্মত হলেন। কিন্তু শর্ত হয় যে, রাত্রিবেলায় সহবাসের সময় উভয়ের সাক্ষাৎ হবে, এর পূর্বে বা পরে তাঁদের পরস্পর দেখা হবে না। বিয়ের কিছুদিন পর উভয়ে পরস্পরকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অবশেষে ছলে কৌশলে পরস্পরকে দেখলেন। কুশকুমারের এরূপ কদাকার রূপ দর্শন করে প্রভাবতী পিতার বাড়ি চলে গেলেন, বললেন "এরূপ কুৎসিত স্বামীর সংসার করব না।" কিন্তু কুশকুমারের মন-প্রাণ স্ত্রীর জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। তিনি দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হলেন, যে কোনো ভাবেই হোক তাঁকে ফিরিয়ে আনতে হবে। তিনি সাগল নগরে যেখানে তাঁর স্ত্রী প্রভাবতী বাস করছিলেন সেখানে উপনীত হলেন। সেখানে তিনি সর্বপ্রথম সুমধুর বাঁশির সুরে রাজার মনোযোগ আকর্ষণ করার প্রয়াস পেলেন। তৎপর অপরূপ মৃন্ময়পাত্র নির্মাণ, পরে কারুকার্যখচিত ঝুড়ি নির্মাণ করে, তৎপর মালাকার সেজে মাল্য তৈরি করে, অবশেষে পাচকের বেশে রাজার সহানুভূতি লাভ করেন এবং রাজবাড়ির পাচক হিসাবে নিয়োগ লাভ করেন। প্রভাবতী কিন্তু সব জানতে পেরে কুশকুমারকে সর্বদা অবজ্ঞা ও ঘৃণা করতেন। কুশকুমার মর্মাহত হলেন স্ত্রীর ব্যবহারে। দেবরাজ শত্রু সাতজন রাজকুমারকে প্রেরণ করলেন মদ্র রাজের নিকট, সকলেই প্রভাবতীর পাণিপ্রার্থী। মদ্ররাজ ভীষণ বিপদে পড়লেন। যদি তিনি একজনকে কন্যাদান করেন তাহলে অন্যরা রুষ্ট হয়ে তাঁর সঙ্গে যুদ্ধ করবে। অতঃপর তিনি প্রভাবতীকে বললেন, "মা, তোমাকে সাত টুকরো করে সাতজন রাজাকে সমানভাবে দিতে হবে।" প্রভাবতী ভীত হয়ে রন্ধনশালায় গিয়ে কুশ কুমারের পায়ে পড়লেন এবং তাঁকে বাঁচানোর জন্য প্রার্থনা করলেন। কুশ এখন যেন একজন অসম বীরপুরুষ। সপ্তরাজাকে পরাজিত করে বন্দি করলেন। কিন্তু তিনি যেমন ছিলেন দয়ালু তেমনি ছিলেন বুদ্ধিমানও। তিনি রাজার অপর সাতজন রাজকুমারীকে প্রত্যেক রাজার হাতে একজন করে সমর্পণ করার ব্যবস্থা করলেন। অনন্তর তিনি তাঁর স্ত্রী প্রভাবতীকে নিয়ে স্বরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন। গল্পে রূপের নয়, গুণের মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। বহুবিধ গুণের অধিকারী কুশ কুমার কুৎসিৎ হলেও বিভিন্ন বিদ্যায় ছিলেন পারদর্শী।

www.pathagar.com

মানব জীবনের সাধারণ স্তরের কিছু কিছু ঘটনা দিয়ে বহু জাতক কাহিনী গড়ে উঠেছে। এমন একটি আখ্যান সুজাতা জাতক।[১৯] কাহিনীটি এরূপ–বারাণসীরাজ ব্রহ্মদত্ত একদিন সুজাতা নাম্নী এক অনিন্দ্যসুন্দরী রূপ-লাবণ্যময়ী, পর্ণিক কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন। সেই সময় সুজাতা এক ঝুড়ি কুল মাথায় করে ফেরি করে ঐ রাজপথ দিয়ে যাচ্ছিল। রাজা তাকে দেখে মুগ্ধ হলেন এবং সে অবিবাহিতা জেনে তাকে বিয়ে করে অগ্রমহিষীর পদে অভিষিক্ত করলেন। রাজা প্রিয়তমা পত্নীকে নানাভাবে স্নেহ ও সম্মান প্রদান করলেন।

একদিন রাজা স্বর্ণপাত্রে কুল নিয়ে খেতে দেখে অগ্রমহিষী জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, কি ফল খাচ্ছেন। স্বর্ণপাত্রের এই ফলগুলো কি ?" রাজা সুজাতার এরূপ ছলনা ও প্রহসনে ক্রুদ্ধ হলেন। কুল বিক্রি যার ছিল জীবিকা, সে-ই কিনা পিতৃকুলের ব্যবসাকে এত শীঘ্রই ভুলে গেল ? মহিষী হয়ে সে ভারী অহঙ্কারিণী হয়েছে, তাকে সমুচিত শাস্তি দেওয়া উচিত। তিনি বললেন, "এত শীঘ্র তুমি তোমার অতীতকে ভুলে গেলে ? ব্যঙ্গ করার স্থান পাওনি ? দূর হয়ে যাও এখান থেকে।" রাজার ধর্মানুশাসক ছিলেন বোধিসত্ত্ব। তিনি রাজাকে বুঝিয়ে দিলেন– এ হচ্ছে অযোগ্য পাত্রীদের নৈতিকতা। তারা হঠাৎ করে উচ্চ পদ পেয়ে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়ে, অতীতকে ভুলে যেতে চায়, 'ধরাকে সরা জ্ঞান করে।' রাণীকে ক্ষমা করে দেবার জন্য বোধিসত্ত্ব অনুরোধ করলেন। রাজা সুজাতার অপরাধ ক্ষমা করে দিলেন। বাকি জীবন উভয়ে পরস্পর সম্প্রীতির মাধ্যমে কাটাতে লাগলেন। জীবনের একটি খণ্ড চিত্র এই কাহিনীতে তুলে ধরা হয়েছে।

লোককাহিনীর মত বহু চিরাচরিত গল্প কৌতুক রস সৃষ্টি করেছে জাতক কাহিনীতে। রোহিণী জাতকে[২০] দাসী রোহিণীর মাতা ছিল অতি বৃদ্ধা। একদিন ঢেঁকিঘরে শুইয়ে সে কন্যাকে বলল, "মা, মাছিগুলো বড়ই উৎপাত করছে, এগুলো একটু তাড়িয়ে দে"। নিকটে ছিল একটি মুষল। রোহিনী মুষলের আঘাতে মাছি মারতে গিয়ে মায়ের গায়ে জোরে আঘাত করল। মাতা সঙ্গে সঙ্গে মারা গেল। তারপর 'মা' 'মা' বলে কাঁদতে লাগল। অনুরূপ আর একটি কাহিনী মশক জাতক[২১] । এক বৃদ্ধ কাঠুরে একদিন কাজ করছিল। এমন সময় একটি মশা তার মাথায় হুল ফুটিয়ে দিল। পাশে ছিল বোকা পুত্র। তাকে বলল, "বাবা, আমার মাথায় মশাটা তাড়িয়ে দে।" সে কুঠার দিয়ে সজোরে আঘাত করল পিতার মস্তকে। বৃদ্ধের মস্তক দ্বিখণ্ড হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। এভাবে বহু কাহিনী জাতক সাহিত্যে স্থান পেয়েছে যা প্রচলিত জীবন কাহিনীর সঙ্গে সম্পৃক্ত।

বালক পুত্র পিতার দুষ্কর্মের শিক্ষা দিয়েছে তক্কল জাতকে[২২]। এক ব্যক্তি দুষ্ট স্ত্রীর পরামর্শক্রমে নিজের বৃদ্ধ পিতাকে জীবন্ত মাটি চাপা দেবার জন্য শ্মশানে গর্ত করছিল। তার পাশে ছিল তারই বালক সন্তান। সেও পিতার মত করে অদূরে আর একটি গর্ত খুঁড়তে লাগল। পিতা জিজ্ঞেস করল, "তুই কেন গর্ত করছিস বাবা ?" পুত্র বলল, "বাবা, তুমি যখন বুড়ো হবে, তোমাকেও আমি কবর দেব, তাই গর্ত করে রাখছি।" এবার পিতার জ্ঞানোদয় হল। সে পুত্রকে নিয়ে গৃহে ফিরে গেল। কাত্যায়ণী জাতক[২৩], পদকুশলমানব জাতক[২৪] প্রভৃতিতেও বৃদ্ধ পিতা-মাতার প্রতি স্ত্রীর পরামর্শে নিষ্ঠুর

www.pathagar.com

আচরণের বিষয় বর্ণিত হয়েছে। বস্তুতপক্ষে মাতা-পিতা ও বয়োজ্যেষ্ঠদের প্রতি যথাযথ সম্মান প্রদর্শন করার লক্ষ্যে এ সকল কাহিনীর অবতারণা।

জাতকে বন্ধুত্বের কাহিনীসমূহ লোককথার মত জনপ্রিয় ও উপভোগ্য। সুরুচি জাতকে[২৫] দুই বন্ধু, এক জনের নাম সুরুচি অন্যজনের নাম ব্রহ্মদত্ত। দুই বন্ধু গুরুগৃহের পাঠ সমাপ্ত করে দেশে ফিরে যাচ্ছিলেন। কিছুদূর আসার পর দুই বন্ধু দাঁড়ালেন। এখানে পথ দুই ভিন্ন দিকে চলে গেছে দুই রাজ্যের অভ্যন্তরে। দুই বন্ধু আলিঙ্গন করলেন পরস্পরকে আর প্রতিজ্ঞা করলেন– যদি আমার পুত্র হয় তোমার কন্যা হয়, অথবা যদি আমার কন্যা হয় তোমার পুত্র হয় তাহলে পরস্পরের মধ্যে বিয়ে দেব।" দুই বন্ধু বিদায় নিয়ে স্ব স্ব রাজ্যে চলে গেলেন। যথাসময়ে সুরুচির পুত্র আর ব্রহ্মদত্তের কন্যা জন্ম নিল। সুরুচি বলল, "আমি ব্রহ্মদত্তের কন্যাকে পুত্রবধু করব।" ব্রহ্মদত্তের একমাত্র কন্যা সুমেধা। সে পিতার অতি আদরের। মাতা-পিতার ইচ্ছা স্বামী একপত্নী হবে। অবশেষে ব্রহ্মদত্ত সুরুচির নিকট সংবাদ পাঠালেন, "আমি আপনার সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলাম বটে, কিন্তু এক শর্তে কন্যা সম্প্রদান করব যদি পুরুষ একপত্নী হয়।" সুরুচি বললেন, "তা কি করে সম্ভব। আমার এত বড় সাম্রাজ্য। এ রাজ্যের অধীশ্বরের ষোড়শ সহস্র পত্নী থাকাও কিছুই নয়।"

সুরুচি কুমার সুমেধার রূপগুণের খবর ইতিপূর্বেই শুনেছিলেন, তিনি রাজী হলেন, "সুমেধাকেই বিয়ে করব, আমার বহুপত্নীর প্রয়োজন নেই।"

অপর দুই বন্ধুর কাহিনী শোণক জাতকে[২৬] অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত হয়েছে। রাজকুমার অরিন্দম আর পুরোহিতপুত্র শোণক, দুজনের মধ্যে খুব ভাব, গভীর বন্ধুত্ব। কুমারদ্বয় একসঙ্গে বড় হলেন, বিদ্যাশিক্ষা করলেন। শিক্ষা শেষে গুরুগৃহ হতে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে বারাণসীতে পুষ্পরথ কর্তৃক অরিন্দম কুমার রাজা নির্বাচিত হলেন। বারাণসীর রাজপুরোহিত বললেন, "আপনাকে রাজলক্ষ্মী বরণ করেছে।" অরিন্দম কুমার রাজপদে অভিষিক্ত হলেন। তিনি বন্ধুর কথা একেবারে ভুলে গেলেন। চল্লিশ বছর অতীত হল। একদিন রাজার স্মরণ হল শোণক কুমারের কথা। তখন রাজৈশ্বর্য রাজ সিংহাসন সকলই তাঁর কাছে অসার মনে হল। তিনি গান রচনা করে পুরস্কার ঘোষণা করলেন– "আমার প্রিয় বন্ধু শোণক, আমরা একসঙ্গে কত খেলাধূলা করেছি। আজ কে তার সংবাদ দেবে। যে বলবে শোণক কোথায় আছে তাকে শতমুদ্রা, আর যে বলবে শোণককে দেখেছে তাকে সহস্র মুদ্রা প্রদান করা হবে।" এগানটি প্রচার করা হল সমগ্র দেশে। সকলের কণ্ঠস্থ গানটি। বালক পঞ্চচূড়ক সেই গানটি গাইতে গাইতে বনে কাষ্ঠ আহরণ করছিল। তার সঙ্গে শোণকের দেখা হল। তিনি আর একটি গান রচনার মাধ্যমে রাজাকে তাঁর অবস্থিতি জানালেন। আসলে প্রাচীনকালের কিছু কিছু গল্প কাহিনী নিছক গল্প হলেও অবিশ্বাস্য মনে হয় না।

জাতকে যক্ষ-যক্ষিনীর কাহিনীগুলো গল্পরসে সমৃদ্ধ। এরা বাংলার লোককথার রাক্ষস রাক্ষসীর মত। এরা বহুরূপী ও বিশালদেহী এবং এদের চেহারা অতি কদর্য, আবার

www.pathagar.com

কমনীয় মূর্তিও পরিগ্রহ করতে পারে। তারা অপরিমিত দৈহিক শক্তির অধিকারী হলেও মানুষের বুদ্ধির কাছে চিরকাল পরাজিত হয়েছে। এদের দৈহিক গঠন অতি কুৎসিত ও ভয়ঙ্কর, মূলোর মত দাঁত, কুলোর মত কান, হাতির মত পা, গায়ের রং কালো, চক্ষু বড় বড় রক্তাভ, লম্বা নাম, হাত পায়ের লম্বা লম্বা আঙ্গুলে তীব্র নখ। তারা যেমন নিষ্ঠুর তেমনি ভয়ঙ্কর। আবার তাদের মধ্যে স্নেহ মমতাও দেখা যায়। জয়দ্দিস জাতকে[২৭] যক্ষিণী রাণীর শিশুপুত্রকে ভক্ষণ করতে এনে অপত্য মাতৃস্নেহ জাগ্রত হয়। ফলে তাকে আর ভক্ষণ না করে মাতৃস্নেহে প্রতিপালন করতে থাকে। একটি পাষাণ গহ্বরে তাকে রাখা হয়। শিশুটি ক্রমশ বড় হলে যক্ষদের ন্যায় মনুষ্য মাংস খেত কিন্তু যক্ষদের ন্যায় অদৃশ্য হতে পারত না। যক্ষিণী তাকে একটি ঐন্দ্রজালিক শিকড় দিল। এর প্রভাবে সে অদৃশ্য হয়ে মনুষ্য ভক্ষণ করতে পারত।

পদকুশলমানব জাতক[২৮] যক্ষিণীর স্নেহ প্রেমের আর একটি মর্মান্তিক কাহিনী। এ জাতকে যক্ষিণী এক ব্রাহ্মণকে আহার্য রূপে গ্রহণ না করে পতিরূপে গ্রহণ করে। যক্ষিণী খাদ্যান্বেষণে বের হবার সময় ব্রাহ্মণ যাতে পালাতে না পারে সেজন্য গৃহমুখে ভারী পাথর চাপা দিয়ে যেত। এভাবে দিন কাটে। কিছুদিন পর তাদের এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয়। ক্রমে ছেলেটি বড় হয়ে উঠল। একদিন সে ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞেস করল, "বাবা, মার আর তোমার মুখ এক রকম নয় কেন ?" ব্রাহ্মণ বলল, "তোমার মা নরমাংসভোজী যক্ষিণী। আমি ও তুমি মানুষ সেজন্য।" "তাহলে আমরা এখানে কেন থাকব ? চল, আমরা লোকালয়ে পালিয়ে যাই।" ব্রাহ্মণ বলল, "ও কথা মুখে এনো না। তোমার মা শুনতে পেলে আমাদের দুজনকেই মেরে ফেলবে।"

আর একদিন যক্ষিণীর অনুপস্থিতিতে পিতা-পুত্র পরামর্শ করে পলায়ন করল। যক্ষিণী এসে তাদের না পেয়ে বায়ুবেগে দিয়ে তাদের ধরে আনল। একদিন পুত্র বলল, "মা, মাতৃধন পুত্রের প্রাপ্য, আমার মাতৃধন আমাকে দাও।" যক্ষিণী বলল, তুই কি চাস বল।" "তোমার অধিকার সীমা কতটুকু আমাকে বল।" যক্ষিণী পুত্রের উদ্দেশ্য বুঝতে পারল না। সে বলল, "চারদিকে পর্বতেবেষ্টিত ত্রিশ যোজন দীর্ঘ ও পাঁচ যোজন বিস্তৃত জায়গা আমার অধিকার সীমা।" পরদিন পিতা-পুত্র অতি দ্রুত সেই কথিত সীমা পার হয়ে গেল। এমন সময় যক্ষিণী এসে হাজির। সে আর্ত আবেদন জানাল, "বাবা, আয় ফিরে আয়।" পুত্র বলল, "না, মা, আমরা আর ফিরব না, কারণ তুমি যক্ষিণী আর আমরা মানুষ। চিরকাল আমরা একস্থানে থাকতে পারি না।" যক্ষিণী বলল, "তাহলে তোমাকে চিন্তামণি বিদ্যা দিচ্ছি। এ বিদ্যায় বার বছর আগে যে মানুষ চলে গেছে তার পদচিহ্ন অনুসরণ করতে পারা যায়।" পুত্র চিন্তামণি বিদ্যা শিক্ষা করে মাতাকে প্রণাম করে প্রস্থান করল। যক্ষিণী স্বামী-পুত্র শোকে সেখানেই প্রাণ ত্যাগ করল। নিষ্ঠুর যক্ষিণীদেরও স্বামী সুখ ও পুত্রস্নেহ ইত্যাদি মানবিক গুণগুলো একাহিনীতে লক্ষণীয়।

মহাপিঙ্গল জাতকটি[২৯] একটি বিচিত্র কাহিনী। রাজা মহাপিঙ্গল ছিলেন প্রজা উৎপীড়ক। তাঁর মৃত্যু হলে বারাণসীবাসী সকলে খুশি হল। কিন্তু তাঁর দ্বাররক্ষক কাঁদতে

www.pathagar.com

লাগল। বোধিসত্ত্ব তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমি কাঁদছ কেন ?" সে বলল, "মহাপিঙ্গলের মৃত্যুর জন্য আমি কান্না করছি না। সে রাজপ্রাসাদ হতে আসা যাওয়ার সময় প্রতিবার আমার মস্তকে আটটি করে প্রবল জোড়ে মুষ্ঠির আঘাত করত। এখন আমি ভাবছি, সে এখন পরলোকে যমের সঙ্গে যদি সেই একই ব্যবহার করে তাহলে তাকে পুনরায় মর্ত্যলোকে প্রেরণ করবে। তখন আমাকে আবার আটটি করে মুষ্ঠির আঘাত সহ্য করতে হবে, সেই দুশ্চিন্তায় কাঁদছি।" বোধিসত্ত্ব তাকে আশ্বস্ত করে বললেন, "মৃতব্যক্তি পুনরায় প্রত্যাবর্তন করে না, তার মৃতদেহ যথাযথভাবে পোড়ানো হয়েছে, চিতা জল দ্বারা পরিচ্ছন্ন করা হয়েছে এবং নতুন মাটি দ্বারা আবৃত করা হয়েছে।" দ্বারপালক স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কাহিনীটি রূপকথার মত মনোরম।

বিচিত্র ভাব ও উপকরণে ভরপুর জাতক সাহিত্য। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এর তুলনা নেই বললে অত্যুক্তি হবে না। বিভিন্ন বৈচিত্র্যপূর্ণ কাহিনীতে সমৃদ্ধ জাতকসাহিত্য, তাই বিশ্বসাহিত্যের অমূল্য সম্পদ। পশু-পাখি প্রভৃতি তির্যক প্রাণী নিয়ে বহু চমৎকার কাহিনী রয়েছে জাতক সাহিত্যে। কয়েকটি নমূনা নিম্নে সংক্ষেপে বর্ণিত হল :

ধর্মধ্বজ জাতকে[৩০] কাক তপস্বীর ছদ্মবেশে পক্ষিকূলের সর্বনাশ সাধন করেছে। কাকের ধর্মনিষ্ঠা কেবল শঠতার ভাণ মাত্র। কাকের পাখির ছানা খাওয়ার সাধ। সে এক উপায় বের করল। পক্ষিদের রাজা কাককে দেখে একদিন জিজ্ঞেস করল, "মহাশয়ের নাম কি ?" সে বলল, "আমার নাম ধার্মিক।" "আপনি এক পা তুলে এক পা মাটিতে রেখে দাঁড়িয়েছেন কেন ?" "দু পা মাটিতে রাখলে পৃথিবী ভার সহ্য করতে পারবে না, তাই।" "আপনি হাঁ করে আছেন কেন ?" "আমি কিছু খাই না, কেবল হাঁ করে বায়ু সেবন করি।" "পূর্বদিকে মুখ করে আছেন কেন ?" "সূর্য প্রণাম করার জন্য।" "আহা, আপনি কি সাধুসজ্জন ব্যক্তি।" এরূপ তপস্বী কাককে সকাল সন্ধ্যায় পক্ষিরা দলবেধে প্রণাম করতে আসে। ফিরে যাবার সময় কাক শেষের পাখিটি ধরে কতক চিবিয়ে, কতক গিলে খেয়ে পূর্বের মত দাঁড়িয়ে থাকত। কেউ কিছু বুঝে উঠতে পারত না। আস্তে আস্তে পাখির সংখ্যা কমতে লাগল। তারা ভাবতে লাগল, কারণ কি। কেন এমন হচ্ছে ? তাদের কাকের উপর সন্দেহ হল। পাখিদের রাজা একদিন সকলের পিছনে রইল। কাক যেই আক্রমণ করতে আসল রাজা প্রতি-আক্রমণ করে কাককে মেরে ফেলল। এভাবে ভণ্ড তপস্বীর পরিণতি হল।

শিয়ালের ধূর্তামি, শঠতা, অকৃতজ্ঞতা লোককথায় প্রচুর দৃষ্ট হয়। জাতক সাহিত্যেও শিয়ালকে কেন্দ্র করে বহু কাহিনীর সৃষ্টি হয়েছে। এক শৃগাল লোকালয়ে এসে মাছ মাংস খেয়ে সুরা পান করে এক ঝোপের মধ্যে ঘুমিয়ে ছিল। সকালবেলায় ঘুম ভাঙল। তখন তো আর বাইরে যাওয়া যায় না। সেই পথ দিয়ে এক ব্রাহ্মণ যাচ্ছিলেন। শিয়াল আড়াল থেকে ডাক দিল, "ঠাকুরমশাই, আমার দু'শ কাহন ধন আছে। আপনি যদি আপনার ঐ উড়ানি ঢাকা দিয়ে আমাকে লোকালয়ের বাইরে নিয়ে যান তাহলে আপনাকে ঐ ধন দিতে পারি।" ব্রাহ্মণ খুশি হয়ে বললেন, "ভাল কথা, এসো, নিয়ে আসি।" পথ চলতে চলতে

www.pathagar.com

শিয়াল জিজ্ঞেস করে, "এ কোন জায়গা ?" ব্রাহ্মণ বলেন, "এ অমুক স্থান।" শিয়াল বলে, "আর একটু এগিয়ে দাও ঠাকুর।" ব্রাহ্মণ বলেন, "এটা মহাশ্মশান।" "ব্যাস, ঠাকুর, এবার আপনার চাদরটা বিছায়ে দিন। আর ঐ গাছের গোড়ায় খুঁড়ুন, অনেক ধন পাবেন।" ব্রাহ্মণ মনের আনন্দে মাটি খুঁড়তে লাগলেন। আর শিয়াল ঐ ফাঁকে ব্রাহ্মণের উড়ানিতে পায়খানা করে পালিয়ে গেল। ব্রাহ্মণ ঠকলেন শিয়ালের কাছে।[৩১] এটি অপরূপ রসসমৃদ্ধ রূপকাহিনী। হিমবন্ত প্রদেশের কাঞ্চনগুহায় এক সিংহ তার ছয় সহোদর ও এক সহোদরাসহ একত্রে বাস করত। আর সেই গুহার কাছেই রজত পর্বতের স্ফটিকগুহায় বাস করত এক কামান্ধ শিয়াল। সিংহদের বৃদ্ধ মাতা-পিতার মৃত্যুর পর সহোদরা সিংহীকে গুহায় রেখে সকল সহোদর মৃগয়ায় যেত এবং মাংস এনে সহোদরাকে দিত। শিয়াল ছিল এই তরুণী সিংহীর প্রতি আসক্ত। সিংহীকে একসময় গুহায় একা পেয়ে তার কাছে গিয়ে নানা মিষ্টি কথায় ভুলাতে চেষ্টা করল। সিংহী ভালভাবেই জানত যে, শিয়াল হচ্ছে পশুদের মধ্যে জঘন্য ও হীন প্রাণী। শিয়ালের চাতুর্যপূর্ণ চাটুবাক্য সিংহীর কাছে মোটেই পছন্দ ছিল না। সে নিরুত্তর রইল। শিয়াল বিষণ্ন মনে স্ফটিক গুহায় ফিরে গেল।

একদিন এক সহোদর সিংহ একটি প্রাণী শিকার করে নিজে কিছু আহার করে আর কিছু বোনের জন্য নিয়ে গুহায় ফিরল। সিংহী শিয়ালের কথিত বিষয় সব জানাল। সিংহ ভীষণ ক্রুদ্ধ হয়ে উঠল। স্বচ্ছস্ফটিক গুহায় শায়িত শিয়ালকে দেখে সে মনে করল যে, সে বুঝি আকাশে শুয়ে আছে। সিংহ রেগে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। কিন্তু স্ফটিকে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে তার হৃৎপিণ্ড বিদীর্ণ হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল। এভাবে একে একে ছয়টি তরুণসিংহ-সদোহর মৃত্যুমুখে পতিত হল। সর্বশেষে বড় সহোদর এসে বোনের নিকট সব শুনল। সে ছিল বোধিসত্ত্ব। সে চিন্তা করল, "আমার ভাইয়েরা শিয়ালকে মারতে চেয়েছিল, কিন্তু কৌশল না জানায় নিজেরাই মৃত্যু বরণ করেছে। সে শিয়ালের যাতায়াতের পথ চিনে নিল এবং সেদিকে মুখ রেখে এত উচ্চস্বরে গর্জন করলে যে আকাশ বাতাস কেঁপে উঠল। ভয়ে শিয়াল তখনই মৃত্যু মুখে পতিত হল।[৩২]

পুঁতিমাংস জাতকে[৩৩] ধূর্ত ও বিচক্ষণ শিয়াল নিরীহ প্রকৃতির ছাগলের কাছে বুদ্ধিতে পরাস্ত হয়েছে। কাহিনীটি সরল ও উপভোগ্য। গল্পে আছে এক শিয়াল আর শিয়ালনী বনের ধারে বাস করত। তারা পাশের ছাগল ধরে ধরে খেত। ছাগলের দল প্রায় নিঃশেষ হয়ে এল। দলে ছিল এক বুদ্ধিমতী ছাগী, নাম মেড়মাতা। শিয়াল ছাগল বংশ প্রায় শেষ করে মেড়মাতাকে খাওয়ার ফন্দি করল। শিয়ালনীকে বলল, "যাও, তুমি ঐ ছাগীর সঙ্গে সই পাতাও, আমি মরার ভাণ করে শুয়ে থাকব, তুমি ওকে বলে কয়ে আমার মৃতদেহ সৎকারের জন্য নিয়ে আসবে। তখন আমি ওকে কামড়ে খাব।" শিয়ালনী মেড়মাতার সঙ্গে বন্ধুত্ব গড়ে তুলল। একদিন শিয়ালনী বলল, "সই, আমার স্বামী মারা গেছেন, আমার আপনজন বলতে কেউ নেই। চল, তুমি আর আমি ওঁর সৎকার করি।" ছাগল জবাব দিল, "না ভাই আমার বড় ভয় হয়। তোর স্বামী মোটেই ভাল মানুষ নয়। আমার সব জ্ঞাতীদের সে মেরে খেয়ে ফেলেছে।" শিয়ালনী বলল, "এখন তো সে ভয় নেই,

www.pathagar.com

উনি তো মরেই গেছেন। মৃতকে আর ভয় কিসের ?" মেড়মাতা ভাবল, "তবে বুঝি শিয়াল সত্যিই মরেছে।" দুজনে চলল, আগে শিয়ালনী, পেছনে মেড়মাতা। শিয়াল পায়ের শব্দ পেয়ে চোখ উল্টিয়ে তাকাল, সঙ্গে সঙ্গে ছাগী প্রাণপণে পালিয়ে গেল। শিয়ালনী চিৎকার দিল, "সই, ও সই।' সই ততক্ষণে নাগালের অনেক বাইরে।

তারপর অন্য একদিন। শেয়ালনী বলল, "সই, তুই সেদিন আমাদের কি উপকারটাই না করেছিস, তুই আমাদের বাড়ির কাছে যেতেই আমার স্বামী বেঁচে উঠেছেন। চল্ না সই, তাঁর সঙ্গে আলাপ করবি।" ছাগী বলল, "আমি আমার চাকর বাকর নিয়ে এক্ষুণি যাচ্ছি। তুই সবার জন্য উত্তম খাবার জোগাড় কর, কেমন ?" শিয়ালনী বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করল, "যাদের জন্য খাবার জোগাড় করতে বলছিস তোর সেই চাকর বাকর কে কে? তাদের নাম কি কি ?" মেড়মাতা হেসে বলল, "চারটা কুকুর আমার চাকর।

শুনবি তাদের নাম ?
মালিক আর চতুরাক্ষ– যমালয়ে থাকে।
পিঙ্গলের কয়টা রং– দেখলে ভয় লাগে,
জম্বুক আর কার্তিকেয়ের একই সাথে বাস।
এরাই আমায় রক্ষা করে, এদের খাবার তরে,
তোর সাধ্যমত খাবার যোগাড় করগে, যারে।

এক একটি কুকুরের সঙ্গে আছে পাঁচশ অনুচর। তবেই আমার দু'হাজার কুকুর তোমার অতিথি হবে। এরা যদি ভাল খাবার না পায় তবে তোকে আর তোর স্বামীকে খেয়ে ফেলবে, বুঝলি ?" শিয়ালনী ছাগীর কথা শুনে ভয়ে থরথর। বলল, "না সই, তোর গিয়ে কাজ নেই। তুই যেখানে আছিস সেখানেই থাক। আমি এখন যাই।" অতঃপর শিয়াল ও শিয়ালনী ভয়ে সেই গর্ত ছেড়ে অন্যত্র পালিয়ে গেল। আর এমুখো কোনোদিন হয়নি।

কাহিনীটিতে উপকথার সকল বৈশিষ্ট্য রক্ষিত হয়েছে। শিয়ালের ধূর্ততা এবং ছাগীর বিচক্ষণতা এ কাহিনীটির প্রধান উপজীব্য। গল্পকার ছাগীর প্রতি সহানুভূতিশীল। কারণ ছাগল সবসময় নিপীড়িত ও লাঞ্ছিত।

জলজ প্রাণী কুমীর বিরাট দেহধারী ও অসাধারণ শক্তির অধিকরী। কিন্তু দেহ বড় হলেও বুদ্ধিতে সে খাট প্রমাণিত হয়েছে গল্পকারের উপস্থাপনায়। বোকামির জন্য সে সকলের কাছে হাস্যসম্পদ। এ প্রসঙ্গে শিশুমার জাতক[৩৪] উল্লেখ করা যায়।

এক ছিল কুমীর। সে গঙ্গায় বাস করত। সঙ্গে তার স্ত্রী কুমীরাণী। একদিন কুমীরাণীর সাধ হল, সে বানরের হৃদপিণ্ড ভক্ষণ করবে। কুমীরকে বলল, "স্বামিন, সাধ হয়েছে বানর রাজের হৃদয়ের মাংস ভক্ষণের।" কুমীর বলল, "প্রিয়ে, আমি জলচর, সে স্থলচর। দেখি কিছু করা যায় কিনা।" অনন্তর একদিন বানরের সঙ্গে দেখা। কুমীর বলল, মহারাজ, এই বিস্বাদ ডুমুরফল খেয়ে কেন এত কষ্ট করছেন, নদীর ওপারে কত আম কাঁঠালের বাগান রয়েছে।'

www.pathagar.com

"ওপারে যাব কেমন করে ?"

"আপনি আমার পিঠে এসে বসুন, আমি আপনাকে পার করে দিচ্ছি।"

বানর কুমীরের পিঠে চড়ে বসল। কুমীর মনের আনন্দে বানরকে মাঝনদীতে এনে ডুবিয়ে গিতে লাগল। বানররাজ চিৎকার করে উঠল, "কর কি, কর কি, ডুবিয়ে মারবে নাকি ?" কুমীর বলল, " তোমাকে মারবার জন্যই তো এখানে আনা। আমার বউ তোমার হৃদয়ের মাংস খেতে চায়।"

"বন্ধু, তোমার মনের কথাটি বলে ভালই করলে। কিন্তু আমাদের বুকের মধ্যে তো হৃদয় থাকে না। যদি থাকত তবে ডালে ডালে লাফালাফি করার সময় তা টুকরো টুকরো হয়ে যেত না ?"

"তোমাদের হৃদপিণ্ড তবে কোথায় থাকে ?"

"ঐ ডুমুর গাছে, ঐ যে গাছে থোকা থোকা ঝুলছে, দেখ।"

"যদি তোমার হৃদয়টি এনে দাও তবে তোমাকে ছেড়ে দেব।"

"নিশ্চয়ই, এ আর এমন কি কথা।" কুমীর বানররাজকে তীরে পৌঁছে দিল। বানর একলাফে ডুমুর গাছে উঠে বলল, "ওরে মুর্খ, তোর দেহটাই বড়, বুদ্ধি একেবারেই শূন্য। হৃদপিণ্ড কখনও কি গাছে থাকে বোকা ?"[৩৫]

অনুরূপ আর একটি কাহিনী বানরেন্দ্র জাতক।[৩৬] পাহাড়ের ধারে কোন এক নদী। সেই নদীর তীরে বাস করে এক বানর; নদীর মাঝখানে এক দ্বীপে আম আর পনস ফলের বাগান। বানর প্রতিদিন একলাফে নদীর তীর হতে পাহাড়ের উপর পড়ে, সেখান হতে আর একলাফে দ্বীপে গিয়ে সারাদিন ইচ্ছামত ফলাদি ভক্ষণ করে সন্ধ্যার সময় পূর্বানুরূপে ফিরে যায়। নদীতে ছিল এক কুমীর ও কুমিরাণী। কুমিরাণীর ইচ্ছা বানরের কলিজা খাবে। কুমীর বলল, "দেখা যাক কি করা যায়।" বানর দ্বীপে যাওয়ার আগে রোজ লক্ষ্য রাখে নদীর জল কত দূর উঠেছে, আর পাহাড় কতটা জেগে আছে। আজ সে দেখল নদীর জল বাড়েওনি, কমেওনি। কিন্তু পাহাড়টা যেন একটু বেড়ে গেছে। বানরের মনে সন্দেহ হল, সে ডাকতে লাগল, "ও পাহাড়, পাহাড়।" কোন সাড়া নেই। আবার ডাকে, "ও ভাই পাহাড়, রোজ সাড়া দাও, আজ দিচ্ছ না কেন ?" কুমীর ভাবল, "তাহলে তো সাড়া দিতে হয়।"

"কে ? বানররাজ নাকি ?"

"হা ভাই, তুমি কে গো ?"

"আমি কুমীর।"

"ওখানে বসে আছ কেন ?"

" তোমার কলিজাটা চাই বলে।"

"ও, তাই; বেশ, আমি ধরা দিচ্ছি, তুমি চোখ বুজে হাঁ করে থাক, আমি তোমার মুখের মধ্যে লাফ দিচ্ছি।" কুমীর চোখ বুজে হ্যাঁ করল। বানর কুমীরের মাথায় এক লাফ

www.pathagar.com

দিয়ে নদীর তীরে পার হয়ে গেল। আকারে ছোট হলেও বানরের বিচক্ষণতা গল্পে পরিস্ফুট হয়েছে। এসব গল্প কথাসাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত।

জাতক কাহিনীর কোনো কোনো গল্পে ইতর প্রাণিগণ অনেক ক্ষেত্রে মানুষের চেয়ে কৃতজ্ঞ এবং জাতককার ইতর প্রাণিদের মনুষ্য অপেক্ষা মহৎ রূপে চিত্রায়িত করেছেন। সচ্চঙ্কির জাতক[৩৭] এমন এবটি কাহিনী।

রাজার দুষ্টকুমার নামে এক পুত্র ছিল। সে ছিল ভীষণ নিষ্ঠুর ও দুর্দান্ত। তার অত্যাচারে রাজ্যের লোক অতিষ্ঠ। একদিন তার পরিচারকেরা তাকে মাঝ-নদীতে ভাসিয়ে দিল। দুষ্টকুমার নদীর স্রোতে ভাসতে ভাসতে নদীর নিম্নদিকে অগ্রসর হতে লাগল। জলের স্রোতে একটি গাছের গুঁড়ির আশ্রয় পেল। গুড়ি ধরে ভাসতে ভাসতে তার আরও তিনজন সঙ্গী জুটল। একটি সাপ, একটি ইঁদুর ও একটি শুকপাখি। বন্যার জলে তারা আশ্রয়চ্যুত হয়ে নদীর স্রোতে ভেসে যেতে লাগল। ক্রমে রাত হল। রাজপুত্র প্রাণের ভয়ে চিৎকার করতে লাগল। "কে কোথায় আছ বাঁচাও।" নদীর ধারে থাকতেন এক ব্রাহ্মণ। তিনি আর্তচীৎকার শুনে নদীর জলে ঝাঁপ দিয়ে প্রাণী চারটিকে তাঁর আশ্রমে নিয়ে আসলেন। আগুন জ্বেলে তিনি প্রথমে সাপ, তারপর ইঁদুর, তারপরে পাখির এবং সর্বশেষে রাজপুত্রের সেবা করে সুস্থ করলেন। কারণ রাজপুত্র অন্যপ্রাণী অপেক্ষা সবল ছিল। তিনি অনুরূপভাবে খাদ্যও পরিবেশেন করলেন। এতে রাজপুত্রের ভারী রাগ হল। ভাবল "দেখা যাক, যথাসময়ে এর শোধ নেয়া যাবে।" কিছুদিন পর চার অতিথি সুস্থ হয়ে উঠল। বিদায় বেলায় সর্প বলল, "বাবা, আমাকে বাঁচিয়েছেন। আমার চল্লিশ কোটি সোনার মোহর আছে, প্রয়োজন সময়ে আপনি আমার গর্তের কাছে গিয়ে 'দীঘা' বলে ডাকবেন। আমি ঐ ধন আপনাকে দেব।" ইঁদুর বলল, "আমারও ত্রিশ কোটি সোনার মোহর আছে। আপনি আমার গর্তের কাছে গিয়ে আমাকে ডাকলে তা আমি আপনাকে দিয়ে দেব।" শুকপাখি বলল, "আমার সোনাও নেই, রূপাও নেই। যদি কখনও ভাল ধান আপনার দরকার হয় 'শুক' বলে ডাকবেন। আমি গাড়ি বোঝাই ধান আপনার কাছে পাঠিয়ে দেব।" রাজপুত্র বলল, "আমি রাজা হলে আপনি আমার রাজ্যে যাবেন, আমি আপনার সেবা করব।" মনে মনে বলল, "একবার নিজের মুঠোর মধ্যে পাই, তবেই মজা দেখাব।" সকলে যার যার বাসস্থানে চলে গেল। রাজকুমার দেশে গিয়ে রাজা হল।

কিছুদিন পর ব্রাহ্মণ ভাবলেন, পরীক্ষা করে দেখা যাক, এরা তাদের কথা রাখে কি না। তিনি প্রথমে সাপের কাছে গিয়ে ডাকলেন, 'দীঘা, সাপ গর্ত হতে বের হয়ে ব্রাহ্মণকে প্রণাম করল এবং চল্লিশ কোটি সোনার মোহর প্রদান করল। তারপর ইঁদুর ও শুকপাখির নিকট গেলেন। তারাও তাদের কথা রাখল। সবশেষে আসলেন নতুন রাজার রাজ্যে। রাজা ব্রাহ্মণকে দেখে অনুচরদের নির্দেশ দিল "ঐ যে ভণ্ড ব্রাহ্মণ আসছে, তাকে চৌরাস্তার মাথায় নিয়ে খুব করে পেটাবে। তারপর দেহ থেকে মস্তক বিচ্ছিন্ন করে শূলে চড়াবে।" রাজকর্মচারীগণ ব্রাহ্মণকে ধরে পেটাতে আরম্ভ করল। ব্রাহ্মণ মার খেতে খেতে বলল–

"বনের জলে মানুষ আর কাঠ দুই যাচ্ছে ভেসে।

www.pathagar.com

লোকে বলে–কাঠ তুলি লও, মানুষ ছেড়ে।
এই সত্য জানলাম আজ–
মানুষ তোমার শত্রু হবে, কাঠেই হবে কাজ।"

অনুচরগণ ব্রাহ্মণের বাক্য শুনে জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি কখনও আমাদের রাজার কোন উপকার করেছিলেন ?" ব্রাহ্মণ সবকথা খুলে বললেন। শুনে কর্মচারীরা রেগে গেল। তারা রাজাকে মেরে ব্রাহ্মণকে রাজা করল।[৩৮]

গল্পে ইতর প্রাণী মানুষের চেয়ে শ্রেষ্ঠ, আর মানুষ নিকৃষ্ট ও কৃতঘ্ন। ইতর প্রাণিদের মধ্যেও মানবিক গুণের সমাবেশ। ইতর প্রাণীরা এক একটি মানবিক গুণান্বিত সত্তা। গল্পের এ ধারা অসাধারণ, লোককথার অমূল্য সম্পদ। এমনি বহু কাহিনী জাতক সাহিত্যকে সমৃদ্ধ করেছে। এমনিতর আর একটি কাহিনী মহাকপি জাতক[৩৯]। বনে ঘুরতে ঘুরতে এক ব্রাহ্মণ গভীর খাদে পতিত হয়। এক বানর তাকে পৃষ্ঠে নিয়ে খাদ থেকে উত্তোলন করে। বানর বলল, "একটু বিশ্রাম করে তোমাকে গ্রামের পথ দেখিয়ে দেব।" বিশ্রাম করার সময় ব্রাহ্মণ বানরের মাংস খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য একটি পাথর নিয়ে তার মাথায় আঘাত করল। বানরের মস্তক ফেটে রক্ত পড়তে লাগল। বানর বৃক্ষে আরোহণ করে বলল, "আমি গাছের উপর দিয়ে লাফিয়ে লাফিয়ে যাব, তুমি নীচে আমাকে অনুসরণ কর।" এভাবে বানর কৃতঘ্ন মানুষকে বনভূমির বাইরে পৌঁছে দিল। এখানে বানরের মধ্যে সকল মানবিক গুণের সমাবেশ, আর মানুষ মহাকৃতঘ্ন।

দদ্দভ জাতকটি[৪০] ভারতীয় লোককথা সাহিত্য-ভাণ্ডারে একটি অমূল্য রত্ন। জাতকটি যেমন মনোরম তেমনি মনস্তাত্ত্বিক বিশ্লেষণধর্মীও বটে। জাতকে আছে– একটি বেলগাছের নিচে একটি তালগাছ। একটি শশক সেই তালগাছের তলায় বাস করে। একদিন শশক গাছতলায় বসে আপনমনে ভাবছিল– যদি বিশ্বটা ধ্বংস হয়ে যায় তবে কোথায় গিয়ে বাস করব। এমন সময় একটি বেল সশব্দে তালপত্রের উপর পড়ল। শশক সেই শব্দে ভীত হয়ে পালাতে লাগল। সে ভাবল, "পৃথিবীটা বুঝি ধ্বংসই হল।" পথে দেখা হল আর একটি শশকের সঙ্গে। তাকে বলল, "ভাই শুনেছ, পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে।" সে বলল, "হ্যাঁ, তাই নাকি!" সেও তার পেছনে পেছনে পালাতে লাগল। তারপর আর একটি শশক, তারপর আর একটি– এভাবে শত শত হাজার হাজার শশক ছুটতে লাগল। একইভাবে একটি মৃগপাল, একটি শুকরপাল, গোকর্ণযূথ, একটি মহিষযূথ, একটি গবয়যূথ, একটি গণ্ডারপাল, একটি ব্যাঘ্রপাল, একটি সিংহযূথ এবং একটি হস্তিযূথও পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে শুনে একের পিছনে এক ছুটতে লাগল। বোধিসত্ত্ব তখন সিংহযূথপতি। তিনি পলায়নরত পশুকূলকে দেখে ভাবলেন– "পৃথিবী তো ধ্বংস হতে পারে না। নিশ্চয়ই কোন শব্দ শুনে পালাচ্ছে।" সিংহরাজ দ্রুত গমন করে পশুদের সামনে গিয়ে তিনবার গর্জন করলেন। পশুরা থেমে গেল। বোধিসত্ত্ব জিজ্ঞেস করলেন, "তোমরা দৌড়াচ্ছ কেন ?"

"রাজন, পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে তাই।"

www.pathagar.com

"পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে, কে দেখেছে।"

"হস্তীরা বলতে পারে।"

পশুরাজ হস্তীদের জিজ্ঞেস করলেন। তারা বলল, "আমরা জানি না। সিংহরা বলতে পারে।" এভাবে গণ্ডার, গবয়, মহিষ, গোকর্ণ, শূকর, মৃগ, শশক সকলকে জিজ্ঞেস করা হল। সবশেষে শশকেরা বলল– "এই শশক সব জানে।" সিংহরাজ জিজ্ঞেস করলেন, "বল তো, সত্যিই কি পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে ?"

"হ্যাঁ, প্রভু। আমি স্বচক্ষে দেখেছি।"

"কোথায় দেখেছ ?"

"প্রভু, সমুদ্রের তীরে বেলগাছের তলায়, তালগাছের নীচে আমার বাসা। সেখানে বসে বসে আমি পৃথিবী ধ্বংসের শব্দ শুনেছি। পশুরাজ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন। তিনি শশককে পৃষ্ঠে করে সেই স্থানে উপস্থিত হলেন। বললেন, "কোথায় পৃথিবী ধ্বংস হচ্ছে আমাকে দেখাও।" দেখা গেল– একটি পাকা বেল তালপাতার উপর পড়ার শব্দ হয়েছে। আর সেটা গড়িয়ে মাটিতে পড়েছে। সিংহরাজ আবার শশককে পশুদের কাছে নিয়ে গেলেন। পশুদের বুঝিয়ে বললেন, তালপত্রে বেল পড়ার শব্দ হয়েছে মাত্র। পৃথিবী কোথাও ধ্বংস হচ্ছে না। পশুরা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। এখানে বোধিসত্ত্বরূপী সিংহ তীক্ষ্ণ বিচারবুদ্ধিসম্পন্ন মানবীয় গুণ সমন্বিত। এখানে পশুরা অনুকরণপ্রিয়। তাদের বিচারবুদ্ধি অতি সীমিত। এটা একটি নীতি শিক্ষা বিশেষ। কারণ বিবেক বুদ্ধিহীন মানুষও পশুর মত গুজবে কান দেয় এবং অন্ধভাবে অনুকরণ করে, আর বিবেক বুদ্ধিমানেরা পশুরাজের মত সঠিক বিষয় যাচাই করবে বুদ্ধি বিবেচনা দিয়ে। নীতি শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে কাহিনীটি অনবদ্য যদিও রূপকধর্মী।

জাতকের কাহিনী পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ গল্প সংকলন। বিচিত্র উপকরণে গল্পগুলো এক একটি স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রোজ্জ্বল এবং আখ্যান উপাখ্যান হিসেবে পৃথিবীর অন্যতম শ্রেষ্ঠ লোক সাহিত্যের অন্তর্গত। জাতকের গল্প নিয়ে বিভিন্ন ভাষায় ব্যাপক আলোচনা হয়েছে, তাই আমরা জাতক কাহিনীর কিঞ্চিৎ মাত্র আলোকপাত করে এর প্রকৃতি সম্পর্কে ইঙ্গিত দেওয়ার প্রয়াস পেয়েছি। জাতকের গল্পের স্রোতে নানা কাহিনী নানাভাবে রসসৃষ্টি করেছে। পৃথিবীর বহু সাহিত্যে জাতকের অনুকরণ লক্ষ্য করা যায়। হিতোপদেশ, পঞ্চতন্ত্র, পুরাণ, ইশপসের গল্পে জাতকের সঙ্গে বহু সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায়। কিছু কিছু জাতক কাহিনী নিছক গল্প হলেও অধিকাংশ কাহিনী আখ্যান উপাখ্যান কিংবা লোককথার পর্যায়ভুক্ত। তাই জাতকের গল্প পৃথিবীর সকল ভাষাভাষীদের নিকট সমানভাবে সমাদৃত।

উদান

উদান[৪১] খুদ্দকনিকায়ের তৃতীয় গ্রন্থ। বুদ্ধের মুখ-নিঃসৃত উদাত্ত বাণীকে উদান বলে। উদান আটটি বর্গে বিভক্ত, যথা– বোধি বগ্‌গ, মুচলিন্দ বগ্‌গ, নন্দ বগ্‌গ, মেঘিয় বগ্‌গ,

www.pathagar.com

সোনত্থের বগ্গ, জচ্চন্ধ বগ্গ, চূল বগ্গ ও পাটলিগামিয় বগ্গ। প্রতি বগ্গে ১০টি করে সূত্র রয়েছে। এখানে বুদ্ধ জীবনের বহু ঘটনা পরিবেশিত হয়েছে। সুত্তসমূহ পদ্য ও গদ্যে রচিত। Dr. M. Winternitz মনে করেন যে, উদানের পদ্যাংশ গদ্যাংশ অপেক্ষা প্রাচীনতম। অট্ঠকথা রচয়িতা কর্তৃক পরবর্তী সময়ে গদ্যাংশ সংযোজন করা হয়েছে।[৪২] উদানে বর্ণিত বুদ্ধ জীবনের বহু ঘটনার সঙ্গে বিনয় পিটক ও মহাপরিব্বান সুত্তন্তে বর্ণিত ঘটনার সাদৃশ্য রয়েছে।[৪৩] কোনো কোনো ক্ষেত্রে উদান গাথার সঙ্গে সঙ্গতিহীন গদ্য কাহিনীর অবতারণাও গ্রন্থের মধ্যে লক্ষ্য করা যায়। এ গ্রন্থে কিছু কিছু কাহিনী গল্প রসে সমৃদ্ধ।

কনকনে শীতে মাঘ মাসের শেষদিকে গয়া নদীতীরে বহু জটাধারী তাপস সমবেত হত। তখন মধ্য প্রদেশে দারুণ শীত, হিমপাত হত। মাঘ মাসের শেষ চারদিন ও ফাল্গুন মাসের প্রথম চারদিন তারা গয়া নদীর হিম শীতল জলে একবার ডুব দেয় একবার ওঠে, জল সেচন ও জলক্রীড়া করে। তাদের বিশ্বাস, অধিক শীতে স্নান করলে আত্মশুদ্ধি হয়। জল সমস্ত পাপ ধুয়ে মুছে নিয়ে যায়। বুদ্ধ তাদের এরূপ হাস্যকর আচরণ দিব্যদৃষ্টিতে দেখে এরূপ প্রীতিবাক্য উচ্চারণ করলেন, "জলে বহুবার স্নান করলেও মন শুচি হয় না, যার মধ্যে সত্যধর্ম বিরাজ করে সেই শুচি, সেই ব্রাহ্মণ।[৪৪]

গর্ভিনী সুত্তে একটি মনোজ্ঞ রসপূর্ণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[৪৫] সেই সময়ে কোনো পরিব্রাজকের তরুণী ভার্যা প্রসবের সময় আসন্ন হলে পরিব্রাজককে বলল, "ব্রাহ্মণ, তৈল নিয়ে আস, আমার সন্তান প্রসব হলে উপকারে লাগবে।" সেই সময় রাজা প্রসেনজিৎ কোশল তাঁর খাদ্যভাণ্ডার হতে শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে যথেচ্ছ তৈল ও ঘৃত পান করতে দিতেন কিন্তু নিয়ে যেতে দিতেন না। পরিব্রাজক ভাবল, "রাজার ভাণ্ডার গৃহে গিয়ে বহু পরিমাণে তৈল পান করে গৃহে এসে উহা বমি করে দেব।" সে ভাণ্ডারগৃহে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে তৈল পান করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বমি করার চেষ্টা করল কিন্তু সক্ষম হল না। তার তীব্র বেদনা অনুভূত হতে লাগল। পেটের যন্ত্রণায় এদিক ওদিক পাশ ফিরতে লাগল। বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে পূর্বাহ্ন সময়ে ভিক্ষাচরণে গিয়ে কামুক পরিব্রাজকের অজ্ঞতা হেতু দুঃখ দর্শন করে উদান বাক্য উচ্চারণ করলেন, "যার কোনো বিষয়ের প্রতি তৃষ্ণা নেই সে আর্যমার্গজ্ঞান লাভ করে সুখী হয়, আর তৃষ্ণাগ্রস্ত ব্যক্তি অতিশয় দুঃখ ভোগ করে।[৪৬]

সুপ্পবাসাসুত্তে বর্ণিত কাহিনীটি রূপকথার মত উপভোগ্য অথচ অতীব করুণ। কৌলিয় কন্যা সুপ্পবাসাকে সাত বছর গর্ভ যন্ত্রণা এবং সাত দিন তীব্র দুঃসহ বেদনা ভোগ করতে হয়েছিল। সর্বমোট সাত বছর সাতদিন একটি সন্তান গর্ভে অবস্থান করা একটি অলৌকিক বিষয়। যন্ত্রণাকাতর সুপ্পবাসা বুদ্ধের আশীর্বাদ প্রাপ্ত হয়ে সুখে সন্তান প্রসব করেন। অনন্তর তিনি বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে এক সপ্তাহ ধরে আহার্যাদি দান করার পর বুদ্ধ তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন, "সুপ্পবাসা, তুমি এরূপ পুত্র আরও চাও কি?" সুপ্পবাসা উত্তর দিলেন, "ভন্তে, আমি এরূপ আরও সাতটি পুত্র চাই।" আশ্চর্যের বিষয়

www.pathagar.com

যে, পুত্রের মুখ দেখে মাতা সাত বছর সাতদিন তীব্র গর্ভ যন্ত্রণা ভুলে গিয়ে অনুরূপ আরও সাত পুত্র কামনা করেছেন।[৪৭] মায়া মমতা আর তৃষ্ণার বন্ধনের কারণে এরূপ হয়ে থাকে।

একদা আয়ুষ্মান সারিপুত্র ও আয়ুষ্মান মহামোগ্‌গল্লান স্থবির রাজগৃহে একত্রে 'কপোতকন্দর' নামক স্থানে বাস করার সময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র সদ্য মস্তকের কেশ ছেদন করে রাত্রির জ্যোৎস্নার আলোয় উপবেশন করে সমাধিমগ্ন হয়েছিলেন। সেই সময়ে দুই যক্ষ বন্ধু উত্তর দিক থেকে দক্ষিণ দিকে যাচ্ছিল। সারিপুত্র স্থবিরকে দেখে এক বন্ধু যক্ষ তার মস্তকে প্রহার করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। অপর বন্ধু নিষেধ করা সত্ত্বেও সে সারিপুত্রের কেশহীন মস্তকে এক প্রবল আঘাত করল। আঘাতটি এত গুরুতর ছিল যে, একটি হস্তীও এরূপ আঘাতে মাটিতে ঢুকে যেত অথবা মহাপর্বতও চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে যেত। সঙ্গে সঙ্গে যক্ষটি 'জ্বলে যাচ্ছি, জ্বলে যাচ্ছি' বলতে বলতে মাটি ফেটে মহা অবীচি নরকে পতিত হল। আয়ুষ্মান মহামোগগল্লান দিব্য দৃষ্টিতে ইহা দেখে আয়ুষ্মান সারিপুত্রের নিকট গিয়ে বললেন, "বন্ধু, আপনি ভাল আছেন তো?" আয়ুষ্মান সারিপুত্র উত্তর দিলেন, "হ্যাঁ, বন্ধু ভাল আছি, তবে মাথা একটু ব্যাথা করছে।" আয়ুষ্মান মহামোগ্‌গল্লান বললেন, "আপনি মহাঋদ্ধিসম্পন্ন, মহাশক্তিশালী। যক্ষ কর্তৃক এত বড় আঘাত প্রাপ্ত হয়েও সামান্যমাত্র ব্যাথা পেয়েছেন বলছেন!" সারিপুত্র স্থবির বললেন, "আপনি এত ঋদ্ধিমান ও শক্তিশালী যে, যক্ষ পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছেন, আমি পিশাচও দেখছি না।" বুদ্ধ দুই বন্ধুর বাক্যালাপ শ্রবণ করে বললেন, "যার চিত্ত পর্বতের ন্যায় স্থির, অকম্পিত, অনুরাগহীন, ক্রোধহীন, তার আর দুঃখ কোথায়।"

সুন্দরী নামক এক মহিলাকে হত্যা করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে গভীর ষড়যন্ত্রের বিষয় সুন্দরী সুত্তে বর্ণিত হয়েছে। অন্য তীর্থীয় পরিব্রাজকদের পরামর্শক্রমে সুন্দরী প্রত্যেকদিন জেতবন বিহারে যাতায়ত করত। কিছুদিন পর পরিব্রাজকগণ সুন্দরীকে হত্যা করে গোপনে জেতবনের বিহার সীমানায় মাটিতে পুঁতে রাখে। রাজা প্রসেনজিৎ কোশলকে অভিযোগ করে তারা লুক্কায়িত স্থান থেকে তার মৃতদেহ উত্তোলন করে সর্বত্র বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের বিরুদ্ধে কুৎসা ছড়াতে লাগল।[৪৯] কিন্তু অল্পদিনের মধ্যেই সাধারণ জনগণ সার্বিক বিষয় উপলব্ধি করতে সক্ষম হয়েছিল।

জচ্চন্ধ বগ্‌গের প্রথম তিত্থিয় সুত্তে একটি অতি মনোরম উপভোগ্য কাহিনী বর্ণিত হয়েছে।[৫০] এক সময় নানা মতাবলম্বী বহু শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও পরিব্রাজকগণ একত্রিত হয়ে বিবাদ করছিল, কেহ বলল, "আত্মা শাশ্বত", কেহ বলল, "আত্মা অশাশ্বত", কেহ বলল, "আত্মা অন্তবিশিষ্ট" কেহ বলল, "আত্মা অন্তহীন", কেহ বলল, "শরীর ও জীবের মধ্যে পার্থক্য নেই", কেহ বলল, "শরীর ও জীব অভিন্ন নয়", কেহ বলল, "আত্মা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে", কেহ বলল, "আত্মা মৃত্যুর পর পুনর্জন্ম গ্রহণ করে না", কেহ বলল, "ধর্ম এরূপ নয়, সেইরূপ", কেহ বলল, "ধর্ম সেইরূপ নয়, এইরূপ"। তাদের কলহ বিবাদ শ্রবণ করে ভিক্ষুগণ বুদ্ধকে অবহিত করলে তিনি নিম্নোক্ত গল্পটি বলেন :

www.pathagar.com

শ্রাবস্তীতে এক রাজা ছিলেন। তিনি রাজ্যের সকল অন্ধকে একত্রিত করালেন। তিনি কর্মচারীকে নির্দেশ দিলেন জন্মান্ধদের হস্তী দর্শন করাতে। কর্মচারী অন্ধদের হস্তীশালায় নিয়ে গেল এবং কোনো অন্ধকে হস্তীর শির, কোনো অন্ধকে কর্ণ, কোনো অন্ধকে দন্ত, কোনো অন্ধকে শুণ্ড, কোনো অন্ধকে শরীর কোন অন্ধকে পদ, কোনো অন্ধকে পৃষ্ঠ, কোন অন্ধকে লেজ স্পর্শ করাল। অতঃপর রাজা যখন তাদের জিজ্ঞেস করলেন, হস্তী কি প্রকার ? তাদের মধ্যে যারা হস্তীর শির ধরেছিল তারা বলল, "দেব, হস্তী কলসীর ন্যায়", যারা কর্ণ স্পর্শ করেছিল তারা বলল, "হস্তী যেন একখানি কুলা, যারা দাঁত স্পর্শ করেছিল তারা বলল, 'হস্তী যেন লাঙ্গলের ফাল', যারা শুণ্ড ধরেছিল তারা বলল "হস্তী লাঙ্গলে ঈষের ন্যায়" যারা দেহ ধরেছিল তারা বলল, "হস্তী যেন একটি ধানের গোলা", যারা পা ধরেছিল তারা বলল, "হস্তী যেন একটি থামের মত", যারা পৃষ্ঠ স্পর্শ করেছিল তারা বলল, "হস্তী উদুখলের ন্যায়, যারা লেজ ধরেছিল তারা বলল, "হস্তী ঝাড়ুর ন্যায়"। তারা পরস্পর বিবাদ করতে লাগল, "হস্তী এরূপ নয়, সেরূপ, সেরূপ নয়, এরূপ। রাজাও তাদের বিবাদ শুনে বেশ আনন্দ উপভোগ করতে লাগলেন। গল্পের মূল উপদেশ যদিও 'প্রকৃত জ্ঞানদৃষ্টির অভাবে সত্য উপলব্ধি করা যায় না' তবু গল্পের মাধ্যমে দৃষ্টান্ত উপস্থাপনা চমৎকার, মনোমুগ্ধকর ও গল্পরসে সমৃদ্ধ।

চুন্দ সুত্তে বুদ্ধের অন্তিনতম জীবন কাহিনী বিবৃত হয়েছে।[৫১] ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত বুদ্ধ মল্লদেশ থেকে ক্রমশ পাবা নগরে উপস্থিত হলেন। তথায় তিনি 'চুন্দ' নামক স্বর্ণকার পুত্রের আম্রবনে বাস করছিলেন। চুন্দ বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে 'শুকরমদ্দব' প্রস্তত করে উত্তম খাদ্য ভোজ্যসহকারে দান করেন। চুন্দের অন্ন ভোজন করে বুদ্ধ ভীষণ অসুস্থ হয়ে পড়েন। পেটে তীব্র বেদনা উপস্থিত হল। এ সময় তিনি কুশীনারায় যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন। যাত্রা আরম্ভ করলেন। পথিমধ্যে বিশ্রাম করার সময় বুদ্ধ আয়ুষ্মান আনন্দকে বললেন, "আনন্দ, আমার বড়ই পিপাসা পেয়েছে, একটু জল পান করব, আমার জন্য পানীয় জল আন।" আনন্দ বললেন, "ভন্তে, এখন পাঁচশ গাড়ি ঐ নদীর উপর দিয়ে গেছে। সেই অল্প চক্রচ্ছিন্ন জল আলোলিত ও কর্দমযুক্ত হয়েছে। ভন্তে, অদূরে শীতলোদকা স্বচ্ছ সলিলা কুকুত্থানদী, আপনি তথায় জল পান করবেন।" বুদ্ধ দ্বিতীয় তৃতীয়বারও ক্ষুদ্র জলধারা থেকে জল আনার নির্দেশ দিলে আনন্দ পাত্র হস্তে সেই নদীতে গেলেন। তিনি যাবার সঙ্গে সঙ্গে নদীর জল পরিষ্কার পঙ্কহীন হয়ে প্রবাহিত হতে লাগল। আয়ুষ্মান আনন্দ বুদ্ধের অলৌকিক ঋদ্ধির প্রভাব দেখে আশ্চর্যবোধ হলেন। ঘটনাটি বৌদ্ধদের কাছে অতি জনপ্রিয় কাহিনীরূপে প্রচলিত।

বিশাখা সুত্তটি একটি উৎকৃষ্ট উপদেশমুলক কাহিনী।[৫২] একদা শ্রাবস্তীর পূর্বারামে অবস্থান করার সময় একদিন দিনদুপুরে মিগারমাতা বিশাখা সিক্ত কাপড়ে সিক্ত চুলে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়েছিলেন। বুদ্ধ এর কারণ জিজ্ঞেস করলে বিশাখা বললেন, 'ভন্তে, আমার অতি আদরের এক পৌত্রী মারা গেছে।"

বুদ্ধ–"বিশাখে, তুমি শ্রাবস্তীতে যত মনুষ্য আছে, ততটি পৌত্র চাও কি ?"

www.pathagar.com

বিশাখা–"হ্যাঁ ভন্তে, তাই চাই।"

বুদ্ধ–"শ্রাবস্তীতে দৈনিক কত লোকের মৃত্যু হয় ?"

বিশাখা–"ভন্তে, শ্রাবস্তীতে দৈনিক একাধিক লোক মৃত্যু বরণ করে, শ্রাবস্তীতে লোক মরে না এমন দিন নেই।"

বুদ্ধ–"বিশাখে, তুমি কি আশা কর যে, কখনও তুমি শুষ্ক বসনে ও শুষ্ক কেশে থাকতে পারবে ?"

কথোপকথনে উপস্থাপিত দৃষ্টান্তটি অত্যন্ত বাস্তবধর্মী। এসব রূপকধর্মী আলোচনার মাধ্যমে প্রকৃত সত্যকে উপস্থাপন করা হয়েছে।

এ গ্রন্থে আরও কয়েকটি চমৎকার কাহিনী রয়েছে। তন্মধ্যে গৌতমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের কাহিনী উপাখ্যানের রসে পরিপূর্ণ। এ কাহিনীর রূপান্তর মহাকবি অশ্বঘোষের সৌন্দরানন্দ কাব্য।[৫৩]

উদানে বিচ্ছিন্ন কিছু কিছু ঘটনাকে কেন্দ্র করে ক্ষুদ্র পরিসরে গল্পের আকারে রূপ নিয়েছে। এতে বুদ্ধের উপদেশসমূহ সহজ ও সাবলীল হয়ে সাধারণের বোধগম্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। অতএব বলা যায় যে, উদান পালি কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে এক বিশেষ অনবদ্য গল্পরসে সমৃদ্ধ গ্রন্থ।

পেতবত্থু

পেতবত্থু[৫৪] বা প্রেতকাহিনী খুদ্দক-নিকায়ের সপ্তম গ্রন্থ। বিমানবত্থুর বিপরীতধর্মী কাহিনী বা উপাখ্যান পেতবত্থু গ্রন্থে স্থান পেয়েছে। পেতবত্থুর অট্‌ঠকথা 'পরমত্থদীপণী'[৫৫] রচনা করেন দক্ষিণ ভারতের কঞ্চিপুরের অধিবাসী অন্যতম সুপ্রসিদ্ধ অট্‌ঠকথাকার আচার্য ধম্মপাল। বিমানবত্থু গ্রন্থে কোনো ব্যক্তি কায়-মন-বাক্যে সৎ কর্ম, সৎ চিন্তা ও সৎ বাক্য ভাষণ করলে তার কৃতকর্মের তারতম্য অনুযায়ী দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে সুখৈশ্বর্য ভোগ করার চমৎকার বিবরণ রয়েছে, পক্ষান্তরে কায়-বাক্য ও মন দ্বারা খারাপ কর্ম সম্পাদন করলে নিম্নগতি প্রাপ্ত হয়ে বিশেষ করে প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়ে কিরূপ অসহ্য কষ্ট ভোগ করে তার হৃদয় বিদারক বিবরণ রয়েছে পেতবত্থু গ্রন্থে।[৫৬] এ গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার প্রেত সম্পর্কে এবং প্রেতলোক সম্বন্ধে বৌদ্ধমতের একটি পরিচ্ছন্ন ধারণা জ্ঞাত হওয়া যায়।[৫৭] এখানে প্রেতলোকের দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগের যে বিষাদময় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে তার প্রধান উদ্দেশ্য হল যাতে সাধারণ মানুষ দুষ্কর্মের অশেষ যন্ত্রণা সম্পর্কে অবহিত থেকে ভবিষ্যৎ জীবনে অপকর্ম থেকে বিরত থাকে এবং প্রাণিজগতের প্রতি মৈত্রী পরায়ণ হয়ে সৎকর্ম অনুশীলন করে এবং ফলস্বরূপ ইহ-পরলোকে সুখময় জীবন লাভ করে।[৫৮]

গল্পের মাধ্যমে উপদেশ প্রদান ধর্মীয় সাহিত্যের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। পেতবত্থু গ্রন্থখানিও এর ব্যতিক্রম নয়।[৫৯] গল্পের বর্ণনায় প্রেতদের অবর্ণনীয় দুঃখ-দুর্দশার কাহিনী গল্পপিপাসু পাঠক মনকে সহজে ব্যথিত ও আপ্লুত করে। প্রেতবত্থু গ্রন্থে চারটি বর্গে

www.pathagar.com

সর্বমোট একান্নটি গল্প রয়েছে। আমরা কয়েকটি কাহিনীর সংক্ষিপ্ত বিবরণ এখানে তুলে ধরছি ঃ

রাজগৃহে মহাধনশ্রেষ্ঠী নামে এক ধনকুবেরের একটিমাত্র পুত্র ছিল। সে ছিল আলালের ঘরের দুলাল। মাতা-পিতার অতি আদরে সে ক্রমান্বয়ে হয়ে উঠল উশৃঙ্খল ও ছন্নছাড়া। তার দৈনন্দিন কাজ ছিল দুষ্টু সঙ্গীদের সাথে মিলে দুষ্কর্ম করা। পিতা-মাতার হিতোপদেশ সে উপেক্ষা করত। শ্রমণ-ব্রাহ্মণ দেখলে ভ্রুকূটী ও উপহাস করত। পিতা-মাতার মৃত্যুর পর সে হল সমস্ত সম্পত্তির অধিকারী। অজস্র অর্থ সে যথেচ্ছা খরচ করতে লাগল, ব্যভিচার, নাচ-গান, মদ্যপান ইত্যাদি অসৎকর্মে ব্যয় করে সে অচিরে রিক্ত হয়ে পড়ল। অনন্তর একদা তার সঙ্গীরা পরামর্শ দিল চুরি করতে। চুরি করতে গিয়ে সে ধরা পড়ল রাজকর্মচারীর হাতে। বিচারে তার প্রাণদণ্ড হল। ঘাতক কর্তৃক বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় প্রাসাদ বাতায়ন পথে সুলসা নাম্নী জনৈক বারাঙ্গনা নির্যাতিত চোরকে দেখতে পেল। তার পূর্ব পরিচয়ের কারণে সুলসা চোরের জন্য চতুর্বিধ সুমধুর ওজঃ সম্পন্ন মোদক পানীয় জল পাঠিয়ে দিল। ঠিক সেই সময়ে মোগ্গল্লান স্থবির বিদ্যদৃষ্টিতে শ্রেষ্ঠীপুত্রের শোচনীয় মৃত্যু প্রত্যক্ষ করে তার নিশ্চিত নিরয়গমন হতে উদ্ধার করার জন্য ঋষিপ্রভাবে তার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। তৎমুহূর্তে সুলসার প্রেরিত খাদ্যসামগ্রীও তার সামনে উপস্থিত করা হল। চোর ভাবল "মৃত্যুকালে মোদক খাওয়ার প্রয়োজন কি। এটা আমার পরলোকের পাথেয় হবে।" এরূপ চিন্তা করে সে মোদক ও পানীয় স্থবিরকে শ্রদ্ধাচিত্তে দান করল। অনন্তর ঘাতক যথাসময়ে যথাস্থানে তার শিরচ্ছেদ করল। এই দানের ফলে তার উর্ধ্বতন দেবলোকে উৎপত্তির হেতু হয়েছিল বটে, কিন্তু সুলসার প্রতি অনুরাগ-চিত্ত উৎপন্ন হওয়ায় সে মৃত্যুর পর রাজগৃহের পর্বত কন্দরে এক বটবৃক্ষে হীনস্তরের বৃক্ষদেবতারূপে জন্ম পরিগ্রহ করল। একদা সুলসা ভ্রমণে সেই বটবৃক্ষের নিচে গিয়েছিল। দেবতা তাকে দেখে কামরাগাসক্ত হয়ে দেবঋদ্ধির প্রভাবে স্বীয় ভবনে নিয়ে গেল। এর এক সপ্তাহ পরে বুদ্ধ বেণুবনে ধর্মদেশনা করছিলেন। সুলসার বিশেষ অনুরোধে বৃক্ষদেবতা তাকে ধর্মসভায় উপস্থিত করাল। জনতা সুলসার অন্তর্ধানের বিষয় জানতে চাইলে সে আনুপূর্বিক বিষয় ব্যক্ত করল। সভাস্থ জনগণ আশ্চার্যান্বিত হয়ে বলল, "অর্হৎগণ জগতে শ্রেষ্ঠ পুণ্যক্ষেত্র। এরূপ পুণ্যক্ষেত্রে অল্পমাত্র দান করলেও দেবলোক প্রাপ্তি ঘটে।[৬০] গল্পটিতে লৌকিক ও লোকোত্তর ঘটনার অবতারণা করা হয়েছে।

শূকরমুখ প্রেত কাহিনীতে জনৈক ভিক্ষু বাক্যে অসংযত হওয়ার ফলে সুবর্ণ বর্ণের দেহধারী হয়েছিল বটে, কিন্তু মুখখানা ছিল কুৎসিত কদাকার শূকরের মুখের ন্যায়।[৬১] এই ভিক্ষু কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে প্রব্রজিত হয়েছিল। সে সর্বদা ভিক্ষুদিগকে আক্রোশপূর্ণ বাক্যে ভৎর্সনা করত। মৃত্যুর পর সে নিরয়ে এক বুদ্ধান্তরকাল অসীম দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করে গৌতমবুদ্ধের সময় রাজগৃহে গৃধ্রকূট পর্বতপাদদেশে ক্ষুধা-তৃষ্ণাকাতর প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার দেহ হয়েছিল সুবর্ণবর্ণের এবং মুখখানা হয়েছিল শূকরের ন্যায় কুৎসিত।[৬২] পূতিমুখপ্রেত কাহিনীটিও অনুরূপ বাক্যে সংযমহীনতার পরিণতি। এই

www.pathagar.com

প্রেতের মুখ হতে সর্বদা দুর্গন্ধ বের হত। গল্পে আছে, কশ্যপ বুদ্ধের সময় দু'জন যুবক শাসনে প্রব্রজিত হয়ে উভয়ে একত্রে অবস্থান করতেন। তাঁরা ছিলেন সংযত, শীলবান ও যথালাভে তুষ্ট। তাঁদের বিহারে এক সময় অতিথি হিসাবে উপস্থিত হল এক কুটিল ও বিদ্বেষপরায়ণ ভিক্ষু। বিহারের ভিক্ষুদ্বয় তার যথাযোগ্য অভ্যর্থনা ও সৎকার করে বিহারে রাখলেন। সেই বিহারটি ছিল অতি মনোরম। ভিক্ষাচারণের জন্য গ্রামটিও ছিল অতি উত্তম। আগন্তুক ভিক্ষু আবাসিক ভিক্ষুদ্বয়কে তাড়িয়ে সেখানে একা সুখে বাস করার দুরভিসন্ধি নিয়ে তাদের উভয়কে পরস্পরের বিরুদ্ধে পরুশ বাক্যে বিরোধের সৃষ্টি করল। তাদের বন্ধুত্বের বন্ধন ছিন্ন হল। এক সময়ে পরস্পর পরস্পরকে সন্দেহের চোখে বিদ্বেষভাব পোষন করতে লাগলেন। অবশেষে উভয়ে বিহার ছেড়ে দু'দিকে চলে গেলেন। গ্রামবাসীরা ভিক্ষুদ্বয় সম্পর্কে জানতে চাইলে সেই পাপমতি ভিক্ষু বলল, 'তারা পরস্পর বিবাদ করে বিহার ছেড়ে চলে গেছে। তখন থেকে আগন্তুক ভিক্ষু সেই বিহারে বাস করার সময় তার মনে অনুতাপের উৎপত্তি হল। অচিরে সে অসহ্য রোগে আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হল এবং মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হল। সে এক বুদ্ধান্তর কাল নরক-যন্ত্রণা ভোগ করার পর গৌতম বুদ্ধের সময়ে রাজগৃহের অনতিদূরে পূতিমুখ প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে। তার মুখ হতে সবসময় কৃমিকুল বের হয়ে মুখের বহির্ভাগে নানাস্থানে ক্ষত-বিক্ষত করে খেত। তার দুর্গন্ধ বহুদূর পর্যন্ত প্রবাহিত হত। নারদ স্থবির একসময় এই প্রেতের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হলে তাকে জিজ্ঞেস করেন যে, তার দেহকান্তি সুবর্ণময়, কিন্তু ভীষণ পূতিগন্ধময় কেন ? উত্তরে প্রেত উক্ত কাহিনী ব্যক্ত করে বলল- 'পিশুন ও মিথ্যাবাক্য পরিহার করে বাক্যে সংযমী ব্যক্তি প্রভূত সুখের ভাগী হয়।'[৬৩] এসব কাহিনী অতি প্রাকৃতিক বটে, কিন্তু ধর্মীয় উপাখ্যান হিসেবে চমৎকার।

মৃতজ্ঞাতির সুখ-সমৃদ্ধির উদ্দেশ্যে দান প্রথা প্রত্যেক ধর্মে অনুমেদিত। বৌদ্ধধর্মে জ্ঞাতি প্রেতদের উদ্দেশ্য দান-প্রথা প্রবর্তনের পিছনে কয়েকটি কাহিনীর অবতারণা করা হয়েছে। বুদ্ধ ত্রিকুড্ঢ প্রেত কাহিনীতে উল্লেখ করেছেন, "প্রেতলোকে যদ্বারা প্রেতগণ সুখে বাস করতে পারে, তেমন কৃষি ও গোপালনাদি কিছুই নেই। বাণিজ্য, টাকা পয়সার বিনিময়ে ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যবস্থাও নেই। সুতরাং এখান হতে জ্ঞাতিগণ প্রদত্ত পুণ্যলাভেই প্রেতগণ তথায় সুখে বাস করতে পারে। উন্নতস্থল হতে অতিবর্ষিত জল যেমন নিম্নদিকে প্রবাহিত হয়, সেইরূপ এখান হতে প্রদত্ত পুণ্যরাশিও প্রেতদের নিকট গিয়ে পৌঁছে।[৬৪] কাহিনীতে আছে, বিরানব্বইকল্প পূর্বে ভারতের মধ্যপ্রদেশে কাশিপুরী নামে নগরে জয়সেন নামে এক রাজা ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিলি সিরিমা। তাঁদের পুত্র ফুস্স বুদ্ধ হলেন। বুদ্ধের প্রতি স্নেহবশত রাজা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের ভরণ-পোষণ সেবাপূজাদি করতেন, অন্য কাকেও সেবা-পূজার সুযোগ দিতেন না। বুদ্ধের তিনজন বৈমাত্রেয় ভাতা ছিলেন। তাঁরাও ত্রিরত্নের সেবা করার সুযোগ পেতেন না। তাঁরা পরামর্শ করে অপপ্রচার করলেন যে, সীমান্ত অঞ্চলে বিদ্রোহ হয়েছে। রাজা পুত্রদের বিদ্রোহ দমনে প্রেরণ করলেন।

www.pathagar.com

কিছুদিন পর পুত্রগণ এসে জানালেন যে বিদ্রোহ দমন করা হয়েছে। রাজা খুশী হয়ে তাঁদের বর দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে তাঁরা বুদ্ধকে পূজা করার সুযোগ প্রার্থনা করলেন। রাজা অনন্যোপায় হয়ে তিন মাসের জন্য পূজা করার সুযোগ প্রদান করলেন। রাজপুত্রগণ তিন মাস বর্ষাযাপনের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে নতুন বিহারটি নির্মাণ করে বর্ষাযাপনের ব্যবস্থা করলেন। সেই বিহারের এক সস্ত্রীক ভাণ্ডাগারিক ছিলেন অতি শ্রদ্ধাবান। তিনি বুদ্ধ ও সঙ্ঘের জন্য উৎকৃষ্ট দানীয় বস্তু প্রদান করতেন। সেবার জন্য বহু কর্মচারী ও সেবক নিয়োগ করা হয়েছিল। সেবকের মধ্যে কেহ কেহ ছিল শ্রদ্ধাহীন। তারা অনেক সময় দানীয় বস্তু পূর্বে নিজেরাই পরিভোগ করত। এই শ্রদ্ধাহীন সেবকগণ মৃত্যুর পর নরকগামী হয়ে ভীষণ নারকীয় যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল। এই ভদ্রকল্পে কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে তারা প্রেতরূপে জন্ম গ্রহণ করে। একসময় তারা কশ্যপ বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে তাদের মুক্তির সময়কাল জানতে চাইলে বুদ্ধ বললেন, "অনাগতে গৌতম বুদ্ধের সময় রাজা বিম্বিসার তোমাদের উদ্দেশ্যে পুণ্যদান করলে তোমরা মুক্তি পাবে। কেননা বিম্বিসার তোমাদের পূর্বজ্ঞাতি।"

অনন্তর সিদ্ধার্থকুমার বুদ্ধত্ব প্রাপ্ত হয়ে ধর্মচক্র প্রবর্তনের পর অনুক্রমে সশিষ্যে রাজগৃহে উপনীত হলেন। রাজা সশিষ্য বুদ্ধকে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্যে পরিতৃপ্ত করলেন। বিম্বিসারের জ্ঞাতি প্রেতগণ রাজবাড়ীতে সমবেত হল পুণ্যাংশ লাভের আশায়, কিন্তু রাজা পুণ্যদান না করায় তারা ক্ষোভে-দুঃখে সেই রাত্রিতে রাজবাড়ীতে ভীতিজনক বিকট চীৎকার করতে লাগল। রাজা প্রত্যুষে বুদ্ধের নিকট গিয়ে উক্ত বিষয় নিবেদন করলে বুদ্ধ বললেন, "মহারাজ, আপনার অতীতের বহু জ্ঞাতি প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়ে আপনার পুণ্যাংশ লাভের প্রত্যাশায় এক বুদ্ধান্তরকাল অপেক্ষা করছে, আপনি গতকাল দান দিয়ে পুণ্যাংশ অনুমোদন করেননি। তাই তারা নিরাশ হয়ে চীৎকার করছে।" অতঃপর রাজা ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে উৎকৃষ্ট আহার্য দ্বারা দান দিয়ে পুণ্যানামুদোন করলেন, 'ইহা আমার জ্ঞাতিগণের হোক' বলা মাত্রই তারা সুখী হল, তাদের জন্য দিব্য খাদ্য-বস্ত্র-পানীয় ইত্যাদি উৎপন্ন হল। বুদ্ধের অলৌকিক শক্তির প্রভাবে রাজা প্রেতদের দুর্দশা থেকে দানের প্রভাবে মুক্তি লাভ দর্শন করে অত্যন্ত প্রীতি লাভ করলেন।[৬৫] এ ঘটনার পর থেকে প্রেতদের উদ্দেশ্যে দানাদি সংকর্ম সম্পাদনের মাধ্যমে পুণ্যামোদন করার প্রথা প্রচলিত হয়ে আসছে। ঘটনাটি অতিপ্রাকৃতিক হলেও সাধারণের মনে গভীর রেখাপাত করে, তাই কারো পক্ষে উপেক্ষা করা সম্ভব হয় না।

পঞ্চপুত্রখাদিকা[৬৬] ও সপ্তপুত্রখাদিকা[৬৭] প্রেত কাহিনী দুটির বিবরণ প্রায় একই। শ্রাবস্তীর অদূরে ছিল একব্যক্তির বন্ধ্যা স্ত্রী। স্ত্রী ও জ্ঞাতিগণের অনুরোধে বংশরক্ষা করার জন্য ঐ ব্যক্তি দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করেন। দ্বিতীয় স্ত্রী যথাসময়ে অন্তঃসত্ত্বা হলে প্রথম স্ত্রীর ঈর্ষা হয়। সে ঔষধ প্রয়োগ করে সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করায়। এ বিষয় দ্বিতীয় স্ত্রীর জ্ঞাতিগণ অবগত হয়ে তাকে জিজ্ঞেস করলে সে অস্বীকার করে মিথ্যা শপথ করে, "আমি যদি গর্ভপাত করি তাহলে আমি যেন দুর্গতিপরায়ণা ক্ষুধাতৃষ্ণাতুর হয়ে জন্মগ্রহণ

করি। প্রত্যহ প্রাতে ও সন্ধ্যায় পাঁচটি করে পুত্র প্রসব করে সেগুলো ভক্ষণ করলেও যেন আমার ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তি না হয়।" এই মিথ্যা শপথকারিণী অচিরে মৃত্যুর পর সেই গ্রামের অনতিদূরে ভীষণ দর্শনা এক পেত্নী হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। সে ছিল বিকটদর্শনা, দেহ থেকে সর্বদা পাঁচ দুর্গন্ধ বের হত। সে প্রতিদিন সকাল-সন্ধ্যায় পাঁচটি করে পুত্র প্রসব করে ভক্ষণ করত, কিন্তু ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবৃত্তি হত না। প্রতিনিয়ত ক্ষুধা-তৃষ্ণার অনলে দগ্ধ হত। একদা আটজন স্থবির শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদর্শনে আগমন করার সময় এই বিকটদৃশ্য পেত্নীকে দেখে তার পূর্ব জীবন জিজ্ঞেস করলে সে উক্ত কাহিনী বিবৃত করে এবং তার স্বামীকে জ্ঞাত করিয়ে দান অনুমোদন করার জন্য অনুরোধ করে। ভিক্ষুগণ তার স্বামীর গৃহে গিয়ে সমস্ত বিষয় অবহিত করলে তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে উত্তম দান দিয়ে পুণ্যানুমোদন করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পেত্নী দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করে। সপ্তপুত্রখাদিকা পেত্নীও পূর্বজন্মে সপত্নীর গর্ভ নষ্ট করে মিথ্যা শপথ বাক্য উচ্চারণ করেছিল "আমি যদি গর্ভপাত করি তাহলে সকাল-সন্ধ্যায় সাতটি করে পুত্র প্রসব করে ভক্ষণ করলেও যেন ক্ষুধাতৃষ্ণার নিবৃত্তি না হয়।" সে-ও মৃত্যুর পর ভীষণ দুর্গন্ধময় কদাকার দেহধারিণী পেত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করে সপ্তপুত্র প্রসব করে সকাল-বিকাল ভোজন করত।

গর্ভপাত ও মিথ্যা শপথ গ্রহণের ফলে তারা উভয়ে অসহ্য দুঃখ-যন্ত্রণা ভোগ করেছে। পালৌকিক জীবনে দুঃখ-কষ্টের বিবরণ কাল্পনিক ও রূপকথার মত, কিন্তু ইহকালিক জীবন নিরেট বাস্তবতায় সমুজ্জ্বল। এসব কাহিনী সত্যিই পাঠকমনে নিঃসন্দেহে একটি সুস্পষ্ট ছাপ ফেলে।

মহাপেশকার পেত্নীর[৬৮] করুণ জীবন-কাহিনী হৃদয়বিদারক। কোনো সময় বারজন ভিক্ষু বর্ষাবাসের জন্য স্থান অন্বেষণ করার সময় কোনো এক তন্তুবায় গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেই গ্রামে এগারটি তন্তুবায় পরিবার ছিল। প্রত্যেক পরিবার এক একজন ভিক্ষুর ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করল, প্রধান তন্তুবায় দুইজন ভিক্ষুর ভার গ্রহণ করলেন। তাঁর স্ত্রী ছিল শ্রদ্ধাহীনা, মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণা ও কৃপণ স্বভাবা। তিনি তাঁর স্ত্রীর কনিষ্ঠাকে এনে ভিক্ষুর সেবার দায়িত্ব দিলেন। এই রমণী শ্রদ্ধাসহকারে ভিক্ষুদের সেবা করতেন। বর্ষাশেষে প্রত্যেক ভিক্ষুকে একটি করে চীবর দান করলেন। তখন কৃপণ স্ত্রী প্রদুষ্ট মনে স্বামীকে ভৎর্সনা করল, "তুমি শ্রমণদিগকে যে অন্নপানীয় দান করেছ, তা তোমার জন্য পরলোকে বিষ্ঠা-মুত্র-পুঁজ-রক্ত ও দানীয় বস্ত্র প্রজ্জ্বলিত লৌহপাত হোক।"

যথাকালে উভয়ে মৃত্যুর পর তন্তুবায় প্রধান 'বিজ্ঞ' অরণ্যে মহানুভব বৃক্ষদেবতারূপে এবং তাঁর পত্নী অনতিদূরে পেত্নীরূপে জন্মগ্রহণ করে। পেত্নী হল বিবস্ত্রা, দুর্বণা ও তীব্র ক্ষুধা-পিপাসাতুরা। সে একদা স্বামী বৃক্ষদেবতার নিকট উপস্থিত হয়ে বস্ত্র ও অন্নপানীয় যাচনা করল। দেবতা বহু খাদ্য দান করলেন, কিন্তু পেত্নী গ্রহণ করা মাত্রই বিষ্ঠা, মূত্র, পুঁজ ও রক্তে পরিণত হল, বস্ত্র প্রদান করলেন, তাও প্রজ্জ্বলিত লৌহপাতে পরিণত হল। পেত্নী মহাদুঃখ ভোগ করে ক্রন্দন করতে লাগল। সেই সময় একজন ভিক্ষু উক্ত অরণ্যপথে যাবার সময় উক্ত বৃক্ষদেবতার আশ্রিত বৃক্ষমূলে উপস্থিত হলেন। বৃক্ষদেবতা

www.pathagar.com

মানববেশে ভিক্ষুকে তাঁর বিমানে নিয়ে গেলেন। এই সময় উক্ত পেত্নী অন্ন-পানীয় যাচনা করল। দেবপুত্র অন্ন-বস্ত্র প্রদান করা মাত্রই পূর্ববৎ অবস্থা প্রাপ্ত হল। ভিক্ষু ইহা দর্শন করে দেবপুত্র ও পেত্নীর পূর্বকাহিনী দেবতার নিকট জ্ঞাত হয়ে পেত্নীর উদ্দেশ্যে কোনো আর্যশ্রাবককে দান দেওয়ার পরামর্শ দিলেন। দেবপুত্রও দিব্য অন্ন-পানীয় ভিক্ষুকে দান দিয়ে, সেই দান ফল পেত্নীর উদ্দেশ্যে দান করলেন। সঙ্গে সঙ্গে পেত্নী দিব্য খাদ্য-বস্ত্রের অধিকারী হল।

বুদ্ধ বারাণসীর ঋষিপতনে বাস করার সময় অর্হৎ সংকৃত্য স্থবিরের ধর্ম শ্রবণ করে তথাকার জনগণ ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন হয়েছিল। তখন সেই সময়ে বারাণসীতে এক মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ন ব্রাহ্মণ পরিবার ছিল। তাদের দুই পুত্র ও এক কন্যা, তাদের জ্যেষ্ঠপুত্রের সঙ্গে কোনো এক শ্রদ্ধাবান উপাসকের বন্ধুত্ব ছিল। একদা তিনি বন্ধুকে নিয়ে সংকৃত্য স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করেন। বন্ধুর অনুরোধে প্রত্যহ একজন ভিক্ষুর পিণ্ডপাত দানের জন্য ব্রাহ্মণপুত্র রাজী হল। ভিক্ষুর ধর্ম শ্রবণ করে তার কনিষ্ঠ ভ্রাতা ও ভগ্নী উভয়ে বুদ্ধশাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বিভিন্ন পুণ্যকর্মে আত্মনিয়োগ করল। কিন্তু তাদের মাতাপিতা ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ও অপ্রসন্ন ছিল। এই ব্রাহ্মণ স্বীয় শ্যালক-পুত্রের সাথে আপন কন্যার বিয়ে দেবার ঠিক করেছিল। এদিকে সেই বর আয়ুষ্মান সংকৃত্য স্থবিরের নিকট ধর্ম শ্রবণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি প্রতিদিন স্বীয় মাতৃ-গৃহে ভোজন করার জন্য গমন করলে মাতা স্বীয় কন্যা দ্বারা প্রলুব্ধ করাত। এর ফলে তিনি উৎকণ্ঠিত হয়ে চীবর ত্যাগ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলে গুরু দিব্য দৃষ্টিতে তাঁর অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির হেতু দর্শন করে তাঁকে কিছুকাল অপেক্ষা করতে বললেন। এদিকে কিছুদিন পর সেই ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী পুত্রদ্বয় ও কন্যাসহ প্রবল ব্যাতাঘাতে ঘরচাপা পড়ে মৃত্যুমুখে পতিত হয়। মৃত্যুর পর পুত্রদ্বয় ও কন্যাটি ভূমিবাসী দেবতা এবং ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণী প্রেতকূলে জন্মগ্রহণ করল। পুত্রদের জন্য হস্তীযান ও অশ্বযান এবং কন্যার জন্য সুবর্ণসিবিকা উৎপন্ন হল আর ব্রাহ্মণ-ব্রাহ্মণীর জন্য উৎপন্ন হল দুটি বৃহৎ মুদ্গার। উক্ত ভিক্ষু সংকৃত্যের সঙ্গে ঋষিপতন বিহারের পিছনে দাঁড়িয়েছিলেন, তখন উক্ত প্রেতদ্বয়কে দেখে তাদের কর্মবিপাক সম্পর্কে জানতে চাইলে তারা বলল, "শ্বেতহস্তীতে আরূঢ় ব্যক্তি আমাদের বড়পুত্র, অশ্বপৃষ্ঠে কনিষ্ঠপুত্র এবং স্বর্ণশিবিকায় আমার কন্যা পুণ্যপ্রভাবে জন্মগ্রহণ করেছে আর আমরা ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাহীন ও কৃপণ ছিলাম বিধায় এখানে ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করছি। আমরা পরস্পরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রহার করি। আঘাতপ্রাপ্ত স্থানে সুবৃহৎ ব্রণ উৎপন্ন হয়ে তখনই পরিপক্ক হয়। তারপর একে অন্যের ব্রণ বিদীর্ণ করে রক্ত পান করি, এতেও আমাদের তৃপ্তি হয় না। আমরা তোমার সেই মাতুল-মাতুলানী। শ্রামণের প্রেতদের মুখে এসব শ্রবণ করে সংসারে বিরাগ উৎপন্ন হল। তিনি কর্মস্থান গ্রহণ করে অচিরে অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হলেন।[৬৯] বিচিত্র দুঃখ-কষ্টের করুণ কাহিনী মানব-হৃদয় সহজে আকৃষ্ট করে।

একসময় আয়ুষ্মান সারিপুত্র, মোগ্‌গল্লান, অনুরুদ্ধ ও কপ্পিন স্থবির রাজগৃহের অনতিদূরে এক মনোরম অরণ্যে বাস করছিলেন। সেই সময়ে বারাণসীতে মহাধনাঢ্য এক

www.pathagar.com

ব্রাহ্মণ বণিক বাস করতেন। তিনি ছিলেন অতি শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি। সর্বদা শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দীন-দুঃখীদের শ্রদ্ধার সাথে যথাযোগ্য দান করতেন। একদা তাঁর স্ত্রীর উপর দানকার্যাদির দায়িত্ব অর্পণ করে বাণিজ্যে গমন করেছিলেন। স্ত্রী ছিল অত্যন্ত দুর্মতি পরায়ণা ও শ্রদ্ধাহীনা। সে স্বামী যাওয়ার পরই দান-প্রথা উচ্ছেদ করে দেয়। দীন-দরিদ্র অন্নপানীয় চাইলে বলত, "বিষ্ঠা খাও, মূত্র পান কর, রক্ত পান কর এবং তোমাদের মায়ের মাথা খাও।" এই নারী এভাবে অকুশল কর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর প্রেতযোনি প্রাপ্ত হয়। সে বস্ত্রহীন, কুৎসিত, অস্থিচর্মাবৃত বিস্তৃত দেহধারিণী হয়েছিল। সে নারী-পুরুষের বমি, নিঃসৃত শ্লেষ-কপ, নিক্ষিপ্ত থুথু, সিকনি, শ্মশানে অর্ধদগ্ধ মৃতদেহের চর্বি, প্রসূতির গর্ভমল, ব্রণের পুঁজ-রক্ত এবং হস্ত-পদ-নাসিকা ও শিরচ্ছেদে যেই রক্তস্রাব হত, তদ্দ্বারা ক্ষুন্নিবৃত্তি করত এবং বাসস্থানবিহীন নিঃস্ব অবস্থায় শ্মশানে মললিপ্ত শব-মঞ্চে শয়ন করত। সে এসব দুঃখের কাহিনী একদা সারিপুত্র স্থবিরকে নিবেদন করে বলল, "ভন্তে, আপনি আমার গত পঞ্চম জন্মের পুত্র। আপনি দান দিয়ে সেই দানের পুণ্য আমাকে প্রদান করুন। এতে আমি দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ করব।" সারিপুত্র স্থবির পেত্নীর সেই কথা শ্রবণের পর যথাসময়ে মোগ্‌গল্লান স্থবির প্রমুখ একত্রে পিণ্ডাচরণে বহির্গত হয়ে নৃপতি বিম্বিসারের গৃহে উপস্থিত হলেন। রাজা বিম্বিসার চারখানা কুটীর এবং নানাবিধ অন্ন-পানীয় ও বস্ত্রাদি সজ্জিত করে সারিপুত্র স্থবিরকে দান করলেন। সারিপুত্র সেই কুটীর ও দানীয় সামগ্রী বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু সঙ্ঘকে দান দিয়ে পেত্নীকে পুণ্যদান করলেন। পেত্নী সেই পুণ্য অনুমোদন করে তম্মুহূর্তেই দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল।[৭০] পুণ্যানুমোদনের অলৌকিক প্রভাব এখানে বিশেষভাবে লক্ষণীয়।

তিষ্যা অতি শ্রদ্ধাবতী, ত্রিরত্নে প্রসন্না ও পতিভক্তিপরায়ণা রমণী। তার জ্যেষ্ঠ সপত্নী মত্তা ছিল শ্রদ্ধাহীনা ও ক্রোধপরায়ণা। তার ইহজীবনের কর্ম ও পরজীবনে দুর্গতি লাভ রূপকথার মত। তিষ্যা যথাকালে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। তার প্রতি মত্তার ঈর্ষা বেড়ে গেল। সে ঈর্ষানলে প্রজ্জ্বলিত হয়ে গৃহ সমার্জ্জনের স্তূপীকৃত আবর্জনা দু'হাতে নিয়ে তিষ্যার মস্তকের উপর নিক্ষেপ করল। এছাড়া সে তিষ্যার কাপড়, আভরণ ইত্যাদি অপহরণ করে তাকে বিভিন্নভাবে কষ্ট দিত। অনন্তর মৃত্যুর পর মত্তা বস্ত্রহীন, কদাকার, কৃশাঙ্গিনী ও বিষ্ঠা-গন্ধা পেত্নী হয়ে জন্মগ্রহণ করে অনন্ত দুঃখ ভোগ করতে লাগল। একদিন সেই মত্তা-পেত্নী তিষ্যাকে দর্শন দিয়ে তার অবর্ণনীয় কষ্টের কাহিনী বিবৃত করে মুক্তির জন্য পুণ্য ভিক্ষা করল। তিষ্যা ও তার স্বামী ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহার্যাদি দান করে মত্তার উদ্দেশ্যে পুণ্যানুমোদন করল। মত্তা মুক্তি লাভ করে সুখের অধিকারিনী হল।[৭১] তিষ্যাই মত্তাকে প্রেতলোক থেকে মুক্ত করেছিল। মুক্তিলাভের পর মত্তা তিষ্যাকে দেখা দিয়ে তার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করল।

ধনপালপ্রেত[৭২] কাহিনী একটি রোমাঞ্চকর উপাখ্যান। শ্রদ্ধাহীন, কৃপণ ও মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এরকচ্ছ নগরের শ্রেষ্ঠী বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়ে জীবনে কখনও দান করেনি। যাচকের ভয়ে সে দ্বার রুদ্ধ করে আহার করত। কারো উপকার করা দূরে থাক,

www.pathagar.com

সুযোগে ক্ষতি সাধন করত। সেই পাপী ধনপাল মৃত্যুর পর এক মরুভূমিতে তালবৃক্ষ প্রমাণ দেহবিশিষ্ট প্রেতরূপে জন্ম গ্রহণ করে। সে চর্মহীন, শির-কেশ রুক্ষ ও বিকট দেহের আকৃতি ভয়ানক দুর্বর্ণ বিশিষ্ট হয়েছিল। সে কণা প্রমাণ তণ্ডুল ও বিন্দু পরিমাণ জলও পেত না। সে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় ক্লিষ্ট হয়ে ইতস্তত ছুটাছুটি করত।

সেই সময়ে শ্রাবস্তীর কতিপয় বণিক শকট-পূর্ণ পণ্য সামগ্রী নিয়ে উত্তরাপথে বাণিজ্যার্থে যাতায়াত করতেন। তাঁরা একসময় সায়াহ্নে কোনো এক শুষ্ক নদী তীরে উপনীত হয়ে রাত্রি যাপনের আয়োজন করছিলেন। তখন উক্ত প্রেত ক্ষুৎ-পিপাসায় ক্লান্ত দেহে জল অন্বেষণে রত হয়ে রাতে সেখানে উপনীত হল। সেখানেও বিন্দুমাত্র জল না পেয়ে সে হতাশায় ছিন্নমূল তালবৃক্ষ সদৃশ খোলা মাঠে পড়ে রইল। বণিকগণ তাকে দেখে তার দুর্গতির কারণ জানতে চাইলেন। সে নিজেই অতীত জীবনের দুষ্কর্মের বিষয় ব্যক্ত করল, "আমার প্রভূত পরিমাণে ধন-সম্পত্তি ছিল, কিন্তু আমি ছিলাম শ্রদ্ধাহীন, মাৎসর্য্য পরায়ণ ও কৃপণ। অন্যের দানে বাধা সৃষ্টি করতাম, নিজেও দান দিতাম না বরং অন্যের দেওয়া পুষ্করিণী, জলছত্র, সেতু ইত্যাদি ধ্বংস করতাম। সেই দুষ্কর্মের ফলে আমি প্রেতরূপে জন্ম গ্রহণ করে সীমাহীন কষ্ট ভোগ করছি। এখান থেকে নরকে গমন করে আমাকে আরও অধিকতর যন্ত্রণা ভোগ করতে হবে।"

বণিকগণ প্রেতের বাক্য শুনে তার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে জলপূর্ণ পাত্র হতে তার মুখে জল ঢালতে লাগলেন। কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় একবিন্দু জলও তার মুখে পড়ল না। পাপের ফল এরূপই হয়। অনন্তর বণিকগণ শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করে প্রেতের উদ্দেশ্যে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিয়েছিলেন। প্রেত অবর্ণনীয় দুঃখ থেকে মুক্তি পেল।

অঙ্কুরপ্রেত কাহিনীটিও উপাখ্যানের মতো চমৎকার। অঙ্কুর কিন্তু প্রেত নহে, অঙ্কুরের জীবনাশ্রিত কাহিনী বলে এরূপ নামকরণ।[৭৩] উপসাগর ছিলেন উত্তর মধুর রাজ্যের অধিপতি। অসিতরঞ্জন নগরের মহাকংশের কন্যা দেবগর্ভার সঙ্গে তাঁর পরিণত হয়। তাদের অঙ্কুরসহ দশ ভ্রাতা ও এক কোন ছিল। পিতার মৃত্যুর পর রাজ্য বর্ধিত করে দশ ভ্রাতা দশ ভাগ করে নিলেন। অঙ্কুর স্বীয় অংশ একমাত্র বোন অঞ্জনাকে প্রদান করে নিজে বাণিজ্য দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে লাগলেন। তিনি প্রায় সময় দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। তাঁর এক ভাণ্ডাগারিক দাস ছিল। অঙ্কুর তাকে যথাকালে বিয়ে করালেন। স্ত্রী অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় তার মৃত্যু হয়। যথাসময়ে সে একটি পুত্র সন্তান প্রসব করল। অঙ্কুর মাতা-পুত্রের ভরণ-পোষণ চালাতে লাগলেন। বালক বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অঙ্কুর তাদের মুক্তি দান করেন। পুত্র সেখান হতে ভেরুর নামক নগরে গিয়ে এক দর্জিকন্যার পাণিগ্রহণ করে দর্জিকর্ম দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে থাকে। সেই নগরে অস্য়হ্ নামক এক দানশীল শ্রেষ্ঠী বাস করতেন। কোনো যাচক শ্রেষ্ঠী-গৃহ চিনতে না পারলে উক্ত দর্জি সানন্দচিত্তে দক্ষিণবাহু প্রসারণ করে শ্রেষ্ঠীর বাড়ি দেখিয়ে দিত। মধুর বাক্যে পথনির্দেশ করার ফলে মৃত্যুর পর সে কোনো মরুদ্যানের বটবৃক্ষে বৃক্ষ-দেবতা হয়ে জন্ম গ্রহণ করে। তখন তার দক্ষিণ হস্ত হয়েছিল সর্বকামদ মণি সদৃশ। সেই সময়ে ভেরুর নগরে এক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন

শ্রদ্ধাহীন লোক বাস করত। শ্রেষ্ঠীর দান দেখে সে ঈর্ষায় মর্মাহত হত। সে মৃত্যুর পর পূর্বোক্ত বৃক্ষদেবতার অনতিদূরে প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করে।

একদা অঙ্কুর বাণিজ্যগমনের সময় এক ব্রাহ্মণ বণিকও তাঁর সঙ্গী হয়েছিলেন। তাঁরা উভয়ে শকটপূর্ণ দ্রব্যসম্ভার নিয়ে মরুকান্তার পথে যাত্রা করলেন। মরুদ্যানে তাঁরা পথভ্রান্ত হয়ে দিকবিদিক ঘুরাঘুরি করতে লাগলেন। তাঁদের আহার্যাদি নিঃশেষ হয়ে এল। এমন সময় উক্ত মরুদ্যানের বৃক্ষদেবতার তাঁদের এরূপ বিপদ দর্শনে চিত্ত দয়াদ্র হল। অঙ্কুর পূর্বজন্মে তাঁর উপকারী ছিলেন- এ বিষয় স্মরণ করে ঋদ্ধি বলে তাঁদের সবাইকে বটবৃক্ষের নীচে নিয়ে আসলেন। শাখা-প্রশাখা পল্লবিত বৃহৎ বটবৃক্ষের ছায়ায় তাঁদের বিশ্রামের ব্যবস্থা করলেন। বৃক্ষদেবতা দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করে প্রথমে পানীয় জল দ্বারা সকলের পিপাসা নিবৃত্তি করলেন। অতঃপর তাঁদের ইচ্ছানুযায়ী সবকিছু প্রদান করলেন। বণিকগণ ও বলীবর্দ্দভদের পথশ্রান্তি বিনোদন করলেন। দেবতার এরূপ দিব্য প্রভাব দেখে ব্রাহ্মণ বণিক বৃক্ষদেবতাকে যে কোনো উপায়ে জোরপূর্বক হলেও শকটে তুলে নগরে নিয়ে যাবার জন্য অঙ্কুরকে বলল। অঙ্কুর মিত্রদ্রোহীতা ত্যাগ করার জন্য ব্রাহ্মণকে উপদেশ দিলেন। দেবতা তাঁদের কথা শুনে ব্রাহ্মণের প্রতি অসন্তুষ্ট হলেন। তাঁর অসম ক্ষমতা ছিল। পূর্বজন্মে যাচ-ককে দক্ষিণহস্ত প্রসারিত করে অসয়হ্ শ্রেষ্ঠীর গৃহ প্রদর্শন করে দিতেন বলে তাঁর দক্ষিণ হস্ত সুবর্ণময় ও সর্ব-কামদ হয়েছিল। ব্রাহ্মণ বণিককে বললেন, "হে ব্রাহ্মণ, তুমি আমার মত দেবতাকে বল-পূর্বক নিয়ে যেতে চাও। তুমি নিজের ওজন বোঝ না।" এরূপ বলে তার সমস্ত পণ্যদ্রব্য অন্তর্হিত করে তাঁকে ভীষণ ভয় প্রদর্শন করে তর্জন-গর্জন করতে লাগলেন। ব্রাহ্মণ ক্ষমা প্রার্থনা করলে দেবতা তুষ্ট হয়ে তার পণ্য সামগ্রী ফিরিয়ে দিলেন। অনন্তর তাঁরা দেশের দিকে যাত্রা করলে কিছুদূর অগ্রসর হবার পর এক বিকট-দর্শন প্রেতের সাক্ষাৎ পেলেন। প্রেতের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলল, "আমি উদারচিত্ত জুতিন্ধর গৃহপতির দানকার্যের কর্মচারী ছিলাম। দানের জন্য আগত যাচক ও ক্ষুধার্তদের দেখে আমি সরে যেতাম, আমার অন্তর সংকোচিত হত। দান দেবার সুযোগ পেলেও দান দিতাম না। এজন্য আমি মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়ে ষৎপরনাস্তি দুঃখ-কষ্ট ভোগ করছি।"

অতঃপর অঙ্কুর স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করে দানে আত্মনিয়োগ করলেন। তিনি প্রতিদিন ষাট সহস্র নৌকা বোঝাই সুগন্ধি তণ্ডুলের অন্ন যাকচদের দান করতেন। এভাবে সারা জীবন দান কার্য সম্পাদন করে তিনি যথাকালে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হয়ে দিব্যসুখ উপভোগ করতে থাকেন। বুদ্ধের সময় ইন্দক নামক জনৈক ব্যক্তি আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবিরকে এক চামচ মাত্র অন্ন দান করে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্ম গ্রহণ করেন এবং তিনি অঙ্কুরদের পুত্র অপেক্ষা অধিকতর দিব্য সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। গৌতম বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের সপ্তম বর্ষে তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হয়ে অভিধর্ম দেশনার মানসে পারিজাত বৃক্ষ-মূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবেশন করলে দশ সহস্র চক্রবালের দেবগণ সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তখন ইন্দক দেবপুত্র বুদ্ধের অনতিদূরে এবং অঙ্কুর

দেবপুত্র বহু দূরে উপবেশ করেছিলেন। বুদ্ধ অঙ্কুর দেবকে নিকটে আহ্বান করে তাঁর পূর্বকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। অঙ্কুর বললেন, "আমি বহু দানীয় সামগ্রী দীর্ঘকাল যাবৎ যেই মহাদান দিয়েছিলাম তা উপযুক্ত ক্ষেত্রে পড়েনি। ইন্দকের এক চামচ মাত্র অন্ন সুপাত্রে পড়াতে সুক্ষেত্রে উপ্ত বীজের ন্যায় বহুফল উৎপন্ন হয়েছে। আমি যখন দান দিয়েছিলাম তখন শীলবান দান গ্রহীতা ছিলেন না, তাই আমার বিপুল পরিমাণ দানেও অল্প পরিমাণ ফল প্রসব করেছে।"

গল্পে একদিকে স্বর্গীয় সুখের পরমানন্দ অন্যদিকে প্রেতদের নরক যন্ত্রণার বিষয় পাঠককে হর্ষ-বিষাদে দোলায়িত করে।

একদা উত্তরমাতা[৭৪] নাম্নী এক প্রেত্নী গঙ্গাতীরে বিশ্রামরত কঙ্কারেবত নামক স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়েছিল। সে ছিল দুর্বর্ণা ও বিকট দর্শনা। কিন্তু শির-কেশ ছিল অতি নীল, স্নিগ্ধ, কুঞ্চিতাগ্র, সুচিকণ ও সুদীর্ঘ, শির-কেশ এতই দীর্ঘ ছিল যে, চলার সময় কেশের অগ্রভাগ ভূমি স্পর্শ করত। সে স্বীয় কেশ দ্বারা দেহ আচ্ছাদন করে রেবত স্থবিরকে অনুরোধ করল, "ভন্তে, বিগত পঞ্চদশ বর্ষ যাবৎ আমি ভোজন-পান করিনি। আমি অতি পিপাসিত, আমাকে জল দান করুন।" স্থবির তার পূর্বজন্মের পাপকর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে সে বলল, "মহারাজ উদয়নের অমাত্য উত্তর আমার পুত্র। সে একসময় অরণ্যে কচ্চায়ণ স্থবিরের নিকট গিয়ে ত্রিশরণে শরণাপন্ন হয়। তদবধি সে প্রতিদিন ভিক্ষু-সঙ্ঘকে উত্তম আহার্যদি দান করত। কিন্তু আমি সেই দান অনুমোদন করতাম না, আমার ভীষণ ঈর্ষা উৎপন্ন হত। তাকে এরূপে তিরস্কার করতাম, "তুমি আমার ইচ্ছার বিরুদ্ধে শ্রমণদিগকে যে অন্ন-পানীয় দান দিচ্ছ, তা যেন পরকালে তোমার জন্য রক্তরূপে উৎপন্ন হয়। একসময় বিহার পরিষ্কার করার নিমিত্ত এক মুষ্ঠি ময়ূর-পালক দান দেবার সময় আমি অনুমোদন করেছিলাম। এই পুণ্যফলে আমরা শির-কেশ এত সুশ্রী হয়েছে, কিন্তু দানে অনুমোদন না করার ফলে অন্ন-পানীয়হীন জীবন কাটাতে হচ্ছে। গঙ্গানদীতে জল পান করতে গেলে সমস্ত জল রক্তে পরিণত হয়।" স্থবির উত্তর-মাতার প্রতি অনুকম্পা পরবশ হয়ে ভিক্ষালব্ধ অন্ন-পানীয় ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিয়ে পেত্নীর উদ্দেশ্যে পুণ্যানুমোদন করলেন। অতঃপর পেত্নী প্রেতলোক থেকে মুক্তি পেয়ে দিব্য সম্পত্তির অধিকারিণী হয়েছিল।

কণ্ণমুণ্ডপেত্নী কাহিনীটি একটি চমকপ্রদ উপাখ্যান। কাহিনীর বৈচিত্র্য বর্ণনা অতীব মনোমুগ্ধকর। কাহিনীতে আছে. কশ্যপবুদ্ধের সময় কিম্বিল নামক নগরে এক স্রোতাপন্ন উপাসক অবস্থান করতেন। তাঁর পাঁচশত সহায়ক উপাসক ছিলেন। তাঁরা সম্মিলিতভাবে জনকল্যাণকর কাজ করতেন এবং একত্রে বিহারে গমন করে ধর্মশ্রবণ করতেন। তাঁদের সহধর্মিনীগণও পূজার উপকরণাদি নিয়ে একযোগে বিহারে যেতেন। বিহারে গমনাগমনের সময় পথিমধ্যে বিশ্রামশালায় বিশ্রাম করতেন। একদা কতিপয় ধূর্ত বিশ্রামশালায় উপবিষ্টা জনৈক রূপসী উাসিকার শীলভ্রস্ট করা জন্য এই মর্মে বাজী রাখল যে, যে ব্যক্তি উক্ত উপাসিকার শীলভ্রষ্ট করতে সমর্থ হবে তাকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হবে,

www.pathagar.com

অন্যথা তাকেই তদনুরূপ অর্থ দণ্ড দিতে হবে। ধূর্তদের মধ্যে একজন রাজী হল। উপাসিকাগণ বিশ্রামশালায় উপস্থিত হলে সে সপ্ততন্ত্রী বীণা সুমধুর সুরে বাজাতে বাজাতে সেখানে উপস্থিত হত। এভাবে কিছুদিন অতীত হলে উক্ত মহিলা বীণার সুরে মুগ্ধ হয়ে তার সঙ্গে শীলভ্রষ্ট হয়। বাজীতে পরাজিত ধূর্ত এ বিষয় তার স্বামীকে জানাল। স্বামী-স্ত্রীর নিকট এর সত্যতা জানতে চাইলে সে অস্বীকার করে বলল, "আমি যদি এরূপ দুষ্কর্ম করে থাকি তাহলে মৃত্যুর পর ছিন্নকর্ণ কাল কুকুর আমাকে ভক্ষণ করুক।" স্বামী তার কথায় বিশ্বাস না করতে পেরে উক্ত পাঁচশত উপাসিকার নিকট গিয়ে এর সত্যতা জানতে চাইলেন। তারাও অস্বীকার করে বলল, "আমরা যদি তা জানি তাহলে জন্মান্তরে তার দাসী হব।" এরূপ মিথ্যা শপথ করার অপরাধে উক্ত ভ্রষ্টা মহিলা মৃত্যুর পর হিমালয় পর্বতের অভ্যন্তরে 'কণ্নমুণ্ড' নামক সরোবরের তীরে বৈমানিক পেত্নী হয়ে এবং পাঁচশত মহিলা তার দাসী হয়ে জন্মগ্রহণ করল। কণ্নমুণ্ড পেত্নী সঞ্চিত পুণ্য প্রভাবে দিবাভাগে দিব্য সুখ উপভোগ করত, কিন্তু রাত্রির মধ্যযামে পাপকর্মের আকর্ষণে সরোবর-উপকণ্ঠে পুষ্করিণী তীরে গমন করত। তখন হস্তী-শাবক প্রমাণ কালবর্ণ ভয়ঙ্কর এক কুকুর উপস্থিত হত। এর কর্ণদ্বয় ছিন্ন, দন্তসমূহ তীক্ষ্ণ, দীর্ঘ ও কঠিন, চক্ষুদ্বয় প্রজ্জ্বলিত অঙ্গার সদৃশ, বিদ্যুতের ন্যায় জিহ্বা, নখ অত্যধিক তীক্ষ্ণ ও শক্ত এবং লোমগুলো অত্যন্ত দুর্বর্ণ ও দীর্ঘ। এই ভীষণকায় কুকুর সেখানে উপস্থিত হয়ে পেত্নীকে ভূমিতে নিপাতিত করে তীব্র ক্ষুধার্তের ন্যায় নৃশংসভাবে খেতে আরম্ভ করত। পরিশেষে মাংসবিহীন কঙ্কালখানি দংশন করে পুষ্করিণীতে নিক্ষেপ করে অন্তর্হিত হত। কঙ্কাল নিক্ষিপ্ত হওয়া মাত্রই পেত্নী পুনরায় পূর্বাবয়ব প্রাপ্ত হয়ে দেববালা সদৃশ্য বিমানে আরোহণ করত। পূর্বোক্ত দাসীগণও তার দাসীবৃত্তি করে দুঃখ ভোগ করছিল। এভাবে পাঁচশত বছর অতিক্রান্ত হলে তাদের অন্তরে কামভাবের উৎপন্ন হল।

সেই কণ্নমুণ্ড হ্রদ হতে নির্গত স্রোতস্বিনী পর্বত-বিবর দিয়ে গঙ্গা নদীতে পতিত হয়েছিল। সেখানে বিভিন্ন সুস্বাদু ফলের একটি বাগান ছিল। একদা পেত্নীগণ পরামর্শ করে কিছু সুমিষ্ট আম্রফল নদীতে ভাসিয়ে দিল, "যদি কোনো পুরুষ এগুলো প্রাপ্ত হয় তাহলে খেলে ফলের অন্বেষণে এখানে আগমন করলে তার সঙ্গে আমরা রমিত হব।" নদীতে প্রক্ষিপ্ত আম্রফলসমূহের একটি মাত্র গঙ্গায় পতিত হয়ে অনুক্রমে বারাণসীতে গিয়ে পৌঁছাল। সেই সময়ে বারাণসীরাজ গঙ্গায় লৌহজাল আবেষ্টনীর মধ্যে স্নান করার সময় ফলটি জল-তলে ভাসতে ভাসতে লৌহজালে সংলগ্ন হল। রাজকর্মচারীগণ এই প্রকাণ্ড ফলটি রাজাকে প্রদান করল। রাজা পরীক্ষা করার জন্য ফলটি সামান্য অংশ কেটে একটি চোরকে খাওয়ালেন। সে খাওয়া মাত্র তার রূপলাবণ্য যুবকের মত হয়ে গেল। সে বলল, "মহারাজ, এরূপ সুমিষ্ট আম্রফল আমি জীবনে খাইনি, এটা বোধহয় দিব্য আম্র।" অতঃপর রাজা নিজেও সেই বিদ্যফল আহার করে স্বীয় দেহের পরিবর্তন লক্ষ্য করে অমাত্যদের জিজ্ঞেস করলেন- "এ আম্রফল কোথায় আছে?" তিনি সুদক্ষ এক বনচরকে সহস্র টাকা দিয়ে এরূপ আম্রফল সংগ্রহ করে আনার জন্য বনে প্রেরণ করলেন। সে গভীর

www.pathagar.com

বনে প্রবেশ করে তাপসদের কাছ থেকে জিজ্ঞেস করে অনুক্রমে গমন করতে লাগল, অবশেষে ষাট সহস্র যোজন পথ অতিক্রম করে সূর্যোদয়ের সময় সেই মনোরম আম্রবনে উপগত হল। তখন উক্ত অমনুষ্য স্ত্রীগণ দূর থেকে তাকে পাবার জন্য ধাবিত হল। বনচর তাদের দেখে ভীত হয়ে পলায়ন করে বারাণসীতে উপস্থিত হয়ে সমস্ত বিষয় অবহিত করল। বনচরের বিবরণ শুনে রাজার সেই নারীদিগকে দেখার ও আম্রফল ভক্ষণের ইচ্ছা প্রবল হল। তিনি অস্ত্রে-শস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কতিপয় বনচর সঙ্গীসহ যাত্রা শুরু করলেন। কয়েক যোজন পথ অতিক্রম করার পর তাঁর সঙ্গীদের দেশে পাঠিয়ে দিয়ে একাকী সেই দুর্গম পথ অতিক্রম করে একদিন সূর্যোদয়ের সময় উক্ত আম্র-কাননে উপস্থিত হলেন। রমণীগণ তাঁকে সাদর আহ্বান জানাল এবং জানতে পারল যে, 'তিনি বারাণসীর রাজা'। তখন রাজাকে বহু যত্নসহকারে স্নান করাল এবং উত্তম বস্ত্রালংকার দ্বারা সুসজ্জিত করে বিমানে নিয়ে গেল। তিনি সেখানে যথেচ্ছা দিব্য-সুখ উপভোগ করতে লাগলেন। এভাবে তাঁর আড়াইশ বছর কেটে গেল।

একদা নিশীথ কালে উক্ত ভ্রষ্টা পেত্নী শয্যাত্যাগ করে পুষ্করিণীর দিকে যেতে দেখে রাজাও তাকে অনুসরণ করলেন। তিনি পেত্নীকে কুকুর কর্তৃক নির্মমভাবে আক্রমণ ও ভক্ষণ দৃশ্য দেখে ভাবলেন কুকুরটি হয়ত তার শত্রু হবে। রাজা বিষমিশ্রিত শৈল্যে বিদ্ধ করে কুকুরটিকে বধ করলেন। রমণী পুষ্করিণী থেকে উঠলে পূর্বের ন্যায় তাকে রূপলাবণ্যশালিণী দেখে রাজা আশ্চার্য হয়ে এক কারণ জানতে চাইলেন। পেত্নী পূর্বোক্ত কাহিনী বিবৃত করল। অতঃপর রাজাকে অনুরোধ করল– দিব্য কাম-সুখ উপভোগ করে আজীবন সেখানে বাস করার জন্য। কিন্তু রাজা রাজী হলেন না। অগত্যা সে বহু রত্নসহ ঋদ্ধি প্রভাবে রাজাকে রাজ-প্রাসাদে নিয়ে গেলেন। রাজা পেত্নীর কর্মফল স্মরণ করে ভীত হলেন এবং বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে দেহান্তে সুগতি লাভ করলেন।[৭৫] রূপকথার রাজকন্যা-বিজয়ের মতো গল্পটি উপভোগ্য।

অতীতে বারাণসীর 'কিতবস্‌স' নামক রাজার পুত্র 'সুনেত্ত' নামক এক পচ্চেক বুদ্ধকে অপমান করার অপরাধে নিদারুণ নরক-যন্ত্রণা ভোগের কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। সানুবাসী প্রেত-কাহিনী[৭৬] মতে একদা পচ্চেক বুদ্ধ নগরে ভিক্ষাচরণ শেষে নগর থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার সময় পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হয় বারাণসীর রাজার পুত্রের সঙ্গে। বুদ্ধ তার প্রতি অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে সম্মান না করায় ক্ষুদ্ধ হয়ে হস্তীপৃষ্ঠ হতে অবতরণ করে তাঁর ভিক্ষা পাত্রটি নিয়ে মাটিতে নিক্ষেপ করল। পাত্র ভেঙ্গে অন্ন ছড়িয়ে ছিটিয়ে পড়ল। বুদ্ধ করুণ দৃষ্টি দিয়ে তার দিকে তাকিয়ে রইলেন। রাজপুত্র তাঁর প্রতি কটুবাক্য ও বিদ্রোপবাক্য উচ্চারণ করে প্রস্থান করার সময় কয়েক পদ অতিক্রম করতেই তার দেহে তীব্র দাহ উৎপন্ন হল। অল্পক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হয়ে অবিচী মহানরকে উৎপন্ন হল। তথায় চুরাশি হাজার বছর নরক-যন্ত্রণা ভোগ করে প্রেতলোকেও বহুকাল কষ্ট ভোগান্তে গৌতম বুদ্ধের সময় কুণ্ডিল নগর সমীপে কৈবর্তকুলে জাতিস্মর জ্ঞান সম্পন্ন হয়ে জন্ম পরিগ্রহ করল। সে পূর্ব জন্মের দুঃখের বিষয় স্মরণ করে পাপকর্মে বিরত থাকত, মৎস্যাদি শিকারে যেত না। তার এরূপ

www.pathagar.com

আচরণে পরিবারের সকলে রুষ্ট হয়ে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দিল। সেই সময়ে আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবির কুণ্ডিল নগরের সন্নিকটে সানুবাসী পর্বতে বাস করতেন। কৈবর্ত্তপুত্র ইতস্তত ঘুরতে ঘুরতে আনন্দ স্থবিরের নিকট উপস্থিত হল। স্থবির তাকে অন্নব্যঞ্জন প্রদান করলেন। আহারের পর স্থবির তাকে ধর্মদেশনা করলেন। সে প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা যাচনা করলে স্থবির তাকে প্রব্রজ্যা দান করলেন। অতঃপর তাকে নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলে তিনি বললেন, "সে মহাপাপের দরুণ অল্পলাভী হয়েছে।" বুদ্ধের নির্দেশে সে ভিক্ষুদের পানীয় জলের পাত্র পূর্ণ করে দিত। এজন্য উপাসকেরা তাকে আহার্যাদি দান করত। পরবর্তীকালে তিনি উপসম্পাদ্য লাভ করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। একসময় তিনি দ্বাদশ ভিক্ষুসহ সানুবাসী পর্বতে বাস করছিলেন। তখন তাঁর পাঁচশ জ্ঞাতি মৃত্যুর পর প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়েছিল। তাঁর পিতা-মাতা প্রেত হয়ে চিন্তা করতে লাগল, "ইনি আমাদের পুত্র, কিন্তু তাকে একসময় গৃহ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছিলাম।" এই লজ্জায় তারা তাঁর নিকট উপস্থিত হতে পারছিল না। স্থবিরের স্নেহপরায়ণ এক ভ্রাতাও প্রেত হয়েছিল, তাকে স্থবিরের নিকট প্রেরণ করল। সে স্থবিরকে বলল, "ভন্তে, আপনার পিতা-মাতা পাপকর্ম করে প্রেতলোকে উৎপন্ন হয়েছে। তাদের মুখের ছিদ্র সূচাগ্রের ন্যায়, তারা নগ্ন ও অত্যন্ত কৃশ হয়ে ক্ষুধা-তৃষ্ণায় কষ্ট ভোগ করছে। আপনি অনুগ্রহ করে আমাদিগকে মুক্ত করুন।" স্থবির ভিক্ষা করে অন্ন-পানীয় বস্ত্র ইত্যাদি সংগ্রহ করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিয়ে-জ্ঞাতিগণের উদ্দেশ্যে পুণ্যানুমোদন করলেন। পুণ্যের প্রভাবে প্রেতগণ অন্ন-পানীয় ইত্যাদি প্রাপ্ত হয়ে সুখে অবস্থান করতে লাগল। তাদের দিব্য-রথ উৎপন্ন হল। তারা সেই রথে করে স্থবিরের নিকট উপস্থিত হয়ে বন্দনা জ্ঞাপন করল।

ভূসপ্রেত কাহিনী শ্রাবস্তীর এক প্রতারক বণিক পরিবারকে কেন্দ্র করে বর্ণিত। বণিক প্রতারণা করে জীবিকা নির্বাহ করত। সে শালিধানের ভূষিতে তাম্রবর্ণ মৃত্তিকা মেখে রক্তশালিধানের সাথে মিশ্রিত করে বিক্রি করত। তার পুত্রও ছিল বদমেজাজী। সে এক সময় মাতার মস্তকে আঘাত করেছিল। মাতা কারো সঙ্গে সদ্ব্যবহার করত না। কোনো যাচক আসলে সে মিথ্যা শপথ করত, "যদি আমার কাছে থাকে তাহলে আমি জন্মান্তর বিষ্ঠা ভক্ষণ করব।" পুত্রবধূও চুরি করে আহার্যাদি ভক্ষণ করে মিথ্যা শপথ করত, "আমি যদি ভক্ষণ করি তাহলে জন্মে জন্মে যেন আমার দেহ-মাংস কর্তন করে খাই।" তারা চারজনই মৃত্যুর পর বিন্ধা পর্বতে প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করল। বণিক প্রজ্বলিত ভূষি নিয়ে উভয় হস্তে স্বীয় মস্তকে বিকীর্ণ করে মহাদুঃখ ভোগ করতে লাগল। তার পুত্র নিজেই স্বীয় মস্তক লৌহমুগ্দরের আঘাতে পুনঃপুন বিদীর্ণ করে মহা দুঃখ ভোগ করত। পুত্রবধূ প্রকাণ্ড সুতীক্ষ্ণ স্বীয় নখে পৃষ্ঠমাংস কর্তন করে ভক্ষণ করত। বণিক স্ত্রী কৃমিকূল সমাচ্ছন্ন দুর্গন্ধময় বিষ্ঠা ভক্ষণ করত।[৭৭] এভাবে দুর্বিসহ দুঃখে তাদের জীবন কাটতে লাগল।

রাজগৃহে জনৈক ব্যাধ দিবারাত্র মৃগ বধ করে জীবিকা নির্বাহ করত।[৭৮] তার এক মিত্র পরম ধার্মিক ও ত্রিরত্নের উপাসক ছিলেন। উপাসক বহু চেষ্টা করেও বিফল হয়ে এক ক্ষীণাসব স্থবিরকে অনুরোধ করলেন যেন তার বন্ধুকে এমনভাবে ধর্মদেশনা করেন যাতে

প্রাণিহত্যা থেকে বিরত হয়। স্থবির একদিন ভিক্ষাচরণে বের হয়ে অনুক্রমে উক্ত ব্যাধের গৃহ-দ্বারে উপস্থিত হলেন। শিকারী প্রসন্ন হয়ে স্থবিরকে উৎকৃষ্ট আসনে বসাল। স্থবির ধর্মদেশনা করলেন, প্রাণিহত্যা থেকে বিরত থাকতে উপদেশ দিলেন। ব্যাধ ধর্ম শ্রবণ করল বটে কিন্তু প্রাণিহত্যায় বিরত হতে স্বীকৃত হল না। অবশেষে স্থবির তাকে অন্তত রাত্রিতে হলেও বিরত হতে বললেন। শিকারী সম্মত হল। তদবধি রাত্রিবেলায় সে প্রাণিহত্যা করত না। সে এই পাপকর্মের ফলে মৃত্যুর পর রাজগৃহের সমীপে এক বৈমানিক প্রেতরূপে জন্মগ্রহণ করল। সে দিবাভাগে মহা দুঃখ ভোগ করত, রাত্রে দিব্য পঞ্চকাম সুখে অভিরমিত হত।[৭৯]

কাহিনীর বর্ণনায় বৈচিত্র্যময় গল্পরসের সৃষ্টি হয়েছে অম্বসক্ষর প্রেত কাহিনীতে। গল্পের বিবরণ এরূপ- বৈশালীর লিচ্ছবিরাজ অম্বসক্ষর অতি বদস্বভাবসম্পন্ন, মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ও নাস্তিকবাদী। সেই সময়ে বৈশালী নগরের জনৈক বণিকের দোকানের সম্মুখের পথ কর্দমাক্ত হয়েছিল। যাতায়াতে জনগণের কষ্ট হত। বণিক ভগ্ন রাস্তায় গরুর শির-অস্থি নিক্ষেপ করে জনগণের যাতায়াতের ব্যবস্থা করে দিতেন। তিনি ছিলেন শীলবান, মধুরভাষী, অক্রোধী ও পরোপকারী। একদা তার বন্ধু স্নান করার সময় তার পরিধেয় বস্ত্র ক্রীড়াচ্ছলে অপসারিত করে রেখেছিলেন। কিছুক্ষণ পর বস্ত্রখানি দিয়েছিলেন। তাঁর এক ভাগিনা কিছু জিনিস চুরি করে এনে তাঁর দোকানে লুকিয়ে রেখেছিল। গৃহস্বামী অন্বেষণ করে তাঁর দোকানে জিনিসগুলো পেয়ে অম্বসক্ষর রাজার নিকট বিচার প্রার্থনা করল। রাজা বণিককে শিরচ্ছেদ ও ভাগিনাকে শূলে দেওয়ার জন্য আদেশ দিলেন। যথারীতি রাজাজ্ঞা প্রতিপালিত হল। বণিক মৃত্যুর পর ভূমিবাসী দেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তিনি বেগশালী দিব্য-অশ্ব লাভ করলেন। তাঁর দেহ হতে দিব্য সুগন্ধ প্রবাহিত হত। কিন্তু বন্ধুর কাপড় লুকিয়ে কষ্ট দিয়েছিলেন বিধায় বিবসন হয়েছিলেন। ভূমিদেবতা (প্রেত) রূপে জন্মগ্রহণ করার পর স্বীয় কর্মফল অবলোকন করার সময় স্বীয় ভাগিনাকেও শূলে দেখতে পেলেন। তার প্রতি দয়ার্দ্রচিত্ত হয়ে তিনি দিব্য-অশ্বে আরোহন করে প্রতি মধ্যরাত্রে তার নিকট উপস্থিত হয়ে বলতেন, "নিরয়ে পতিত হয়ে জীবিত থাকা অপেক্ষা এই শূলারোপিত অবস্থাতেই জীবিত থাকা তোমার পক্ষে শ্রেয়স্কর।"

এক সময় অম্বসক্ষর রাজা হস্তীপৃষ্ঠে আরোহন করে নগর ভ্রমণে বের হয়ে কোনো গৃহের বাতায়ন পথে রাজার ভ্রমণ-লীলা দর্শনরত এক রূপসী রমণীকে দেখতে পেলেন। রাজা তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়লেন। ভ্রমণ শেষে রাজা লোক প্রেরণ করে জানতে পারলেন, সেই মহিলা বিবাহিতা। তখন তিনি উক্ত মহিলাকে নিজ আয়ত্তে পাবার জন্য তার স্বামীকে রাজসেবায় নিযুক্ত করলেন। কিছুদিন পর রাজা তাকে নির্দেশ দিলেন, "অমুক স্থানে গিয়ে পুষ্করিণী থেকে অরুণবর্ণের মৃত্তিকা ও একটি সপুষ্প উৎপলের গাছ সূর্যাস্তের পূর্বে নিয়ে এস, যদি না আসতে পার তাহলে তোমাকে বধ করা হবে।" বৈশালী থেকে তিন যোজন দূরে অবস্থিত সেই পুষ্করিণী। সে অতি কষ্টে পূর্বাহ্নে উপস্থিত হয়ে মৃত্তিকা ও সপুষ্প রক্তোৎপল নিয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে রাজদরবারে উপস্থিত হল। রাজার

www.pathagar.com

নির্দেশানুযায়ী দ্বারপাল তাকে দেখে তাড়াতাড়ি নগর-দ্বার রুদ্ধ করে দিল। সে বহু চিৎকার করার পরও দ্বারপাল কর্ণপাত করল না। সে অনন্যোপায় হয়ে উক্ত শূলে আরোপিত ব্যক্তিকে সাক্ষী করল যে, সে যথাসময়ে নগরে উপস্থিত হয়েছিল, কিন্তু দ্বারপাল দ্বার রুদ্ধ করে দিয়েছে। শূলারোপিত ব্যক্তি বলল, "রাত্রিতে আমার নিকট এক ঋদ্ধিবান প্রেত আসবে, তুমি তাকেই সাক্ষী কর।" নিশীথরাত্রে প্রেত সেখানে উপস্থিত হলে তাঁকে সাক্ষী করল। প্রভাতে সে রাজার নিকট উপস্থিত হয়ে সূর্যাস্তের পূর্বে তার আগমনের বিষয় ও আনুপূর্বিক ঘটনা অবহিত করল। রাজা বিশ্বাস করলেন না। সে সাক্ষী হিসেবে প্রেতের কথা জানালে রাজা স্বয়ং প্রত্যক্ষ করার জন্য নগর দ্বারে উপস্থিত হলেন।

মধ্যরাত্রে প্রেত এসে পূর্বোক্ত বাক্যে শূলারোহিত ব্যক্তিকে উপদেশ দিতে শুনে অবাক হয়ে প্রেতকে এরূপ উপদেশ দেওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তখন ভূমি দেবতা বললেন, "মহারাজ, এ ব্যক্তি আমার জ্ঞাতি। মৃত্যুর পর সে শূলের যন্ত্রণা অপেক্ষা বহুগুণ বেশি দুঃখময় নরকে উৎপন্ন হবে- এ কারণে আমি তাকে এরূপ বাক্য বলছি।"

অতঃপর রাজা ভূমি দেবতার জীবন কাহিনী জানতে চাইলে তিনি পূর্বোক্ত জীবনী বিবৃত করলেন এবং বললেন, "ঠাট্টাচ্ছলে বন্ধুর বস্ত্র কিছুক্ষণের জন্য অপহরণ করার ফলে আমি দিব্য-সুখের অধিকারী হয়েও বস্ত্রহীন হয়েছি।" অনন্তর তিনি সত্ত্বগণের কর্মবিষয়ক সম্পর্কে বিস্তৃত আলোচনা করলেন। রাজা তাঁর কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে কপিনচ্চন স্থানে অবস্থানরত কপ্পিন ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে আট জোড়া বস্ত্র দান করে উক্ত ভূমি দেবতার উদ্দেশ্যে পুণ্যানুমোদন করলেন। প্রেত তখনই দিব্য বস্ত্রালংকারে বিভূষিত হয়ে অশ্বারূঢ় অবস্থায় স্থবিরের ও রাজার পুরোভাগে প্রাদুর্ভূত হলেন। রাজা প্রীতিফুল্ল অন্তরে বললেন, "আমি কর্মের ফল প্রত্যক্ষরূপে দর্শন করলাম। এখন থেকে আমি পাপকর্ম ত্যাগ করে পুণ্যকর্মই সম্পাদক করব।"

তিনি স্থবিরকে বন্দনা পূর্বক প্রত্যাবর্তন করে শূলারোপিত ব্যক্তিকে মুক্তি দিয়ে চিকিৎসার ব্যবস্থা করালেন। তদবধি তিনি ত্রিশরণসহ শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দানাদি পুণ্যকার্য সম্পাদনে রত হলেন।[৮০]

ইক্ষু-প্রেত কাহিনীটি কৌতুকাশ্রয়ী উপাখ্যান। কাহিনীতে আছে, একদা মহামোগ্গল্লান স্থবির রাজগৃহে পিণ্ডাচরণে গমনকালে এক প্রেত দেখতে পান। প্রেতটি স্থবিরকে দেখে তার দুঃখের কারণ জিজ্ঞেস করল, "ভন্তে, আমার পুণ্যফলে এই ইক্ষু-বন উৎপন্ন হয়েছে বটে, কিন্তু আমি পরিভোগ করতে পারি না। কিঞ্চিৎ ইক্ষু পরিভোগ করার চেষ্টা করলে ইক্ষু দ্বারা সাঙ্ঘাতিকরূপে প্রহৃত হই, খরশান অসি দ্বারা কর্তনের ন্যায় ইক্ষু-পত্রে সর্বাঙ্গ কর্তিত হয়। তখন আমি শক্তিশূন্য হয়ে অতিশয় দুঃখে প্রপীড়িত হই এবং জলে উত্থিত মৎসের ন্যায় বিগলিত নয়নে রোদন পরায়ণ হয়ে ছটফট করতে থাকি। তখন আমি অত্যন্ত ক্ষুধিত, ক্লান্ত ও পিপাসিত হয়ে পড়ি। একবারও ইক্ষু খাওয়ার সৌভাগ্য আমার হয়নি। ভন্তে, ইহা কোন পাপের ফল এবং কিভাবে আমি ইক্ষু পরিভোগ করতে পারব আপনি দয়া করে ব্যক্ত করুন।"

www.pathagar.com

স্থবির প্রত্যুত্তরে বললেন, "তুমি পূর্বজন্মে নিজেই এর কারণ উৎপন্ন করেছ। তুমি ছিলে কৃপণ স্বভাবের, কখনও কিছু দান করনি। একদা তুমি এক আঁটি আখ কাঁধে নিয়ে আর একখানি খেতে খেতে গমন করার সময় এক শীলবান ব্যক্তি একটি বালকসহ তোমার পশ্চাৎ পশ্চাৎ অনুগমন করছিল। বালকটি একটি আখের জন্য কান্নকাটি করলে উক্ত শীলবান ব্যক্তি তোমার নিকট আখ যাচনা করেন। তুমি অতি তাচ্ছল্যভরে একখানা আখ পিছন দিকে নিক্ষেপ করেছিলে। যদি তুমি পিছু হাতে খেতে চাও তাহলে ইচ্ছামত আখ খেতে পারবে। এটা তোমার কর্মেরই বিপাক।"

প্রেত পিছু হাতে ইক্ষু ইচ্ছানুযায়ী খেয়ে পরিতৃপ্ত হল। অনন্তর উক্ত নিয়মে প্রকাণ্ড এক আঁটি আখ নিয়ে স্থবিরকে দান করলে স্থবির তার প্রতি করুণা পরবশ হয়ে তার দ্বারা আখের আঁটি বহন করিয়ে বেণুবন বিহারের নিকট উপস্থিত হয়ে দান করালেন। সেই আখ বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিভোগ করলেন। বুদ্ধ প্রেতের উদ্দেশ্যে ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। প্রেত প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রস্থান করল। তখন থেকে প্রেত যথাসুখে আখ পরিভোগ করতে লাগল এবং আয়ু শেষে চ্যুত হয়ে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হল।[৮১]

একসময় শ্রাবস্তীবাসী ও পাটলিপুত্রবাসী বহু বণিক একত্রিত হয়ে নৌকাযোগে বাণিজ্যার্থে সুবর্ণভূমির দিকে যাত্রা করেছিলেন। নৌকায় এক ব্যাধিগ্রস্ত উপাসকের মৃত্যু হয়েছিল তিনি সহযাত্রী কোনো এক রমণীর প্রতি আসক্ত পরায়ণ ছিলেন। সেই কারণে মৃত্যুর পর তিনি সমুদ্র মধ্যে বিমান-প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করলেন। বিমান-প্রেত সেই রমণীকে পাবার ইচ্ছায় নৌকার গতিরোধ করে রাখলেন। তখন বণিকগণ 'দুর্ভাগা' শলাকা দ্বারা পরীক্ষা করে দেখলেন। শলাকা প্রেতের ঋদ্ধিবলে উক্ত রমণীর হাতেই পড়ল। এভাবে তিনবার পরীক্ষা করে উক্ত রমণীই দুর্ভাগা বলে স্থির হল। সিদ্ধান্ত হল, তাকে সমুদ্রে নিক্ষেপ করা হবে। তার প্রতি অন্য এক বণিক আসক্ত ছিল, সে করুণাবশত এক আঁটি বাঁশের উপর উক্ত মহিলাকে ভাসিয়ে দিল। রমণীর অবতরণমাত্র নৌকা তীরবেগে চলতে আরম্ভ করল। উক্ত বিমান-প্রেত তখন রমণীটিকে তাঁর বিমানে তোলে নিলেন। সে এক বছরকাল অতিক্রম করার পর প্রেতকে অনুরোধ করল পাটলিপুত্র নগরে পৌঁছে দেবার জন্য। প্রেত তাকে দানাদি পুণ্যকর্মে সম্পাদন করার জন্য উপদেশ দিয়ে আকাশ পথে পাটলিপুত্র নগরের মধ্যস্থানে রেখে প্রস্থান করলেন। তার আত্মীয়স্বজন তাকে দেখে আশ্চার্যান্বিত হয়ে স্বাগত জানালেন।[৮২] এসব কাহিনী রূপকথার মতো উপভোগ্য।

শ্রাবস্তীর এক গৃহপতি ভোগসম্পত্তির পরিক্ষীণ হওয়ায় অতিশয় দরিদ্র অবস্থায় পতিত হল। একমাত্র কন্যা রেখে তার স্ত্রীও মৃত্যুবরণ করল। গৃহপতি কন্যাটিকে এক বন্ধুর নিকট একশ টাকায় বন্ধক রেখে পণ্য-দ্রব্য ক্রয় করে অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে বাণিজ্য করার মানসে অন্যত্র গিয়েছিল। সেখানে সে পণ্য-দ্রব্য বিক্রি করে চারশ টাকা লাভ করল। প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে তারা চোর কর্তৃক আক্রান্ত হল। বণিকেরা চোর-ভয়ে পলায়ন করল, গৃহপতি টাকার থলেটি এক বৃক্ষে গোপনে রেখে অনতিদূরে লুকিয়ে রইল। চোরেরা অনুসন্ধান করে তাকে ধরে হত্যা করল। ধনের প্রতি তৃষ্ণার কারণে উক্ত

www.pathagar.com

গৃহপতি মৃত্যুর পর প্রেত হয়ে জন্মগ্রহণ করল। বণিকেরা শ্রাবস্তীতে এসে তার কন্যাকে পিতার মৃত্যু সংবাদ জ্ঞাপন করল। পিতার এরূপ আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে সে অত্যধিক শোকাহত হয়ে অনবরত রোদন করতে লাগল। তখন তার পিতৃবন্ধু তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বলল, "আজ থেকে তুমি আমার কন্যার ন্যায় এখানে থাকবে, আমি তোমার পিতৃ-কর্তব্য সম্পাদন করব।" তদবধি সে পিতৃ-বন্ধুকে পিতার ন্যায় গৌরব-সম্মানসহকারে পরিচর্যা করত। এক সময় সে যাগু, আম্রফল ও একখণ্ড বস্ত্র নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে দান করল এবং দানের পুণ্যাংশ পিতার উদ্দেশ্যে অনুমোদন করল। কন্যার পুণ্যানামোদনের সঙ্গে সঙ্গে প্রেত বিমান, আম্রকানন, কল্পবৃক্ষ, পুষ্করিণী ইত্যাদি দিব্য সম্পত্তি লাভ করল।

অনন্তর শ্রাবস্তীবাসী উক্ত বণিকগণ পুনরায় ব্যবসা উপলক্ষে সেই পথে যাবার সময়ে সেই একই স্থানে পৌঁছলে রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা করল। উক্ত প্রেত তাদের দেখা দিয়ে বিমানে নিয়ে গেল। তারা তার দিব্য সম্পত্তি দেখে বিমুগ্ধ হল। প্রেত তাদিগকে পঞ্চশত টাকার থলেটি দেখায়ে দিয়ে বলল, "আপনারা অর্ধেক টাকা গ্রহণ করবেন, আর অর্ধেক টাকা হতে আমার ঋণ পরিশোধ করে অবশিষ্ট টাকা আমার কন্যাকে দেবেন।" বণিকগণ যথাসময়ে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হয়ে একশ টাকা পিতৃ-বন্ধুকে ঋণশোধ করার জন্য দিয়ে অবশিষ্ট চারশ টাকা কন্যাকে দিল। উক্ত পিতৃ-বন্ধু স্বীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের সঙ্গে তাকে বিয়ে দিল। পরবর্তীকালে সে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল।[৮৩]

ষষ্টিকূট সহস্র প্রেত কাহিনীটি হাস্যরসে পূর্ণ একটি কৌতুকবহ উপাখ্যান হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে। কাহিনীর বিবরণ এরূপ- অতীতে বারাণসী নগরে এক খঞ্জ ধনুর্বিদ্যা ও কাঁকর নিক্ষেপ বিদ্যায় অত্যন্ত দক্ষ ছিল। সে নগরদ্বারে এক বটবৃক্ষ মূলে বসে কাঁকর নিক্ষেপ করে বটবৃক্ষের পত্রে হস্তী, অশ্ব, রথ, মনুষ্য, পতাকা সমলঙ্কৃত পূর্ণ ঘটাদির আকৃতি করে দেখাত। এক সময় বারাণসীরাজ নগর হতে বের হয়ে সেই বটবৃক্ষমূলে উপস্থিত হয়ে বটপত্রে নানাবিধ আকৃতি দেখে জানতে পারলেন যে, উক্ত খঞ্জ এসব আকৃতি করেছে। রাজা তাকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমার একজন বাচাল পুরোহিত আছে। তার অজ্ঞাতসারে তুমি ছাগ-বিষ্ঠায় তার উদর পূর্ণ করে জব্দ করতে পারবে কি ?" খঞ্জ বলল, "হ্যাঁ, পারব।" রাজা তাকে রাজপ্রাসাদে নিয়ে গেলেন।

অনন্তর রাজা বহুভাষী ও অল্পভাষী পুরোহিতদ্বয়কে ডেকে নির্জন স্থানে নিয়ে গেলেন এবং পর্দার অন্তরালে উপবেশন করে মন্ত্রণা করতে লাগলেন। ইত্যবসরে পূর্বের ইঙ্গিতানুসারে খঞ্জকে আহ্বান করালেন। খঞ্জ তখন পাঁচপোয়া পরিমাণ ছাগ-বিষ্ঠা সঙ্গে করে পর্দার বাইরে বহুভাষী পুরোহিতের মুখোমুখি বসল। পুরোহিত কথা বলার সময় মুখ বিবৃত করা মাত্র পর্দার ছিদ্র দিয়ে এক একটি করে ছাগ-বিষ্ঠার পিণ্ড তার মুখে নিক্ষেপ করতে লাগল। নিক্ষিপ্ত প্রত্যেকটি বিষ্ঠাপিণ্ড তার কণ্ঠনালীতে পতিত হতে লাগল। পুরোহিত তা লজ্জাবশত বাইরে ফেলতে না পেরে এক একটি করে গলাধঃকরণ করতে

www.pathagar.com

লাগল। ছাগ-বিষ্ঠায় যখন তার উদর পূর্ণ হল তখন রাজা তাঁকে চলে যাবার আদেশ দিলেন, "ব্রাহ্মণ, এখন আপনি যেতে পারেন। আপনি বহুভাষণের ফল লাভ করেছেন। 'মদনফল' অথবা 'প্রিয়ঙ্গু পত্রাদি' দ্বারা উর্দ্ধ বিরেচন গ্রহণ করবেন, এতেই আপনার মঙ্গল হবে।"

রাজা তুষ্ট হয়ে খঞ্জকে চৌদ্দখানা গ্রাম প্রদান করলেন। সে সপরিবারে সুখে বাস করতে লাগল এবং শ্রমণ-ব্রাহ্মণদিগকে যথাশক্তি দান দিয়ে কুশল কর্মে নিয়োজিত হল। সে নিজ খরচে শিল্প-শিক্ষার্থীদিগকে শিল্প শিক্ষা দিতে লাগল। তখন এক ব্যক্তি তার নিকট শিল্প শিক্ষা সমাপ্ত করে অধীত শিল্প পরীক্ষা করার জন্য গঙ্গাতীরে উপস্থিত হল। সেখানে সুনেত্র নামক বুদ্ধকে ধ্যানরত দেখে পরীক্ষার উদ্দেশ্যে তাঁর মস্তকে কাঁকর নিক্ষেপ করতে লাগল। পচ্চেক বুদ্ধ আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে সেখানেই পরিনির্বাপিত হলেন। তথাকার জন সাধারণ ইহা দেখে তাকে ভীষণভাবে প্রহার করল। ফলে তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর সে অবীচি নরকে উৎপন্ন হয়ে সহস্র বছর নরক যন্ত্রণা ভোগ করেছিল। সেখান হতে পুনরায় প্রেতকূলে জন্মগ্রহণ করে পাপকর্মের ফল ভোগ করতে লাগল। তখন ষাট সহস্র লৌহ হাতুড়ী প্রত্যহ তার মস্তকে পতিত হত। এতে তার মস্তক চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে যেত এবং যন্ত্রণায় মৃতবৎ ভূমিতে পড়ে থাকত। লৌহহাতুড়ী অন্তর্হিত হলে সে পুনরায় পূর্ববৎ শিরসম্পন্ন হত। এভাবে কর্মফল ভোগ করতে লাগল।[৮৪] উপাখ্যানটি নিঃসন্দেহে মনোরম এবং চিত্তবিনোদনকর।

বিমান বত্থু

পালি সাহিত্যের বহু গ্রন্থে বিভিন্ন প্রকার স্বর্গ, স্বর্গে অবস্থানকারী দেবদেবীগণের অবস্থা ও অবস্থান, তাঁদের অপ্রমেয়-অনাবিল সুখ ও ঐশ্বর্য, রূপ, যশ, ক্ষমতা ইত্যাদি সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে।[৮৫] আলোচ্য 'বিমান বত্থু'[৮৬] গ্রন্থখানি মূলত সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন প্রকার স্বর্গ ও স্বর্গের বসবাসকারী দেবদেবীদের ঐশ্বর্যময় কাহিনীতে সমৃদ্ধ। বিমান শব্দের অর্থ স্বর্গ বা দেবভূমি এবং বত্থু শব্দের অর্থ গল্প বা কাহিনী। গল্পগুলোর মূল প্রতিপাদ্য বিষয় বৌদ্ধ-কর্মবাদ।[৮৭] বিমান বত্থুর কাহিনীগুলোর বিবরণ মতে সত্ত্বগণ কুশলকর্ম বা ভাল কাজ করার ফলে স্বর্গ-সুখ লাভে সমর্থ হয়। তারা অভিনব দেব বিমান প্রাপ্ত হয়। গল্পের নায়ক-নায়িকা তথা দেবদেবীর জীবন অবিরাম সুখ-উল্লাসে মাধুরীময়, তারা অপরূপ রূপসী শত-সহস্র অপ্সরা দ্বারা সর্বদা পরিবৃত। সকলেই অফুরন্ত আনন্দে মশগুল—যেন প্রতিটি বিমান সীমাহীন আনন্দ আর দিব্য-সুখ ভোগের লীলা নিকেতন।[৮৮] বিমান বত্থুর কাহিনীসমূহ অতীব চমৎকার এবং রূপকথার মতই উপভোগ্য। বিমানের বসবাসকারী দেবদেবীদের গাত্রবর্ণ অপরূপ স্বর্ণময়, তাঁদের পোশাক চমকপ্রদ রঙবেরঙের, আর বিমানে অজস্র কনক-রজত হিরণ্য-মণি-মাণিক্য ইত্যাদি মূল্যবান ধনরত্নে পরিপূর্ণ। বিমানের দিব্য সুগন্ধি প্রতিনিয়ত ছড়ায়, চারদিকে পদ্ম উৎপল, পুণ্ডরীকা ইত্যাদি বিভিন্ন প্রকার পুষ্প দ্বারা পরিপূর্ণ, অপরূপ বিচিত্র লতা-গুল্মে পরিবৃত বিমান থেকে নিত্য শ্রুতিমধুকর দিব্য শব্দ বের হয়।[৮৯]

www.pathagar.com

বিমানবত্থুর কাহিনীগুলোতে সত্ত্বগণ বিশেষ করে বুদ্ধের গৃহীভক্তগণ ইহকালে সৎকর্ম সম্পাদন করে পরজীবনে কিরূপ দিব্যসুখের অধিকারী হয়ে প্রতিনিয়ত সুখ ও আনন্দ উপভোগ করছে তার বিশদ বিবরণ পাঠককে ভাবাবেগে আপ্লুত করে তোলে, সাথে সাথে সৎকর্ম সাধনে অনুপ্রেরণা দান করে।

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, বৌদ্ধসাহিত্যে কামাবচর দেবভূমি, রূপাবচর দেবভূমি (রূপব্রহ্মলোক) ও অরূপাবচর দেবভূমি (অরূপাবচর ব্রহ্মলোক) ভেদে ত্রিবিধ দেবলোকের বিবরণ রয়েছে। কামাবচর দেবভূমির সংখ্যা ছয়টি, যথা- চতুর্মহারাজিক, তাবতিংস, যাম, তুসিত, নিম্মাণরতি ও পরনিম্মিতবসবত্তি।[৯০] এদের প্রত্যেকটি ক্রমান্বয়ে উন্নতর। মূলত কামাবরচ দেবদেবী ও তাঁদের আবাসভূমি বা বিমানসমূহের বর্ণনায় সমৃদ্ধ বিমানবত্থু গ্রন্থখানি। কাহিনীর বিবরণে অধিকাংশ সত্ত্ব তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছেন। এখানে অন্যান্য দেবলোকের কাহিনী অতি অল্পই দৃষ্ট হয়।[৯১]

বিমানবত্থুর দুটি অংশ ঃ ইত্থিবিমান ও পুরিসবিমান। ইত্থিবিমান বা স্ত্রীলোকের দেব আসাবভূমি চারবর্গে বিভক্ত; যথা- পীঠবগ্গ, চিত্তলতাবগ্গ, পারিচ্ছত্তক বগ্গ ও মঞ্জেট্‌ঠি বগ্গ এবং এই অংশে মোট ৫০টি কাহিনী আছে। পুরিসবিমান বা পুরুষদের দেব আবাসভূমি তিন বর্গে বিভক্ত; যথা- মহরথ বগ্গ, পায়াসি বগ্গ, সুনিক্‌খিত্ত বগ্গ এবং এই অংশে ৩৫টি কাহিনী আছে। আমরা কতিপয় কাহিনীর নমুনা এখানে উপস্থাপন করছি ঃ

বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবনে অনাথপিণ্ডিক নির্মিত বিহারে অবস্থানকালে কোশলরাজ প্রসেনজিৎ সপ্তাহকালব্যাপী অসদৃশ মহাদান দিয়েছিলেন। মহাশ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক তিন দিন ও মহাউপাসিকা বিশাখা তিন দিন মহাদান দিয়েছিলেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপে প্রচারিত হল তাদের অসদৃশ মহাদানের কথা। জনসাধারণ তখন থেকে শ্রদ্ধাচিত্তে দান দিতে লাগলেন শ্রমণ-ব্রাহ্মণ, দীন-দরিদ্রকে। সেই সময়ে কোনো শীলসম্পন্ন ভিক্ষু ভিক্ষা করতে করতে কোনোও এক গৃহের সামনে উপস্থিত হলেন। সেই গৃহের এক কন্যা ভিক্ষুকে দেখে অত্যধিক প্রীতিফুল্ল মনে বন্দনা করে গৃহে নিয়ে গেলেন। কন্যা অতি শ্রদ্ধাসহকারে উত্তম খাদ্যভোজ্য দ্বারা আহার করালেন এবং স্বীয় পীঠ বা পিড়িঁখানা পীতবস্ত্রে আচ্ছাদিত করে দান করলেন। অনন্তর সেই কন্যা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে জন্মগ্রহণ করেন। ভিক্ষুকে প্রবল শ্রদ্ধাসহকারে পীতবস্ত্র আচ্ছাদিত পীঠদানের ফলে তার আকাশে দ্রুত বিচরণশীল উপরে কূটাগার সদৃশ যোজন প্রমাণ বিশিষ্ট কনকপালক উৎপন্ন হয়েছিল। তিনি যথাভিরুচি বিচরণ করতে সমর্থ হতেন।[৯২]

রাজগৃহে জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু একসময় প্রয়োজনীয় ভিক্ষা সংগ্রহ করে ভোজনের জন্য কোনো এক গৃহে প্রবেশ করলেন। গৃহবাসিনী স্ত্রীলোক অতি শ্রদ্ধাবতী। তিনি প্রসন্নচিত্তে স্থবিরকে ভদ্রপীঠ পীতবর্ণের বস্ত্র দিয়ে আচ্ছাদিত করে নিঃস্বার্থভাবে দান দিয়ে প্রার্থনা করলেন, "এই দান-ফলে যেন স্বর্ণপীঠ প্রাপ্ত হই।" স্থবির কার্য শেষে প্রস্থানের সময়

www.pathagar.com

পীঠখানা প্রদান করলেন। তিনি এটা বিহারে নিয়ে সঙ্ঘকে দান করলেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন। তখন তিনি অতি জ্যোতির্ময়ী ও পুণ্যঋদ্ধি সম্পন্ন অপার দিব্য-সুখ ভোগ করেছিলেন।[৯৩]

বুদ্ধ এক সময় রাজগৃহে অবস্থান করার সময় নক্ষত্র উৎসব উপলক্ষে নগর বিভিন্ন বর্ণের পতাকা, পূর্ণঘট ইত্যাদি দ্বারা সুসজ্জিত করা হয়েছিল। মগধরাজ বিম্বিসার সুসজ্জিত মহা-পরিষদ পরিবৃত হয়ে রাজলীলায় নগর প্রদক্ষিণ করার সময় জনৈক নগরবাসিনী অতীব বিস্ময়াবিষ্ট হয়েছিলেন। তিনি কোনো ব্যক্তির নিকট জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, শ্রদ্ধার সঙ্গে দান দিলে এরূপ বিভব প্রাপ্ত হওয়া যায়। তিনি দেবসম্পত্তি লাভের জন্য অতীব উৎসাহের সঙ্গে পুণ্যকার্য সম্পাদনে ব্রতী হলেন। একদিন তিনি ক্ষীরপায়স প্রস্তুত করলেন, বহু খাদ্যভোজ্য পৃথক পৃথক সাজালেন, বসবার আসন পদ্মপুষ্পে সুসজ্জিত করলেন, উপরে চন্দ্রতাপ বেঁধে পুষ্পমালে সজ্জিত ও চতুর্দিকে পদ্মকেশর বিকীর্ণ করলেন। অতঃপর স্নানান্তে নববস্ত্র পরিধান করে দাসীকে নির্দেশ দিলেন দানের উপযুক্ত পাত্র অন্বেষণ করে নিয়ে আসতে। দাসী কিছুদূর গিয়ে অগ্রমহাশ্রাবক সারিপুত্র স্থবিরকে দেখে বন্দনা করে তার প্রার্থনা নিবেদন করল। স্থবির তার হাতে পাত্র দিয়ে তাকে অনুসরণ করলেন, কুলকন্যা স্থবিরকে আগু বাড়ায়ে নিলেন। অগ্রশ্রাবক আসনে উপবেশন করলে পদ্মপুষ্প দ্বারা পূজা করলেন এবং পায়সাদি খাদ্যভোজ্য দ্বারা আহার করালেন। তিনি প্রার্থনা করলেন, "এই পুণ্য প্রভাবে আমার যেন পদ্মপরিশোভিত দিব্যগজকূটাগার উৎপন্ন হয়।" অনন্তর যথাসময়ে সেই রমণী মৃত্যুর পর সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হয়ে তাবতিংস স্বর্গে কনকময় বিমানে উৎপন্ন হন। প্রার্থনানুসারে তাঁর জন্য পঞ্চযোজন উচ্চ পদ্মমালা অলঙ্কৃত মনোজ্ঞ দর্শনীয় সুখ সংস্পর্শ বিবিধ হেমময় রত্নরাজি বিভূষিত গজরাজ উৎপন্ন হল। সেই গজপৃষ্ঠে যোজন প্রমাণ অতীব শোভাসমজ্জ্বল স্বর্ণপালঙ্ক উৎপন্ন হল। দেবকন্যা সেই কুঞ্জর বিমানোপরি রত্নপালঙ্কে দিব্যসুখ ভোগ করতে লাগলেন।[৯৪] মহামোগ্‌গল্লান স্থবির কর্তৃক জিজ্ঞাসিত হয়ে দেবকন্যা স্বীয় পুণ্যকর্মের বিপাক বর্ণনা প্রসঙ্গে বললেন, "যারা সম্যকবিমুক্ত, উপশান্ত ও ব্রহ্মচারী, তাঁদিগকে যে ব্যক্তি প্রসন্ন চিত্তে বসবার আসন প্রদান করবে সে নিশ্চয়ই আমার ন্যায় এরূপ আনন্দ লাভ করতে পারবে।"[৯৫]

এক সময় সশিষ্য তথাগত কোশলরাজ্যের থুন নামক ব্রাহ্মণ গ্রামের দিকে যাত্রা করেছিলেন। মিথ্যাদৃষ্টি পরায়ণ ব্রাহ্মণগণ বুদ্ধ যাতে থুন গ্রামে প্রবেশ করতে না পারেন তজ্জন্য নদীপথ রুদ্ধ করে দিলেন এবং একটিমাত্র কূপ রেখে সমস্ত জলকূপ তুষদ্বারা বন্ধ করে দিয়ে নির্দেশ দিলেন যে, কেউ যেন বুদ্ধ ও বুদ্ধশিষ্যদের পরিচর্যা না করে। বুদ্ধ সশিষ্যে আকাশ মার্গে নদী পার হয়ে থুন গ্রামে এসে কোনো এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন। সেই সময় জনৈক ব্রাহ্মণ দাসীসহ কয়েকজন মহিলা সেই কূপ থেকে কলসী করে জল আনার সময় দিব্যজ্যোতিতে উদ্ভাসিত পথশ্রান্ত সশিষ্য বুদ্ধকে দেখে দাসীর প্রবল শ্রদ্ধা উৎপন্ন হল। সে ব্রাহ্মণের নির্দেশ উপেক্ষা করে বুদ্ধ প্রমুখ শিষ্যদের হস্ত-পদ প্রক্ষালণ ও পান করার জন্য স্বীয় কলসী থেকে জল দান করল। বুদ্ধসহ ভিক্ষু-সঙ্ঘ

www.pathagar.com

প্রয়োজনীয় জল ব্যবহারের পরও কলসী পরিপূর্ণ রইল। দাসী এসে বিস্ময়াভিভূত হয়ে বন্দনা করে ত্রিরত্নের অপার গুণমহিমা চিন্তা করতে করতে হৃষ্ট অন্তরে জলপূর্ণ কলসী নিয়ে প্রস্থান করল। দাসীপ্রভু ব্রাহ্মণ এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে ক্রোধে অগ্নিশর্মা হলেন এবং দাসীকে বেদম প্রকার করতে লাগলেন। আঘাতে দাসীর মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে কল্পবৃক্ষ পরিশোভিত বিচিত্র কারুকার্যখচিত সুবৃহৎ দেব বিমানে দেব অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দেবকন্যা রূপে উৎপন্ন হলেন। তার বিমান পরিবেষ্টন করে মুক্তাজাল শোভিত রজত সৈকত সম্পন্ন মণিবর্ণ নির্মল জলপূর্ণ নদী উৎপন্ন হল। নদীর উভয় তীরে ছিল উদ্যান, বিমান। দ্বারে পঞ্চবর্ণ পদ্মশোভিত মহতী পুষ্করিণী, তার জলে সুদৃশ্য স্বর্ণনৌকা। দেবকন্যা সেই নৌকায় বিচরণ করে দিব্য সম্পত্তি উপভোগ করতে লাগলেন।

অতঃপর বুদ্ধ আনন্দ স্থবিরকে জল আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। আনন্দ থুন গ্রামবাসী কর্তৃক জল দূষিত করার বিষয় অবহিত করলেন। বুদ্ধ দ্বিতীয়-তৃতীয়বার জল আনার জন্য আদেশ প্রদান করলে আনন্দ জল আনতে গিয়ে দেখলেন- কূপ জলপূর্ণ হয়ে চতুর্দিক উছলিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে। সেই জলপ্রপাত ক্রমশ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে সমগ্র গ্রাম প্লাবিত হতে লাগল। গ্রামবাসীরা হঠাৎ এই জল প্লাবন দেখে হতবুদ্ধি ও ভীত হয়ে বুদ্ধের সমীপে উপগত হয়ে আপন আপন দুষ্কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল এবং সশিষ্য বুদ্ধের প্রশান্তিভাব লক্ষ্য করে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পরদিনের জন্য নিমন্ত্রণ করল। পরদিন যথাসময়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষুগণ প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবিষ্ট হলে গ্রামবাসী প্রচুর উত্তম খাদ্যভোজ্য পরিবেশন করল। আহারান্তে গ্রামবাসী বুদ্ধের সম্মুখে এসে উপবেশন করল।

সেই দেবকন্যা স্বর্গে এরূপ দিব্যসম্পত্তি লাভের কারণ দিব্যজ্ঞানে জ্ঞাত হয়ে নরশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে বন্দনা করার জন্য সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হয়ে উদ্যান, নদী ও বিমানসহ মহতী দেবঋদ্ধি ও দেবানুভব প্রকাশ করতে করতে থুন গ্রামের সেই মহাসভায় উপস্থিত হলেন। সভাসদ এসব স্বর্গীয় বিভব অবলোকন করে বিস্ময়াবিষ্ট হল। দেবকন্যা বুদ্ধের পাদপদ্মে সশ্রদ্ধ অভিবাদনান্তে নতশিরে দণ্ডায়মান হলে বুদ্ধ তাঁর পূর্বজন্মের পুণ্যকর্মের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। দেবকন্যা আনুপূর্বিক কৃতকর্মের বিষয় ব্যক্ত করলেন। সভাসদ ত্রিরত্নের শরণাপন্ন হল।[৯৬] কাহিনীটি কল্পনাপ্রসূত ও রূপকথার মতো উপজীব্য।

বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করার সময় সমুনশ্রেষ্ঠীর পূর্ণ নামক ভৃত্য ছিল। তার পরিবারে ছিল তার ভার্য্যা ও উত্তরা নাম্নী কন্যা। একদা নগরে সপ্তাহকালব্যাপী নক্ষত্র উৎসব অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সুমনশ্রেষ্ঠীর পরিবার-পরিজন উৎসবে যোগদানের সময় পূর্ণের কাছে কাজ করবে কিনা জানতে চাইলে সে উত্তরে জানাল যে, উৎসবাদি ধনীদের ব্যাপার, সে দীন, তার পক্ষে নক্ষত্র-ক্রীড়ায় যোগদান করা অসম্ভব। সে যদি গরু পায় তাহলে মাঠে কাজ করবে। তাকে বলবান দুটি গরু দেওয়া হল। সে মাঠে গিয়ে জমি কর্ষণ করতে যাবার সময় স্ত্রীকে বলল, "আমার জন্য আজ উত্তম খাদ্য পাক করে নিয়ে এস।" সেইদিন সারিপুত্র স্থবির নিরোধ সমাপত্তি ধ্যান হতে উঠে 'কাকে অনুগ্রহ করবেন' দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করে পূর্ণকে দেখতে পেলেন। স্থবির পাত্র-চীবর গ্রহণ করে পুর্ণের কর্ষণস্থানে

www.pathagar.com

উপস্থিত হলেন। পূর্ণ তাঁকে দেখে বন্দনা করে বন্দনান্তর দন্তকাষ্ঠ ও মুখ প্রক্ষালনের জল দিল। স্থবির মুখ প্রক্ষালন করে গ্রামাভিমুখে যাত্রা করলেন। পূর্ণ্যের স্ত্রী তখন খাদ্য নিয়ে মাঠের দিকে যাচ্ছিল। পথিমধ্যে সাক্ষাৎ হল সারিপুত্র স্থবিরের সঙ্গে। সে স্থবিরকে শ্রদ্ধাচিত্তে বন্দনা করে হস্তস্থ পাত্রের সমুদয় খাদ্য দান করে প্রার্থনা করল, "ভন্তে, আপনি যেই ধর্মের অধিকারী আমিও যেন সেই ধর্মের অধিকারী হই।" স্থবির আহার্য নিয়ে প্রস্থান করলেন। পূর্ণের স্ত্রী গৃহে প্রত্যাবর্তন করে পুনরায় রান্না করে আহার্য নিয়ে মাঠে চলল। পূর্ণ শ্রম-ক্লান্ত হয়ে গরু ছেড়ে দিয়ে বৃক্ষ ছায়ায় বসেছিল। স্ত্রী আহার্য নিয়ে এসে স্বামীকে সমস্ত বিষয় অবহিত করল। স্বামী প্রফুল্ল মনে দানের অনুমোদন করল। আহারান্তে পূর্ণ শ্রান্ত দেহে স্ত্রীর অঙ্কে মস্তক রেখে ঘুমিয়ে পড়ল। ঘুম থেকে উত্থিত হয়ে স্বামী-স্ত্রী উভয়ে দেখতে পেল কর্ষিত মাটি সমস্তই স্বর্ণে রূপান্তরিত হয়েছে। পূর্ণ রাজাকে এ বিষয় জ্ঞাত করাল। রাজা সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে বললেন, "এ সবই ধর্মসেনাপতিকে দান করার প্রত্যক্ষ ফল।" রাজা কর্মচারীসহ শকট পাঠিয়ে দিলেন স্বর্ণ আনার জন্য। রাজঙ্গণে স্বর্ণের স্তূপ করা হল। এত সম্পদ তখন নগরে কারো কাছে ছিল না। পূর্ণকে শ্রেষ্ঠীপদে অভিষিক্ত করা হল। পূর্ণ এখন রাজগৃহে অন্যতম শ্রেষ্ঠী।

পূর্ণ সুবৃহৎ প্রাসাদ নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। তিনি সপ্তাহকাল বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। ধর্ম শ্রবণ করে পূর্ণ, তাঁর স্ত্রী ও কন্যা উত্তরা তিনজনে শ্রোতাপত্তি ফল লাভ করলেন। অনন্তর একদা সুমন শ্রেষ্ঠী পুত্রের জন্য পূর্ণশ্রেষ্ঠীর কন্যা উত্তরাকে চাইলেন। সুমনশ্রেষ্ঠী ছিলেন মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন। তাই প্রথমে পূর্ণশ্রেষ্ঠী তাঁর প্রস্তাবে রাজী হলেন না। পরে আত্মীয়বর্গের অনুরোধে রাজী হলেন। বিয়ের পর উত্তরা কোন পুণ্যকর্ম কিংবা ধর্মশ্রবণ করার সুযোগ পাননি। এ ছিল তাঁর অসহ্য। অবশেষে পিতাকে এ বিষয় জ্ঞাত করালে পূর্ণশ্রেষ্ঠী শ্রীমা নাম্নী সুন্দরী গণিকাকে দৈনিক এক হাজার টাকার বিনিময়ে পনের দিনের জন্য উত্তরার স্বামীর সঙ্গ দেবার জন্য নিয়োগ করে উত্তরাকে পুণ্যকর্ম করার সুযোগ করে দেন। শ্রীমার রূপে বিমোহিত উত্তরার স্বামী উত্তরাকে পুণ্যকাজ করার অনুমতি দিলেন। উত্তরা পনের দিনের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে প্রতিদিন উত্তমরূপে দান দিতেন ও ধর্মশ্রবণ করতেন। শেষ দিন ছিল প্রবারণা। পূর্বদিনে উত্তরা সহচরীসহ উত্তম খাদ্যভোজ্য প্রস্তুত করছিলেন। তিনি ঘর্মাক্ত কলেবরে এদিক-সেদিক কাজের তদারক করছিলেন, এমন সময় দ্বিতল থেকে তাঁর স্বামী উত্তরাকে এরূপ কঠোর শ্রমে ব্যাপৃত দেখে ঘৃণাব্যঞ্জক হাস্য করে চলে গেলেন। শ্রীমা তাকে হাসতে দেখে নীচে অবলোকন করে উত্তরাকে দেখতে পেল এবং তাঁর প্রতি বিদ্বেষভাব উদয় হল যে, সে কেন তাঁর প্রেমিকের সঙ্গে হাস্য করল। সে যে এ বাড়ির কেউ নয় সে কথাও ভুলে গেল। সে উত্তরাকে শাস্তি দেবার জন্য তর্জন গর্জন করতে করতে রান্নাঘরে গিয়ে উষ্ণ সূপ নিয়ে উত্তরার মস্তকে ঢেলে দিল। উত্তরার চিত্ত ছিল মৈত্রীপূর্ণ ও বিদ্বেষহীন। তাঁর নিকট শীতল জলের মত অনুভূত হল। শ্রীমা পুনরায় এক চামচ সূপ নিয়ে উত্তরার মস্তকে ঢেলে দিতে গেলে উত্তরার পরিচারিকাগণ তাকে ধরে

www.pathagar.com

প্রহার করতে লাগল। উত্তরা তাদের নিবৃত্ত করালেন। তখন শ্রীমার সম্বিৎ ফিরে এল। সে উত্তরার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলে তিনি বুদ্ধের নিকট ক্ষমা চাইতে বললেন। শ্রীমা বুদ্ধের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ উত্তরার মৈত্রীচিত্তের বিষয় জ্ঞাত হয়ে বললেন, "ক্রোধকে অক্রোধ, অসাধুকে সাধুতা, কৃপণকে দানে এবং মিথ্যাকে সত্য দ্বারা জয় করতে হয়।"[৯৭] বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে উত্তরা সকৃদাগামী ফল এবং তাঁর শ্বশুর, শাশুড়ী, স্বামী ও শ্রীমা স্রোতপত্তিফল লাভ করেন। উত্তরা যথাসময়ে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন।[৯৮] মহামোগ্‌গল্লান স্থবির স্বর্গে বিচরণকালে উত্তরাবিমানে উত্তরাদেবীকে পূর্ব জীবনের পুণ্যকর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলে উত্তরা উক্ত কাহিনী বিবৃত করেন। কাহিনীটির নাটকীয় বৈচিত্র্য অতি মনোরম।

রাজগৃহের রূপসী গণিকা শ্রীমা স্রোতাপত্তিফল লাভ করার পর সমস্ত পাপকর্ম বর্জন করে পুণ্যকর্ম সম্পাদনে রত হয়েছিলেন। তিনি প্রতিদিন আটজন ভিক্ষুকে আহার্য দান করতেন। অনন্তর কোনো ভিক্ষু তাঁর গৃহে আহার্য গ্রহণ করে তিন যোজন দূরবর্তী কোনো বিহারে গমন করলে সেই বিহারের ভিক্ষু কোথায় ভিক্ষা গ্রহণ করেছেন জানতে চাইলেন। আগন্তুক ভিক্ষুও শ্রীমার গৃহে ভোজন গ্রহণ এবং তাঁর শ্রদ্ধার প্রশংসা করলেন। এ-ও বললেন যে, শ্রীমা রূপলাবণ্যে অনন্য সুন্দরী। সেই সময় অন্য একজন ভিক্ষু শ্রীমার সৌন্দর্যের বিবরণ শুনে তাঁর প্রতি আসক্তচিত্ত হয়ে পড়েন। তিনি পরদিন বেণুবনে উপগত হয়ে শ্রীমার গৃহে উপস্থিত হলেন। তখন শ্রীমা অসুস্থ। আভরণহীন শ্রীমা রোগশয্যায় শায়িত। দাসীগণ শ্রীমার নির্দেশে ভিক্ষুদিগকে উত্তম আহার্য দান করল। শ্রীমা শীর্ণদেহে ভিক্ষুদিগকে বন্দনা করলেন। রোগগ্রস্থ শরীরের রূপলাবণ্য দেখে সেই ভিক্ষুর প্রতিবদ্ধ চিত্ত উৎপন্ন হল। তিনি সংজ্ঞাহীনের ন্যায় অভূক্ত অবস্থায় আহার্যপূর্ণপাত্রসহ বিহারে প্রত্যাবর্তন করে শয্যাশায়ী হলেন। তিনি অনশনে দিন কাটাতে লাগলেন।

শ্রীমার মৃত্যু হল। রাজা বুদ্ধের নিকট সংবাদ পাঠালেন, "ভন্তে, জীবকের কনিষ্ঠা ভগ্নি শ্রীমার মৃত্যু হয়েছে।" বুদ্ধ রাজার নিকট সংবাদ পাঠালেন, "শ্রীমার দেহ মশানে সংরক্ষণ করা হোক।" রাজা তাই করলেন। চতুর্থ দিনে শ্রীমার দেহ স্ফীত হয়ে উঠল, নবদ্বারে দূষিত পদার্থ নির্গত হতে লাগল। বুদ্ধের আদেশক্রমে রাজা নগরে ভেরী শব্দে প্রচার করালেন, "গৃহ রক্ষক ব্যতীত নগরবাসী শ্রীমাকে দর্মন নিমিত্ত মশানে যেতে হবে।" নগরবাসী মশানে উপস্থিত হলে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘও মশানে সমবেত হলেন, সঙ্গে শ্রীমার প্রতি আসক্তচিত্ত শয্যাশায়ী ভিক্ষুও। মশানে চারি পরিষদের মহাসমাগম নীরব-নিস্তব্ধ। বুদ্ধ মহাজনতার মধ্যে নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জিজ্ঞেস করলেন, "মহারাজ, এই মৃতা কে?" রাজা বিনীত স্বরে বললেন, "ভন্তে, জীবকের ভগ্নি শ্রীমা।" বুদ্ধ রাজাকে ভেরীশব্দে ঘোষণা করে দিতে বললেন যে, যার ইচ্ছা সে যেন হাজার টাকার বিনিময়ে শ্রীমার দেহ নিয়ে যায়। ঘোষণা করা হল। গ্রাহক পাওয়া গেল না। তারপর মূল্য ক্রমান্বয়ে কমিয়ে পাঁচশ, আড়াইশ, বিশ, দশ, এক টাকা, আট আনা, চার আনা, এক আনা, অতঃপর এক কড়ির বিনিময়ে শ্রীমাকে গ্রহণ করতে বলা হল, অবশেষে বিনামূল্যে গ্রহণ করার জন্য বলা

www.pathagar.com

হল, তথাপি কেহ গ্রহণ করতে রাজী হল না। অতঃপর বুদ্ধ সমাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও জনগণের উদ্দেশ্যে দেহের অসারতা ও অনিত্যতা সম্পর্কে বিস্তৃত ধর্মদেশনা করলেন। শ্রীমার প্রতি প্রতিবিদ্ধচিত্ত ভিক্ষুর তৃষ্ণা বিমোচন হল। সমাগত জনগণের ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হল। শ্রীমা মৃত্যুর পর দিব্য ঐশ্বর্যময় নিম্নাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে দিব্যদৃষ্টিতে তাঁর অতীত জীবন পর্যবেক্ষণ করে মশানে তার মৃতদেহ পরিবেষ্টন করে সেই ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ বুদ্ধ ও জনগণকে দেখতে পেলেন। তিনি পঞ্চশত অপ্সরাসহ দিব্যবিমানে করে সেই মহাসমাগমে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে বন্দনা করলেন। বঙ্গীশ ভিক্ষু তাঁর দেববিভব দেখে জানতে চাইলেন তাঁর পূর্বজীবন ইতিহাস। শ্রীমা ব্যক্ত করলেন পূর্বোক্ত অতীত জীবন।[৯৯] পৌরাণিক কাহিনীর মতো গল্পটি হৃদয়গ্রাহী এবং বর্ণনাচ্ছটায় অনুপম সৌন্দর্যময়। উপাখ্যানের মাধ্যমে এমন নীতিশিক্ষা আর কোনো সাহিত্যে দৃষ্ট হয় না।

শ্রাবস্তীর জনৈক উপাসকের দাসী শীলানুশীলন ও ভিক্ষু-সঙ্ঘের পরিচর্যা করে মৃত্যুর পর কিরূপ দিব্য বিভবের অধিকারিণী হয়েছিলেন তার কাহিনী বর্ণিত হয়েছে দাসী-বিমান নামক গল্পে। উপাসক বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করলে উক্ত দাসী অতীব আনন্দচিত্তে ভিক্ষুদের উপবেশন স্থান সুন্দররূপে লেপন ও আসনাদি প্রজ্ঞাপ্ত করতেন। ভিক্ষুগণ উপস্থিত হলে আসনে উপবেশন করায়ে সুগন্ধপুষ্প, ধূপ ও প্রদীপপূজা সম্পাদনান্তর সৎকারও গৌরব সহকারে অন্নপানীয় পরিবেশন করতেন। তিনি ত্রিশরণসহ শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ১৬ বছর যাবৎ ৩২ প্রকার অশুভ ভাবনা করেছিলেন। সেই পুণ্যকর্মের প্রভাবে তিনি দেবরাজ ইন্দ্রের প্রিয় পরিচারিকা রূপে জন্ম গ্রহণ করেন। এক লক্ষ অপ্সরা তাঁর চিত্ত বিনোদনের জন্য নিযুক্ত ছিল। ৬০ হাজার তূর্যধ্বনি দ্বারা পূজা লাভ করতঃ বিপুল দিব্য সম্পত্তি পরিভোগ করতেন।[১০০]

আচামদায়িকা বিমানবত্থুতে বর্ণিত হয়েছে রাজগৃহের পিতৃ-মাতৃহীন এক দরিদ্র স্ত্রীলোকের জীবনকাহিনী। একসময় রাজগৃহে মহামারীর প্রাদুর্ভাব হলে উক্ত পরিবারের স্ত্রীলোকটি ব্যতীত সকলেই মৃত্যু মুখে পতিত হয়। সে মৃত্যুভয়ে গৃহ ও ধন-সম্পত্তি ত্যাগ করে কোনো গৃহের পশ্চাৎ অলিন্দে বাস করতে লাগল। সেই গৃহবাসী লোকজন তার প্রতি অনুকম্পা করে ভুক্তাবিশিষ্ট অন্ন যাগু ইত্যাদি তাকে প্রদান করত। এভাবে তার জীবন কাটতে লাগল। একদিন মহাকশ্যপ স্থবির সমাপত্তিধ্যান হতে উত্থিত হয়ে জগৎ অবলোকন করে সেই দুর্গত স্ত্রীলোকটিকে দেখতে পান। তিনি পাত্র-চীবর গ্রহণ করে দরিদ্র রমণীর বাসস্থানের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। পথিমধ্যে দেবরাজ ইন্দ্র অজ্ঞাতবেশে দিব্য অন্ন-ব্যঞ্জন দান করতে চাইলে স্থবির তা গ্রহণ না করে উক্ত স্ত্রীলোকটির সম্মুখে গিয়ে স্থিত হলেন। স্ত্রীলোক চিন্তা করল, "এই মহান স্থবিরকে দান করার মত আমার কিছুই নেই। এই ক্লিষ্ট ভাজনে তৃণচূর্ণ ও ধূলিসমাকীর্ণ লবণহীন শীতল বিস্বাদ অন্নমণ্ডমাত্র আছে, ইহা কিভাবে তাঁকে দান করব?" এইরূপ চিন্তা করে বলল, "ভন্তে, ক্ষমা করবেন, আপনি অন্য গৃহে গমন করুন।" স্থবির এক পদমাত্র অগ্রসর হয়ে স্থিত রইলেন। অন্যরা স্থবিরকে অন্ন-ব্যঞ্জন দিতে চাইলে তিনি গ্রহণ করলেন না। স্ত্রীলোক বুঝতে পারল যে,

www.pathagar.com

স্থবির তার দান গ্রহণ করার জন্যই এখানে এসেছেন। সে অতি শ্রদ্ধাসহকারে সেই অন্ন-মণ্ড স্থবিরের পাত্রে অর্পণ করল। স্থবির তার প্রসন্নতা বৃদ্ধির জন্য সেখানে আসন পেতে আহার করলেন এবং ভোজন শেষে তাকে ধর্মোপদেশ দিয়ে প্রস্থান করলেন। অনন্তর সেই স্ত্রীলোক মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে দিব্য সুখৈশ্বর্যের অধিকারিণী হলেন।[১০১]

সামাজিক আর অলৌকিক পরিবেশনায় সমৃদ্ধ ভদ্রাস্ত্রী বিমান কাহিনী। কিম্বিল নামক নগরে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন ও শীলাচারণসম্পন্ন রোহক নামে জনৈক গৃহপতি ছিলেন। সেই নগরে মহৈশ্বর্য ও পুতপবিত্র চরিত্র সম্পন্ন ভদ্রা নাম্নী এক কন্যার সঙ্গে তাঁর পরিণয় হয়। পতিপ্রাণা নারী সর্ববিষয়ে স্বামীর উপযুক্তা ছিলেন। ভদ্র ব্যবহারের জন্য তিনি ভদ্রাস্ত্রী নামে পরিচিতি লাভ করেন। তখন সারিপুত্র ও মোগ্গল্লান দুই অগ্রশ্রাবক পাঁচশ করে শিষ্য সঙ্গে নিয়ে দেশ পর্যটন করতে করতে কিম্বিল নগরে উপনীত হন। রোহক সংবাদ পেয়ে সশিষ্য স্থবিরদ্বয়কে নিমন্ত্রণ করেন। পরদিন ভিক্ষু-সঙ্ঘের আহার গ্রহণের পর রোহক সস্ত্রীক পরিবার-পরিজন নিয়ে ধর্মশ্রবণ করেন। তাঁরা ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠিত হয়ে উপোসথ দিবসে উপোসথ রক্ষা করতেন। এক সময় রোহক বাণিজ্য করার জন্য তক্ষশীলায় গিয়েছিলেন। নক্ষত্র উৎসবের দিনে ভদ্রার ইচ্ছা হল স্বামী সন্দর্শনের। দেবতা তাঁর চিত্তভাব জ্ঞাত হয়ে দৈবশক্তি বলে ভদ্রাকে স্বামীর নিকট নিয়ে গেলেন। আবার যথাসময়ে স্বগৃহে পৌঁছে দিলেন। সেই স্বামী সহবাসে তিনি অন্তসত্ত্বা হয়ে ক্রমশ গর্ভ প্রকাশ পেতে থাকলে তাঁর কলঙ্ক ছড়িয়ে পড়তে লাগল। আত্মীয়-স্বজন সকলে তাঁকে ঘৃণা করতে লাগল। তখন ভদ্রা তক্ষশীলায় স্বামী প্রদত্ত অঙ্কুরী দেখিয়ে তাদের সন্দেহ নিরসন পূর্বক বিশুদ্ধ শীলাচারসম্পন্না বলে পরিচিতি লাভ করেছিলেন। মৃত্যুর পর ভদ্রাস্ত্রী তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন। একসময় বুদ্ধ তাবতিংস স্বর্গে উপস্থিত হয়ে পারিজাত বৃক্ষমূলে পাণ্ডুকম্বল শিলাসনে উপবেশন করলে দেব পারিষদের সঙ্গে সেই ভদ্রাস্ত্রী দেবী দিব্য বিভূতি-বিমণ্ডিত হয়ে বুদ্ধসমীপে উপগত হয়ে সশ্রদ্ধ বন্দনা করেন। বুদ্ধ দেবসমাগমে সকলের জ্ঞাতার্থে দেবীকে পূর্ব পুণ্যকর্মের বিষয় জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্ব জীবনকাহিনী ব্যক্ত করেন।[১০২]

বুদ্ধ বেণুবনে অবস্থান করার সময় এক শ্রদ্ধাসম্পন্না বালিকা ছিল। দান না করে সে ভোজন করত না। নিজের খাদ্য হতে অর্ধেক পরিমাণ দান করে দিত। মাতা-পিতা তার প্রতি অতি সন্তুষ্ট ছিলেন। তাকে দ্বিগুণ পরিমাণ খাদ্য দিতেন, তাও সে দান করে দিত। সে বয়ঃপ্রাপ্ত হলে মাতা-পিতা সেই নগরের এক কুলপুত্রের সঙ্গে বিয়ে দেন। তার শ্বশুরকুল মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ছিল। এক সময় মোগ্গল্লান স্থবির উক্ত মেয়ের শ্বশুরবাড়ির দ্বারে স্থির হয়েছেন দেখে সে অত্যধিক আনন্দিত হল এবং আহ্বান করে গৃহে বসাল। সে অতীব শ্রদ্ধার সাথে বন্দনান্তর শাশুড়ির স্থাপিত পিষ্টক তার অজ্ঞাতসারে স্থবিরকে দান করল। স্থবির দানের ফল বর্ণনা করে প্রস্থান করলেন। পিষ্টক দানের বিষয় শাশুড়িকে জানালে সে ক্রোধান্ধ হয়ে তাকে মুষল দ্বারা প্রহার করল। সে আহত হয়ে কিছুদিন পর

www.pathagar.com

মৃত্যুবরণ করে তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হল। মোগ্‌গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণ কালে সহস্র দেব-অপ্সরা পরিবৃত মনোহর দিব্য-সম্পত্তি সম্পন্ন সেই দেবীকে দেখে তার পুণ্যকর্ম সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে পূর্বোক্ত বিষয় তার কাছ থেকে জ্ঞাত হন।[১০৩]

বর্ণনাবৈচিত্র্যে মনোরম ও সামাজিক ঘাত-প্রতিঘাতে পরিপূর্ণ গুত্তিল বিমান কাহিনী। বারাণসীরাজ্যে ব্রহ্মদত্ত রাজের রাজত্বকাল। তখন বোধিসত্ত্ব গন্ধর্বকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় গুত্তিল। তিনি গন্ধর্বশিল্পে পারদর্শিতা লাভ করে চতুর্দিকে খ্যাতিলাভ করেন। উজ্জয়িনীবাসী মুসিল নামক জনৈক ব্যক্তি আচার্য গুত্তিলের সুখ্যাতি শ্রবণ করে তাঁর নিকট বাদ্য শিক্ষা করতে ইচ্ছা করল। আচার্য তার লক্ষণ দেখে বুঝতে পারলেন যে, সে অতি কঠিন হৃদয়, কর্কশ ও অকৃতজ্ঞ হবে। তাই তিনি শিক্ষা দানে অসম্মতি প্রকাশ করলেন। মুসিল অনুমতি না পেয়ে আচার্যের মাতা-পিতার সেবা করে তাঁদের তুষ্টি সাধন করলে তাঁরা মুসিলকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য পুত্রকে অনুরোধ করলেন। মাতা-পিতার গৌরব রক্ষার্থে তাকে শিষ্যপদে বরণ করতে বাধ্য হলেন। আচার্য তাকে অকপটে সমস্ত বিষয় শিক্ষা দিলেন। মুসিল ছিল মেধাবী, অচিরে সর্ববিধ বাদ্যযন্ত্রে পারদর্শিতা অর্জন করল। আচার্য গুত্তিল ছিলেন বারাণসী রাজদরবারের প্রধান গন্ধর্ব। মুসিল আচার্যের চেয়ে অধিক কীর্তি লাভের আশায় রাজার সম্মুখে বাদ্য বাজানোর ইচ্ছা প্রকাশ করল এবং তার ব্যবস্থা করে দিতে অনুরোধ করল। আচার্য তাকে রাজসমীপে নিয়ে গেলেন। মুসিলের বাদ্য শুনে রাজা তুষ্ট হলেন এবং আচার্যের অর্ধেক পারিশ্রমিকের বিনিময়ে বাদক হিসেবে নিযুক্ত হতে বললেন। মুসিল বলল, "আমি আচার্যকে ভয় করি না, আচার্যকে যা দেবেন আমাকেও তাই দিন।" রাজা সম্মত না হলে সে আচার্যের সঙ্গে বাদ্য বাজনায় প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করার জন্য স্বীয় অভিমত প্রকাশ করে সমস্ত নগরীতে জানিয়ে দিল যে, "আগামী এক সপ্তাহ পর রাজোদ্যানে আমার ও গুত্তিলাচার্যের বীণাবাদন প্রদর্শন করা হবে।" ইহা শ্রবণ করে বৃদ্ধ গুত্তিল আচার্য ভাবলেন, "যদি আমার পরাজয় হয়, তবে মৃত্যু সমতুল্য হবে। সুতরাং তার পূর্বে অরণ্যে গমন করে আত্মহত্যা করাই শ্রেয়।" এরূপ চিন্তা করে আচার্য বনে গিয়ে আত্মহত্যা করার পরিকল্পনা করেছিলেন, তখন দেবরাজ ইন্দ্র বনে উপস্থিত হল এবং সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে আচার্যকে অভয় দিলেন এবং দেবরাজ ইন্দ্র প্রতিযোগিতায় অংশগ্রহণ করতে অনুরোধ করলেন। সপ্তম দিবসে রাজোদ্যানে রাজাসহ অসংখ্য জনতার সমাগম হল প্রতিযোগিতা প্রত্যক্ষ করার জন্য। গুত্তিল আচার্য ও মুসিলের মধ্যে বীণা প্রতিযোগিতা আরম্ভ হল। দেবেন্দ্র সে সভায় উপস্থিত হয়েছিলেন, গুত্তিল আচার্যই শুধু তাঁকে দেখতে পাচ্ছিলেন। দেবরাজ আচার্যকে একখানা তন্ত্রী ছেদন করতে বললেন, তিনি তাই করলেন। তথাপি বীণার সেই রূপই মধুরধ্বনি ধ্বনিত হল। এরূপ ক্রমান্বয়ে দ্বিতীয়, তৃতীয়, চতুর্থ, পঞ্চম, সপ্তম তন্ত্রী ছেদন করা হল। তবুও বীণা হতে ততোধিক সুমধুর ধ্বনি নিঃসৃত হতে লাগল। ইহা দেখে মুসিল পরাজয় স্বীকার করে নিল। রাজা মুসলিকে সভা হতে বহিষ্কার করে দিলেন। দর্শকবৃন্দের হর্ষধ্বনিতে সভামণ্ডপ মুখরিত হয়ে উঠল। অতঃপর দেবরাজ ইন্দ্র আচার্যের সঙ্গে প্রীতি

www.pathagar.com

আলাপ করে প্রস্থান করলেন। দেবগণ ইন্দ্রের নিকট গুত্তিলের বিষয় শুনে তাঁকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। তিনি ইন্দ্রের অনুরোধে দেবলোকে গিয়ে বীণাবাদন করে দেব-পরিবারকে তুষ্ট করেছিলেন। দেবগণও নিজ নিজ সুকর্মের বিষয় আচার্যের নিকট প্রকাশ করে তাঁরা প্রসাদ উৎপাদন করেছিলেন।[১০৪] কাহিনীটি নিঃসন্দেহে অপরূপ।

মগধের নালক নামক গ্রামে ধনাঢ্য গৃহপতির শেষবতী নাম্নী এক পুত্রবধূ ছিলেন। তিনি পূর্বজন্মে কশ্যপবুদ্ধের কনক-স্তূপ নির্মাণ করার সময় তাঁর কণ্ঠহারখানা চৈত্যের জন্য দান করেছিলেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে তিনি মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে দিব্যসুখ উপভোগ করার পর গৌতম বুদ্ধের শাসনকালে পুনরায় সেই নালক গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বয়স যখন দ্বাদশবর্ষ, তখন মাতা তাঁকে তৈলের জন্য এক দোকানে প্রেরণ করেছিলেন। দোকানদারের পিতা ইতিপূর্বে বহু স্বর্ণ, হীরক, মণি, মুক্তা প্রভৃতি রত্নরাশি নিধান করে রেখেছিলেন। একসময় দোকানদার মৃত্তিকাগর্ভ হতে সেই রত্নরাজি উত্তোলন করে দেখলেন- সমস্ত রত্ন পাষাণখণ্ডে পরিণত হয়েছে। তিনি সেই সব পাষাণখণ্ড দোকানের পাশে স্তূপাকারে রেখেছিলেন। সেই বালিকা দোকানে গিয়ে আশ্চর্যস্বরে জিজ্ঞেস করলেন. "এত রত্নরাজী গোপনস্থানে না রেখে বাইরে খোলা স্থানে রেখেছেন কেন?" দোকানদার বালিকার কথা শুনে বুঝতে পারলেন যে, "এই বালিকা মহাপুণ্যবতী, এর দ্বারা স্বর্ণাদি রত্নরাশি লাভে সক্ষম হব। তাকে পুত্রবধূ করতে হবে।"

অনন্তর সেই বালিকাকে দোকানদার স্বীয় পুত্রবধূ করে ঘরে আনলেন এবং বললেন, "মা, এখন হতে তুমি এ গৃহের যাবতীয় সম্পত্তির অধিকারিণী হলে। তুমি আমাদিগকে যা দেবে তাই আমরা পরিভোগ করব।" তখন সেই বধূর নাম হল শেষবতী। সারিপুত্র স্থবির পরিনির্বাপিত হওয়ার সপ্তাহ পর তাঁর অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। শেষবতী তখন অন্তসত্ত্বা। তিনিও সেই অনুষ্ঠানে শ্বশুরের অনুমতি নিয়ে যোগদান করেছিলেন। তিনি সারিপুত্রের শবদেহ সুগন্ধিযুক্ত পুষ্প, দীপ, ধূপ ইত্যাদি দিয়ে অতি শ্রদ্ধাসহকারে পূজা করলেন। তখন রাজপরিষদের হস্তী উন্মত্ত হয়ে সেখানে উপস্থিত হলে মহাজনতা ভয়ে পলায়ন করার সময় পদদলিত হয়ে শেষবতীর মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হলেন। তিনি সহস্র অপ্সরা পরিবৃত ও ষাট শকটপূর্ণ অলংকারে বিভূষিত হয়ে মহতী দেব-ঋদ্ধিসহকারে বুদ্ধকে বন্দনা করার জন্য শ্রাবস্তীর জেতবনে আগমন করলেন। বুদ্ধকে অভিবাদন করে একান্তে দাঁড়ালে তাঁর দেববিভব সম্পর্কে জানার জন্য বঙ্গীশ স্থবির প্রশ্ন করেন। শেষবতীদেবী স্থবিরের প্রশ্নের উত্তরে পূর্বোক্ত বিবরণ বিবৃত করেন।[১০৫]

শ্রাবস্তীর জনৈক কাঠুরিয়ার স্ত্রী সপল্লব অঙ্কুরযুক্ত বহু অশোকপুষ্প দ্বারা বুদ্ধকে ভক্তিসহকারে পূজা ও বন্দনা করেছিলেন। সেই মহিলা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সর্বদা অপ্সরা পরিবৃত হয়ে নন্দন বনে নৃত্য-গীতে ব্যাপৃত থাকতেন, পারিজাত মালা রচনা করে আনন্দ মনে ক্রীড়া করতেন, তিনি নৃত্য করার সময় অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ হতে মনোহর দিব্য শব্দ নিঃসৃত হত, দেহ হতে দিব্যসুগন্ধ প্রবাহিত হত, শরীর বিবর্তিত হবার সময় কেশবেণীর অলঙ্কার নির্ঘোষ পঞ্চাঙ্গিক তূর্য ধ্বনির ন্যায় শ্রুত

www.pathagar.com

হত। তাঁর সমস্ত দেহ থেকে অপূর্ব সুগন্ধ সমগ্র এলাকায় ছড়িয়ে পড়ত।[১০৬] তাঁর এরূপ দিব্য-বিভূতি দেখে মহামোগ্‌গল্লান স্থবির তাঁকে পূর্ব জীবনের পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে জিজ্ঞেস করেন। উত্তরে দেবকন্যা বললেন, "আমি প্রভাস্বর দীপ্তিমান অশোকপুষ্পের মালা দিয়ে বুদ্ধকে পূজা করেছিলাম এবং বুদ্ধের প্রশংসিত কুশল কর্ম সম্পাদন করে এরূপ দিব্য সুখের অধিকারিণী হয়েছি।"[১০৭]

বিহারবিমান নামক কাহিনীতে বিশাখা কর্তৃক বিহার দান এবং তাঁর সখীদের কর্তৃক দান অনুমোদনের ফল সম্পর্কে বর্ণিত হয়েছে। একসময় বিশাখা সুশোভিত পরিচ্ছদ ও মহালতা অলঙ্কার পরিধান করে পঞ্চশত সখীসহ উদ্যান ভ্রমণে গিয়েছিলেন। পথিমধ্যে তাঁর ভাবান্তর উদয় হল, "অযথা ক্রীড়ায় সময় নষ্ট না করে বুদ্ধের নিকট গিয়ে ধর্ম শ্রবণই অধিক লাভ হবে।" অনন্তর সখীগণসহ শ্রাবস্তীর জেতবনে বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়ে মহালতা প্রসাধন খুলে একান্তে রেখে বুদ্ধকে বন্দনান্তর একান্তে উপবেশন করলেন। বুদ্ধের মুখে ধর্ম শ্রবণান্তর প্রফুল্ল অন্তরে বুদ্ধকে বন্দনা করে প্রস্থান করলেন। কিছুদূর গিয়ে দাসীর কাছে মহালতা প্রসাধন চাইলেন। দাসী ভুলে প্রসাধন বিহার অঙ্গণে ফেলে এসেছিল। বিশাখা দাসীর কাছে জ্ঞাত হয়ে তা বিহারের জন্য দান করার মনস্থির করলেন এবং পুনরায় বিহারে গিয়ে বন্দনা করে বুদ্ধকে এ বিষয়ে জানালেন। বুদ্ধ সম্মতি জানালে তিনি প্রসাধনের পরিবর্তে নয় কোটি মুদ্রা প্রদান করে বিচিত্র কারুকার্য খচিত এক সহস্র প্রকোষ্টযুক্ত সুবৃহৎ দ্বিতল প্রাসাদ নির্মাণ করালেন। নয় মাসে বিহারের নির্মাণ কার্য সমাপ্ত হল। বিশাখা সখীদের আহ্বান করে বললেন, "এই বিহার নির্মাণে আমার যেই পুণ্য অর্জিত হয়েছে সেই পুণ্যাংশ তোমাদিগকে দান করছি, তোমরা অনুমোদন কর।" সকলে প্রসন্ন চিত্তে অনুমোদন করল। তাদের মধ্যে একজন সহচরী অচিরে মৃত্যুবরণ করে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হল। তার পুণ্যফলে বহু কূটাগার, উদ্যান ও পুষ্করিণী প্রতিমণ্ডিত ষোড়শ যোজন বিস্তৃত ও সমউচ্চতা বিশিষ্ট আকাশচুম্বী সুবৃহৎ বিমান উৎপন্ন হল। মহাউপাসিকা বিশাখাও মৃত্যুর পর নির্মাণরতি দেবলোকে সুনির্মিত দেবরাজের অগ্রমহিষীরূপে জন্মগ্রহণ করে দিব্য-সুখ ভোগ করতে লাগলেন।[১০৮]

পূর্বজন্মের শত্রুতার ফলে ইহজীবনেও প্যারস্পরিক শত্রুতার বিষময় প্রতিক্রিয়া রজ্জুমালা বিমান কাহিনী। গয়াগ্রামের এক ব্রাহ্মণ কন্যার সঙ্গে সেই গ্রামের জনৈক ব্রাহ্মণপুত্রের বিয়ে হয়। সেই গৃহে ছিল এক দাসী কন্যা। কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে ব্রাহ্মণকন্যা দাসী এবং দাসী-কন্যা তার প্রভূস্বামিনীরূপে জন্ম গ্রহণ করেছিল। তখন উভয়ের মধ্যে শত্রুতা শুরু হয়। দাসী সেই জন্মে দানাদি পুণ্যকর্ম করে পর্যায়ক্রমে জন্মান্তরের পর গৌতম বুদ্ধের সময় গয়াশ্রমে ব্রাহ্মণকন্যা দাসীরূপে আর দাসীকন্যা তার স্বামিনীরূপে জন্ম গ্রহণ করে। ব্রাহ্মণকন্যা কারণে অকারণে তাকে চুলে ধরে উৎপীড়ন করত। দাসী তার উপীড়ন সহ্য করতে না পেরে মস্তক মুণ্ডন করে ফেলল। কিন্তু ব্রাহ্মণ কন্যা তার শির-রজ্জুদ্বারা বন্ধন করে তাকে প্রহার করত। রজ্জু অপনয়ন করতে দিত না। তদবধি তার নাম হল রজ্জুমালা। রজ্জুমালা অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে একদিন আত্মহত্যা করার মনস্থ

www.pathagar.com

করে অরণ্যে প্রবেশ করল। একটি বৃক্ষে রজ্জুবন্ধন করে ফাঁস তৈরি করল। তা গলায় পরার সময় কেউ দেখছে কিনা চতুর্দিকে অবলোকন করে দেখতে পেল, ষড়বর্ণ রশ্মি বিকীর্ণ করে অনতিদূরে বুদ্ধ উপবিষ্ট আছেন। বুদ্ধের প্রতি তার শ্রদ্ধা উৎপন্ন হল। বুদ্ধ তার চিত্তের অবস্থা জ্ঞাত হয়ে মধুর কণ্ঠে তার নাম ধরে ডাকলেন। বললেন, "রজ্জুমালা এস, ধর্মশ্রবণ কর।" রজ্জুমালা একান্তে উপবেশন করলে বুদ্ধ তাকে ধর্মোপদেশ দিলেন, চতুরার্য সত্য নির্বান লাভের পথ।[১০৯] বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শুনে রজ্জুমালা স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হল। সে ব্রাহ্মণ কন্যার নিগ্রহ-উৎপীড়ন নীরবে সহ্য করার সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রশান্ত বদনে জলপূর্ণ কলসটি নিয়ে গৃহে প্রত্যাবর্তন করল। ব্রাহ্মণ দাসীকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "জল আনতে তোমার এত বিলম্ব হল কেন?" দাসী পূর্ববৃত্তান্ত প্রকাশ করল। ব্রাহ্মণ বুদ্ধের নিকট উপগত হয়ে বন্দনান্তর নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ তাঁর গৃহে উপস্থিত হলে উৎকৃষ্ট খাদ্যভোজ্য দ্বারা পরিবেশন করলেন। আহারান্তে ব্রাহ্মণের পরিবার-পরিজন ও গয়াগ্রামবাসী সমবেত হয়ে বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণ করল। সকলে ত্রিশরণে শরণাগত হল। ব্রাহ্মণও রজ্জুমালাকে কন্যার ন্যায় স্নেহ করতে লাগল। রজ্জুমালা মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল, তার সেবায় সহস্র অপ্সরা নিয়োজিত হল। দিব্য আভরণে সে সর্বদা সজ্জিত থাকত। মহামোগ্গল্লান স্থবির তার এরূপ দিব্য-বিভূতি দর্শন করে তার পূর্ব জীবন-কাহিনী জানতে চাইলে উক্ত বৃত্তান্ত বিবৃত করেন।[১১০]

বুদ্ধ তখন গগ্গরা পুষ্করিণীর তীরে অবস্থান করছিলেন। একদিন সন্ধ্যার সময় ধর্মসভায় চারি পরিষদ সমবেত হলে তিনি গন্ধকুটি হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ধর্মসভা-মণ্ডপে প্রবেশ করলেন এবং কেশরী সিংহ সদৃশ অষ্টাঙ্গযুক্ত ব্রহ্মস্বরে অচিন্তনীয় বুদ্ধলীলায় ধর্মদেশনা করতে লাগলেন। তখন একটি মণ্ডুক পুষ্করিণী থেকে উঠে 'ধর্মভাষণ হচ্ছে' এরূপ মনে করে ধর্মসংজ্ঞায় বুদ্ধের স্বরে নিমিত্ত গ্রহণ পূর্বক পরিষদের এক প্রান্তে স্থিত হল। এক গোপালক বুদ্ধের কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে সেও তন্ময়চিত্তে ধর্মশ্রবণের মানসে পরিষদের একান্তে যেখানে মণ্ডুক সেখানে স্থিত হল। তার হস্তস্থিত দণ্ডের দ্বারা মাটিতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াবার সময় অজ্ঞতাবশত মণ্ডুকের মস্তকের উপরে দণ্ডের অগ্রভাগ স্থাপন করল। সেই গুরুভারে মণ্ডুকের তখনই মৃত্যু হল। ধর্মসংজ্ঞায় প্রসন্নচিত্তে মৃত্যু হওয়ায় তক্ষণেই তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনক-বিমানে সুপ্তোত্থিতের ন্যায় উৎপন্ন হল। বহু অপ্সরা তার সেবায় নিযুক্ত হল। তখন মণ্ডুক দেবপুত্র দেববিমানসহ সপারিষদ মহতী দেবলীলায় জনসঙ্ঘের দৃষ্টিপথেই এসে ভগবানের পাদমূলে নতশিরে বন্দনা করলেন। বুদ্ধ তার সুকৃতি বিষয় জিজ্ঞেস করলে দেবপুত্র পূর্বাবৃত্তান্ত ব্যক্ত করলেন। বুদ্ধ পরিষদে ধর্মদেশনা করলে মণ্ডুক দেবপুত্র স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।[১১১]

বেরতী বিমানে নন্দিক ও রেবতী নাম্নী স্বামী-স্ত্রীর বর্তমান জীবন-কর্ম এবং মৃত্যুর পর রেবতীর নরক যন্ত্রণা ও নন্দিকের স্বর্গপ্রাপ্তির কাহিনী বর্ণিত হয়েছে- যা রূপকথার মতো উপভোগ্য। নন্দিক ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি। তাঁর সঙ্গে বিয়ে হল মাতুলকন্যা রেবতীর।

www.pathagar.com

রেবতী ছিল ত্রিরত্নে অপ্রসন্ন। কিন্তু নন্দিকের নির্দেশ ছিল ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মাতা-পিতার মত সেবা করতে হবে। রেবতী অনিচ্ছাসত্ত্বেও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সেবা করত বটে কিন্তু শ্রদ্ধা করত না। নন্দিকের মাতা-পিতার মৃত্যুর পর রেবতী হল গৃহকর্ত্রী। নন্দিক প্রতিদিন ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিতেন। তিনি ঋষিপতনে চারিপ্রকোষ্ঠযুক্ত একটি মহাবিহার দান দিয়েছিলেন। জল ঢেলে উৎসর্গ করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর জন্য তাবতিংস স্বর্গে দীর্ঘপ্রস্থে দ্বাদশ যোজন ও উচ্চতায় শতযোজন বিশিষ্ট সপ্তরত্নময় মহাপ্রাসাদ এবং সেবার জন্য প্রাসাদে সহস্র অপ্সরা উৎপন্ন হল। একদা মহামোগ্গল্লান স্থবির দেবলোকে বিচরণকালে উক্ত দেববিমান দেখে জানতে পারেন যে, উহা নন্দিক দেবপুত্রের জন্য তৈরি হয়ে আছে। স্থবির বুদ্ধকে এ বিষয়ে অবহিত করলে বুদ্ধ বললেন, "সুদূর প্রবাসে দীর্ঘকাল বাস করে নিরাপদে সমাগত ব্যক্তিকে জ্ঞাতিমিত্র ও সুহৃদগণ এসে যেমন অভিনন্দিত করে, তেমনি পুণ্যবান ব্যক্তি ইহলোক হতে পরলোকে গমন করলে, প্রিয়জ্ঞাতির আগমনের ন্যায় পুণ্যসমূহ তাকে প্রতিগ্রহণ করে।[১১২] নন্দিক ইহা জ্ঞাত হয়ে অধিকতর পুণ্যকর্মে নিযুক্ত হলেন। একদা নন্দিক বহির্দেশে বাণিজ্যে গমন করার সময় রেবতীকে দানকার্য সুষ্ঠুরূপে সম্পাদন করার নির্দেশ দিয়ে যান। রেবতী যথাযথ দান কার্য না করে বরং ভিক্ষু-সঙ্ঘের দুর্নাম করতে লাগল। নন্দিক দূরদেশ থেকে প্রত্যাগমন করে এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে তাকে গৃহ থেকে বহিষ্কার করে দেন। তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও অনাথদের আবার যথারীতি দান দেওয়ার ব্যবস্থা করেন। এক সময় নন্দিকের মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তিনি তাবতিংস স্বর্গে নির্ধারিত দেববিমানে উৎপন্ন হলেন। এদিকে রেবতী ভিক্ষু-সঙ্ঘকে এরূপ আক্রোশবাক্য বলে বিচরণ করতে লাগল যে, "এরাই আমার সমূহ ক্ষতি সাধন করেছে।" যমরাজের নির্দেশে দুটি যক্ষ রেবতীকে দুই বাহুতে ধরে নগরের প্রত্যেক রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে তাবতিংস দেবলোকে নন্দিকের দিব্য সম্পত্তি দর্শন করাল। সে নন্দিকের স্বর্গীয় বিভব দর্শন করে তাঁর কাছে যেতে চাইল। যক্ষরা বলল, "তুমি মনুষ্যলোকে কোনো পুণ্যকর্ম করনি। পাপীরা দেবগণের সাহায্য লাভ করতে পারে না।" এই বলে যক্ষরা তাকে গূথনরকে (বিষ্ঠাকুণ্ডে) নিক্ষেপ করে বলল, "রেবতে, তুমি শ্রমণ ও ভিক্ষাজীবীকে মিথ্যাবাক্যে বঞ্চিত করেছ তাই তোমাকে সহস্র বৎসর এই নরকে দুঃখ ভোগ করতে হবে। তোমার সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ছিন্ন করা হবে, অতঃপর কাকেরা তোমার দেহের মাংস ছিঁড়ে খাবে।[১১৩] রূপকথার জগতে এসব কাহিনী অতি চমৎকার।

বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করার সময় সেবত্য নগরে এক ব্রাহ্মণের ছত্র নামক একটি পুত্র ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁকে উক্কট্ঠ নগরে পোক্খরসাতি নামক আচার্যের নিকট বিবিধ শাস্ত্র শিক্ষার জন্য প্রেরণ করা হল। তিনি ছিলেন অতি মেধাবী, অল্প সময়ের মধ্যে সমস্ত ব্রাহ্মণ্য শিল্পে পারদর্শিতা লাভ করলেন। যথাসময়ে তাঁর বিদ্যা শিক্ষা সমাপ্ত হলে গুরুকে জানালেন। গুরু এক সহস্র টাকা গুরুদক্ষিণা দিতে বললে ছত্তকুমার মাতা-পিতার নিকট উপস্থিত হয়ে প্রণাম জানিয়ে সহস্র টাকা গুরুদক্ষিণা যাচনা করলেন। পিতা-মাতা সহস্র টাকা প্রদান করলে পরদিন গুরুগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। চোরগণ এ সংবাদ

www.pathagar.com

জ্ঞাত হয়ে ছত্তের গমন পথে গভীর অরণ্যে আত্মগোপন করে রইল। তারা সঙ্কল্প করল-ছত্তকে হত্যা করে টাকা আত্মসাৎ করবে। বুদ্ধ প্রত্যুষে সমাপত্তি ধ্যান হতে উঠে দিব্যচক্ষে জগৎ পর্যবেক্ষণ করে ছত্তকে দেখতে পেলেন। তিনি ছত্তের গমন পথে কোনো বৃক্ষমূলে উপবেশন করলেন, ছত্ত যাবার সময় পথিমধ্যে বুদ্ধকে দেখে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁকে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে দীক্ষা দিলেন। ছত্ত উত্তমরূপে শরণ ও শীল গ্রহণ করে বুদ্ধকে বন্দনা করে বিদায় গ্রহণ করলেন। তিনি ত্রিরত্নের গুণ করতে করতে যেতে লাগলেন, এমন সময় চোরগণ পশ্চাৎ থেকে এসে তাঁকে আঘাত করল। সেই আঘাতে তাঁর মৃত্যু হল। চোর টাকা নিয়ে পলায়ন করল। ছত্ত মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হল। ত্রিশযোজন বিশিষ্ট কনক বিমানে সহস্র অপ্সরা তাঁর সেবায় নিয়োজিত রইল। তাঁর বিমানের আভা ১২০ যোজন পরিব্যাপ্ত হত। ছত্তের মৃত্যু সংবাদ পেয়ে তার মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন ও সপারিষদ আচার্য পোক্‌খরসাতি রোদন করতে করতে সেখানে উপস্থিত হলেন। বহু লোকের সমাবেশ হল। অনতিদূরে চিতা সাজিয়ে মৃতদেহ সৎকারের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল। সেই সময় বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ শ্মশানে উপস্থিত হলেন। ছত্তদেবপুত্র দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে অপার দিব্যৈশ্বর্য দেখে কিরূপে লব্ধ হয়েছে, তা দিব্যচক্ষে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন, ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করার ফলেই ইহা প্রাপ্ত হয়েছেন। তিনি বুদ্ধের প্রতি প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করে সপারিষদ দেববিমানে করে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে সশ্রদ্ধ বন্দনা করে একান্তে স্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁর মুখে পূর্ব জীবনের সুকৃতি বলার জন্য জীবন কাহিনী জিজ্ঞেস করলে তিনি আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করলেন।[১১৪] সামান্য হলেও কুশল কর্মের বিপাক মহৎ।

বুদ্ধ তখন রাজগৃহের বেণুবনে অবস্থান করছিলেন। সেই সময় তিনজন ক্ষীণাসব ভিক্ষু গ্রাম্যবিহারে বর্ষাবাস যাপন করে বুদ্ধকে বন্দনা করার মানসে রাজগৃহাভিমুখে যাচ্ছিলেন। মধ্যপথে সন্ধ্যা হল। তাঁরা কোনো এক ইক্ষুক্ষেত্রের সামনে দাঁড়ালেন। সেই ইক্ষুক্ষেত্র ছিল জনৈক মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্রাহ্মণের। ভিক্ষুরা ইক্ষুপালের নিকট জানতে পারলেন রাজগৃহ সেস্থান থেকে অর্ধযোজন দূরে। সে ভিক্ষুদিগকে রাত্রি যাপনের জন্য পর্ণকুটির তৈরি করে দিল। ভিক্ষুগণ রাত্রিযাপন করলেন। ইক্ষুপাল প্রত্যুষে খাদ্য-ভোজ্য প্রস্তুত করে ভিক্ষুদিগকে দান করল। আহারান্তে তাঁরা ইক্ষুপালকে ধর্মদেশনা করলেন। ভিক্ষুগণ প্রস্থানের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে একখানা করে ইক্ষু দান করল। ভিক্ষুগণ ইক্ষু হাতে যাবার সময় ক্ষেত্রস্বামী-ব্রাহ্মণের সঙ্গে দেখা হয়। সে ভিক্ষুদের কাছে ইক্ষুপাল কর্তৃক ইক্ষু প্রদানের বিষয় জ্ঞাত হয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে ইক্ষুপালকে মুদ্‌গর দ্বারা প্রহার করল। প্রহারে তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর ইক্ষুপাল তাবতিংস স্বর্গে সুধর্মাদেবসভায় উৎপন্ন হল। তাঁর পুণ্যবলে এক সুবৃহৎ দিব্য শ্বেতহস্তী প্রাদুর্ভূত হল। ইক্ষুপালের সৎকার করার জন্য বহু আত্মীয়বর্গ সমবেত হলে দিব্য হস্ত্যারূঢ়, অপ্সরা পরিবৃত দেবঋদ্ধিতে দেদীপ্যমান সেই দেবপুত্র পঞ্চাঙ্গিক তূর্যধ্বনিতে নিনাদিত করে দেবলোক হতে আগমন পূর্বক আকাশে সকলের নয়নপথে স্থিত হলেন।

www.pathagar.com

তাঁকে জনৈক পণ্ডিত ব্যক্তি তার পূর্ব সুকৃতি জিজ্ঞেস করলে তিনি পূর্বোক্ত জীবন-কাহিনী বিবৃত করেন।[১১৫]

চুলরথ বিমান কাহিনীটি রূপকথার ন্যায় চমৎকার ও উপভোগ্য। বুদ্ধ তথাগতের পরিনির্বাণের পর মহাকচ্চায়ন স্থবির স্বীয় শিষ্যগণ পরিবৃত হয়ে প্রত্যন্ত অঞ্চলে কোনো অরণ্যে বাস করছিলেন। সেই সময় অস্‌সক নামক রাজা অস্‌সক রাজ্যের পোতলী নগরে রাজত্ব করতেন। তাঁর অগ্রমহিষীর গর্ভে সুজাত নামক এক পুত্রের জন্ম হয়। তাঁর মাতার মৃত্যুর পর রাজা অন্য এক রাজকন্যাকে অগ্রমহিষীর পদে বরণ করেন। তাঁর গর্ভেও একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করে। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাকে বর দেবার প্রতিশ্রুতি দেন। সুজাত কুমার যখন ষোড়শবর্ষে উপনীত হন, তখন রাণী রাজার নিকট স্বীয় পুত্রকে রাজ্যাভিষিক্ত করার জন্য বর প্রার্থনা করল। রাজা সেই বর প্রদানে অস্বীকৃত হলেও রাণীর বারবার প্রার্থনা ও স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী ছোট সন্তানকে রাজ্য দিতে রাজী হলেন। রাজা সুজাত কুমারকে আহ্বান করে সমস্ত বিষয় জানালেন এবং তার মৃত্যুর পর এসে রাজ্য গ্রহণ করতে বললেন। পুত্র বললেন, "পিত, আমার রাজ্যের প্রয়োজন নেই, আমি অরণ্যে গমন করব।" পিতার কাছ থেকে বিদায় নিয়ে তিনি অরণ্যে প্রবেশ করলেন। তিনি অরণ্যে মৃগয়ায় জীবন ধারণ করতে লাগলেন। একদিন তিনি মৃগয়ায় প্রবেশ করলে এক দেবপুত্র মৃগের ছদ্মবেশে তাঁকে প্রলোভিত করলেন। মৃগরূপী দেবপুত্র ক্রমশ পলায়ন করে কচ্চায়ন স্থবিরের বাসস্থানের নিকটে অন্তর্ধান হলেন। রাজকুমার মৃগের অনুসরণ করতে গিয়ে স্থবিরের পর্ণশালায় উপস্থিত হলেন। স্থবির তাঁকে দেখে, তাঁর সমস্ত বিষয় দিব্যজ্ঞানে অবগত হলেন। তাঁর পরিচয় জেনে তাঁকে অতি সমাদরে তৃণাসনে বসতে বললেন এবং শীতল পানীয় জল পান করতে দিলেন। কুমার স্থবিরের ব্যবহারে অতীব প্রসন্ন হলেন এবং সদ্ধর্মের উপদেশ শ্রবণ করে বিমোহিত হলেন। স্থবির নানা প্রকারে উপদেশ দিয়ে বললেন, " কুমার, পাঁচ মাস পরে তোমার মৃত্যু হবে, তুমি দুঃখ থেকে মুক্তি লাভের জন্য পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর। তোমার অরণ্যবাসে প্রয়োজন নেই, তুমি পিতার নিকট অবস্থিত হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম কর যাতে তোমার স্বর্গলাভের হেতু হয়।" রাজপুত্র স্থবিরকে বন্দনান্তর স্বরাজ্যে আমন্ত্রণ করে প্রস্থান করলেন। কুমার পিতৃ-রাজ্যে উপনীত হয়ে পিতাকে সংবাদ পাঠালেন। রাজা তাঁকে আলিঙ্গন করে রাজপুরীতে যাবার জন্য বললেন এবং তাঁকে রাজ্যাভিষেকের ইচ্ছাও প্রকাশ করলেন। রাজকুমার পিতাকে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করালেন। রাজা শুনে অতিশয় দুঃখিত ও সংবিগ্ন হলেন। রাজা স্থবিরের গুণাবলী শ্রবণ করে তাঁর জন্য একখানা সুদৃশ্য বিহার নির্মাণ করালেন এবং স্থবিরকে আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করলেন। স্থবির মহাকচ্চায়ন আগমন করলে সপরিবারে রাজা ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে চতুর্প্রত্যয় দ্বারা স্থবিরের সেবা করলেন। রাজকুমারও শীলে প্রতিষ্ঠিত থেকে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে পাঁচ মাস পর দেহত্যাগ করে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হলেন। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে সপ্তরত্ন প্রতিমণ্ডিত, সপ্তযোজন প্রমাণ বিশিষ্ট একখানা দিব্যরথ উৎপন্ন হয়েছিল। বহু অপ্সরা তাঁর সেবায় নিয়োজিত রইলেন।[১১৬]

www.pathagar.com

রাজা বিম্বিসারের অকালে আম্রফল খাওয়ার ইচ্ছা উৎপন্ন হলে উদ্যান পালকে আহ্বান করে তাঁর ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। উদ্যানপাল রাজাকে কিছুদিন অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে অচিরে আম্রফল ফলানোর উদ্দেশ্যে আম্রবৃক্ষের মূলদেশ হতে মাটি অপসারিত করল। তাতে এমন সারযুক্ত মাটি ও জল দেওয়া হল যে, অল্পদিনের মধ্যে বৃক্ষ স্নিগ্ধ ও সতেজ হয়ে উঠল এবং বৃক্ষ পল্লবিত হয়ে পুষ্পিত হলে ক্রমশ বৃক্ষ ফলবান হয়ে এক বৃক্ষে সিন্দুরবর্ণ বিশিষ্ট সুমিষ্ট গন্ধযুক্ত চারটি আম্রফল পরিপক্ব হল। উদ্যানপাল সেই আম্রফল চারটি নিয়ে রাজাকে প্রদানের উদ্দেশ্যে যাবার সময় পথিমধ্যে মহামোগ্গল্লান স্থবিরকে পিণ্ডাচরণ করতে দেখে চিন্তা করল, "এই আম্রফলগুলো রাজাকে দিলে হয়ত কিছু পুরস্কার পাওয়া যাবে, কিন্তু আর্যকে দিলে ইহ-পরকালের মঙ্গল সাধিত হবে। কাজেই এগুলো আর্যকেই দান করব, রাজা আমাকে যে শাস্তিই দিন না কেন।" এরূপ চিন্তা করে উদ্যানপাল ফল চারটি স্থবিরকে দান করল। অতঃপর রাজার নিকট গিয়ে উক্ত বিষয় অবহিত করল। রাজা উদ্যানপাল কর্তৃক এরূপ পুণ্যকর্ম সম্পাদিত হওয়ায় অত্যধিক আনন্দিত হয়ে তাকে পুরস্কৃত করলেন। স্থবির ফল চারটি বুদ্ধকে প্রদান করলেন। বুদ্ধ একটি মোগ্গল্লান স্থবিরকে, একটি সারিপুত্র স্থরিবকে, একটি মহাকশ্যপ স্থবিরকে দিয়ে অপরটি স্বয়ং পরিভোগ করলেন। অনন্তর যথাসময়ে উদ্যানপালের মৃত্যুর পর দেবলোকে সপ্তশত কূটাগার প্রতিমণ্ডিত ষোড়শ যোজন বিস্তৃত কনক বিমানে উৎপন্ন হলেন। প্রত্যেক কূটাগারে আটজন শিক্ষিত, শীলাচারসম্পন্ন, রূপশালিনী, ত্রিদশালয়ে সুখবিহারীণী প্রভৃত বিভব-সম্পন্ন দেবকন্যা দিব্যবীণা মধুরস্বরে বাদ্য করত।[১১৭]

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর কুমার কশ্যপ স্থবির পাঁচশ' ভিক্ষুসহ সেতব্য নগরে সিংসপাবনে অবস্থান করছিলেন, পায়াসিরাজ স্থবিরের তথায় অবস্থান সংবাদ পেয়ে বহু পরিষদ সমভিব্যাহারে তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। তিনি ছিলেন মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন। স্থবির তাঁকে বিভিন্ন যুক্তি উপমাসহযোগে তাঁর মিথ্যা দৃষ্টি অপনোদন করলেন। রাজা সম্যক দৃষ্টিসম্পন্ন হয়ে শ্রমণ, ব্রাহ্মণ ও দরিদ্রদিগকে দান দিতে আরম্ভ করলেন। কিন্তু অনুদারতাবশত হীনভাবেই দান দিতেন- মাত্র কোনো প্রকারে জীবন ধারণে সমর্থ ক্ষুদের যাগূ, পাতাসিদ্ধ কাঞ্জি ও সামান্য বস্ত্রখণ্ড দান দিতেন। এভাবে অপ্রসন্নভাবে দান দিয়ে মরণান্তে তিনি চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে উৎপন্ন হন। অথচ রাজার কার্যকারক উত্তর নামক মানব শ্রদ্ধাসহকারে দানকার্য সম্পাদন করেছিলেন বিধায় মণরান্তে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।[১১৮] এই উপাখ্যানে শ্রদ্ধাসহযোগে দান ও গতানুগতিক শ্রদ্ধাহীনভাবে দানের মধ্যে বিপাকের তারতম্য প্রদর্শন করা হয়েছে।

বুদ্ধ তখন রাজগৃহে অবস্থান করছিলেন। এক সময় রাজগৃহবাসীর কোনো গোপালক প্রাতঃরাশের জন্য যবনির্মিত খাদ্যসহ গাভী নিয়ে মাঠে গিয়েছিল। সেই সময়ে মহামোগ্গল্লান স্থবির সেই মাঠের পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন এবং গোপালককে দেখে দিব্যদৃষ্টিতে জানতে পারলেন যে, অল্পক্ষণের মধ্যে তার মৃত্যু হবে এবং সে যদি যবখাদ্য দান করে তাহলে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হবে। স্থবির ইহা জ্ঞাত হয়ে তার সম্মুখীন হলে

www.pathagar.com

গোপালক যেইমাত্র তার যব-খাদ্য স্থবিরকে প্রদান করতে উদ্যত হল, এমন সময় দেখতে পেল গাভীগুলো মাষক্ষেত্রে প্রবেশ করছে। সে ক্ষেত্র হতে গাভী না তাড়িয়ে প্রথমে স্থবিরকে পরম শ্রদ্ধাসহযোগে যব-খাদ্য দান করল। তৎপর সে গাভীগুলোকে ক্ষেত্র থেকে বের করার জন্য দ্রুতবেগে মাঠে যাবার পথে এক বিষধর সর্প তার পায়ে আক্রান্ত হয়ে তাকে দংশন করল। গোপলক গাভীগুলো বের করে ফিরে আসল। স্থবিরকে তখন যব-খাদ্য ভোজনরত অবস্থায় দেখে সে অতীব প্রসন্ন হল। অতিশয় প্রীতি-সৌমনস্য অন্তরে সে স্থবিরের কাছে গিয়ে উপবেশন করল। তখন তার শরীর বিষে আচ্ছন্ন হল। সেমুহূর্তেই তার মৃত্যু হল। মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে দ্বাদশ যোজন বিশিষ্ট কনকবিমানে উৎপন্ন হল।[১১৯]

কন্থকের অশ্ব বোধিসত্ত্বের সহজাত। সিদ্ধার্থ গৌতম এই কন্থকের পৃষ্ঠে আরোহণ করে অভিনিষ্ক্রমণ করেছিলেন। কন্থক বোধিসত্ত্বকে পৃষ্ঠে নিয়ে রাত্রির অবশিষ্ট সময়ে তিনটি রাজ্য অতিক্রম পূর্বক প্রত্যুষে অনোমা নদীর তীরে উপনীত হয়েছিল। মহাসত্ত্ব সূর্যোদয়ের সময় ঘটিকায় নামক মহাব্রাহ্মাপ্রদত্ত পাত্র-চীবর দ্বারা প্রব্রজ্যা গ্রহণান্তর ছন্নের সাথে কন্থককে কপিলাবস্তু অভিমুখে প্রেরণ করেছিলেন। কন্থক প্রগাঢ় স্নেহপূর্ণ হৃদয়ে মহাপুরুষের শ্রীপদ্মযুগল জিহ্বায় লেহন করেছিল এবং প্রসন্নতাপূর্ণ নয়নযুগল উন্মীলন পূর্বক মহাসত্ত্বের প্রতি নিরীক্ষণ করে স্থিত হয়েছিল। সিদ্ধার্থ দর্শনপথের অতিক্রান্ত হলে কন্থকের অন্তরে প্রবল সংবেগ উৎপন্ন হয়েছিল, "এই লোকশ্রেষ্ঠ মহাপুরুষকে আমি বহন করতাম, সেই কারণে আমার এই শরীর সার্থক এবং এ জীবন সাফল্যমণ্ডিত হয়েছে।" এরূপ চিন্তা করতে করতে দীর্ঘকালের সঞ্জাত প্রেমহেতু প্রিয়-বিয়োগ দুঃখ অসহ্য হওয়ায় সেই স্থানেই কন্থকের মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর সে তাবতিংস স্বর্গে কন্থক নামক দেবপুত্র হয়ে উৎপন্ন হল। সেই দেবপুত্র বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে সদ্ধর্ম শ্রবণ করতঃ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[১২০]

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর পঞ্চশত শিষ্যসহ কুমার কশ্যপ স্থবির সেতব্য নগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানকার পায়াসিরাজ ছিলেন মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। কশ্যপস্থবির ধর্মোপদেশ দ্বারা তাঁর মিথ্যাদৃষ্টি অপনোদন করে সম্যক দৃষ্টিতে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন। তিনি তদবধি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিতেন, কিন্তু দানে তাঁর শ্রদ্ধাবল ছিল অতি ক্ষীণ। তিনি যথাকালে মৃত্যুর পর চাতুর্মহারাজিক দেবলোকের অন্তর্গত 'সেরিস্‌সক' নামক আকাশ বিমানে জন্ম পরিগ্রহ করেন।

অতীতে কশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক অর্হৎ ভিক্ষু কোনো গ্রামে পিণ্ডাচরণ করে প্রতিদিন কোনো এক নির্দিষ্ট স্থানে বসে আহার কার্য সম্পাদন করতেন। তা দেখে কোনো এক গোপালক সেই স্থানে একখানা মণ্ডপ তৈরি করে মণ্ডপ সমীপে সিরীসবৃক্ষ রোপণ করে দিয়েছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি স্বর্গাদি সুখভোগের পর গৌতমবুদ্ধের সময় জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। স্থবির দিবা বিশ্রামে চাতুর্মহারাজিক স্বর্গে গিয়ে একদা সেই পায়াসি দেবপুত্রের সাক্ষাৎ লাভ

www.pathagar.com

করেন। দেবপুত্র স্থবিরকে অবহিত করেন যে, তিনি পূর্বজন্মে শ্রদ্ধাহীনভাবে দান করায় এরূপ নিম্ন স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছেন।

সেই সময়ে মহারাজ বৈশ্রবণ সেরিস্‌সক দেবপুত্রকে মরুকান্তারের রক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন। একসময় মগধ ও অঙ্গবাসী বণিকগণ এক সহস্র শকট পণ্যদ্রব্যে পূর্ণ করে সিন্ধু ও সোবীর দেশে বাণিজ্যার্থে গমন করেছিলেন। তাঁরা মরুপ্রান্তরে উপস্থিত হয়ে উষ্ণতার দরুণ রাত্রিবেলায় মরুকান্তার পার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়ে যাত্রা করলেন। কিছুদূর যাবার পর তাঁরা পথ হারিয়ে ফেললেন, সুবিশাল বিস্তীর্ণময় কান্তারের বালুকারাশির উপর দিয়ে তাঁরা ছুটে চললেন। কোনো সঠিক পথের সন্ধান না পেয়ে তাঁরা মৃত্যুভয়ে ভীত হলেন। এমন সময় তাঁরা দেখতে পেলেন, তাঁদের সম্মুখে আকাশে মনোরম স্নিগ্ধ দিব্যপ্রভায় দেদীপ্যমান একখানা প্রাসাদ। তা দিব্য পুষ্করিণী, দিব্য নদী ও দিব্য উদ্যানে পরিবৃত থেকে অনুপম সৌন্দর্যের সৃষ্টি করেছে, সেই প্রাসাদে এক দেবপুত্র। বণিকদের মধ্যে এক শ্রদ্ধাবান উপাসক ছিলেন। তাঁর প্রতি অনুগ্রহ করেই সেরিস্‌সক দেবপুত্র তাঁদের রক্ষা করার জন্য দর্শন দিলেন। তিনি তাঁর বিমানে করে সেই শকটসহ বণিকদের সিন্ধু-সোবীর নগরে পৌঁছে দিলেন। তাঁরা বিপুল পরিমাণ অর্থ প্রাপ্ত হয়ে স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেছিলেন। তাঁরা সেরিস্‌সক দেবপুত্রের নামে একখানা বিহার নির্মাণ করে দান করেছিলেন।[১২১]

বিমানবত্থুর কাহিনীগুলো পাঠক ও শ্রোতাদের অন্তরে এক প্রশান্তি উদ্রেক করে, যদিও কাহিনীগুলো অতীন্দ্রিয়লোকের ভাব-পরিবেশ মিশ্রিত। মূলত উপাখ্যানাকারে পরিবেশিত হলেও প্রতিটি কাহিনীর মুখ্য লক্ষ্য সাধারণের মনে সৎকর্ম অনুশীলনের প্রবৃত্তি জাগানো। এদিক থেকে প্রতিটি কাহিনী সার্থক।

থেরগাথা

থেরগাথা[১২২] বুদ্ধের সময়কালে প্রখ্যাত স্থবিরদের বিবৃত গাথা বা কবিতা সংকলন বিশেষ। এর অট্‌ঠকাথার নাম পরমত্থদীপনী।[১২৩] গাথাগুলোতে তৎকালীন স্থবিরদের বৈচিত্র্যময় জীবন এবং প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধ জ্ঞানময় বাণী বিধৃত হয়েছে। থেরগাথায় ২৬৪ স্থবিরদের সংক্ষিপ্ত জীবন ও বাণী সংকলিত হয়েছে। তাঁদের মধ্যে কয়েকজন স্থবিরের জীবন-কাহিনী অতি চমৎকার এবং রূপকথার মতো উপভোগ্য।

সানু স্থবির[১২৪] গৌতম বুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর এক উপাসককুলে জন্মগ্রহণ করেন। বয়স যখন মাত্র সাত বছর তখন তাঁর মাতা তাঁকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন। তিনি জ্ঞানবান, সদাচার সম্পন্ন, বহুশ্রুত, ধর্মকথিক, সত্ত্বগণের হিতকামী দেবমনুষ্যদের প্রিয় সানু শ্রামণ নামে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর অতীত জন্মের মাতা যক্ষযোনিতে জন্মগ্রহণ করেছিল, তাকেও যক্ষগণ সানু শ্রামণের মাতা বলে গৌরব করত। একসময় সানু শ্রামণের চিত্ত চীবর ত্যাগের জন্য উৎকণ্ঠিত হলে তাঁর যক্ষিণীমাতা মনুষ্যমাতাকে বলল, "তুমি তাঁকে বল 'সানু, তুমি বুদ্ধকে বর্জন করবে না, এটা তোমার যক্ষিণী মাতার উপদেশ। যদি তুমি

www.pathagar.com

পাপকর্ম কর ভবিষ্যতে দুঃখ থেকে মুক্ত হতে পারবে না।" মনুষ্য মাতা তার কথা শুনে রোদন করতে লাগলেন। শ্রামণ পূর্বাহ্নে মাতার নিকট এসে রোরুদ্যমান মাতাকে দেখতে পেলেন। তিনি জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে, তাঁর মাতা তাঁর জন্যই রোদন করছেন। মাতা তাঁকে চীবর ত্যাগ না করে শ্রামণ্যধর্ম রক্ষা করার উপদেশ প্রদান করলে তিনি সাধনায় আত্মনিয়োগ করেন এবং অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন।

ভদ্দজি স্থবিরের[১২৫] অলৌকিক ক্ষমতা বর্ণিত হয়েছে তাঁর জীবনগাথায়। তিনি ৮০ কোটি বিভবসম্পন্ন ভদ্দিয় শ্রেষ্ঠীর পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। অতি অল্প বয়সে তিনি কোনো ধর্ম সভায় উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের উপদেশ শ্রবণ করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং যথাসময়ে উপসম্পদা গ্রহণ করেন। একদিন ভদ্দজি স্থবির গ্রামের অদূরে গঙ্গাতীরে রাস্তার সমীপে ধ্যানস্থ হয়ে সংকল্প করলেন যে, ভগবান বুদ্ধ আগমন করলে তিনি ধ্যান ভঙ্গ করবেন। মহাস্থবিরগণ আসলেও তিনি আসন হতে উঠলেন না, বুদ্ধ আসলেই উত্থিত হলেন। সাধারণ ভিক্ষুরা অভিযোগ করলেন যে, "ইনি নব প্রব্রজিত হয়েও অহংকারবশত মহাস্থবির দেখলেও সম্মান প্রদর্শন করেন না।" বুদ্ধ তাঁর প্রতিভা প্রকাশ করার জন্য ভদ্দজি স্থবির ও অন্যান্য ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ গঙ্গানদীতে প্রজ্ঞাপ্ত নৌকায় আরোহন করলেন। বুদ্ধ বললেন, "দেখ, ভদ্দজি, যখন তুমি মহাপণাদ রাজা হয়ে রত্নময় প্রাসাদে অবস্থান করতে, এখন তোমার সেই প্রাসাদ কোথায় ?" "ভন্তে, এই স্থানে নিমগ্ন আছে।" "তাহলে ব্রহ্মচারীদের সন্দেহ দূর কর।" তখনই স্থবির বুদ্ধকে বন্দনা করে ঋদ্ধিবলে প্রাসাদের চূড়ায় পদাঙ্গুলি প্রবেশ করিয়ে আকর্ষণ করতে লাগলেন। তিনি ২৫ যোজন প্রাসাদ নিয়ে জল হতে ৫০ যোজন ঊর্ধ্বে আকাশে অন্তর্হিত হলেন। পূর্বজন্মে তাঁর যেই সমস্ত জ্ঞাতি প্রাসাদলোভে মৎস্য-কচ্ছপ-মণ্ডুক হয়ে সেখানে জন্ম নিয়েছিল, প্রাসাদ জল হতে উঠানোর সময় সবাই জলে পতিত হয়েছিল। বুদ্ধ বললেন, "ভদ্দজি, তোমার জ্ঞাতিবর্গের ভীষণ কষ্ট হচ্ছে।" স্থবির প্রাসাদ ছেড়ে দিলেন, প্রাসাদ যথাস্থানে পূর্ববৎ নিমজ্জিত হল। সমবেত ভিক্ষুগণ বুঝতে পারলেন ভদ্দজি বয়সে নবীন হলেও সাধনায় প্রবীণ।

মিগসির স্থবির[১২৬] প্রথম জীবনে ব্রাহ্মণ্য শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করেন। তিনি মৃতশির বিদ্যায় এমন পারদর্শী ছিলেন যে, তিন বছরের পুরাতন মৃতমস্তকে নখাঘাত করে বলতে পারতেন তার জন্মস্থান কোথায় বা কোন স্থানে কিরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। একদিন তিনি শ্রাবস্তীতে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে স্বীয় দক্ষতার বিষয় বললে বুদ্ধ কোনো এক পরিনির্বাণ প্রাপ্ত ভিক্ষুর শির প্রদান করে বললেন, "বল দেখি এই মৃত মস্তকের কি পরিণাম ?" তিনি কপোলমন্ত্র জপ করে নখাঘাত করলেও দেখতে সমর্থ হলেন না। তিনি বারবার পরীক্ষা করেও ব্যর্থ হলেন। তখন তিনি লজ্জায় অধোবদন হয়ে রইলেন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, "এর গতি আপনি জানেন কি ?" বুদ্ধ বললেন, "হ্যাঁ, জানি। এর চেয়ে অধিক জানি। এটা একটা নির্বাণপ্রাপ্ত ভিক্ষুর মস্তক।" মিগসির সেই মন্ত্র শিক্ষা দেওয়ার জন্য অনুরোধ করলে বুদ্ধ তাঁকে প্রব্রজ্যা প্রদান করেন এবং সাধনা করে অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। এটা অতিভৌতিক কাহিনীর পর্যায়ভুক্ত।

www.pathagar.com

যশোজ স্থবিরের[১২৭] জীবন কথার সঙ্গে একটি চমৎকার ঘটনা সম্পৃক্ত। গৌতম বুদ্ধের সময়কালে তিনি শ্রাবস্তীনগরে এক কৈবর্তপ্রধানের পুত্র রূপে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি সমগোত্রীয় কৈবর্তদের সঙ্গে অচিরাবতী নদীতে জাল নিক্ষেপ করেছিলেন। সেই জালে একটি সুবর্ণ মৎস্য ধরা পড়ে। সকলে মৎস্যটি বুদ্ধকে দেখাল। বুদ্ধ বললেন, "এই মৎস্য কশ্যপবুদ্ধের শাসনের পরিহীন সময়ে প্রব্রজিত হয়। সে মিথ্যাচার দোষে শাসনের অবনিত সাধন করে, মৃত্যুর পর সে নরকে জন্মগ্রহণ করে। এক বুদ্ধান্তর পর সে অচিরাবতী নদীতে মৎস্যরূপে জন্মগ্রহণ করেছে। তার একজন ভ্রাতা নির্বাণ লাভ করেছে।" বুদ্ধ এসব বিবরণ ঋদ্ধি শক্তিদ্বারা মৎস্যের মুখে বলালেন। যশোজ এসব শুনে অতিশয় ব্যথিত হলেন এবং সহকর্মীসহ বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি 'আনেঞ্জ সমাপত্তি' ধ্যান অনুশীলন করে অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন।

সাটিমত্তিয় স্থবিরের[১২৮] জীবন কাহিনী কল্পকথার ন্যায় অপূর্ব। মগধরাজ্যে তাঁর জন্ম। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি অরণ্যবাসী ভিক্ষুর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ষড়াভিজ্ঞ হন। তিনি ধর্মোপদেশের মাধ্যমে জনসাধারণের অতি প্রিয়ভাজন হন। স্থবির পিণ্ডার্থ গ্রামে প্রবেশ করলে এক পরমা সুন্দরী বালিকা খাদ্য-ভোজ্য পরিবেশন করে। মার স্থবিরের অখ্যাতি প্রকাশের জন্য একদিন স্থবিরের রূপ ধারণ করে উক্ত বালিকার হাত ধরেছিল। বালিকা স্পর্শমাত্রই বুঝতে পারল যে, "এটা মনুষ্যের হাত নয়।" সে তখনই হাত সরিয়ে নিল। এ ঘটনা দেখে সাধারণ মানুষ স্থবিরের উপর রুষ্ট হল। পরদিন সেই বিষয় চিন্তা না করেই তিনি পুনরায় সেই গৃহে প্রবেশ করেন। তখন কেউ তাঁকে পূর্বের ন্যায় সমাদর করল না। স্থবির মারের দুষ্ট অভিপ্রায় অন্তর্দৃষ্টি দ্বারা বুঝতে পারলেন এবং অধিষ্ঠান করলেন, "মারের গ্রীবায় কুকুরের মৃতদেহ লেগে থাকুক।" মার সেই কুকুরের গ্রীবা ছাড়াবার জন্য গৃহস্থদের নিকট উপস্থিত হয়ে পূর্বদিনের ঘটনা প্রকাশ করল। গৃহস্বামী স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করে যথারীতি পরিচর্যা করতে লাগল।

সুমন স্থবির[১২৯] মাত্র সপ্তমবর্ষ বয়সে আয়ুষ্মান অনুরুদ্ধ স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি অল্প বয়সেই অসীম ঋদ্ধি শক্তির অধিকারী ছিলেন। একদিন সুমন শ্রামণ জল আনয়ন করার জন্য ঘট নিয়ে অনবতপ্ত হ্রদে গমন করেছিলেন। সেখানে এক মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন নাগরাজ ঋদ্ধিবলে অনবতপ্ত হ্রদকে সাতবার বেষ্টন করে হ্রদের উপরিভাগে বৃহৎ ফণা বিস্তার করে শ্রামণকে জল গ্রহণে অবকাশ দিচ্ছিল না। সুমন গরুড়রূপ ধারণ করে নাগরাজকে পারাস্ত করেন এবং জল নিয়ে আকাশ পথে আসতে লাগলেন।[১৩০] বুদ্ধ তাঁর শক্তি দর্শন করে প্রশংসা করলেন।

সুন্দর স্থবিরের[১৩১] জীবন কাহিনী বড়ই উপভোগ্য। অনুরূপ কাহিনী ধম্মপদটঠকথায়ও দৃষ্ট হয়।[১৩২] এ কাহিনীতে সুন্দরী গণিকার পরাজয় এবং সুন্দর স্থবিরের জয়ের বিষয় লক্ষ্য করা যায়। গণিকা শত চেষ্টা করেও স্থবিরকে তাঁর সিদ্ধান্ত অর্থাৎ ব্রহ্মচর্য থেকে টলাতে পারে নি।

www.pathagar.com

সোপাক স্থবিরের[১৩৩] জীবন কাহিনী একটি চমৎকার উপাখ্যান। তিনি কোনো বণিককুলে জন্মগ্রহণ করেন। জন্মের চার মাস পরেই তাঁর পিতা মৃত্যুবরণ করেন। তখন তাঁর খুল্লতাত তাঁকে লালনপালন করত। তাঁর সাত বছর বয়সকালে খুল্লতাত স্বীয় পুত্রের সঙ্গে তাকে বিবাদ করতে দেখে অতিশয় রুষ্ট হয়ে তাকে শ্মশানে নিয়ে হাত দুখানি বেঁধে ফেলে এবং মৃতদেহের সঙ্গে দৃঢ়ভাবে বেঁধে শৃগাল-কুকুরে খাওয়ার জন্য ফেলে রাখাল বালক ছিল পুণ্যবান, তাই তাকে কেহ মারতে পারল না। গভীর রাত্রে করুণাঘন বুদ্ধ অর্ন্তদৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন যে, সোপাক বালক শ্মশানে উক্তরূপ দুঃখ ভোগ করছে। তিনি সোপাকের অর্হত্ত্ব প্রাপ্তির হেতু পর্যবেক্ষণ করে তাঁর দেহ থেকে একটি আলোক সম্পাত করলেন এবং স্মৃতি উৎপাদন করে বললেন, "সোপাক, এস ভয় করো না, তথাগতকে দর্শন কর। রাহুমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় তোমাকে ত্রাণ করব।" বুদ্ধ প্রভাবে বালকের বন্ধন ছিন্ন হয়ে গেল এবং বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। অতঃপর বুদ্ধের সঙ্গে গন্ধকুটিরে চলে গেলেন। এদিকে তাঁর মাতা গৃহে তাঁকে না দেখে খোঁজাখুজি করে অবশেষে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ ঋদ্ধি শক্তি দ্বারা তাঁকে লুকিয়ে রেখে ধর্মদেশনা করলেন। ধর্ম শুনে মাতা স্রোতাপত্তি ও বালক অর্হত্ত্বফল লাভ করলেন। অনন্তর ঋদ্ধি ছেড়ে দিলেন। মাতা পুত্রকে দেখে অতিশয় আনন্দিত হলেন। অবশেষে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।

একবিহারী তিষ্য[১৩৪] মৃগয়ায় গিয়ে অরণ্যে দেখতে পেলেন যে, মহাধর্মরক্ষিত স্থবিরকে এক বন্যহস্তী শালশাখা দ্বারা ব্যজন করছে। তিনি দেখে অতিশয় প্রসন্ন হলেন এবং প্রব্রজিত হয়ে স্থবিরের ন্যায় অরণ্যে বাস করার ইচ্ছা পোষণ করলেন। স্থবির তাঁর মনোভাব জ্ঞাত হয়ে তিনি দেখেন মত আকাশপথে অশোকারামে উপস্থিত হয়ে পুষ্করিণীর জলের উপর বসে স্নান করতে লাগলেন এবং উত্তরাসঙ্গ চীবর খানি আকাশে ঝুলিয়ে রাখলেন। বিহারীতিষ্য তাঁর অলৌকিক শক্তি দেখে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং অচিরে অর্হত্ত্বফর লাভ করলেন।

চূলপন্থকের[১৩৫] জীবন কাাহিনী রূপকথার মতো চমকপ্রদ। তাঁর অগ্রজ মহাপন্থক তাঁকে প্রব্রজ্যা দান করে একটি গাথা মুখস্ত করতে দিয়েছিলেন। কিন্তু তিনি চার মাসেও উহা আয়ত্ত্ব করতে না পারায় অগ্রজ ভৎর্সনা করে তাঁকে বহিষ্কার করে দিলেন। চূলপন্থক এতে অতীব দুঃখিত হয়ে দরজার কাছে গিয়ে কান্না করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে জীবক পাঁচশজন ভিক্ষুকে স্বীয় গৃহে নিমন্ত্রণ করেন। নিমন্ত্রণ গ্রহীতা ছিলেন মহাপন্থক স্থবির। তিনি চূলপন্থককে বাদ দিয়ে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করেন। এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে তিনি আরও বেশি ব্যথিত হলেন, বুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে এ ঘটনা অবগত হয়ে তাঁর সম্মুখে উপস্থিত হয়ে জিজ্ঞেস করে সমস্ত বিষয় অবহিত হলেন এবং বললেন, "পন্থক, তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমার শাসনেই তোমার প্রব্রজ্যা। এদিকে এস, দেখ এই বস্ত্রখণ্ড মর্দন করে 'রাজঃহরণ রজঃহরণ' শব্দে মনোনিবেশ করো।" তিনি বুদ্ধের উপদেশমত বস্ত্রখণ্ড মর্দন করতে লাগলেন। কিছুক্ষণ পরে দু'হস্তের সংঘর্ষণে বস্ত্রখণ্ড অতিশয় মলিন হল। তিনি

www.pathagar.com

এতে মনোনিবেশ করে বিদর্শন বর্ধিত করলেন এবং অর্হত্ত্বে উন্নীত হলেন। সঙ্গে সঙ্গে ত্রিপিটক শাস্ত্রে তাঁর অসাধারণ জ্ঞান উৎপন্ন হল। এদিকে বুদ্ধ ৪৯৯ জন ভিক্ষু নিয়ে জীবকের গৃহে ভোজনার্থ উপস্থিত হলেন। কিন্তু চূলপন্থক সেখানে উপস্থিত ছিলেন না। জীবক খাদ্য পরিবেশন করতে চাইলে বুদ্ধ হাত দ্বারা পাত্র ঢেকে রাখলেন এবং বললেন, "বিহারে একজন ভিক্ষু আছে, তাকে আহ্বান করে আন।" সেই সময় চূলপন্থক নিজের আকৃতিমত এক সহস্র ভিক্ষু ঋদ্ধিবলে নির্মাণ করে বসেছিলেন। প্রেরিত লোকটি গিয়ে বহু ভিক্ষু দেখে ফিরে গিয়ে বুদ্ধকে জানালে বুদ্ধ বলেলেন, "বিহারে যে ভিক্ষু আছে তাঁর নাম চূলপন্থক।" সে পুনঃবিহারে গিয়ে "চুলপন্থক কে ?" জিজ্ঞেস করলে সহস্র কণ্ঠে বলে উঠল, "আমি চূলপন্থক, আমি চূলপন্থক।" দূত আবার ফিরে গিয়ে বুদ্ধকে অবহিত করলে বুদ্ধ বললেন, "যে প্রথম বলবে 'আমি চূলপন্থক' তুমি তাঁকে বলবে, "শাস্তা আপনাকে আহ্বান করছেন।" এই বলে তাঁর চীবরের কোণায় ধরবে।" দূত বিহারে গিয়ে তাই করল। তখনই নির্মিত ভিক্ষুরা অন্তর্হিত হল। চূলপন্থক জীবকের গৃহে গিয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের সাথে খাদ্য গ্রহণ করলেন। এখানে চুলপন্থকের জীবনের ঘটনাবলী অলৌকিকভাবে বিবৃত এবং সাধারণের কাছে কল্পকথার মত উপভোগ্য।

চম্পানগরের উসভশ্রেষ্ঠীর পুত্র সোণ বা স্বর্ণকুমার।[১৩৬] বিপুল বিভবের অধিকারী সোণকুমার অতিশয় সুখে বর্ধিত হতে লাগলেন। তাঁর হস্ত-পদতল শতধূনিত কার্পাসের ন্যায় সুকোমল। তাঁর তিনটি সুরম্য প্রাসাদ ছিল ত্রিঋতুতে ব্যবহারের জন্য। তিনি তখন যৌবনপ্রাপ্ত। রাজা বিম্বিসার মগধের অধিপতি। গৌতমবুদ্ধ ধর্মচক্র প্রবর্তন করে রাজগৃহে পৌঁছলে রাজা ৮০ হাজার গ্রামবাসীকে ধর্ম শ্রবণের জন্য আহ্বান করলেন। সোণ কুমার সেই সমাগমে উপস্থিত কয়ে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তিনি কর্মস্থান গ্রহণ করে নির্জন বনে সাধনায় রত হলেন। চংক্রমণ করতে করতে তাঁর কোমল পদতলে ফোস্কা পড়ল, সেদিকে তাঁর লক্ষ্য নেই। দৃঢ়বীর্যসহকারে ধ্যানে তন্ময় হয়েও যখন কৃতকার্য হতে সক্ষম হলেন না, তখন তিনি ব্রহ্মচর্য ত্যাগ করার মনস্থ করেন। বুদ্ধ অর্ন্তদৃষ্টিতে জ্ঞাত হয়ে তাঁকে উপদেশ দিলেন। উপদেশ শুনে তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে অচিরে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হলেন।[১৩৭]

আয়ুস্মান সারিপুত্র স্থবির[১৩৮] বৌদ্ধ সাহিত্যে বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব। তিনি বুদ্ধশাসনরূপ সাম্রাজ্যের ধর্মসেনাপতি নামে অভিহিত। তাঁর জীবনের বহুবিধ ঘটনাবলীর মধ্যে অন্তিম জীবনের কিঞ্চিৎদংশ এখানে উপস্থাপন করা হল। সারিপুত্র স্থবিরের নির্বাণযাত্রার সময় উপস্থিত। তিনি তাঁর পঞ্চশত শিষ্যকে নালক গ্রামে তাঁর অনুগমন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। শিষ্যগণ প্রস্তুত হলেন। তিনি সশিষ্যে জেতবনে গন্ধকুটীরে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধের নিকট চিরবিদায় প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ বললেন, "সারিপুত্র, তোমার কনিষ্ঠ ভ্রাতাগণের পক্ষে তোমার ন্যায় ভিক্ষুর দর্শন দুর্লভ হবে। তোমার এই অন্তিম সময়ে তাদেরকে একবার ধর্মোপদেশ প্রদান কর।"

www.pathagar.com

স্থবির ভাবলেন, "বুদ্ধ নিশ্চয়ই আমার সঋদ্ধি ধর্মোপদেশ আকাঙ্ক্ষা করেন।" তিনি বুদ্ধকে বন্দনা করে তালবৃক্ষ প্রমাণ আকাশে উত্থিত হলেন। পুনরায় অবতরণ করে সুগতচরণ বন্দনা করলেন। এভাবে সপ্ত তালবৃক্ষ প্রমাণ আকাশে উঠে বিবিধ ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন এবং ধর্মোপদেশ দিলেন। অনন্তর বুদ্ধকে বন্দনা করে শেষ বিদায় গ্রহণ করে সশিষ্য নালক গ্রামের উদ্দেশ্য যাত্রা করলেন। পথে সাত দিন যাবৎ ধর্মোপদেশ দিতে দিতে সপ্তম দিনে নালক গ্রামে উপস্থিত হয়ে এক বটবৃক্ষের নীচে উপবেশন করে বিশ্রাম করছিলেন। সেই সময়ে স্থবিরের ভাগিনেয় উপরেবত সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁকে বললেন, "তোমার মাতামহীকে (সারিপুত্র স্থবিরের মাতা) বলবে, "আজ সশিষ্য এখানে অবস্থান করব, তিনি যেন আমি যে কক্ষে ভূমিষ্ঠ হয়েছিলাম সেই কক্ষটি পরিষ্কার এবং ভিক্ষুদের অবস্থানের জন্য আবাসের ব্যবস্থা করেন।" যথানুরূপ ব্যবস্থা গৃহীত হলে স্থবির সশিষ্য প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। ভিক্ষুদিগকে নিজ নিজ বাসস্থানে অবস্থান করার আদেশ দিয়ে স্থবির ভূমিষ্ঠগৃহে প্রবেশ করলেন। সেখানে প্রবেশ করার পর পরই স্থবির রক্তাতিসার রোগে আক্রান্ত হলেন। রোগের যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগলেন। মাতা সারিব্রাহ্মণী দরজায় দাঁড়িয়ে রইলেন। ইত্যবসরে চারিলোকপাল দেবগণ, দেবরাজ ইন্দ্র, স্বর্গের অন্যান্য দেবগণ ও মহাব্রহ্মা সকলে একে একে উপস্থিত হয়ে সারিপুত্রকে বন্দনা করে সেবা করার দায়িত্ব নিতে চাইলেন। স্থবির সবাইকে বিদায় করে দিলেন। তাঁর মাতা এসব দেখে বিস্মিত হলেন। জিজ্ঞেস করলেন, "এঁরা কারা?" সারিপুত্র বললেন, "এরা সকলেই চারিলোকপাল দেবতা, দ্বিতীয় যামে দেবরাজ ইন্দ্র এবং শেষে মহাব্রহ্মা এসেছিল। এরা সকলেই আমাদের আজ্ঞাবহ।" ব্রাহ্মণী বুদ্ধ এবং বুদ্ধের ধর্মের মহত্ত্ব উপলব্ধি করতে পারলেন। তিনি ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করলেন এবং স্থবিরের ধর্ম শুনে স্রোতাপত্তিফলে উন্নীত হলেন। অন্তিম সময়ে সারিপুত্রের এরূপ অলৌকিক প্রভাব দর্শন করে তাঁর মাতা অভিভূত হয়েছিলেন এবং সাধারণ জনগণ বিস্মিত হয়েছিলেন।

এখানে কাহিনীগুলো মূলত জীবন ভিত্তিক হলেও আখ্যান পর্যায়ভুক্ত। বহু কাহিনী পাঠকের মনকে এক অতীন্দ্রিয় লোকে নিয়ে যায়। তাই কোনো কোনো জীবনী উপাখ্যানের ন্যায় হৃদয়গ্রাহী।

থেরীগথা

থেরীগাথা[১৩৯] বৌদ্ধ ভিক্ষুণীদের আত্মজীবনীমূলক কাব্য। পঞ্চম শতাব্দীতে দাক্ষিণাত্যের কাঞ্চি পুরাধিবাসী ভিক্ষু ধর্মপাল কর্তৃক থেরীগাথার টীকা 'পরমত্থদীপনী' রচিত হয়। অন্যান্য বৌদ্ধ গ্রন্থের ন্যায় থেরীগাথার মূল বিষয়বস্তু অনিত্য, দুঃখ, অনাত্ম, কর্ম, কর্মের বিপাক, নির্বাণ ইত্যাদি। আমাদের প্রধান আলোচ্য বিষয় উপাখ্যান বা রূপকথা। থেরীগাথায় এমন কিছু জীবন-কাহিনী রয়েছে যেগুলো উপাখ্যানের পর্যায়ভুক্ত। এখানে কয়েকজন থেরীর জীবনোপাখ্যান উপস্থাপন করা হল ঃ

www.pathagar.com

শ্রাবস্তীর কোনো দরিদ্র পরিবারে কিসা গৌতমীর[১৪০] জন্ম। বিবাহিত জীবনে তিনি অনাদৃতা ছিলেন। তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তিনি সকলের সমাদর প্রাপ্ত হন। পুত্রটি যখন হাঁটতে শিখল তখন তার মৃত্যু হল। মাতা শোকে উদ্ভ্রান্ত হলেন। উন্মাদিনী প্রায় কিসা গৌতমী মৃতসন্তান বক্ষে নিয়ে দ্বারে দ্বারে গিয়ে বলতে লাগলেন, "সন্তানের জন্য ওষুধ দাও।" নগরবাসী ঘৃণাভরে প্রত্যাখ্যান করতে লাগল। অবশেষে এক ব্যক্তি আর্ত নারীর বেদনা বুঝে তাকে মহামানব বুদ্ধের নিকট গিয়ে ওষুধ প্রার্থনা করতে উপদেশ দিলেন। কিসা শ্রাবস্তীর জেতবনে গিয়ে বুদ্ধকে বললেন, "প্রভু, আমার সন্তানের জন্য ঔষধ দিন।" বুদ্ধ তাঁর উচ্চতর জীবনের যোগ্যতা উপলব্ধি করে বললেন, "কিসা, নগরে গমন করে এমন একটি গৃহ থেকে কিছু সর্ষবীজ নিয়ে এসো যে গৃহে কোনো মানুষের মৃত্যু হয়নি।" কিসা নগরে গিয়ে গৃহ হতে গৃহান্তরে সর্ষবীজ ভিক্ষা করে জিজ্ঞেস করলেন, এ গৃহে কোনো মানুষের মৃত্যু হয়েছি কিনা। কিন্তু সব গৃহে একই উত্তর, "এ গৃহে কত কত মৃত্যু হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই।" অবশেষে কিসা বুঝলেন যে, কোনো গৃহই মৃত্যুর করাল গ্রাস থেকে মুক্ত নয়। তিনি উপলব্ধি করতে সক্ষম হলেন, জন্ম হলেই মৃত্যু অনিবার্য। অনন্তর নগর ত্যাগ করে তিনি শ্মশানে গিয়ে সন্তানের সৎকার করে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। বললেন, "প্রভু, আর সর্ষবীজের প্রয়োজন নেই। আমায় দীক্ষা দান করুন।" বুদ্ধ কিসা গৌতমীকে উপদেশ দান করলেন। উপদেশ শুনে তিনি স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হলেন।[১৪১] কিসা এক নবতর জীবন লাভ করলেন।

বঙ্কহার প্রদেশের কোনো ব্যাধপল্লীর প্রধানের কন্যা ও উপক নামক তপস্বীর প্রণয়কাহিনী অতি চমৎকারভাবে পরিবেশিত হয়েছে। ব্যাধকন্যার নাম চাপা।[১৪২] তপস্বী প্রতিদিন চাপাদের গৃহে ভিক্ষার্থ আগমন করতেন। ব্যাধ একসময় কন্যাকে তপস্বীর সেবার ভার অর্পণ করে দূরদেশে শিকারে গিয়েছিলেন। তাপস ভিক্ষা করতে গিয়ে রূপসী চাপার রূপে মুগ্ধ হন এবং চাপাকে জীবন সঙ্গীরূপে না পেলে প্রাণত্যাগ করবেন- এই মর্মে অনশন শুরু করেন। ব্যাধ সপ্তম দিবসে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে জানতে পারলেন যে, তপস্বী প্রথম দিনের পর আর ভিক্ষার জন্য আগমন করেননি। ব্যাধ উপকের নিকট গিয়ে দেখলেন, তিনি শয্যাশায়ী। তপস্বী তাঁর অভিপ্রায় ব্যাধকে জানালেন। তাপস কোনো শিল্প বিদ্যা জানতেন না। ব্যাধ তাঁতে মৃগয়া শিল্প শিক্ষা দিয়ে স্বীয় কন্যা চাপাকে সম্প্রদান করলেন। তপস্বী সংসারী হলেন। কিছুদিন পর তাদের একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করল। তার নাম রাখা হল সুভদ্র। শিশু ক্রন্দন করলে তাকে শান্ত করার জন্য চাপা স্বামীকে উপহাস করে সুরে গাইতেন, "উপকের পুত্র, তপস্বীর পুত্র, ব্যাধের পুত্র শান্ত হও, শান্ত হও।" স্ত্রীর উপহাস উপক সহ্য করতে না পেরে একদিন ক্রোধান্বিত হয়ে গৃহত্যাগের জন্য প্রস্তুত হলেন। চাপা তাঁকে নিবৃত্ত করার বৃথা চেষ্টা করলেন। উপক শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে বন্দনান্তর দীক্ষা গ্রহণ করে কর্মস্থান গ্রহণ করলেন। এদিকে স্বামীর গৃহত্যাগে ব্যথিত হয়ে চাপা পুত্রকে মাতামহের হাতে সমর্পণ করে উপকের অনুগামী হয়ে শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হলেন এবং প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হন।

www.pathagar.com

তরুণী শুভা[১৪৩] দিব্য দেহকান্তির অধিকারিণী। রাজগৃহের এক ব্রাহ্মণ পরিবারে তাঁর জন্ম। নবীন বয়সে তিনি বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাবতী হয়ে শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। পরবর্তী সময়ে তিনি সংসারের অনিত্যতা উপলব্ধি করে মহাপ্রজাপতি গোতমীর নিকট অভিষিক্ত হন এবং ধ্যান অনুশীলন করে অচিরে অনাগামীত্ব প্রাপ্ত হন। একদিন রাজগৃহ নগরের এক দুষ্ট চরিত্রের যুবক জীবকের আম্রকুঞ্জে দাঁড়িয়েছিল। সেসময় শুভা বিশ্রামের জন্য জীবকারামে যাচ্ছিলেন। উক্ত যুবক তাঁর পথরুদ্ধ করে প্রেম নিবেদন করে বলল, "তোমার চোখ দুটি অপরূপ।" শুভা তাঁর একটি চোখ উৎপাটন করে যুবককে আহ্বান করে বললেন, "এই নাও, যে চোখ তোমার কাছে অপরূপ, আমার পক্ষে ক্ষতিকারক।" যুবক তার অপরাধের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করল। শুভা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে সমস্ত বিষয় জানালেন। বুদ্ধের অনুগ্রহে তাঁর চোখ ভাল হল। তিনি কর্মস্থান গ্রহণ করে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হলেন।

ইসিদাসী[১৪৪] উজ্জয়িনী নগরের এক ধনাঢ্য বণিকের কন্যা, কিন্তু তাঁর জীবন ছিল দুর্বিসহ। পরিণত বয়সে সাকেত নগরের এক শ্রেষ্ঠী-পুত্রের সঙ্গে তার বিয়ে হয়। ইসদাসী শ্বশুর-শাশুড়ী ও স্বামীকে সেবা করতেন। তিনি নিজ হাতে পরিচরিকার ন্যায় গৃহের সমস্ত কাজ সম্পাদন করতেন। কিন্তু এরূপ সতী-সাধ্বী স্ত্রীর প্রতি স্বামী বিমুখ হলেন, তিনি স্ত্রীর সঙ্গে একত্রে বাস করতে অস্বীকৃতি প্রকাশ করলেন। অবশেষে তাঁকে স্বামীগৃহ ত্যাগ করে পিত্রালয়ে চলে আসতে হল। মাতা-পিতা তাঁকে পুনরায় এক ভিক্ষাজীবীর সঙ্গে বিয়ে দেন। বিয়ের মাত্র পনের দিন পর সেই স্বামীও ইসিদাসীকে ত্যাগ করে চলে যায়। অতঃপর তিনি জিনদত্তা থেরীর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ভিক্ষুণীসঙ্ঘে প্রবেশ করলেন এবং সাধনা দ্বারা অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করলেন। ইসিদাসী বিপুল বিভবের অধিকারী হয়েও সংসার জীবনে বিন্দুমাত্র শান্তি পাননি, বরং সমস্ত বিভব পরিত্যাগ করেই পরম সুখ ও শান্তি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। তিনি তাঁর অতীত জীবন কাহিনী বলতে গিয়ে প্রকাশ করলেন যে, কোনো জন্মে ধনশালী সুবর্ণকাররূপে জন্মগ্রহণ করে তিনি যৌবনে একবার পরদার লঙ্ঘন করেন। সেই পাপের ফলে তিনি বহুকাল নিরয়ে দগ্ধ হয়েছিলেন। তির্যক যোনিতে জন্মগ্রহণ করে মুষ্কছিন্ন ও কৃমি দষ্ট হয়ে বহু জন্ম অতিবাহিত করেন। এই জন্মেও স্ত্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে শান্তি বর্জিত হন। এসবই তাঁর অতীত জন্মের পরদার গমনের ফল।

ভদ্রাকুণ্ডলকশা[১৪৫] রাজগৃহ নগরে কোষাধ্যক্ষের বংশে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে একদিন তিনি দেখলেন যে, নগররক্ষী রাজার আদেশক্রমে রাজপুরোহিতের পুত্র সত্থুকে দস্যুতার অপরাধে হত্যা করার জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছে। অপরাধীর প্রতি প্রেমাকৃষ্ট হয়ে তিনি শয্যা গ্রহণ করে বললেন, "তাকে পেলে জীবন ধারণ করব, নচেৎ মৃত্যু বরণ করব।" পিতা কন্যার প্রতি স্নেহপরবশ হয়ে রক্ষীকে প্রচুর উৎকোচ প্রদান পূর্বক অপরাধীকে মুক্ত করলেন এবং স্বীয় কন্যার ইচ্ছানুযায়ী উভয়কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করালেন। মূল্যবান রত্নালংকারে বিভূষিতা ভদ্রাকে একদিন সত্থু বলল, "ভদ্রা, নগররক্ষী

www.pathagar.com

যখন আমাকে শৈলশৃঙ্গে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাচ্ছিল তখন আমি উক্ত স্থানের দেবতার নিকট অঙ্গীকার করেছিলাম যে প্রাণরক্ষা হলে অর্ঘ দ্বারা পূজা করব। তুমি অর্ঘ প্রস্তুত কর।" স্বামীর মনোরঞ্জনার্থ ভদ্রা সমুদয় রত্ন অঙ্গে ধারণ করে তার সঙ্গে রথারোহণে শৈলশৃঙ্গাভিমুখে যাত্রা করলেন। পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে সত্থু ভদ্রার সমস্ত আভরণ দেহ হতে উন্মোচন করতে আদেশ দিল। ভদ্রা এর কারণ জানতে চাইলে সে বলল, "তুমি কি মনে কর আমি তোমাকে এখানে অর্ঘ দিতে এনেছি। আমি তোমার রত্নালংকার নেওয়ার জন্য এখানে এনেছি।" ভদ্রা অনুনয়-বিনয় করে তাঁর প্রেম-ভালোবাসার কথা বোঝাতে ব্যর্থ হয়ে বললেন, "স্বামীন, আমাকে সালংকারে শেষবারের মতো একবার তোমাকে প্রমাণ করার সযোগ দাও।" চোর সম্মত হল। ভদ্রা প্রণাম করে আলিঙ্গন করার সময় তাকে ধাক্কা দিয়ে পর্বতশৃঙ্গ হতে গভীর খাদে ফেলে দিলেন। অনন্তর ভদ্রা গৃহে না গিয়ে সংসার ত্যাগ করে নির্গ্রন্থদের সঙ্ঘভূক্ত হলেন। এখানে শিক্ষা সমাপ্ত করে তিনি উপলব্ধি করলেন যে, এতে সম্যক জ্ঞান লাভ অসম্ভব। এরপর তিনি বিভিন্ন বিদ্বান ও তার্কিকদের নিকট শিক্ষা করে বিতর্কে পারদর্শিতা প্রাপ্ত হলেন। তৎপরে তিনি একটি গ্রামের প্রবেশদ্বারে একটি বালুকার স্তূপ করে তার উপর একটি জম্বুবৃক্ষের শাখা রোপণ পূর্বক বালক-বালিকাদিগকে বললেন, "যে আমার সঙ্গে তর্কযুদ্ধে প্রবৃত্ত হতে সক্ষম সে এই শাখা পদদলিত করতে পারে।" তখন বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। ভদ্রা ও শ্রাবস্তীতে উপনীত হয়ে উক্ত প্রকারে বৃক্ষশালা প্রোথিত করেছিলেন। বুদ্ধের প্রিয় শিষ্য সারিপুত্র এ শাখা দেখে কুণ্ডলকেশার অভিপ্রায় জ্ঞাত হয়ে উক্ত শাখা পদদলিত করলেন। কুণ্ডলকেশাও তর্কযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্য প্রস্তুত হলেন এবং নগরবাসীকে বিতর্ক অবলোকন করার জন্য সমবেত হতে আহ্বান করলেন। সমবেত জনসমাগমে ভদ্রা একটির পর একটি প্রশ্ন করতে লাগলেন, সারিপুত্র প্রত্যেকটি প্রশ্নের যথাযথ উত্তর প্রদান করলেন।

অতঃপর সারিপুত্র প্রশ্ন করলেন, কিন্তু ভদ্রা একটি প্রশ্নেরও উত্তর দিতে সমর্থ হলেন না। ভদ্রা সারিপুত্রের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে বুদ্ধের নিকট উপনীত হয়ে ধর্ম শ্রবণ করলেন। বুদ্ধের উপদেশ শুনে ভদ্রাকুণ্ডলকেশার জ্ঞান উদয় হল, তিনি ভিক্ষুণীসঙ্ঘে অভিসিক্ত হলেন।[১৪৬] ভদ্রার জীবন কাহিনী অতি চমৎকার এবং সর্বসাধারণের উপভোগ্য।

এরূপ পটাচারা[১৪৭] বিত্তশালীর কন্যা হয়ে অতি দুঃখে জীবন কাটাচ্ছিলেন। তাঁদের এক কর্মচারীর প্রেমে আসক্ত হয়ে তিনি তাঁকে বিয়ে করেন। তাঁর দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করার পর স্বামী সর্প দংশনে কালগত হয় আর এক পুত্র নদীস্রোতে ভেসে যায় অন্য পুত্রকে শ্যেণ পক্ষি মাংস খণ্ড মনে করে নিয়ে যায়। এদিকে প্রবল ঝড়ে আক্রান্ত হয়ে তাঁর মাতা-পিতা ও আত্মীয়-স্বজন মৃত্যুমুখে পতিত হয়। প্রিয়জন বিচ্ছেদ বেদনায় পাগলিনী প্রায় পটাচারা পরিশেষে বুদ্ধের শরণ নিয়ে পরমশান্তি নির্বাণের সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন।[১৪৮]

প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে এসব কাহিনী বৌদ্ধদের নিকট জনপ্রিয় তো বটেই বিশ্ব সাহিত্যেও বিপুলভাবে সমাদৃত। জীবনের ঘটনাবলী সাধারণ পর্যায় থেকে স্বতন্ত্র গতিতে

www.pathagar.com

যেন প্রবাহিত হয়ে একটি অতিপ্রাকৃত রূপে উন্নীত করেছে। তাই এসব জীবন কাহিনী উপাখ্যান বা রূপকথার শ্রেণীভূক্ত হবার যোগ্য।

২. পরবর্তীকালের পালি ঐতিহাসিক উপাখ্যান

ত্রিপিটক সংকলিত হবার পর পিটকান্তর্গত গ্রন্থাবলীর উপর বহু টীকা ও ভাষ্যগ্রন্থ রচিত হয়েছিল। সেগুলোর সাধারণ নাম অট্‌ঠকথা (অর্থকথা) বা টীকা।[১৪৯] সমগ্র অট্‌ঠকথা ও বংসসাহিত্য পরবর্তীকালের পালি রচনার অন্তর্গত। এসব সাহিত্যে ইতিহাস আশ্রয়ী অসংখ্য গল্প, উপাখ্যান, রূপকথা ইত্যাদি স্থান লাভ করেছে। উপাখ্যানগুলো ধর্মীয় ভাবাবেশপূর্ণ ও উপদেশমূলক হলেও গল্পরসে সমৃদ্ধ। মূলত বুদ্ধের ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করে তাঁর শিক্ষা ও ভাবধারাকে বৌদ্ধ ভিক্ষু ও জনসাধারণের মধ্যে প্রচার ছিল এসব অট্‌ঠকথা বা ভাষ্য রচনার প্রধান উদ্দেশ্য।[১৫০]

অট্‌ঠকথা রচয়িতা বা ভাষ্যকারদের মধ্যে বুদ্ধদত্ত, বুদ্ধঘোষ ও ধম্মপালের নাম সর্বাগ্রে সবিশেষ উল্লেখযোগ্য।[১৫১] এই তিনজন প্রখ্যাত ভাষ্যকারদের মধ্যে বুদ্ধদত্ত বয়োঃজ্যেষ্ঠ ছিলেন, তবে বুদ্ধঘোষ ছিলেন তাঁর সমসাময়িক বয়োঃকনিষ্ঠ।[১৫২] তাঁরা উভয়ে খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতকের প্রথমার্ধের লোক ছিলেন।

বুদ্ধদত্ত দক্ষিণ ভারতের চোলরাজ্যের অন্তর্গত কাবেরী অঞ্চলে আধুনিক ত্রিচিনোপোলির কাছে উরগপুর বর্তমান উরইউরের অধিবাসী ছিলেন। তিনি ছিলেন কলব্‌ভ বা কলম্ব (কদম্ব) বংশীয় রাজা অচ্চুতবিক্‌ত বা অচ্চুতক্কিক্কমের সমসাময়িক।[১৫৩] তিনি কাবেরী তীরস্থ একটি বৌদ্ধ বিহারে তাঁর গ্রন্থাবলী রচনা করেন। তিনি ছিলেন অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী। অভিধর্ম চর্চায় তাঁর অবদান বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৫৪] তিনি বিনয়বিনিচ্ছয়, উত্তরবিনিচ্ছয়, অভিধম্মাবতার ও রূপারূপবিভাগ নামে চারটি সারগ্রন্থ এবং মধুর বিলাসিনী নামে বুদ্ধবংসের অট্‌ঠকথা রচনা করেন।

আচার্য বুদ্ধঘোষ পালিসাহিত্যের ইতিহাসে অনন্য সাধারণ অবদানের জন্য চিরস্মরণীয় হয়ে আছেন। পালি ভাষ্যকারদের মধ্যে তিনি সর্বোচ্চ আসনে সমাসীন। বুদ্ধঘোষ জন্মগ্রহণ করেন বুদ্ধগয়ার সন্নিকটে ঘোষগ্রামে এক ব্রাহ্মণ পরিবার। তাঁর পিতার নাম ছিল কেশীব্রাহ্মণ আর মাতার নাম ছিল কেশিনী। সপ্তম বর্ষ বয়সেই বেদত্রয় উত্তমরূপে শিক্ষা সমাপ্ত করেন। অনন্তর তিনি ভারতীয় সাহিত্য, পাণিনি, ব্যাকরণ, যোগ, সাংখ্য ইত্যাদি বিষয়ে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন।[১৫৫] তিনি অতঃপর একদিন বৌদ্ধ পণ্ডিত ভিক্ষু রেবতের সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হয়ে পরাজয় বরণ করেন এবং তাঁর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অল্পদিনের মধ্যে ত্রিপিটক অধ্যয়ন সমাপ্ত করে বৌদ্ধধর্মে পাণ্ডিত্য অর্জন করেন। তারপর তিনি সদ্ধর্ম প্রচারে ব্রতী হন। উপাধ্যায় রেবত স্থবিরের সঙ্গে থাকাকালীন তিনি 'ঞাণোদয়' ও ধম্মসঙ্গণির অট্‌ঠকথা 'অত্থসালিনী' রচনা করেন এবং 'পরিত্তট্‌ঠকথা' নামে ত্রিপিটকের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য প্রণয়ন আরম্ভ করেন।[১৫৬] এটা দেখে রেবত স্থবির তাঁকে সিংহলে গমন করে অট্‌ঠকথা অধ্যয়ন ও মাগধী ভাষায় ভাষান্তর করার পরামর্শ প্রদান করলে[১৫৭] তিনি

রাজা মহানামের রাজত্বকালে সেখানে উপগত হয়ে অট্ঠকথা অধ্যয়ন করে সুপ্রসিদ্ধ 'বিসুদ্ধিমগ্গ' নামক ত্রিপিটকের সারগ্রন্থখানি রচনা করেন। এতে তিনি মহাবিহারের স্থবিরদের সম্মতি লাভ করে উক্ত অট্ঠকথা পালি ভাষায় অনুবাদ করেন।[১৫৮] অতঃপর তিনি জম্বুদ্বীপে (ভারত) প্রত্যাবর্তন করেন।

বুদ্ধঘোষ সর্বাধিক অট্ঠকথা রচয়িতা। তাঁর বাচনভঙ্গী, শব্দ নির্বাচন ও নিপুন রচনাশৈলী তুলনাহীন। অভিধর্মের দুরূহ ও জটিল তত্ত্বগুলো তাঁর সহজ পরিবেশনায় পাঠকের নিকট সহজবোধ্য হয়ে উঠেছে।[১৫৯] তাই পালি সাহিত্যে তিনি অমর ব্যক্তিত্ব। তিনি দশ বা ততোধিক অট্ঠকথা রচনা করেন। তন্মধ্যে ধম্মপদট্ঠকথা প্রাচীন উপাখ্যান ও গল্পরসে অতি চমৎকার।

ধম্মপাল তিন প্রধান ভাষ্যকারদের মধ্যে কনিষ্ঠ। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের পদরতীর্থের অধিবাসী। এটা ছিল সিংহলের কাছে তমিল বা দমিল রাজ্যে।[১৬০] খুব সম্ভবত তিনি জন্মসূত্রে তামিল অথবা দ্রাবিড় ছিলেন।[১৬১] মনে হয় ধম্মপাল সিংহলের মহাবিহারে যেখানে বুদ্ধঘোষ লেখাপড়া ও অট্ঠকথা রচনা করেছিলেন, সেইখানে অধ্যয়ন করেছিলেন। কেননা Rhys Davids এর মতে বুদ্ধঘোষ ও ধম্মপালের রচনারীতিতে উপমাপ্রয়োগ, শব্দবিন্যাস ও বিষয়ের গুরুত্ব প্রায় একরূপ। দুজনেই বুদ্ধের জীবন ও উপদেশ সম্পর্কে একই মত পোষণ করতেন।[১৬২]

ধম্মপালের রচনাবলীতেও যথেষ্ট ঐতিহাসিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদান পাওয়া যায়। বুদ্ধেঘোষ যে সকল গ্রন্থের অট্ঠকথা রচনা করেননি ধম্মপাল সে সকল গ্রন্থ যেমন উদান, ইতিবুত্তক, বিমানবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা ইত্যাদি গ্রন্থের অট্ঠকথা 'পরমত্থদীপনী' ও অন্যান্য টীকা রচনা করেন।

'অট্ঠকথা' শব্দের মর্মার্থ হল 'অর্থের ব্যাখ্যা বা 'Explations of the Meaning.' অর্থাৎ মূল পিটকগ্রন্থে বর্ণিত বুদ্ধের ধর্ম দর্শনের কঠিন বিষয় বা শব্দগুলোর ব্যাখ্যা করাই হচ্ছে অট্ঠকথা সাহিত্যের মুখ্য উদ্দেশ্য।

আমরা পূর্বেই উল্লেখ করেছি যে, পালি অট্ঠকথা (অর্থকথা) সাহিত্যে অসংখ্য মনোরম উপাখ্যান রয়েছে যেগুলো গল্প রসে পরিপূর্ণ। বর্তমান উপ-অধ্যায় অট্ঠকথা সাহিত্যের কিছু কিছু উপাখ্যান আলোচনা করা হল।

ধম্মপদ্ট্ঠকথা

সুত্তপিট্কের অন্তর্গত খুদ্দকনিকায়ের দ্বিতীয় গ্রন্থ ধম্মপদ (ধর্মপদ) সমগ্র বৌদ্ধ সাহিত্যে সর্বাপেক্ষা অধিক পরিচিত ও প্রচারিত সম্পূর্ণ গাথায় রচিত পালি কাব্যগ্রন্থ। এটা ২৬ বর্গে বিভক্ত ৪২৩টি উপাদেয় গাথায় সমাপ্ত। এটার ভাষ্য গ্রন্থই 'ধম্মপদট্ঠকথা' নামে অভিহিত। এই সুবৃহৎ ভাষ্যগ্রন্থে ২৯৯টি উপাখ্যান রয়েছে।

বৌদ্ধ ঐতিহ্যমতে ধম্মপট্ঠকথার রচয়িতা আচার্য বুদ্ধঘোষ। কিন্তু পণ্ডিতদের মধ্যে অনেকে এ মতের সমর্থন করেন না। বুদ্ধেঘোষের অন্যান্য অট্ঠকথার ভাষা ও

www.pathagar.com

রচনাশৈলীর পার্থক্য অবলোকন করে T.W. Rhys Davids, M. Winternitz ও E.W. Burlingame অভিমত প্রকাশ করেন যে, ধম্মপদট্‌ঠকথা তাঁর রচনা নয়।[১৬৩]

M. Winternitz মন্তব্য করেছেন, "The commentaries on the Jataka and the Dhammapada are so different in Language and style from the Buddhagoaa's commentary that he cannot possibly have written them."[১৬৪] ধম্মপদট্‌ঠকথার ইংরেজি অনুবাদক E.W. Burlingame পরিষ্কারভাবে বলেছেন যে, "Buddhaghosa is not the author of the Jataka commentary and of the Dhammapada commentary, their authors were unknown."[১৬৫]

ধম্মপদট্‌ঠকথায় পরিচয় পরিচ্ছেদে (colophon) বুদ্ধঘোষই এর রচয়িতা বলে উল্লেখ আছে।[১৬৬] গ্রন্থের শেষ পরিচ্ছেদেও (Epilogue) উল্লেখ আছে যে, "সিংহলে সিরিকুড্‌ড রাজার রাজত্বকালে তাঁর নির্মিত বিহারে উক্ত অট্‌ঠকথা আমাকর্তৃক লিখিত হয়েছে।"[১৬৭] সিরিকুড্‌ডের অপর নাম সিরিনিবাস বা মহানাম।[১৬৮] এবং তিনি ছিলেন বুদ্ধঘোষের সমসাময়িক। প্রফেসর Hardy উল্লেখ করেছেন যে, বুদ্ধঘোষকৃত অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্‌ঠকথা মনোরথপূরণী গ্রন্থের ঘোষক বণিকের কাহিনীর সঙ্গে ধম্পদপদট্‌ঠকথায় বর্ণিত ঘোষক বণিকের কাহিনীর মধ্যে বহু পার্থক্য লক্ষিত হয়। এখানে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, বুদ্ধঘোষ পিট্‌কান্তগর্ত কোনো গ্রন্থের নতুন করে অট্‌ঠকথা রচান করেননি। তিনি সিংহলে রক্ষিত বিভিন্ন প্রকার অট্‌ঠকথার সংকলন করেছেন মাত্র, এগুলো হল মহা-অট্‌ঠকথা, মহাপচ্চারী ও কুরণ্ড-অট্‌ঠকথা। এই অট্‌ঠকথাসমূহ কোনো একজনের রচনা ছিল না। কাজেই কোনো কোনো অট্‌ঠকথা রচনায় বা ভাষান্তরে কিছু কিছু ভাষাগত ও রচনাশৈলীতে পার্থক্য হওয়া স্বাভাবিক।"[১৬৯] কেননা "... a subtle commentary thereon has been handed down from generation to generation in this Island of Ceylon. But because it is composed in the language of this Island, it is of no help to others, ... Therefore for the sake of people and for the welfare of mankind Buddhaghosa at the request of elder Kumarakassapa translated the book into Magadhi i.e. Tanti."[১৭০] অতএব, ধরে নেওয়া যায় যে, ধম্মপদট্‌ঠকথার রচনাকার আচার্য বুদ্ধঘোষ।

ধম্মপদট্‌ঠকথার গল্পগুলোর গঠন প্রণালী অনুসারে প্রত্যেকটিকে আট ভাগে ভাগ করা যায়। (১) মূল গাথা বা যাকে ভিত্তি করে গল্পটি রচিত, (২) যাকে বা যাদের লক্ষ্য করে গল্পটি বলা হয়েছে, (৩) বর্তমান গল্প বা পচ্চুপন্নবত্থু, (৪) গাথা বা গাথা সমষ্টি, (৫) প্রত্যেক গাথা বা শব্দের ব্যাখ্যা, (৬) শ্রবণকারীর আধ্যাত্মিক ফল লাভের সংক্ষিপ্ত বিবরণ, (৭) অতীত কাহিনী ও (৮) গল্পে সম্পৃক্ত পাত্রপাত্রীর পরিচিতি।[১৭১] এখানে উল্লেখ্য যে, জাতক ও অট্‌ঠকথার মধ্যে বেশ সাদৃশ্য রয়েছে। জাতক হচ্ছে বোধিসত্ত্ব জীবনের কাহিনী আর ধম্মপদট্‌ঠকথা হচ্ছে শ্রাবক-শ্রাবিকা বা শিষ্যদের অতীত জীবন-কাহিনী। Mr. Burlingame ধম্মপদট্‌ঠকথার কাহিনীগুলোকে কম-বেশি রূপকথা ও লোককথার বিরাট

www.pathagar.com

সংগ্রহ বলে উল্লেখ করেছেন।[১৭২] তবে বুদ্ধের ধর্ম-দর্শন, বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, সঙ্ঘের ক্রমবিকাশ ও মূল পিটক গ্রন্থসমূহ সঠিকভাবে উপলব্ধি করার জন্য এই অট্‌ঠকথাসমূহের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

ধম্মপদট্‌ঠকথার গল্পগুলোর চরিত্রে অর্হৎ ভিক্ষু থেকে আরম্ভ করে সাধারণ ভিক্ষু-শ্রামণ, নর-নারী, ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়, ধনী-শ্রেষ্ঠী, দীন-দরিদ্র, জীব-জন্তু ও প্রেত-আসুরাদি পর্যন্ত স্থান পেয়েছে। এদেরকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছে এক একটি গল্প কাহিনী যেগুলো উপাখ্যান-উপকথার মত উপভোগ্য।

শ্রাবস্তীর এক তরুণ যুবক মাতার ঐকান্তিক আগ্রহে অনিচ্ছাসত্ত্বেও বিয়ে করেছিল। কিন্তু স্ত্রী বন্ধ্যা হওয়ায় বংশরক্ষার জন্য স্ত্রী ও মায়ের ইচ্ছানুসারে দ্বিতীয়বার দার পরিগ্রহ করল। দ্বিতীয়া স্ত্রী গর্ভবতী হলে প্রথমা স্ত্রীর প্রতিহিংসা উৎপন্ন হল। যে গোপনে ঔষধ প্রয়োগ করে দুবার গর্ভপাত করাল। তৃতীয়বার গর্ভবতী হলে ঔষধ প্রয়োগের ফলে গর্ভস্থ সন্তানসহ তার মৃত্যু হল। প্রথমা স্ত্রীর ষড়যন্ত্রের বিষয় অবগত হয়ে যুবক তাকে এমনভাবে প্রহার করল যে, আঘাতে তাঁর মৃত্যু হল। কিন্তু দুই সপত্নীর শত্রুতা জন্ম-জন্মান্তর অবধি চলতে লাগল।[১৭৩] একসময় শ্রাবস্তীতে একজন কুলবধূ ও অপরজন যক্ষিণী হয়ে জন্মগ্রহণ করল। গৃহবধূর সন্তান জন্মগ্রহণ করলে যক্ষিণী খেয়ে ফেলত। এভাবে তৃতীয়বারও যখন যক্ষিণী তার সন্তান খাবার জন্য আসল তখন কুলবধূ বুঝতে পেরে শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে গিয়ে পুত্রকে বুদ্ধের পদতলে সমর্পণ করে রক্ষা করেছিল।[১৭৪] কাহিনীটি রূপকথার মতো লোমহর্ষক। যদিও গল্পের মূল উপদেশ-শত্রুতার দ্বারা শত্রুতা বৃদ্ধি পায়।

বুদ্ধের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দ অনিচ্ছাসত্ত্বেও বুদ্ধের প্রতি গৌরব প্রদর্শনার্থে প্রব্রজ্যা নিতে বাধ্য হয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মন সর্বদা বাগদত্তা জনপদকল্যাণীর জন্য উৎকণ্ঠিত। বুদ্ধ তাঁকে অলৌকিক ঋদ্ধিবলে নিয়ে গেলেন তাবতিংস স্বর্গে। পথে দেখালেন এক হস্তপদনাসা ছিন্ন বানরীকে। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "স্বর্গের এই অপ্সরাগণ সুন্দরী নাকি জনপদকল্যাণী।" নন্দ উত্তর দিলেন, "জনপদকল্যাণীর কাছে বানরী যেমন কুৎসিত এই অপ্সরাগণের কাছেও জনপদকল্যাণী তদ্রূপ।" বুদ্ধ বললেন, "আমি দায়িত্ব নিলাম, তোমাকে আপ্সরা পুরস্কৃত করা হবে, তুমি সদ্ধর্ম আচরণ কর।" নন্দ সাধনায় রত হলেন, অচিরে লাভ করলেন অর্হত্ত্বফল। বুদ্ধ দায়মুক্ত হলেন।[১৭৫]

ধম্মপদট্‌ঠকথার কোনো কোনো কাহিনী রূপকথাকেও হার মানায়। কৌশাম্বীর পরন্তপ নামে রাজা একদিন অরুণোদয়ের তাপ সেবনার্থে খোলা আকাশের নীচে উপবিষ্ট ছিলেন। পাশে আলাপরত ছিলেন মূল্যবান কম্বল-আচ্ছাদিতা মহিষী। সেই সময়ে হস্তীলিঙ্গপক্ষী[১৭৬] রক্তকম্বল ভূষিত মহিষীকে মাংস খণ্ড মনে করে সেখানে অবতরণ করত রাণীকে নখপঞ্জরে ধারণ করে আকাশে উড়ে গেল। হিমবন্ত প্রদেশের এক বিরাট বটবৃক্ষের উপর প্রশস্ত স্থানে রাণীকে রাখার সঙ্গে সঙ্গে তিনি যথাশক্তি হাততালি ও শব্দ করতে লাগলেন। পাখি ভীত হয়ে পালিয়ে গেল। ক্রমশ সন্ধ্যা হয়ে এল, রাণীর প্রসববেদনা শুরু হল। রাত

www.pathagar.com

গত হয়ে প্রভাত হল, পূর্বাকাশে সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে রাণী একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। পুত্রের নাম রাখা হল উদয়ন। সেই বৃক্ষের অদূরে ছিল অল্লকপ্প তাপসের পর্ণকুটীর। তাপস খাদ্যান্বষণে বৃক্ষমূলে গিয়ে শুনতে পেলেন শিশুর কান্না। তিনি অসহায় মাতা ও শিশুকে নিয়ে গেলেন নিজ আশ্রমে। রাণী তাপসের সঙ্গে আন্তরিকতা গড়ে তুললেন এবং একত্রে বাস করতে লাগলেন। উদয়ন ধীরে ধীরে বড় হয়ে উঠল। একদিন তাপস নক্ষত্রপাত দেখে প্রকাশ করলেন, "আজ কৌশাম্বীরাজ পরন্তপের মৃত্যু হয়েছে।" একথা শুনে মহিষী দুঃখিত হয়ে উদয়নের ভবিষ্যৎ জীবন সম্বন্ধে উৎকণ্ঠিত হয়ে তাপসকে অভিহিত করলেন। তাপস উদয়নকে হস্তীকান্তবীণা প্রদান করে মন্ত্র শিক্ষা দিলেন। অনন্তর মাতা রক্তকম্বল ও অঙ্গুরীয় কুমারের হাতে দিয়ে কৌশাম্বীরাজ্য গ্রহণের জন্য প্রেরণ করলেন। উদয়ন হস্তীকান্তবীণা বাজিয়ে প্রয়োজনীয় হস্তী সংগ্রহ করে কৌশাম্বী যাত্রা করলেন। কৌশাম্বীবাসী উদয়নের কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে রাজ্য প্রদান করলেন, তিনি হলেন কৌশাম্বীর রাজা।[১৭৭] রূপকথার রাজপুত্রের মতো উদয়ন বীরদর্পে কৌশাম্বীর সিংহাসন অধিকার করে নিলেন।

রাজা উদয়নের জীবন কাহিনী ভারতীয় সাহিত্যে নয় শুধু বিশ্ব সাহিত্যেও অতি জনপ্রিয় উপাখ্যান। কৌশাম্বীরাজ উদয়নের শ্যামাবতী, বাসুলদত্তা ও মাগন্ধিয়া নাম্নী তিন অগ্রমহিষীদের নিয়ে এই মনোজ্ঞ ও বিচিত্র জীবন কাহিনী। রাজা উদয়ন হস্তীকান্ত বীণা ও হস্তীকান্ত মন্ত্রের অধিকারী। উজ্জয়িনীরাজ চন্দ্রপ্রদ্যোতের প্রবল আকাঙ্ক্ষা এই মন্ত্র আয়ত্ব করতে। তিনি দারুময় এক মনোরম হস্ত তৈরি করে তার উদরে ষাটজন সুদক্ষ সৈন্য পুরে সুকৌশলে রাজা উদয়নেক বন্দি করলেন। অনন্তর তাঁর কাছে হস্তীকান্ত মন্ত্র শিক্ষা করতে চাইলে তিনি তাঁকে প্রণাম করে শিষ্যত্ব গ্রহণ করতে বললেন। কিন্তু প্রদ্যোত ছিলেন অহংকারী, তিনি রাজী হলেন না। অবশেষে তাঁর সুন্দরী কন্যা বাসুলদত্তাকে কুব্জী পরিচয় দিয়ে এবং কন্যার নিকট উদয়নকে শ্বেত কুষ্ঠরোগী পরিচয় দিয়ে পর্দার অন্তরাল বসে মন্ত্র শিক্ষা দানের সিদ্ধান্ত হল। বাসুলদত্তা প্রণাম করে শিক্ষা আরম্ভ করলেন। কিন্তু তিনি যথাযথভাবে মন্ত্র উচ্চারণ করতে পারেন না। বাসুলদত্তার অক্ষমতাহেতু একদা উদয়ন তাঁকে কুব্জী বলে তিরস্কার করলেন। রাজকন্যা দারুণ অপমানবোধ করে উভয়ে বাদ-প্রতিবাদের পর পরস্পরকে চিনতে পারলেন। উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা গড়ে উঠল। উদয়ন বাসুলদত্তার মাধ্যমে মুক্তির পথ খুঁজতে লাগলেন, বিনিময়ে তাঁকে পাঁচশ সখীসহ অগ্রমহিষীপদে অভিষিক্ত করার প্রতিশ্রুতি দিলেন।

অনন্তর একদিন চন্দ্রপ্রদ্যোত উদ্যোনক্রীড়ায় বহির্গত হলে পূর্ব পরিকল্পনা অনুযায়ী প্রচুর স্বর্ণমুদ্রাসহ ভদ্রাবতী হস্তিনীর পৃষ্ঠে আরোহণ করে তাঁরা পলায়ন করলেন।

প্রহরী কর্তৃক অবগত হয়ে রাজা প্রদ্যোত সশস্ত্র সৈন্য প্রেরণ করলেন। সৈন্যগণ অনুধাবন করতে দেখে উদয়ন স্বর্ণমুদ্রা ফেলে যেতে লাগলেন। সৈন্যগণ পরিত্যক্ত স্বর্ণমুদ্রা লাভের লোভে পড়ে গতিপথ স্থিমিত করে মুদ্রা সঙগ্রহ করতে লাগলেন। ইত্যবসরে উদয়ন বাসুলদত্তাকে নিয়ে দ্রুতবেগে নিজ রাজ্যভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। তাঁর অপেক্ষামান

www.pathagar.com

সৈন্য পরিবৃত হয়ে উভয়ে রাজধানীতে উপনীত হলেন। যথাসময়ে বালুসদত্তাকে রাজমহিষীর পদে অভিষিক্ত করে নিলেন।

উদয়নরাজের প্রথমা স্ত্রী শ্যামাবতী ছিলেন বুদ্ধভক্ত আর কনিষ্ঠা মহিষী মাগন্দিয়া ছিলেন বুদ্ধ বিদ্বেষী। মাগন্দিয়া বহু চেষ্টা করেও বুদ্ধের কোনো ক্ষতি করতে না পেরে শাম্যাবতী ও তাঁর সখীগণের ক্ষতি সাধনে সক্রিয় হলেন। তিনি প্রায় সময় শ্যামাবতীর বিরুদ্ধে রাজাকে মিথ্যা অভিযোগ করতেন। কিন্তু রাজা বিশ্বাস করতেন না। অবশেষে হস্তীকান্ত বীণার ছিদ্রপথে একটি বিষদন্তহীন সর্প ঢুকিয়ে ছিদ্রপথ বন্ধ করে রাখল। রাজা পালাক্রমে এক সপ্তাহ করে তিন মহিষীর প্রাসাদে রাত্রিযাপন করতেন। শ্যামাবতীর প্রাসাদে রাত্রি যাপনের জন্য যাবার সময় মাগন্দিয়া বারংবার নিষেধ করলেন। রাজা নিষেধ অমান্য করে গেলে তিনিও সঙ্গে গেলেন। কিছুক্ষণ পর পরিকল্পনা মতো গোপনে বীণার ছিদ্রপথ খোলে দিলে সর্প বীণা হতে বের হয়ে শোঁ শোঁ শব্দ করে ফণা তুলল। রাজা তা দেখে মনে করলেন যে, মাগন্দিয়া ইতিপূর্বে যা বলছে সবই সত্য। তিনি শ্যামাবতী ও তার সখীদের উপর রুষ্ট হলেন। শ্যামাবতীকে সামনে রেখে পাঁচশ সখীদের তাঁর পিছনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করালেন। তারপর তাঁর শক্তিশালী তীর নিক্ষেপ করলেন। কিন্তু তীর তীব্রগতিতে গিয়ে শ্যামাবতীর বুক থেকে ফিরে এসে রাজার বক্ষ বরাবর এসে স্থির হল। রাজা শ্যামাবতীর গুণে মুগ্ধ হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। শ্যামাবতীর দয়ায় রাজা সত্যের সন্ধান লাভ করলেন, তিনি শরণ নিলেন বুদ্ধপ্রমুখ ত্রিরত্নের আর প্রতিদিন পাঁচশ ভিক্ষুর আহার্যদানের সুযোগ পেলেন শ্যামাবতী। মাগন্দিয়ার বিদ্বেষ আরও বেড়ে গেল। তিনি তাঁর খুল্লতাতের দ্বারা পাঁচশ সখীসহ শ্যামাবতীর প্রাসাদে আগুন জ্বালিয়ে দিলেন। সকলে পুড়ে মারা গেলেন। রাজা বুঝতে পারলেন এসব কীর্তি নিশ্চয়ই মাগন্দিয়ার। তিনি প্রসন্নভাব দেখালেন, সভাসদদের মাঝে প্রশংসা করলেন, "যিনি এ কাজ করেছেন তিনি নিশ্চয়ই আমার পরম কল্যাণমিত্র ও উপকারী বন্ধু, কারণ শ্যামাবতী মোটেই ভালো ছিল না। পাশে স্থিত মাগন্দিয়া উল্লসিত হয়ে বললেন, "আমিই সেই কল্যাণমিত্রা।" রাজা প্রসন্ন বদনে বললেন, "উত্তম কাজ করেছ। আমি তোমাকে পুরস্কৃত করব। তোমার আত্মীয়-জ্ঞাতীদের আহ্বান কর।" মাগন্দিয়া ও তাঁর জ্ঞাতীবর্গ উপস্থিত হলে রাজা কর্মচারীদের নির্দেশ দিলেন, "খোলা মাঠে এদের বক্ষ অবধি মাটিতে পুতিয়ে উপরাঙ্গে শুকনো তৃণাদি আচ্ছাদিত করে আগুন জ্বালিয়ে দেবে। তারপর অর্ধমৃত হলে তাদের দেহের উপর লাঙ্গল দিয়ে চাষ করে দেবে।" রাজার আদেশ পালন করা হল।[১৭৮] কাহিনী এভাবে শেষ হল। গল্পের প্রয়োজনীয় বৈচিত্র্য উপাদানে গল্পটি নিঃসন্দেহে উপাখ্যানের পর্যায়ভুক্ত।

শ্রাবস্তীর জনৈক কুলপুত্র সদ্ধর্ম শ্রবণ করে অর্হত্ত্বফলে উন্নীত হয়ে ভিক্ষুধর্ম গ্রহণ করে শ্রাবস্তীতে অবস্থান করছিলেন। সঙ্ঘরক্ষিত নামে তাঁর এক ভাগিয়েন তাঁর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিল। একদিন সে দুখানা বস্ত্র প্রাপ্ত হল। একখণ্ড গুরুকে দান করতে চাইলে তিনি তা গ্রহণ করলেন না। সঙ্ঘরক্ষিত অতিশয় দুঃখিত হল। গুরুকে পাখা দ্বারা বাতাস

www.pathagar.com

করার সময় চিন্তা করতে লাগল, "আমি গুরুদেবের ভাগিনেয়, এখন তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেছি। অথচ তিনি আমার দান গ্রহণ করছেন না, কাজেই ভিক্ষু থেকে লাভ কি ? আমার সংসারধর্ম গ্রহণ করাই শ্রেয়।" সে ভাবতে লাগল, "এই বস্ত্রখণ্ডদ্বয় বিক্রি করে একটি মেষ ক্রয় করব, মেষের শাবক হলে বিক্রি করে বিয়ে করব। তখন স্ত্রীকে নিয়ে মাতুল দর্শনে গমন করব। সে যদি রাজি না হয় তাহলে তাকে এভাবে প্রহার করব।" এরূপ চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে পাখা দ্বারা স্ত্রীকে প্রহার করল, পাখার আঘাত গুরুর মস্তকে লাগল। লজ্জা ও ভয়ে সে পলায়ন করতে উদ্যত হল।[১৭৯] গল্পটি লোককথার মত মনোজ্ঞ, রসময় ও উপভোগ্য।

শ্রাবস্তীর ধনীকন্যা পটাচারা।[১৮০] তিনি তাঁদের গৃহে কর্মরত জনৈক যুবকের প্রেমে পড়ে বিয়ে করেন। অতঃপর তারা দুজনে অন্যত্র বসবাস করার সময় অন্তঃসত্ত্বা হলে পিতৃগৃহে যাবার ইচ্ছায় স্বামীকে অবহিত করেন। স্বামী রাজী হলেন, কিন্তু আজ নয় কাল করতে করতে স্ত্রী পূর্ণ গর্ভাবস্থায় পরিণত হলে অবশেষে একাকী যাত্রা শুরু করেন। অগত্যা স্বামীও তাঁর অনুসরণ করে সঙ্গী হলেন। পথিমধ্যে পটাচারার গর্ভ-বেদনা শুরু হল এবং সেখানেই একটি সন্তান প্রসব করলেন। অনন্তর তাঁরা স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন। দ্বিতীয় সন্তানের জন্মকালও সেই একই ঘটনা ঘটল। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তানের জন্মলগ্নে পথিমধ্যে প্রবল ঝড় উঠল। স্বামী বৃক্ষের ডালপালা দিয়ে একটি অস্থায়ী ছাউনী তৈরি করলেন। ওটা আচ্ছাদিত করার জন্য ঘাস সংগ্রহ করতে গিয়ে তিনি সর্প দ্বারা দংশিত হয়ে মারা গেলেন। দুঃখিনী মা দুই শিশু সন্তান নিয়ে পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। ক্রমান্বয়ে উপস্থিত হলেন এক নদীর তীরে। দুই শিশু নিয়ে সেই নদী পাড় হওয়া অসম্ভব। কাজেই তিনি বড় সন্তানকে রেখে ছোটটিকে অপর পাড়ে রেখে বড়টিকে আনার জন্য যখন নদীর মাঝপথে উপনীত হলেন তখন একটি বাজপাখি ছোট ছেলেটিকে খাদ্য মনে করে তুলে উড়ে গেল। পটাচারা বাজপাখিকে তাড়াবার জন্য যখন হস্ত উত্তোলন করলেন, অপরপাড়ে বড় সন্তান মনে করল যে, তার মা তাকে যাবার জন্য ইঙ্গিত করছেন। সুতরাং সে জলে নেমে পড়ল, জলস্রোত তাকে ভাসিয়ে নিল। একইসঙ্গে দুই পুত্রকে হারালেন। পিতৃগৃহে গিয়ে জানতে পারলেন যে, প্রচণ্ড ঘূর্ণিবাত্যায় তাঁর পিতৃগৃহ ধ্বংস হয়ে গেছে আর তার মাতা-পিতা সকলে ঘরচাপা পড়ে মারা গেছেন। তাঁদের এইমাত্র শ্মশানে দাহ কার্য সমাধা করা হয়েছে।

পটাচারা শোকে পাগলিনীপ্রায়, গায়ের কাপড় ছুড়ে ফেলে দিয়ে সর্বত্র উন্মাদিনীর ন্যায় ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। অনেক দিন কেটে গেল। অবশেষে একদিন মহামানব বুদ্ধ ধর্মসভায় দেশনা করার সময় তিনি শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ সস্নেহে বললেন, "বোন, তোমার পূর্বস্মৃতি স্মরণ কর।" বুদ্ধের আহ্বান তিনি শুনতে পেলেন। সম্বিৎ ফিরে এলে তিনি লজ্জায় জড়সড় হয়ে পড়লেন। একজন লোক তাঁকে একখণ্ড কাপড় দিল। তিনি লজ্জা নিবারণ করলেন। বুদ্ধ ধর্মদেশনা করলেন তাঁকে। তিনি ভিক্ষুণী হলেন এবং অচিরে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শোকহীন হয়ে বাস করতে লাগলেন।[১৮১]

www.pathagar.com

কাহিনীটি লৌকিক জগতের একটি ঘাত-প্রতিঘাতময় জীবনের জীবন্ত চিত্র অথচ রূপকথার মতো অনন্য।

রাজগৃহের কোনো শ্রেষ্ঠীকন্যা মৃতদণ্ডপ্রাপ্ত এক চোরের প্রেমাসক্ত হয়ে আহার-বিহার ত্যাগ করে প্রাসাদে শুয়ে রইলেন। তাঁর মাতা-পিতা কন্যার অভিপ্রায় জানতে পেরে বারণ সত্ত্বেও তিনি সংকল্পে অচল বিধায় অবশেষে ভারপ্রাপ্ত রাজকর্মচারীকে উৎকোচ প্রদান পূর্বক অপরাধীকে মুক্ত করে তার হাতে কন্যা সম্প্রদান করলেন। নব-পরিণীতা বধূ স্বামীর মনতুষ্টির জন্য সর্বদা সচেষ্ট থাকতেন। কিন্তু 'চোর শোনে না ধর্মের কাহিনী।' তার মন সবসময় শঠতায় পূর্ণ থাকত, চিন্তা করত কিভাবে স্ত্রীর মূল্যবান অলংকারসমূহ আত্মসাৎ করা যায়। একদিন সে তার নর-পরিণীতা স্ত্রীকে ছলনা করে এক উচ্চ পাহাড়ে নিয়ে গেল। পাহাড়ে উঠে চোরের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলে বুদ্ধিমতী নারী কাতর মিতনি জানালেন, "মৃত্যুর পূর্বে একবার তোমার চরণধূলা নিতে চাই।" চোর রাজী হল। শ্রেষ্ঠীকন্যা প্রদক্ষিণ করে প্রণাম করতে লাগলেন। তৃতীয়বার প্রদক্ষিণ করার সময় পিছন দিক থেকে চোরকে সজোরে ধাক্কা দিয়ে পাহাড়ের গভীর খাদে ফেলে দিলেন। চোরের মর্মান্তিক মৃত্যু হল গভীর অরণ্যে। অতঃপর তিনি সংসার ত্যাগ তরে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন বুদ্ধের কাছে। তাঁর নাম হল কুণ্ডলকেশী থেরী[১৮২] বুদ্ধিমতী কুণ্ডলকেশী জীবনচিত্র লোক-কাহিনীর মতো চমৎকার ও হৃদয়গ্রাহী।

শ্রাবস্তীর কোনো কুলকুমারী প্রতিদিন তাদের গৃহপালিত মুরগীর ডিম খেয়ে ফেলত। প্রতিনিয়ত এভাবে খেতে খেতে মুরগীর মনোবেদনা উৎপন্ন হল। সে সংকল্প করল, "আমি পরজন্মে যক্ষিণী হয়ে জন্মগ্রহণ করে এই মেয়ের প্রবস করা সন্তান ভক্ষণ করব।" এভাবে প্রতিহিংসা পোষণ করে মৃত্যুর পর মুরগী বিড়ালী হয়ে জন্মগ্রহণ করল। বালিকা মৃত্যুর পর সেই গৃহে কুক্কুটী হয়ে জন্ম নিল। কুক্কুটি ডিম প্রসব করলে বিড়ালী খেয়ে ফেলত। এভাবে চলতে লাগল। কুক্কুটীও বিড়ালের প্রতি হিংসার অনলে জ্বলতে থাকে। অবশেষে বিড়ালী মৃত্যুবরণ করে মৃগী আর কুক্কুটী ব্যাঘ্রীরূপে জন্মগ্রহণ করে। ব্যাঘ্রী মৃগীর প্রসব করা সমস্ত বাচ্চা খেতে থাকে। অনন্তর উভয়ের মৃত্যুর পর মৃগী যক্ষিণী হয়ে এবং ব্যাঘ্রী শ্রাবস্তীর কুলধীতা রূপে জন্মগ্রহণ করে। কুলধীতার যথাকালে বিয়ের পর সন্তান হলে যক্ষিণী খেয়ে ফেলে। এভাবে তৃতীয় সন্তানও যখন খাওয়ার জন্য যক্ষিণী আসে তখন কুলবধূ শ্রাবস্তীর বুদ্ধের আশ্রয় গ্রহণ করে। বুদ্ধ তাদের উভয়কে মৈত্রীপ্রেমে উদ্বুদ্ধ হওয়ার জন্য ধর্মদেশনা করলে উভয়ের জ্ঞানচক্ষু উৎপন্ন হয়।[১৮৩] গল্পটি কালিযক্ষিণী উপাখ্যানের মতো উপভোগ্য।

শ্রাবস্তীতে ত্রিশজন ভিক্ষু বুদ্ধের নিকট কর্মস্থান গ্রহণ করে প্রত্যন্ত অঞ্চলে যাত্রার সময় বুদ্ধ সারিপুত্র স্থবিরের নিকট পাঠালেন। সারিপুত্র স্থবির তাঁদের বিপদে সাহায্য করার জন্য সঙ্কিচ্চ নামক জনৈক সপ্তমবর্ষীয় অর্হৎ শ্রামণেরকে তাঁদের সঙ্গে দিলেন। তাঁরা দূর প্রত্যন্ত এলাকায় গিয়ে কোনো অরণ্য-নিকটবর্তী একটি গ্রামে বর্ষাব্রত আরম্ভ করলেন এবং গভীর সাধনায় নিমগ্ন হলেন। একজন প্রসাদভোজী প্রৌঢ়ব্যক্তি ভিক্ষুদের সঙ্গে বাস করত।

www.pathagar.com

এক সময় সে ভিক্ষুদের অগোচরে তার কন্যাকে দেখার জন্য স্বগ্রামে যাবার পথে একদল দস্যু কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তখন সে বলল যে, সে ভিক্ষুদের প্রসাদ খেয়ে জীবন ধারণ করে। প্রসাদ ভোজীকে বলিরূপে অর্পণ করা হলে দেবতা তুষ্ট হবে না। সে দস্যুদলকে সঙ্গে নিয়ে ভিক্ষুদের আশ্রমে গেল। দস্যুদলপতি ভিক্ষুদের নিকট তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করল। ভিক্ষুরা প্রত্যেকে অন্যদের বাঁচিয়ে আপন আপন প্রাণ দিতে প্রস্তুত হলেন। অবশেষে শ্রামণের ভিক্ষুদের অনুরোধ করে অনুমতি নিয়ে দস্যুদলের সঙ্গে গেলেন। দস্যুদলপতি অনেক চেষ্টা করেও শ্রামণেরকে বধ করতে ব্যর্থ হল। তাঁর গুণে মুগ্ধ হয়ে দস্যুগণ তাঁর শরণ গ্রহণ করল। শ্রামণের দস্যুদের নিয়ে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলে বুদ্ধ তাদেরকে উপদেশ দান করেন।[১৮৪] আধ্যাত্মিক ও অলৌকিক প্রভাবে বয়োঃকনিষ্ঠ সাত বছরের সঙ্কিচ্চ শ্রামণ বিপদ থেকে ত্রিশজন ভিক্ষুকে রক্ষা করতে সক্ষম হন।

শ্রাবস্তীর জনৈক শ্রেষ্ঠী তাঁর পুত্রের জন্য একটি দরিদ্র পরিবার হতে কিসা গৌতমী নাম্নী এক কন্যাকে পুত্রবধূ করে গৃহে এনেছিলেন। কিছুদিন পর গৌতমী এক পুত্র সন্তান প্রসব করেন। পুত্রটি যখন একটু হাঁটতে চলতে শিখল, তখনই মৃত্যুমুখে পতিত হল। শোকে উন্মাদিনী প্রায় কিসা গৌতমী মৃত পুত্রের জীবন দান করার জন্য কাতর প্রার্থনা জানালেন। বুদ্ধ তাঁর পুত্রের জীবন দানে সম্মত হলেন এই শর্তে যে, তাঁকে কিছু সর্ষে এনে দিতে হবে এমন গৃহ হতে যে গৃহে কোনো সময় কারো মৃত্যু হয়নি। গৌতমী পুত্র ক্রোড়ে শ্রাবস্তীর দ্বারে দ্বারে সর্ষে ভিক্ষা চাইলেন, কিন্তু সর্ষে পাওয়া গেলেও মৃত্যুহীন গৃহ পাওয়া গেল না। গৌতমীর জ্ঞান নেত্র উন্মেষ হল, তিনি স্বহস্তে পুত্রের সৎকার করে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হলেন। ধম্মদেশনা করলেন বুদ্ধ। প্রখ্যাত ভিক্ষুণী হিসেবে পরিচিতি লাভ করলেন কিসা গৌতমী।[১৮৫] কাহিনীটির বৈচিত্র্য নিঃসন্দেহে হৃদয়গ্রাহী। এটা লোককাহিনীর ন্যায় সমগ্র ভারতবর্ষে লোকমুখে প্রচলিত। গ্রীক, পারস্য ও আরব্য সাহিত্যেও এ ধরণের উপাখ্যানের প্রভাব লক্ষ্য করা যায়।[১৮৬]

পব্‌ভারবাসী তিষ্য স্থবির উপাখ্যানে বর্ণিত হয়েছে, তিষ্য স্থবির কর্মস্থান গ্রহণ করে অরণ্যের এক গুহায় অবস্থান করছিলেন। সেই গুহায় বাস করত সস্ত্রীক এক দেবতা। স্থবিরের শীলতেজে দেবতা গুহায় থাকতে পারল না, তারা বাইরে রাত্রিযাপন করল। পরদিন ভিক্ষান্ন সংগ্রহ করতে গেলে স্থবিরকে জনৈক উপাসিকা বর্ষা যাপনের জন্য নিমন্ত্রণ করেন। স্থবিরও তাঁর নিমন্ত্রণ গ্রহণ করে সেই গুহায় অবস্থান করতে লাগলেন। দেবতা ভিক্ষুর শীলরক্ষায় কোনো শিথিলতা না দেখে উপাসিকার পুত্রের দেহে প্রবিষ্ঠ হয়ে তার গ্রীবা মুচড়ে দিল। এতে তার চোখ উল্টে গিয়ে মুখ হতে লালা বেরুতে লাগল। পুত্রের এরূপ অবস্থা দেখে উপাসিকা রোদন করতে লাগলেন। দেবতা দৈববাণীতে বলল, "তোমার কুলপুরোহিত থেকে কিছু যষ্ঠিমধু যাচনা করে তৈলসহ পাক করত তোমার পুত্রের নস্য কর্ম করাও।" উপাসিকা রাজী হলেন না। অতঃপর দেবতা বলল, "তাহলে স্থবিরের পদধৌত জল পান করাও।" উপাসিকা তাই করলেন। তাঁর পুত্র সুস্থ হয়ে উঠল। স্থবির সেদিন যথাসময়ে গুহায় উপস্থিত হলে দেবতা বলল, "হে মহাবৈদ্য, আপনি এখানে

www.pathagar.com

প্রবেশ করবেন না।" স্থবির তার পরিচয় জানতে চাইলে বলল, "আমি এই গুহায় অধিষ্ঠিত দেবতা।" স্থবির তার উপসম্পন্ন জীবনের শীল বিশুদ্ধতা পর্যবেক্ষণ করে বিন্দুমাত্রও দোষ দেখতে পেলেন না। তিনি তাঁর শীলের প্রতি প্রণিধান বর্ধিত করে সেখানেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। বর্ষার তিন মাস সেই গুহায় নির্বিবাদে অবস্থানান্তে প্রত্যাগমন করেছিলেন।[১৮৭] কাহিনীটি রোমাঞ্চকর।

রূপনন্দা ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের বৈমাত্রেয় ভ্রাতা নন্দের স্ত্রী। একদিন তিনি ভাবলেন, তাঁর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা রাজশ্রী ত্যাগ করে জগতে অগ্রপুদ্গল বুদ্ধ হয়েছেন, তাঁর পুত্র রাহুলকুমারও প্রব্রজিত, তাঁর ভাই নন্দ, মাতা মহাপ্রজাপতি গৌতমী এবং স্বামীও প্রব্রজিত- অনন্তর তিনি সিদ্ধান্ত নিলেন যে, তাঁর জ্ঞাতিগণ যে পথ অনুসরণ করে পৃথিবী বিখ্যাত হয়েছেন, তিনিও সেই পথ গ্রহণ করবেন। তিনি প্রব্রজিত হলেন বটে শ্রদ্ধায় বশবর্তী হয়ে নয়, জ্ঞাতিস্নেহের বশে।

কেননা, রূপানন্দা ছিলেন অত্যন্ত রূপসী এবং রূপের গর্বে গরবিণী। কিন্তু বুদ্ধ রূপের অনিত্যতা সম্পর্কে দেশনা করেন বলে প্রব্রজিত হয়েও বুদ্ধের সামনে যেতেন না। উপাসিকাদের মুখে বুদ্ধের গুণবর্ণনা শ্রবণ করে তিনি একদিন ধর্মশ্রবণে যেতে মনস্থ করলেন, কিন্তু স্থির করলেন যে, তিনি বুদ্ধকে দেখা দেবেন না। রূপনন্দা ধর্ম শোনার জন্য সঙ্গীদের সাথে যাবার সময় তথাগত বুদ্ধ দিব্যনেত্রে তাঁর আগমন দেখতে পেয়ে ভাবলেন, "এই রমণী রূপগর্বে গর্বিতা, তার রূপমাদকতা অপনোদন করা উচিত।" এরূপ চিন্তা করে রূপনন্দা বিহারে প্রবেশ করার সময় বুদ্ধ অপূর্ব সুন্দরী ষোড়শবর্ষীয়া রক্তবস্ত্র পরিহিতা স্বর্ণালংকারে বিভূষিতা এক তরুণী ব্যজনী হাতে বুদ্ধকে বাতাস প্রদান করতে করতে স্থিতাবস্থায় ঋদ্ধিবলে নির্মাণ করে রাখলেন। এ অবস্থা শুধু রূপনন্দাই দেখতে পাচ্ছিলেন। তিনি ভিক্ষুণীদের সঙ্গে সভায় প্রবেশ করে বন্দনা করলেন। তখন তাঁর মনে হল- এ রূপসীর কাছে তিনি যেন কাক সদৃশ। রূপনন্দা দেখতে পেলেন, ক্রমশ সেই রূপসী তন্বীর বয়স বাড়ছে, প্রসূতির ন্যায়, মধ্যবয়সী, তৎপর জরাজীর্ণ বৃদ্ধা স্ত্রীর ন্যায় হয়ে দন্ত পড়ছে, চুল পেকে যাচ্ছে, দেহ বক্র হয়ে ব্যাধিতে আক্রান্ত হচ্ছে। অতঃপর মাটিতে পড়ে বিষ্ঠামূত্রে নিমগ্ন হয়ে এদিক-ওদিক গড়াচ্ছে, তারপর রূপসীর মৃত্যু হল। মৃতদেহ ক্রমান্বয়ে পচে গলে দুর্গন্ধময় হয়ে গেল, শৃগাল-কাক এসে সেই দেহ ভক্ষণ করতে লাগল। রূপনন্দার সংবেগ উৎপন্ন হল- "আমিও এ সুন্দরী মহিলার ন্যায় জরা-ব্যাধি মৃত্যুতে আক্রান্ত হব। দেহ মাত্রই অনিত্যময়।" তার চিন্তা কর্মস্থানাভিমুখে ধাবিত হল এবং অচিরে তৃষ্ণাক্ষয় করে আশ্রবযুক্ত হলেন।[১৮৮]

সুন্দর-সমুদ্র শ্রাবস্তীর বিপুল বিভবশালী শ্রেষ্ঠীপুত্র। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে কোনো একসময় তিনি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণান্তে প্রব্রজ্যা গ্রহণে ইচ্ছুক হলেন। মাতা-পিতাকে রাজী করিয়ে তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে রাজগৃহে গিয়ে বাস করছিলেন। এদিকে শ্রাবস্তীতে কোনো এক সার্বজনীন উৎসবে সুন্দর-সমুদ্রের অপর ভাইয়েরা আনন্দোৎসব করছে দেখে পিতা-মাতার মনে দুঃখের উদ্রেক হল যে, তাদের পুত্র সুন্দর এসব আমোদ-প্রমোদ থেকে বঞ্চিত।

www.pathagar.com

তখন কোনো গণিকা পুরস্কারের বিনিময়ে তাঁকে চীবর ত্যাগ করাবার দায়িত্ব গ্রহণ করল। সে সুন্দর-সমুদ্র স্থবির যেস্থানে ভিক্ষাচরণে বের হতেন সেই স্থানে গিয়ে গৃহ নির্মাণ করে স্থবিরকে প্রতিদিন ভিক্ষা দিতে লাগল। কিছুদিন পর সে স্থবিরকে তার গৃহে আহার্য গ্রহণ করার জন্য প্রার্থনা জানাল। স্থবিরও গৃহে উপবেশন করে গণিকা কর্তৃক পরিবেশিত আহার্য গ্রহণ করতে লাগলেন। কিছুদিন পর গণিকা বলল, "ভন্তে, এখানে আহার্য গ্রহণ নিরাপদ নয়, গৃহাভ্যন্তরে সুখে বসে আহার্য গ্রহণ করুন।" স্থবিরও সরলমনে সম্মত হলেন। অতঃপর গণিকা সমুদ্র স্থবিরকে প্রাসাদের অভ্যন্তরে নির্জন কক্ষে নিয়ে উপবেশন করাল এবং স্ত্রী-লীলা প্রদর্শন করে বলল, "তুমি এখন যুবক আমিও যুবতী, উভয়ে সংসার করে বৃদ্ধাকালে প্রব্রজতি হব।"[১৮৯] গণিকার কথা শুনে স্থবিরের সংবেগ উপস্থিত হল। তিনি জেতবনে প্রত্যাবর্তন করলেন।[১৯০]

বারাণসী নগরের এক তরুণ তক্ষশীলায় বিদ্যাশিক্ষার্থ গমন করেছিলেন। তাঁর আচার ব্যবহার অমায়িক ছিল বিধায় তিনি আচার্যের প্রিয়পাত্র হতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁর মেধা ছিল অত্যন্ত দুর্বল, কোনো গাথা কিংবা শিল্পকর্ম আয়ত্ত্ব করতে না পেরে গুরুগৃহ ত্যাগ করার মনস্ত করেন। আচার্য তাঁর প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল ছিলেন, তাই তিনি তাকে একটি পদযুক্ত মন্ত্র উত্তমরূপে শিক্ষা দিয়ে স্বগৃহে প্রেরণ করলেন। মন্ত্রটি ছিল এরূপ ঃ "ঘট্টেসি ঘট্টেসি কিং ঘট্টেসি ? অহম্পি তং জানামি জানামি।"[১৯১] যুবক বারাণসীতে স্বগৃহে উপস্থিত হয়ে মন্ত্রটি স্মরণ রাখার জন্য প্রায় সময় আনমনে আবৃত্তি করতেন।

একসময় বারাণসীরাজ রাত্রিবেলায় প্রজাদের পর্যবেক্ষণ করার জন্য উক্ত যুবকের বাড়ির নিকটে এসে দেখতে পেলেন, কতিপয় চোর বাড়িতে সিঁদ দিয়ে প্রবেশ করার সময় উক্ত তরুণ অনুচ্চস্বরে মন্ত্রটি আবৃত্তি করলে চোরগণ ভয়ে পালায়ন করে। পরদিন রাজা সেই তরুণকে ডেকে সহস্র টাকা দক্ষিণা দিয়ে মন্ত্রটি শিক্ষা করলেন। সেই সময়ে রাজমন্ত্রী ক্ষৌরকারকে সহস্র টাকা উৎকোচ দিয়ে বলল, "রাজা শ্মশ্রু কর্তন করার সময় তাঁর গলা দ্বিধাখণ্ড করবে। রাজার মৃত্যুর পর আমি রাজা হলে তোমাকে মন্ত্রী করব।" রাজা পরদিন শ্মশ্রু কর্তন করার সময় ক্ষৌরকার তীক্ষ্ণ ক্ষুর দ্বারা তার গলনলি কর্তনের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছিল, তখনই রাজা সেই মন্ত্রটি স্বগতস্বরে উচ্চারণ করলেন, "ঘট্টেসি ঘট্টেসি কিং ঘট্টেসি ? অহম্পি তং জানামি জানামি।" ক্ষৌরকার ভয়ে রাজার পদতলে পতিত হয়ে মন্ত্রীর ষড়যন্ত্রের বিষয় অবহিত করাল এবং স্বীয় দুষ্কর্মের জন্য জীবন ভিক্ষা প্রার্থনা করল।[১৯২] এরূপ চমৎকার লোককাহিনী ধম্মপদট্ঠকথায় বহু লক্ষ্য করা যায়।

দুই উদ্দালক বৃহৎ রুই মাছ পেয়ে পরস্পর বিবাদ করতে লাগল, "শিরোভাগ আমার আর লেজের ভাগ তোমার।" সে সময় এক শৃগাল এসে উপস্থিত হল। উদ্দাল বলল, "মামা, এ মাছটি আমাদের ভাগ করে দিন।" শৃগাল বলল, "অনেকক্ষণ রাজকার্য সমাধা করে এখানে পায়চারী করার জন্য এসেছি, এখন আমি ক্লান্ত, আমার দ্বারা সম্ভব হবে না।" উদ্দাল ছাড়বে না, মাছ ভাগ করে দিতেই হবে। শৃগাল মৎস্যের মাথা ও লেজ ছেদন করে দুই উদ্দালকে অর্পণ করে বলল, "এই মধ্যম খণ্ড বিচারকার্যে নিরত

www.pathagar.com

আমার।"[১৯৩] দুই তরুণ ভিক্ষু কোনো বিহারে দুখণ্ড শ্বেতবস্ত্র ও একখানা মূল্যবান কম্বল প্রাপ্ত হয়েছিল। উভয় ভিক্ষু কম্বলখানা দাবী করে বিবাদে লিপ্ত হল। সে সময় উপস্থিত হলেন ধর্মদেশনায় দক্ষ উপনগ ভিক্ষু। তরুণ ভিক্ষুদ্বয় তাদের বিবাদ মীমাংসা করে দিতে অনুরোধ জানালে তিনি শ্বেতবস্ত্র দু'খণ্ড ভিক্ষুদ্বয়ের হাতে দিয়ে নিজে মূল্যবান কম্বলখানা নিয়ে বললেন, "এ কম্বলখানা দেশক হিসেবে আমারই প্রাপ্য।"[১৯৪] গল্পদ্বয়ে কৌতুকের আভাস লক্ষণীয়।

হিমবন্তের এক সরোবরে বাস করত এক কচ্ছপ। দুটি হংস শাবক আহার অন্বেষণে গিয়ে কচ্ছপের সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করেছিল। তাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হলে হংসদ্বয় বলল, "বন্ধু, আমরা হিমালয়ের কাঞ্চনময় রমণীয় চিত্রকূটে বাস করি। তুমি আমাদের সঙ্গে সেখানে যাবে কি? কচ্ছপ বলল, "বন্ধু, আমি সেখানে কিভাবে যাব?" হংস বলল, "তুমি মুখ সংযত করে যদি একটি দণ্ড কামড়িয়ে রাখতে পার তাহলে আমরা তোমাকে বহন করে নিয়ে যাব।" কচ্ছপ সানন্দে রাজী হলে হংসদ্বয় তাদের কথানুযায়ী আকাশপথে নিয়ে চলল। এই অপূর্ব দৃশ্য অবলোকন করে গ্রাম্যবালকেরা চিৎকার করে বলতে লাগল, "দু'টি হংস দণ্ডের দ্বারা এক কচ্ছপ বহন করে নিয়ে যাচ্ছে।" তখন কচ্ছপ, "হে দুষ্ট বালকগণ, যদি আমার বন্ধুগণ আমাকে বহন করে নিয়ে যায় তাতে তোমাদের ক্ষতি কি?" এই কথা বলার অভিপ্রায়ে মুখ খোলার সঙ্গে সঙ্গে বারাণসীর রাজঙ্গনে পতিত হয়ে কচ্ছপের দেহ দ্বিধাখণ্ডিত হয়ে মৃত্যুবরণ করল।[১৯৫] গল্পগুলো প্রচলিত লোককাহিনীর ন্যায় কৌতুকময় ও উপভোগ্য।

শ্রাবস্তীর জনৈক সম্ভ্রান্ত ধনীর অনিস্থিগন্ধ কুমার বাল্যকাল থেকে নারী সংস্পর্শ ঘৃণা করতেন। তাঁর বিয়ের বয়স হলে পিতা-মাতা তাঁকে পীড়িপীড়ি করতে লাগলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই সম্মতি দিতে চাইলেন না। অবশেষে অনন্যোপায় হয়ে একটি স্বর্ণপ্রতিমা প্রস্তুত করে বললেন, তিনি এরূপ সুন্দরী মহিলাকে বিয়ে করতে প্রস্তুত। চারদিকে ঘটক প্রেরণ করা হল। অবশেষে বহু খোঁজাখুঁজির পর প্রতীমার চেয়ে সুন্দরী এক কন্যার সন্ধান পেয়ে তাকে পুত্রবধূরূপে নির্বাচন করা হল। কিন্তু কন্যার পিতৃগৃহ থেকে আনার সময় পথিমধ্যে সে কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেল। কুমার তার মৃত্যুতে শোকে অভিভূত হয়ে পড়েন।[১৯৬]

সিরিমা (শ্রীমা) ছিলেন প্রখ্যাত চিকিৎসক জীবকের কনিষ্ঠা বোন। তিনি রূপে ছিলেন অদ্বিতীয়া। তিনি রাজগৃহে গণিকাবৃত্তি করতেন। রাজগৃহে সুমন নামক শ্রেষ্ঠীপুত্রের সঙ্গে সদ্ধর্মপরায়ণ উত্তরা নাম্নী শ্রেষ্ঠী কন্যার বিয়ে হয়েছিল। সুমন কুমার ছিলেন কামাসক্ত। তাই উত্তরা ইচ্ছাসত্ত্বেও কোনো পুণ্যকর্ম করতে সমর্থ হতেন না। একসময় প্রতিরাত্রে এক সহস্র টাকার বিনিময়ে পনের দিনের জন্য সিরিমাকে স্বামীর সেবায় নিয়োগ করেছিলেন।[১৯৭] একদিন সিরিমা উত্তরা উপাসিকার প্রতি অপরাধ করেছিলেন। তিনি উত্তরার নিকট অপরাধ ক্ষমা প্রার্থনা করে বললেন, "বুদ্ধ যদি ক্ষমা করেন তাহলেই তাঁকে ক্ষমা করা হবে।" একদিন সশিষ্য বুদ্ধ তাঁর গৃহে আহার্য গ্রহণের জন্য আসলেন। বুদ্ধের

www.pathagar.com

আহার গ্রহণ সমাপ্ত হলে সিরিমা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ তাঁর প্রশংসা করে ধর্মোপদেশ দিলেন যে, "প্রেম-ভালবাসা দিয়ে ক্রোধকে, সাধুতা দিয়ে অসাধুতাকে, দান দ্বারা কৃপণকে আর সত্য দ্বারা মিথ্যাকে জয় করতে হয়।"[১৯৮] বুদ্ধের উপদেশ সিরিমা মনোযোগসহকারে শ্রবণ করলেন। দেশনা শেষে তিনি স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হলেন। তদবধি তিনি প্রতিদিন আটজন ভিক্ষুকে আহার্য দান করতেন।[১৯৯]

কোশলরাজ প্রসেনজিৎ কোনো উৎসবের দিনে সহাসমারোহে শ্রাবস্তী নগর পরিভ্রমণে বের হয়েছিলেন। নগরবাসী সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়ে রাজমহিমা অবলোকন করছিল। জনতার ভিতরে হঠাৎ এক সুন্দরী মহিলোর প্রতি রাজার দৃষ্টি পড়ল অনুসন্ধান করে জানা গেল যে, সুন্দরী রমণী জনৈক দরিদ্র ব্যক্তির স্ত্রী। নারী হরণের নৈতিক দায়িত্ব হতে মুক্তি লাভের জন্য রাজা রমণীর স্বামীকে রাজকার্যে নিযুক্ত করলেন। একদিন রাজা তাকে আদেশ দিলেন, "আগামীকল্য সূর্যোদয়ের পূর্বে বহুদূরে অবস্থিত এক নদী হতে নীলপদ্ম ও অরুণবর্ণের মাটি এনে দিতে হবে। অন্যথা তার শিরচ্ছেদ করা হবে।[২০০] এদিকে রাজা রমণীর চিন্তায় কামানলে দগ্ধ হয়ে বিনিদ্ররজনী যাপন করার সময় বহু দুর্নিমিত্ত দর্শন করছিলেন আর ক্ষণে ক্ষণে রোমাঞ্চিত হচ্ছিলেন। প্রভাতে দৈবজ্ঞ ডেকে পূর্বোক্ত ঘটনা প্রকাশ করলে তাঁরা রাজার জীবননাশের আশঙ্কা করে প্রতিকারের জন্য সর্বশত যজ্ঞের বিধান ব্যক্ত করলেন। রাজা মহাযজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। যজ্ঞের জন্য প্রত্যেক প্রকারের জীবজন্তু থেকে নর-নারী ও বালক-বালিকা পর্যন্ত জড়ো করা হল। রাজপ্রাসাদে মহাশোকের ছায়া নেমে আসল। এসব দেখে মহারানী মল্লিকাদেবী রাজাকে বুদ্ধের নিকট নিয়ে গেলেন। এদিকে রূপসী রমণীর স্বামীও সেই নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পদ্ম ও মাটি নিয়ে আসার পরও রাজপ্রাসাদে প্রবেশ না করতে পেরে বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করে বুদ্ধের শরণাপন্ন হল। তাঁরা উভয়ে বুদ্ধকে জানালেন যে, গতরাত্রি যেন অতি দীর্ঘ বোধ হয়েছে। বুদ্ধ উভয়ের কথা শুনে উপদেশ দিলেন, জাগ্রত ব্যক্তির রাত্রি দীর্ঘ হয়, ক্লান্ত ব্যক্তির পথ দীর্ঘ হয় আর যে মূর্খ ব্যক্তি সত্যধর্ম জানে না তার সংসার যাত্রাও দীর্ঘ হয়।[২০১]

সোরেয়্য শ্রেষ্ঠীপুত্রের উপাখ্যানটি[২০২] রূপকথার মত রোমাঞ্চকর। একসময় শ্রেষ্ঠীপুত্র স্নান করার জন্য নগরের বাহিরে গিয়ে মহাকচ্চায়নের দৈহিক রূপ লাবণ্য দর্শন করে প্রদুষ্ট মনে চিন্তা করছিলেন, "অহো, স্থবির যদি আমার ভার্যা হত, আমার স্ত্রীর শরীর-বর্ণও তার ন্যায় হত।" এরূপ চিন্তা করার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর পুংলিঙ্গের পরিবর্তন হয়ে স্ত্রীলিঙ্গের চিহ্ন উৎপন্ন হল। এতে তিনি লজ্জিত হয়ে গৃহত্যাগ করে পলায়ন করতে লাগলেন এবং তক্ষশীলাগামী শকটের অনুসরণ করতে লাগলেন। শকট-চালকেরা তাঁকে শকটে তুলে নিয়ে তক্ষশীলার এক শ্রেষ্ঠী পুত্রকে অর্পণ করল। শ্রেষ্ঠীপুত্রও তাঁকে পত্নীরূপে গ্রহণ করে একত্রে বাস করতে লাগলেন। তাঁদের সংসার জীবনে যথাসময়ে দুটি পুত্রের জন্ম হল।

www.pathagar.com

সোরেয়্য শ্রেষ্ঠীপুত্রের অন্য এক বন্ধু বাণিজ্যার্থে তক্ষশীলায় গমন করলে স্ত্রীরূপী শ্রেষ্ঠপুত্রকে দেখে চিনতে পারল এবং গৃহে আহ্বান করে যথাযথ পরিচর্যা করত নিজের পরিচয় দান করলেন। বন্ধু সমস্ত বিষয় অবহিত হয়ে তাঁকে মহাকচ্চায়ন স্থবিরের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করতে উপদেশ দিলেন। অনন্তর স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করে বহুবিধ উপাদেয় আহার্য দ্বারা সেবা করত তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। স্থবির ক্ষমা করলেন। সঙ্গে সঙ্গে তিনি পূর্ববৎ পুরুষত্ব প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর তিনি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভে সক্ষম হলেন। বুদ্ধ উপদেশ দিলেন- সৎপথে চালিত চিত্ত পরম বন্ধু ও উপকারী।[২০৩]

শ্রাবস্তীর অদত্তপূর্ব ব্রাহ্মণ অতিশয় কৃপণ। তাঁর একমাত্র পুত্র মৃষ্টকুণ্ডলীর পাণ্ডুরোগ হলে সুচিকিৎসার অভাবে মৃত্যুশয্যায় পতিত হয়।[২০৪] ব্রাহ্মণ পুত্রের মৃত্যু আসন্ন ভেবে তাকে বাড়ির অলিন্দে ফেলে রাখেন। বুদ্ধ জেতবন থেকে এসে দূর হতে তাঁর দেহরশ্মি বিচ্ছুরিত করলে মৃষ্টকুণ্ডলী বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাসহকারে বন্দনা জ্ঞাপন ও শরণ গ্রহণ করে। সঙ্গে সঙ্গে তার মৃত্যু হয়। মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে। এদিকে ব্রাহ্মণ প্রতি রাত্রে পুত্রের শ্মশানে গিয়ে পুত্রের জন্য কান্না করতে থাকেন। দেবপুত্র স্বর্গ থেকে পিতার এরূপ কার্য দিব্যদৃষ্টিতে অবলোকন করে সেও শ্মশানের এক প্রান্তে বসে কাঁদতে লাগল। ব্রাহ্মণ বালকের কান্না দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলেন,"আমি পুত্র শোকে কান্না করছি, তুমি কি জন্য কান্না করছ?" দেবপুত্র উত্তর করলেন, "আমার রথের চক্রের জন্য চন্দ্র-সূর্যের প্রয়োজন।" ব্রাহ্মণ বললেন, "তুমি মূর্খ, মৃত্যুতেও রবি-শশী পাবে না।" দেবপুত্র বললেন, "যা দেখা যাচ্ছে তার জন্য কান্না করা মূর্খতা, নাকি যা দেখা যায় না তার জন্য কান্না করা অধিক মূর্খতা।[২০৫] ব্রাহ্মণের সুবুদ্ধির উন্মেষ হল। তিনি বুঝতে পারলেন, প্রসন্ন অন্তরে সৎকর্ম করলে তার ফল হয় কল্যাণকর। অতঃপর তিনি সৎকর্মে আত্মনিয়োগ করলেন।[২০৬]

অনুরুদ্ধ ছিলেন সিদ্ধার্থ গৌতমের পিতৃব্যভ্রাতা, মহানামের কনিষ্ঠ। একদিন ছয়জন ক্ষত্রিয় বালকের সঙ্গে পিষ্টক বাজী রেখে ক্রীড়া আরম্ভ করেছিলেন। তখন অনুরুদ্ধ ক্রীড়ায় পরাজিত হয়ে মাতার নিকট পিষ্টকের জন্য প্রেরণ করলে মাতা বৃহৎ সুবর্ণপাত্র পিষ্টকে পূর্ণ করে পাঠালেন। এভাবে তিনবার পিষ্টক প্রেরণ করার পর চতুর্থবারে মাতা বললেন, "এখন পিষ্টক আর নেই।" ভৃত্য অনুরুদ্ধকে জানালে তিনি বললেন, "নাই পিষ্টক নিয়ে এস।" কারণ 'নাই' শব্দ তিনি কখনও শোনেননি। মাতা ছেলেকে 'নাই' শব্দ বুঝাবার জন্য একটি খালি থালা ঢাকনা দিয়ে পুত্রের নিকট পাঠালেন। পুত্র ঢাকনা উল্টিয়ে দেখেন থালাপূর্ণ পিষ্টক। পিষ্টকের সুবাসে সমগ্র নগর সুবাসিত হয়ে গেল। পিষ্টক মুখে দেওয়া মাত্রই স্বাদ যেন সহস্র শিরা-উপশিরায় প্রতিষ্ঠিত হল। অনুরুদ্ধ মাকে বললেন, তিনি যেন সবসময় নাই পিষ্টকই তাঁর জন্য প্রস্তুত করেন। মাতা ভৃত্যের নিকট তার আনুপূর্বিক বিষয় জ্ঞাত হয়ে বুঝতে পারলেন, এটা তাঁর অতীত জন্মের পুণ্যের ফল।[২০৭]

www.pathagar.com

রাজগৃহের নিকটবর্তী সক্কারনগরে কোসিয় নামক শ্রেষ্ঠীর পিষ্টক ভোজনের সাধ হল। গৃহে প্রকাশ্যে পিষ্টক প্রস্তুত করলে অনেক অর্থ ব্যয় হবে মনে করে তিনি তাঁর পত্নীকে প্রাসাদের সপ্ততলে গোপন কক্ষে পিষ্টক প্রস্তুতের নির্দেশ দিলেন। শ্রেষ্ঠীপত্নী তাঁকে সঙ্গে নিয়ে প্রাসাদের সপ্ততলে নির্জন কক্ষে পিষ্টক তৈরি করতে লাগলেন এমন সময় বুদ্ধের নির্দেশক্রমে আকাশপথে সেখানে উপস্থিত হলেন মহামোগগল্লান স্থবির। কৃপণ শ্রেষ্ঠী তাঁকে দেখে প্রমাদ গুণলেন। স্থবির তাঁর অবস্থা লক্ষ্য করে ধর্মোপদেশ প্রদান করলেন। ধর্মদেশনা শ্রবণ করে বুদ্ধের প্রতি তাঁর প্রসন্ন চিত্ত উৎপন্ন হল। স্থবির তাঁর দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে পিষ্টকসহ শ্রেষ্ঠী দম্পতিকে বুদ্ধ সমীপে নিয়ে আসলেন। তাঁরা জেতবনের ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ বুদ্ধকে পিষ্টক দ্বারা পরিতৃপ্ত করলেন।[২০৮]

রোহণী ছিলেন অনুরুদ্ধের বোন। তিনি শ্বেত-কুষ্টিরোগে ভোগছিলেন। তিনি ভাইয়ের নিকট যেতেন না, কারণ তিনি ভয় পাচ্ছিলেন যে এ রোগ যদি তাঁর মধ্যে সংক্রমিত হয়। অনুরুদ্ধ তাঁকে পাপ থেকে মুক্তি পাবার জন্য ভিক্ষু-সঙ্ঘের বাসোপযোগী একটি বিশ্রামাগার প্রস্তুত করতে বললেন। রোহিণী বিশ্রামাগার প্রস্তুত করে এটাকে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে রাখতেন। আশ্চার্যের বিয়ষ, বিশ্রামাগার তৈরি করার পর তিনি সুস্থ হয়ে গেলেন। কিছুদিন পর বুদ্ধ কপিলাবস্তু আগমন করলে রোহিণীকে আহ্বান করলেন। তিনি উপস্থিত হলে বুদ্ধ তাঁর অতীত জীবনের কাহিনী বিবৃত করলেন ঃ তিনি অতীতে বারাণসীরাজের স্ত্রীরূপে জন্ম নিয়েছিলেন। রাজা তখন কোনো নর্তকীর প্রতি প্রেমাসক্ত হয়েছিলেন। রাণী তা অবগত হয়ে সেই রমণীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হন এবং তার কাপড় ও স্নানজলে কিছু ঔষধ মিশ্রণ করে দিয়েছিলেন যা ব্যবহারের পর তার সমস্ত দেহে প্রচণ্ড খোসপাঁচড়া উঠে। এই পাপের ফলেই তিনি ইহজন্মে এরূপ রোগগ্রস্ত হয়েছিলেন। অবশ্য পরবর্তী সময়ে তাঁর দেহ দিব্যময় হয়েছিল এবং তিনি স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।[২০৯]

বোধিরাজকুমার 'কোকনদ' নামে অতি মনোরম গগনচুম্বী একটি প্রাসাদ নির্মাণ করেছিলেন। এরূপ কারুকার্যখচিত প্রাসাদ আর কোথাও ছিল না। বোধি রাজকুমার ভাবলেন, 'শিল্পীরা যাতে এরূপ প্রাসাদ আর কোথাও নির্মাণ না করতে পারেন তজ্জন্য তাদের হত্যা বা হস্ত-পদ ছেদন অথবা চক্ষু উৎপাটন করতে হবে।" তিনি এই সিদ্ধান্ত তার এক বন্ধুকে অবহিত করলে তিনি শিল্পীদের নিকট বোধিরাজের সংকল্পের কথা জানালেন। প্রাসাদ নির্মাণ সমাপ্ত হওয়ার পরও শিল্পী জানাল যে, কাজ আরও কিছু বাকী, আরও কিছু ভাল কাঠ প্রয়োজণ। বোধিরাজ কাঠের ব্যবস্থা করে দিলেন। শিল্পী সেই কাঠ দ্বারা একটি শকুণ নির্মাণ করে শকুণের উদরে স্ত্রী-পুত্র সকলে উপবেশন করে জানালা পথে উড়ে পলায়ন করল। কথিত আছে- তিনি হিমালয়ে অবতরণপূর্বক একটি নগর পত্তন করেছিলেন এবং তিনি 'কাষ্ঠবাহন' রাজা নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।[২১০]

বুদ্ধ একসময় বারাণসীর সপ্তশ্রী নামক বৃক্ষমূলে অবস্থানকালে এরকপত্ত নামক জনৈক নাগ রোদন করতে করতে জানাল যে, সে অতীতে কশ্যপবুদ্ধের সময় ধ্যানী ভিক্ষু ছিলেন,

www.pathagar.com

কিন্তু পাপকর্ম করায় আর দুর্বল মনুষ্য জন্ম লাভে সক্ষম হচ্ছে না।[২১১] বুদ্ধ উপদেশ দিলেন, মনুষ্যজন্ম, সদ্ধর্ম শ্রবণ ও বুদ্ধগণের উৎপত্তি অতীত দুর্লভ।[২১২]

বুদ্ধ কূটাগারশালায় বাস করার সময় জনৈক বগ্‌গুলি ব্রতধারী কুহক ব্রাহ্মণ বৃক্ষে আরোহনপূর্বক পাদদ্বয়ে বৃক্ষশাখা ধরে অধোশিরে ঝুলে থাকত এবং বলত, "আমাকে অর্থ দাও, বিত্ত দাও, যদি না দাও তাহলে এখান হতে পতিত হয়ে এই নগরকে ধ্বংস করব।" নগরবাসীরা ভয়ে যা চাইত তাই প্রদান করত।[২১৩] এভাবে সে নগরবাসীকে ঠকাত।

রাজা উগ্‌গসেনের পত্নী দিন্নাদেবী ছিলেন তথাগত বুদ্ধের উপাসিকা। রাজা হওয়ার পূর্বে তিনি একটি নিগ্রোধবৃক্ষের দেবীর উদ্দেশ্যে মানত (প্রতিজ্ঞা) করেছিলেন যে, তিনি যদি পিতার মৃত্যুর'পর সিংহাসন লাভ করতে পারেন, তাহলে জম্বুদ্বীপের শতরাজার রক্তে পূজা করবেন। তিনি সৌর্যবলে প্রত্যেক রাজাদের পরাজিত করে সিংহাসন অধিকার করেছিলেন। অনন্তর তিনি জম্বুদ্বীপের একশজন স্বস্ত্রীক রাজাকে বন্দি করে আনয়ন করলেন দেবী-পূজা করার জন্য। দেবী যখন বুঝতে পারলেন যে শতজন রাজাকে তাঁর উদ্দেশ্যে হত্যা করা হবে তখন হৃদয় করুণায় সিক্ত হয়ে উঠল। তিনি রাজাকে আহ্বান করে বললেন- "পূজার জন্য রাণী দিন্নাকেও আনতে হবে।" রাণীকে পূজার নৈবেদ্য দেবার জন্য আনয়ন করা হল। রাণী বুদ্ধবাণী দ্বারা উপদেশ দিলেন। দেবীও সেই উপদেশ অনুমোদন করলেন। রাজারও সজ্ঞান হল, তিনি বন্দি রাজাদের মুক্তি দিলেন।[২১৪] রাণীর বদৌলতে জীবন রক্ষা পেল শত রাজার।

শ্রাবস্তীর কোক নামক এক ব্যাধ কুকুরপাল নিয়ে বনে শিকার করে জীবিকা নির্বাহ করত। একদিন শিকারে যাবার সময় পথিমধ্যে ভিক্ষুকে দেখে যাত্রা অশুভ হবে মনে করে গৃহে ফিরে আসল। পরদিনও শিকারে বের হয়ে উক্ত ভিক্ষুকে দেখে তাঁর প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে শিকারী কুকুর দল লেলিয়ে দিল। কুকুরের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য ভিক্ষু নিকটস্থ একটি বৃক্ষে আরোহণ করলে শিকারী তাঁকে লক্ষ্য করে বিষাক্ত তীর নিক্ষেপ করল। ভিক্ষু শরাহত হয়ে তীব্র বেদনায় ছটফট করতে লাগলেন। ভিক্ষু বৃক্ষ হতে অবতরণ করার সময় তাঁর রঙিন উত্তরীয়খানা শিকারীর মাথার উপর পড়ল। কুকুরপাল শিকারীকে ভিক্ষু মনে করে তীব্রভাবে আক্রমণ করে মেরে ফেলল।[২১৫] অন্যায়কারীর প্রতিফল তাকেই ভোগ করতে হয়।[২১৬]

একসময় বুদ্ধ ধর্মপ্রচারের জন্য আলবীরাজ্যে গমনপূর্বক অগ্‌গালব নামক চৈত্যে বাস করছিলেন। আলবীর অধিবাসীগণ বুদ্ধের দর্শন লাভ করে পুলকিত চিত্তে তাঁকে আন্তরিক সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে তাঁর ধর্মোপদেশ শ্রবণ করছিল। সেই সময়ে আলবীর এক তন্তুবায় কন্যা ধর্মসভায় বুদ্ধের নিকট ধর্ম শোনতে গিয়েছিল। বুদ্ধ তাকে চারটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করেছিলেন। এই প্রশ্নোত্তরগুলো অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এবং রূপকাশ্রয়ী। বুদ্ধ জিজ্ঞেস করলেন, "কুমারী তুমি কোথা হতে এসেছ ?" কুমারী উত্তর করল, "প্রভু, আমি জানি না।"

www.pathagar.com

দ্বিতীয় প্রশ্ন ঃ "কোথায় যাবে ?"
উত্তর ঃ "প্রভু, আমি জানি না।"
তৃতীয় প্রশ্ন ঃ "জান না ?"
উত্তর ঃ "প্রভু, জানি।"
চতুর্থ প্রশ্ন ঃ "জান ?"
উত্তর ঃ "প্রভু, আমি জানি না।"

কুমারীর এরূপ উত্তর শুনে অনেকে তাঁর নিন্দা করতে লাগল। বুদ্ধ কুমারীকে এই কথোপকথনের তাৎপর্য বিশদভাবে বুঝিয়ে দিতে বললেন। কুমারী বলল যে, সে পূর্বজন্মে কোথায় জন্মগ্রহণ করেছিল অর্থাৎ কোন জন্ম হতে এখানে জন্মগ্রহণ করেছে তা সে জানে না, মৃত্যুর পর কোথায় জন্মগ্রহণ করবে তাও সে জানে না। তার মৃত্যু যে একান্ত অনিবার্য এ বিষয়ে সে জানে। তবে মৃত্যুর পর সে কোথায় জন্মগ্রহণ করবে জানে না।[২১৭] গল্পটি রূপকধর্মী ও কৌতূহলোদ্দীপক।

রাজগৃহের কোনো কৃষক-কন্যা একসময় মাঠে ধান সংগ্রহ করার সময় মহাকশ্যপ স্থবির পিপ্‌ফলিগুহায় সপ্তদিন ধ্যানান্তে ভিক্ষা সংগ্রহের জন্য সেই কৃষক-কন্যার নিকট উপস্থিত হলেন। কন্যা অতীব আনন্দিত হয়ে তাঁর পাত্রে শুকনো চালের গুঁড়ো দান করলেন, স্থবির তা গ্রহণ করলেন। কন্যা দান দিয়ে স্বস্থানে ফিরে আসলে এক বিষাক্ত সর্পের দংশনে মৃত্যুমুখে পতিত হল। দানের সুকৃতির ফলে সে তাবতিংস স্বর্গে বিমানে উৎপন্ন হল। তখন তার নাম হয়েছিল লাজদেবধীতা। সে দিব্যজ্ঞানে পূর্বকর্ম বিষয় অবগত হয়ে অধিকতর সুকৃতির প্রত্যাশায় মহাকশ্যপের সেবা করার জন্য স্বর্গ হতে আসল। সে বিহারঙ্গন পরিষ্কার করত এবং ভিক্ষুর ব্যবহারের জল প্রস্তুত করে রাখত। দুদিন পর জানতে পারলেন যে, সে একজন স্বর্গের দেবী। অতঃপর তাকে সেই কর্ম করতে বারণ করা হল। বুদ্ধ এ বিষয় অবগত হয়ে তাকে ধর্মদেশনা করলেন, দেবী স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হল।[২১৮]

বুদ্ধের প্রধান অগ্রশাবক সারিপুত্র স্থবির প্রচুর ধন-সম্পদ ত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি অনুক্রমে তাঁর তিন ভগ্নী চালা, উপচালা ও শিশুপচালা এবং দুই ভ্রাতা চন্দ্র ও উপসেনকে প্রব্রজ্যা দান করেছিলেন। গৃহে তাঁর মাতা ও সর্বকনিষ্ঠ ভ্রাতা সপ্তবর্ষীয় রেবত কুমার ছিলেন। তাঁরা সারিপুত্র ও বুদ্ধের প্রতি প্রসন্ন ছিলেন না। কুমার বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তাঁকেও হারাবার ভয়ে মাতা তাড়াতাড়ি তাঁর বিয়ের ব্যবস্থা করেন। রেবত কুমার বিয়ের অনুষ্ঠানে কন্যার অশীতিপর বৃদ্ধ পিতামহকে দেখে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। বিয়ের পর কন্যার সঙ্গে স্বীয় গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় তিনি মধ্যপথে পলায়ন করে নিকটবর্তী অরণ্যাশ্রমে ভিক্ষুদের নিকট উপনীত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি জ্ঞাতিগণের ভয়ে সেই আশ্রম হতে অন্য আশ্রমে গিয়ে ধ্যান-সাধনায় রত হন এবং অচিরে তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।[২১৯]

www.pathagar.com

খজ্জুত্তরা ছিলেন কোসম্বী রাজ-মহিষী শ্যামাবতীর পরিচারিকা। প্রতিদিন আট কার্যাপণ মূল্যের ফুল রাণীকে এনে দেওয়ার দায়িত্ব ছিল খজ্জুত্তরার উপর। তিনি চার কার্যাপণ মূল্যের ফুল এনে দিয়ে বাকী চার কার্যাপণ আত্মসাৎ করতেন। একদা ফুলের জন্য মালীর বাড়ি গিয়ে জানতে পারলেন যে, সেদিন গৃহে বুদ্ধ আগমন করে ধর্মদেশনা করবেন। সেদিন তিনি বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর তিনি আট কার্যাপণ মূল্যের ফুল নিয়ে রাণীকে অর্পণ করলে তিনি জানতে চাইলেন- ঐ মূল্যে তিনি এতগুলো ফুল কিভাবে ক্রয় করলেন। পরিচালিকা পূর্বোক্ত বিষয় ব্যক্ত করে বললেন, "আমি বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে চুরিতে পাপের বিষয় অবগত হয়েছি। অদ্য হতে আর দুষ্কর্ম করব না।" শ্যামাবতী তাঁকে বুদ্ধের ধর্ম পুনরাবৃত্তি করার জন্য অনুরোধ করলেন। তিনি শ্যামাবতী ও পাঁচশ পরিচারিকাকে বুদ্ধদেশিত ধর্ম আবৃত্তি করে শোনালেন। তদবধি খজ্জুত্তরাকে রাণী ও পঞ্চশত পরিচারিকা মাতা ও শিক্ষকের ন্যায় শ্রদ্ধা করতেন। তাঁকে প্রতিদিন বুদ্ধের নিকট ধর্ম শ্রবণের জন্য পাঠাতেন, আর তিনি শ্রুত ধর্ম তাঁদের নিকট বিবৃত করতেন। পরবর্তী সময়ে তিনি ত্রিপিটক শাস্ত্রে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হন।[২২০]

বুদ্ধের অন্যতম শিষ্য মহাকাত্যায়ন স্থবির অবন্তীনগরে অবস্থানকালে তাঁর ধর্ম শ্রবণ করে 'শ্রোণকোটিকর্ণ' নামে জনৈক উপাসক যুবক স্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। কিছুদিন পর তিনি গুরুর অনুমতি নিয়ে শ্রাবস্তীতে বুদ্ধদর্শনে গমন করেন। যথাসময়ে অবন্তী নগরে প্রত্যাবর্তন করলে তাঁর মাতা লোকমুখে শুনতে পান যে, তাঁর পুত্র উত্তমরূপে সদ্ধর্ম দেশনা করেন। তিনি পুত্রের মুখে ধর্মদেশনা শ্রবণ করার জন্য এক বিরাট ধর্মসভার আয়োজন করেন। গৃহে একজনমাত্র দাসী রেখে ধর্মশ্রবণের জন্য কোটিকর্ণের মাতাসহ সকলে ধর্মসভায় গিয়েছিলেন। তাঁদের পরিবারে বিপুল ধনসম্পদ ছিল। সকলে ধর্মসভায় উপস্থিত জানতে পেরে এক বিরাট ডাকাত দল তাঁদের বাড়ি আক্রমণ করে ধন-সম্পদ লুণ্ঠনে ব্যাপৃত হল। দাসী গোপনে এই সংবাদ ধর্ম শ্রবণরত কোটিকর্ণের মাতার নিকট গিয়ে বললে তিনি ধর্মশ্রবণের অন্তরায় সৃষ্টি না করে গৃহে ফিরে যেতে বললেন। সে সময় ডাকাত সর্দার কোটিকর্ণের মাতার গতিবিধি লক্ষ্য রাখার জন্য ধর্মসভায় উপস্থিত ছিলেন। দাসী পর পর তিনবার এসে সংবাদ দেওয়ার পরও তিনি অপ্রমত্তভাবে ধর্মশ্রবণ করতে দেখে সরদারের চৌর্যবৃত্তির প্রতি ঘৃণা উৎপাদন হল। সে তার দলবলসহ চিরতরে চৌর্যকর্ম পরিত্যাগ করে কোটিকর্ণের নিকট দীক্ষা গ্রহণ করল।[২২১]

শ্রাবস্তীতে এক দরিদ্র দম্পতি-ব্রাহ্মণের একখানিমাত্র কাপড় ছিল। একজন বাড়ির বাহিরে গেলে অপরজন বাড়ির ভিতরে বিবস্ত্র অন্তরীণ বাস করতেন। একদিন ব্রাহ্মণ উক্ত কাপড়খানা পরিধান করে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করতে শ্রাবস্তীতে গেলেন। তিনি বুদ্ধের দানময়-শীলময়-ভাবনাময় ধর্মবাণী শুনে এতই শ্রদ্ধাসম্পন্ন হলেন যে, তাঁদের একমাত্র কাপড়খানা বুদ্ধের হাতে দান করে দিলেন। রাজা প্রসেনসিৎ তাঁর শ্রদ্ধা দেখে পুলকিত

www.pathagar.com

হলেন, তাঁকে প্রচুর অর্থ ও কাপড় প্রদান করলেন। তিনি সামান্য মাত্র নিজের জন্য রেখে তাও দান করে দিলেন।[২২২] বুদ্ধ উপদেশ দিলেন, শুভকাজে তৎপর হতে হবে, আলস্য ত্যাগ করে সৎকর্ম সমাপাদন করতে হবে।[২২৩] ঘটনাগুলো অনেকটা খণ্ডচিত্র, কিন্তু অতি চমৎকার ও উপভোগ্য।

প্রাচীন ভারতের ধনাঢ্য ও অভিজাত পরিবারের প্রতিচ্ছবি ফুটে উঠেছে চূলসুভদ্রা ও মহাউপাসিকা বিশাখার জীবন কাহিনীতে। চূলসুভদ্রা ছিলেন শ্রাবস্তীর ধনাঢ্য শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিকের কন্যা। উগ্‌গনরের উগ্‌গশ্রেষ্ঠী ছিলেন অনাথপিণ্ডিকের বাল্যবন্ধু ও সতীর্থ। তাঁরা প্রতিজ্ঞাবদ্ধ ছিলেন যে, পরস্পরের পুত্র-কন্যা সম্প্রদান করে উভয়ের মধ্যে আন্তরিকতা গড়া হবে। একসময় উগ্‌গশ্রেষ্ঠী ব্যবসা করার জন্য শ্রাবস্তীতে উপস্থিত হলে অনাথপিণ্ডিকের আতিথ্য গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর বাড়িতে সুন্দর সুলক্ষণা চূলসুভদ্রার আচরণ দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন। শ্রেষ্ঠী পূর্ব প্রতীজ্ঞা স্মরণ করে চূলসুভদ্রাকে স্বীয় পুত্রের জন্য বরণ করার প্রস্তাব দিলেন। উগ্‌গশ্রেষ্ঠী ছিলেন মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন, তাই অনাথপিণ্ডিক বুদ্ধের অনুমতিক্রমে কন্যা সম্প্রদানে সম্মত হলেন। অনন্তর বুদ্ধের অনুমতিক্রমে যথাসময়ে মহাসমারোহে শ্রাবস্তীর অনাথপিণ্ডিকের গৃহে কন্যা সম্প্রদান অনুষ্ঠান সম্পন্ন হল। সুভদ্রা শ্বশুরালয়ে যাবার সময় দশবিধ[২২৪] উপদেশ দিয়ে উগ্‌গনগরের আটজন কুটুম্বিকের উপর দেখাশোনার ভার প্রদান করেছিলেন। উগ্‌গশ্রেষ্ঠীর আত্মীয়-স্বজন চূলভদ্রাকে সাড়ম্বরে বরণ করে নিলেন।

একসময় কোনো মাঙ্গলিক অনুষ্ঠানে বাড়িতে নগ্ন সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণ করা হয়েছিল। শ্রেষ্ঠী নববধূকে এসে সন্ন্যাসীগণকে প্রণাম করতে বললেন। সুভদ্রা নগ্ন সন্ন্যাসীগণকে প্রণাম করতে লজ্জাবোধ করে আসতে অসম্মতি জ্ঞাপন করলেন। শ্রেষ্ঠী অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে বাড়ি থেকে বের হতে নির্দেশ দিলেন। সুভদ্রা অকারণে দোষ দিতে বারণ করলেন। কুটুম্বিকের উপস্থিতিতে স্থির হল যে সুভদ্রা নির্দোষ। সুভদ্রার স্বামী বললেন, "এই সন্ন্যাসীগণ নিলর্জ্জ, তাই বন্দনা করেনি।" চূলসুভদ্রা নিজেদের শ্রমণগণের ভূয়সী করতে লাগলেন, "আমার শ্রমণগণ শান্তেন্দ্রিয়, তাঁদের কায়-বাক্য-মন সুবিশুদ্ধ, তাঁরা অষ্টলোধর্মে[২২৫] অকম্পিত ও অবিচলিত।"

শ্রেষ্ঠী সুভদ্রার মুখে শ্রমণদের প্রশস্তি শুনে সন্তুষ্ট হয়ে তাঁদেরকে দেখাবার জন্য বললেন। সুভদ্রা বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য উত্তম খাদ্যাভোজ্য সজ্জিত করে প্রাসাদোপরি উঠে জেতবন অভিমুখী হয়ে বন্দনা করত সুগন্ধি ধূপ ও পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করে বললেন, "ভন্তে, ভগবান, আগামীকল্যের জন্য বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করছি, ইহা আমার সজ্ঞানে নিমন্ত্রণরূপে জানবেন।" এরূপ বলে আটমুষ্ঠি রাজমালতী পুষ্প আকাশে উক্ষেপণ করলেন। সেই পুষ্পরাশি শ্রাবস্তীর জেবতনে চার পরিষদে[২২৬] ধর্মদেশনারত বুদ্ধের মস্তকোপরি বিতানরূপে স্থিত হলে বুদ্ধ অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে অবগত হলেন সুভদ্রা কর্তৃক নিমন্ত্রণ-বিষয়। তিনি পরদিন পঞ্চশত ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ উগ্‌গনগরে উগগশ্রেষ্ঠীর বাড়িতে উপস্থিত

www.pathagar.com

হলেন। শান্ত সমাহিত গজগতি সম্পন্ন আনত আনন সৌম্যকান্তিময় বুদ্ধ ও শ্রাবকসঙ্ঘকে দেখে শ্রেষ্ঠী ও তাঁর পরিবার-পরিজন শ্রদ্ধায় অবনমিত হয়ে পড়লেন। তাঁরা পরম শ্রদ্ধাসহকারে বন্দনান্তে উত্তম আহার্য দ্বারা সেবা করলেন। অনন্তর আজীবন বুদ্ধের উপাসকরূপে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করলেন।[২২৭]

মহাউপাসিকা বিশাখার জীবন কাহিনী ধম্মপদট্ঠকথার[২২৮] অন্যতম প্রধান আকর্ষণীয় উপাখ্যান। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পুত্র।[২২৯] তিনি অঙ্গ রাজ্যের ভদ্রিয় নগরে বাস করতেন। ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী রাজা প্রসেনজিদের অনুরোধক্রমে কোশলরাজ্যের সাকেত নগরে স্থায়ীভাবে বসবাস করছিলেন।[২৩০] বিশাখা ছিলেন ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠীর কন্যা। মেণ্ডক শ্রেষ্ঠীর পরিবারের সকলেই ছিলেন ত্রিরত্নে শরণাপন্ন। শ্রাবস্তীর মিগার শ্রেষ্ঠী ছিলেন নির্গ্রন্থদের অনুসারী। তাঁর পুত্র পূর্ণবর্ধনের সঙ্গে শ্রেষ্ঠী ধনঞ্জয় কন্যা বিশাখার পরিণয় হয়। তাঁদের পরিণয়পর্ব এবং শ্বশুরবাড়িতে বিশাখার প্রথম জীবন রূপকথার মতো রোমাঞ্চকর ও পরম উপভোগ্য।[২৩১]

মিগার শ্রেষ্ঠীর পুত্র পুণ্যবর্ধনের বয়সকালে বিয়ের প্রস্তাব দেওয়া হলে তিনি শর্ত দিলেন যে, পঞ্চকল্যাণী কন্যা ব্যতীত বিয়ে করবেন না। পঞ্চকল্যাণময় লক্ষণসমূহ হচ্ছে- (১) কেশকল্যাণ অর্থাৎ যাঁর মস্তকের চুল ময়ূরপুচ্ছের মত, (২) মাংসকল্যণ অর্থাৎ যাঁর অধরোষ্ঠ সর্বদা পক্কবিম্বফলের মত, (৩) অস্থিকল্যাণ অর্থাৎ যাঁর দন্তপাটিদ্বয় মুক্তার মত শুভ্র, উজ্জ্বল, ফাঁকবিহীন ও সমদীর্ঘ, (৪) ছবিকল্যাণ অর্থাৎ যাঁর দেহের বর্ণ সর্বাঙ্গে সমুজ্জ্বল, (৫) বয়ঃকল্যাণ অর্থাৎ বিশ সন্তানের জননী হলেও যিনি স্থির যৌবনা এবং শতবর্ষ বয়সেও যাঁর কেশ পরিপক্ব হবে না।

পূর্ণবর্ধনের মাতা-পিতা একশ আটজন ব্রাহ্মণকে নিমন্ত্রণ করে উপাদেয় আহার্য দ্বারা সেবা করে প্রচুর অর্থ দিয়ে বললেন, "পুত্রের জন্য পঞ্চকল্যাণময়ী অপূর্ব সুন্দরী কন্যা অনুসন্ধান করতে হবে।" আর সেই কন্যাকে দেবার জন্য দিলেন বহুমূল্য স্বর্ণহার। ব্রাহ্মণগণ এরূপ লক্ষণযুক্ত কন্যার খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। অবশেষে সাকেত নগরে এসে উপস্থিত হলেন। সেদিন নগরীতে হচ্ছিল কোনো উৎসব। এ উৎসবের দিনে কুমারী কন্যাগণ সাধারণত সখীগণসহ নদীতে গিয়ে স্নানাদি করত। অবিবাহিত তরুণেরা তাদের পরস্পরের পছন্দমত কন্যার কণ্ঠে পুষ্পমাল্য দিয়ে বরণ করত। ব্রাহ্মণেরা সেই নদী তীরে এসে উপনীত হলেন। তাঁরা নিকটস্থ কোনো গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। বিশাখা পাঁচশ সখীসহ সেই নদীতে এলেন। হঠাৎ শুরু হল ঝড়বৃষ্টি। বিশাখার সখীগণ দ্রুত দৌড়ে গৃহে প্রবেশ করল, আর বিশাখা স্বাভাবিক গতিতে ঝড়ে ভিজে ভিজে প্রবেশ করলেন। ব্রাহ্মণেরা তাঁর দন্তলক্ষণ ব্যতীত অপর চার লক্ষণ দেখে দন্ত দেখার উদ্দেশ্যে বললেন, "সকল তরুণী দ্রুত দৌড়ে গৃহে প্রবেশ করেছে, অথচ তুমি বৃষ্টিতে ভিজে ধীর-পদে প্রবেশ করলে কেন? তুমিও তো তাদের মত না ভিজে শুষ্কবস্ত্রে দৌড়ে আসতে পারতে?" বিশাখা বললেন, "চার প্রকার ব্যক্তির দ্রুত গমন শোভনীয় নহে, বিসদৃশ। রাজা

www.pathagar.com

বা মহারাজের দ্রুত গমন, মঙ্গলহস্তীর দ্রুত গমন, ভিক্ষুর দ্রুত গমন এবং নারীর দ্রুত গমন বিসদৃশ ও অশোভনীয়। এছাড়া দৌড়তে গিয়ে যদি পদস্খলন হয় তাতে অঙ্গহানির আশঙ্কা থাকে। কাজেই কোনো অবস্থাতেই নারীর পক্ষে দ্রুত গমন যুক্তিসঙ্গত নয়।"

বিশাখা কথা বলার সময় ব্রাহ্মণগণ তাঁর দাঁত দেখে পঞ্চকল্যাণসম্পন্না কন্যারূপে চিহ্নিত করলেন। তাঁরা বিশাখার মাতা-পিতার নিকট গিয়ে তাঁদের অভিপ্রায় জ্ঞাত করালেন এবং সঙ্গে নেওয়া কণ্ঠহার বিশাখাকে প্রদান করলেন। যথাসময়ে তাঁরা শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করে মিগার শ্রেষ্ঠীকে সমস্ত বিষয় অবহিত করলেন।

শুভ পরিণয়ের দিন ধার্য করা হল। পিতা ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী মহালতা আদি স্বর্ণালংকার প্রস্তুতের জন্য পাঁচশ জন স্বর্ণকার নিযুক্ত করলেন। শিরোপরি পরিধানের জন্য তৈরি হল ময়ূরমুকুট, তার নির্মাণ প্রক্রিয়া ছিল অতি সূক্ষ্ম ও মনোরম। বায়ুপ্রবাহে সেই কৃত্রিম ময়ূর কেকারব করত। শতগ্রাম থেকে শত প্রকারের মূল্যবান উপহার সামগ্রী সংগ্রহ করে বিয়ে দেওয়া হল।[২৩২] বিয়ের উৎসব চলল দীর্ঘ চার মাস। স্বয়ং কোসলরাজ প্রসেনজিৎ বিয়ের উৎসবে উপস্থিত ছিলেন। অতঃপর বহুবিধ ধন-সম্পদ ও দাসদাসী সমভিব্যাহারে বিশাখাকে পতিগৃহে প্রেরণ করার সময় ধনঞ্জয় শ্রেষ্ঠী অতিগুরুত্বপূর্ণ দশটি[২৩৩] উপদেশ প্রদান করেন। সংসার জীবনের উপদেশসমূহ একান্ত প্রতিপাদ্য।

উপদেশ দশটি হচ্ছে ঃ (১) ঘরের আগুন বাইরে নিও না, অর্থাৎ ঘরের গোপন বিষয় বাইরে প্রকাশ না করা; (২) বাইরের আগুন ঘরে আনবে না, অর্থাৎ বাইরের অপ্রয়োজনীয় বিষয় নিন্দা-অপবাদ ইত্যাদি ঘরে প্রকাশ না করা; (৩) যে দেয় তাকে দেবে, অর্থাৎ যে ঋণ নিয়ে পরিশোধ করে তাকে দেওয়া; (৪) যে দেয় না তাকে দান করবে, অর্থাৎ যে দরিদ্র ফেরৎ দিতে না পারলেও তাকে দেওয়া; (৫) যে দেয় বা না দেয় তাকেও দান করবে, অর্থাৎ দরিদ্র আত্মীয় ও বন্ধুকে যারা ফেরৎ দিতে পারে বা না পারে তাদেরকে দেওয়া; (৬) সুখে বসবে, অর্থাৎ জ্যেষ্ঠব্যক্তির সামনে উচ্চাসনে উপবেশন না করা; (৭) সুখে খাবে, অর্থাৎ গুরুজন ও পরিবারের সদস্যদের আহারের পরে আহার করা; (৮) সুখে ঘুমোবে; অর্থাৎ গুরুজন ঘুমানোর পর নিজে শয়ন করা; (৯) অগ্নিপূজা করবে, অর্থাৎ স্বামী, শ্বশুর-শাশুড়ীর সেবা করা; (১০) গৃহাগত দেবতার অর্চনা করবে, অর্থাৎ অতিথি সৎকার করা।

এই উপদেশগুলো প্রাত্যহিক জীবনে নিঃসন্দেহে জরুরি। এ দশটি উপদেশ বিশাখা উপাখ্যানটিকে অত্যান্ত জনপ্রিয় করে তুলেছে।

বিশাখা শ্বশুরবাড়িতে প্রথমদিকে খুব একটা শান্তি পাননি। কারণ বিশাখা ছিলেন বুদ্ধভক্ত কিন্তু তাঁর বাড়ির লোকেরা ছিল নির্গ্রন্থ ভক্ত। বিশাখা স্বীয় নৈতিকতাবলে তাঁদেরকে বুদ্ধের ধর্মে দীক্ষা দিতে সক্ষম হয়েছিলেন। বিশাখার বিয়ের কিছুদিন পর মিগার শ্রেষ্ঠী পাঁচশ নগ্ন সন্ন্যাসীকে নিমন্ত্রণ করেছিলেন। সন্ন্যাসীরা গৃহে আগমন করলে শ্রেষ্ঠী নববধূ বিশাখাকে বললেন, তাদের বন্দনা (প্রণাম) করতে। তিনি এসে নগ্ন

সন্ন্যাসীদের দেখে শ্বশুরকে বললেন, "এই নির্লজ্জ ব্যক্তি কখনও সন্ন্যাসী বা অর্হৎ হতে পারে না।" তিনি প্রণাম না করে নিজকক্ষে চলে গেলেন। সন্ন্যাসীগণ শ্রেষ্ঠীকে বলল, "বিশাখা বুদ্ধের শরণাগত, তাকে এ গৃহে রাখা চলবে না, সহসাৎ তাড়িয়ে দিন।"[২৩৪] কিন্তু শ্রেষ্ঠী জানতেন যে বিশাখাকে তাড়ানো সহজ নয়, তিনি সন্ন্যাসীদের কাছে ক্ষমা চেয়ে বিদায় দিলেন।

আর একদিনের ঘটনা। সেদিন মিগারশ্রেষ্ঠী স্বর্ণপাত্রে উপাদেয় খাদ্য ভোজন করার সময় এক বৌদ্ধ ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য পাত্রহস্তে তাঁর গৃহদ্বারে এসে দাঁড়ালেন। তখন বিশাখা ব্যজনী হাতে শ্রেষ্ঠীকে বাতাস করছিলেন। ভিক্ষু কিছুক্ষণ দাঁড়ানোর পর বিশাখা বললেন, "প্রভু, আপনি অন্যত্র গমন করুন, আমার শ্বশুর বাসি খাচ্ছেন।" শ্বশুর রেগে অগ্নিশর্মা। তিনি বিখাশাকে তাড়িয়ে দিতে মনস্থ করলেন। তাঁর এসব ব্যবহারের জন্য বিজ্ঞলোক ডাকা হল। বিশাখা বুঝিয়ে দিলেন তাঁর কথিত উক্তির তাৎপর্য। মিগার শ্রেষ্ঠী অনুতপ্ত হলেন। অতঃপর বিশাখা শ্বশুরবাড়ি ত্যাগ করার ইচ্ছা শ্বশুরকে জানালে শ্বশুর তাঁকে থাকতে অনুরোধ করেন। বিশাখা বুদ্ধের সেবা করার সুযোগ দানের বিনিময়ে থাকতে রাজী হলেন। বিশাখা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করলেন। মিগার শ্রেষ্ঠী অন্তরালে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হলেন। তিনি বিশাখাকে বললেন, "তুমি আমাকে জ্ঞানচক্ষু প্রদান করে নবজীবন দান করলে, "তুমি আজ থেকে আমার মা।" তদবধি বিশাখা 'মিগারমাতা' নামে পরিচিতি লাভ করেন।[২৩৫] বিশাখা বৌদ্ধধর্মের উন্নতিকল্পে বহু সৎকর্ম করেন। তিনি সাতাশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে শ্রাবস্তীতে পূর্বারাম নামে একটি মনোরম বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেন। ধম্মপদট্ঠকথার এই মনোজ্ঞ কাহিনী নাটকীয় দ্বন্দ্বে পরিপূর্ণ।[২৩৬]

গল্প, কাহিনী, রূপকথা, উপাখ্যান, কৌতুক গল্প, রূপক কাহিনী প্রভৃতিতে পরিপূর্ণ ধম্মপদট্ঠকথা সাহিত্য। সাহিত্য পরিমণ্ডলে এর গুরুত্ব সমধিক। এ গ্রন্থে বহু গল্প অন্যান্য গ্রন্থ থেকে সংকলন করা হয়েছে বলে মনে করা হয়। কারণ এতে এমন কিছু কিছু কাহিনী দৃষ্ট হয় যেগুলো বৌদ্ধসাহিত্যের বিভিন্ন গ্রন্থে অবিকল কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে কিঞ্চিৎ পরিবর্তিত আকারে সংকলিত আছে। B.C. Law এর মতে, "If derives a considerable number of its (Dhammapada Atthakatha) stories from the four Nikayas, the vinaya, the Udana, the works of Buddhaghosa and the Jataka Book."[২৩৭] ধম্মপদট্ঠকথায় বিনয়পিটক থেকে দেবদত্ত, বোধিরাজকুমার, ছন্দ প্রভৃতি কাহিনী নেওয়া হয়েছে। উদান থেকে গৃহীত হয়েছে মহাকশ্যপ, শ্রামাবতী, বিশাখা, সোন, কোটিকণ্ন, সুন্দরী, নন্দ, সুপ্পবাসা প্রভৃতি কাহিনী, 'জাতক থেকে নেওয়া হয়েছে দেবধম্ম, কুলাবক, তেলপত্ত, সালিত্তক, বুব্ব,,গোধ, চুল্লপলোভন, কেসব, সালিয়, কুশ, ঘট প্রভৃতি কাহিনী

ধম্মপদট্ঠকথা, থেরীগাথাঅট্ঠকথা ও অঙ্গুত্তর নিকায় অট্ঠকথার কাহিনীর মধ্যে বেশ কয়েকটির অবিকল মিল পাওয়া যায়। এসব হচ্ছে- পটাচারা, কুণ্ডলকেশী, ক্ষেমা, নন্দা,

www.pathagar.com

ধম্মদিন্না ইত্যাদি।[২৩৮] এ ছাড়া মিলিন্দ প্রশ্ন, সংযুক্ত নিকায়, দিব্যাবদান, তিব্বতি কাঞ্জুরেও অনুরূপ কাহিনী রয়েছে।[২৩৮] এতদসত্ত্বেও ধম্মপদট্‌ঠকথার কাহিনীগুলোর সাহিত্যিক মূল্য, বিশেষ করে উপাখ্যান, লোককথা ও নীতিকথার ক্ষেত্রে একটি অনবদ্য গ্রন্থ। প্রায় গল্পের মধ্যে নাটকীয় দ্বন্দ্ব কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রেম-ভালবাসা, সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না ও হর্ষ-বিষাদময় উচ্ছ্বাসের ধারা লক্ষ্য করা যায়।

সুমঙ্গলবিলাসিনী

সুমঙ্গলবিলাসিনী[২৪০] আচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত দীর্ঘনিকায়ের অট্‌ঠকথা। এ গ্রন্থে প্রাচীন ভারতের সামাজিক, রাজনৈতিক, দার্শনিক এবং ধর্মীয় ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে।[২৪১] এখানে কিছু কিছু ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় কাহিনী বর্ণিত হয়েছে যা চমৎকার উপাখ্যান পর্যায়ভুক্ত। কিছু কিছু উপাখ্যানের নমুনা উপস্থাপন করা হল ঃ

বুদ্ধ বৈশাখী পূর্ণিমাতিথিতে কুশীনারায় মল্লদের সালবনে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলে শিষ্য-প্রশিষ্যগণ শোক-পরিদেবন করছিলেন। তখন বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত সুভদ্র ভিক্ষু বললেন, "বন্ধুগণ, আপনাদের শোক কিংবা দুঃখ করার দরকার নেই। এখন আমরা মহাশ্রমণের উৎপীড়ন হতে মুক্ত। কারণ তিনি সর্বদা 'এটা করো, এটা করো না' এভাবে বাধা দিতেন।" সুভদ্র ভিক্ষুর এরূপ উক্তি মহাকাশ্যপের কর্ণগোচর হল। তিনি সদ্ধর্মের পরিহানি আশাঙ্ক্ষা করলেন, তাই সদ্ধর্মের পরিহানি বা বিলুপ্তির হাত হতে রক্ষা করার জন্য ধর্ম-সম্মেলনের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করলেন। তিনি সমাগত ভিক্ষু-সঙ্ঘকে ধর্ম-বিনয় সঙ্গায়নের বিষয় অবহিত করলেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের একুশ দিন পর পাঁচশ জন ধর্ম-বিনয়ে প্রাজ্ঞ অর্হৎ ভিক্ষু নির্বাচন করা হল।

বুদ্ধের পরিনির্বাণ প্রাপ্তির সপ্তম দিন পর্যন্ত বহু সুগন্ধি ও মাল্যাদি দ্বারা পূজা করা হল। সজ্জিত শ্মশানে তাঁর শবদেহ রক্ষিত হল, কিন্তু কোনো প্রকারেই চিতায় আগুন ধরে না। অবশেষে মহাকশ্যপ এসে শবদেহ প্রদক্ষিণান্তে বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে অলৌকিকভাবে আগুন জ্বলে উঠল। তৃতীয় সপ্তাহে তাঁর অস্থিধাতুর পূজা করা হল এবং জ্যৈষ্ঠ মাসের পঞ্চম দিনে ধাতুসমূহ বন্টন করা হল। সেই সময়ে বহু ভিক্ষু সেখানে সমবেত হয়েছিলেন। তন্মধ্যে পাঁচশজন ভিক্ষুকে সঙ্গীতির জন্য নির্বাচন করা হয়। তাঁদের চল্লিশ দিন সময় দেওয়া হল প্রস্তাবিত সঙ্গীতি অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য প্রস্তুতি নিতে। মহাকশ্যপ পাঁচশ জন ভিক্ষু নিয়ে রাজগৃহে গমন করলেন। অন্যান্য মহাস্থবিরগণও তাঁদের অনুসারী শিষ্যদের নিয়ে বিভিন্ন স্থানে প্রস্থান করলেন। আয়ুষ্মান আনন্দ পাঁচশ জন ভিক্ষুসহ জেতবনের শ্রাবস্তীতে প্রত্যাগমন করলেন। শ্রাবস্তীর জনগণ মনে করলেন যে, বুদ্ধও তাঁদের সঙ্গে রয়েছেন, পরে বুদ্ধের পরিনির্বাণের বিষয় অবগত হয়ে তারা কান্না করতে লাগলেন। বুদ্ধ যে গন্ধকুটীতে বাস করতেন সেটার দরজা খুলে পরিষ্কার করার সময় কেঁদে কেঁদে বলতেন, "বুদ্ধ এই সময় এইখানে স্নান করতেন, এই স্থানে ধর্মদেশনা

www.pathagar.com

করতেন, ভিক্ষুদিগকে উপদেশ দিতেন, এখন আপনার শোবার সময়, এখন ঘুমোবার সময়, এখন মুখ-হাত ধৌত করার সময়।"[২৪২]

অনন্তর আয়ুষ্মান আনন্দ রাজগৃহে অনুষ্ঠিতব্য সঙ্গীতিতে যোদগান করার জন্য যথাসময়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। অন্যান্য ভিক্ষু-সজ্ঘ ও যাঁরা সঙ্গীতির জন্য নির্বাচিত হয়েছেন তাঁরা সকলেই ইতিমধ্যে রাজগৃহে সমবেত হয়েছেন। সমবেত ভিক্ষু-সজ্ঘ আষাঢ় মাসের পূর্ণিমায় উপোসথ উদযাপন করলেন। তাঁরা মগধরাজ অজাতশত্রুকে আঠারখানা বিহার পুনর্নির্মাণ করার জন্য অনুরোধ করলেন। অজাতশত্র বিহারসমূহ মেরামত করালেন এবং সপ্তপর্ণি গুহার পাদতলে বেভার পর্বতে একটি অতি মনোরম সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করালেন। এই মণ্ডপ ছিল বিশ্বকর্মা কর্তৃক নির্মিত বৈকুণ্ঠের মত সুদৃশ্য। পাঁচশজন ভিক্ষু উপবেশন করার জন্য পাঁচশটি আসনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। সভাপতির জন্য উত্তর দিকে দক্ষিণমুখী করে আসন নির্মিত হল। ধর্মাসনে উপবেশন করার জন্য আনন্দ ও উপালির আসন নির্মিত হল সভার মধ্যস্থলে।[২৪৩]

আয়ুষ্মান আনন্দ স্থবিরের সঙ্গীতিতে যোগদানের ব্যাপারে ভিক্ষু-সজ্ঘের মধ্যে প্রশ্ন উত্থাপিত হয়েছিল। কারণ সঙ্গীতিতে অংশগ্রহণকারী নির্বাচিত ভিক্ষুদের মধ্যে তিনিই একমাত্র অর্হৎ ছিলেন না। আনন্দ ইহা শুনে ধ্যান-মগ্ন হলেন এবং রাত্রেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। তখন সঙ্গীতি মণ্ডপে ভিক্ষু-সজ্ঘ স্ব স্ব আসনে উপবিষ্ট। শুধু আনন্দের জন্য নির্ধারিত আসনটি ছিল শূন্য। দিব্যদৃষ্টিতে মহাকশ্যপ জ্ঞাত হলেন আনন্দের অর্হত্ত্বফল প্রাপ্তির। তিনি 'সাধুবাদ' দিয়ে তাঁকে স্বাগত জানালেন। আনন্দ মাটিভেদ করে তাঁর জন্য নির্ধারিত আসনের সামনে উঠে উপবেশন করলেন। শুরু হল সঙ্গীতির অধিবেশন। প্রথমে বিনয় সঙ্গায়নের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় এবং বিনয়সংক্রান্ত প্রশ্নের উত্তরদাতা নির্বাচিত হলেন আয়ুষ্মান উপালি। বিনয়ের প্রতিটি নিয়ম কোথায়, কেন, কাকে লক্ষ্য করে প্রজ্ঞাপ্ত হয়েছিল- সমস্ত প্রশ্নের উত্তর উপালি স্থবির প্রদান করলেন। সমবেত ভিক্ষু-সজ্ঘ পুনরাবৃত্তি ও অনুমোদন করলেন। অতঃপর আনন্দ স্থবির অনুরূপভাবে ধম্ম (সুত্ত ও অভিধম্ম) আবৃত্তি করলেন এবং ভিক্ষু-সজ্ঘ অনুমোদন করলেন। এভাবে সমগ্র বিনয় ও ধম্ম সঙ্গায়ন করে সংগৃহীত হল।

এখানে বর্ণিত পোক্খরসাদি[২৪৫] ব্রাহ্মণের জন্মকাহিনী অতিপ্রাকৃতিক। তিনি কশ্যপ বুদ্ধকে দান করার ফলে পরবর্তী জন্মে দেবলোকে উৎপন্ন হন। তিনি মাতৃগর্ভে জন্ম গ্রহণ করতে অনিচ্ছুক হয়ে হিমালয়ের কোনো এক বৃহৎ হ্রদে প্রস্ফুটিত পদ্মপুষ্পে জন্ম গ্রহণ করেন। সেখানে নিকটে বসবাসরত এক তাপস তাঁকে লালন-পালন করেন। তিনি শিশুটিকে ত্রিবেদে পারদর্শী করে গড়ে তোলেন। জম্বুদ্বীপে তিনি একজন প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর দেহের বর্ণ ছিল শ্বেত পদ্মের ন্যায় অপূর্ব সুন্দর। কোশলরাজ তাঁর দক্ষতা দেখে তাঁকে উক্কট্‌ঠ শহর ব্রহ্মোত্তর সম্পত্তিরূপে দান করেন।[২৪৬]

www.pathagar.com

ঘোসিতারামের নির্মাণ প্রসঙ্গে এক চমৎকার কাহিনী[২৪৭] রচনা করেছেন আচার্য বুদ্ধঘোষ সুমঙ্গলবিলাসিনী গ্রন্থে। অতীতে অদ্দিল নামে এক রাজ্য ছিল। এই রাজ্যের দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হলে কোটূহলক নামে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি স্ত্রী-পুত্র নিয়ে অন্যত্র গমন করছিলেন। তারা গোপাল নামক গ্রামে উপস্থিত হয়ে প্রধান গোপালের গৃহে আশ্রয় নিল। সেখানে দুগ্ধমিশ্রিত ভাত খেয়ে সে কলেরায় আক্রান্ত হয়ে রাত্রেই মৃত্যুবরণ করল এবং মৃত্যুর পর এক কুকুরীর গর্ভে প্রতিসিদ্ধ গ্রহণ করল। যথাকালে ভুমিষ্ঠ হলে কুকুর বাচ্চাটি প্রধান গোপালের অতিপ্রিয় হয়ে উঠে। গোপাল প্রতিদিন এক প্রত্যেক বুদ্ধের সেবা করতেন। গোপালের সঙ্গে কুকুরও প্রত্যেক বুদ্ধের আশ্রমে যাতায়াত করত। গোপাল কাজে ব্যপ্ত থাকলে কুকুরকে আশ্রমে প্রেরণ করতেন। সে আশ্রমে গিয়ে ঘেউ ঘেউ শব্দ করে বুদ্ধকে সময় জ্ঞাপন করত এবং সঙ্গে করে প্রভুর বাড়িতে নিয়ে আসত। এভাবে সে প্রত্যেক বুদ্ধের সেবা করত। এখানে মৃত্যুর পর সে দেবলোকে উৎপন্ন হল এবং নাম হয়েছিল 'ঘোষদেবপুত্র'। এখান থেকে চ্যুতির পর কোসাম্বরি এক পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। কোসাম্বীর অপুত্রক শ্রেষ্ঠী তাঁকে দত্তক রূপে গ্রহণ করে নিজ পুত্রের ন্যায় প্রতিপালন করতে লাগলেন। ইতিমধ্যে তাঁর একটি পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে তিনি ঘোষককে মেরে ফেলার চেষ্টা করেন। তাকে সাতবার মারার জন্য চেষ্টা করেও ব্যর্থ হয়ে অবশেষে শ্রেষ্ঠী তাঁর কোনো বন্ধুর নিকট পত্রসহ ঘোষককে পাঠালেন যেন তাকে সেখানে মেরে ফেলা হয়। পথিমধ্যে সে কোনো শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে রাত কাটাবার সময় সেই শ্রেষ্ঠীকন্যা পত্রখানা গোপনে পাঠ করে নতুন করে পত্র লিখে দিলেন, যেন তাকে সেই শ্রেষ্ঠীকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেন। শ্রেষ্ঠীকন্যার বুদ্ধিতে ঘোষক বেঁচে গেল এবং উভয়ের মধ্যে পরিণয় হল। কোশাম্বী শ্রেষ্ঠী এ খবর শুনে শোকে ও দুঃখে মৃত্যুবরণ করলে ঘোষক শ্রেষ্ঠীপদ লাভ করেন। কোসাম্বীতে কুক্কুট ও পাবারিয়া নামে আরও দু'জন শ্রেষ্ঠী ছিলেন। তাঁরা তিনজনেই বাগানে তিনখানা আশ্রম নির্মাণ করেছিলেন তাঁদের সন্ন্যাসীদের জন্য। একদা তাপসগণ হিমালয় হতে বুনো পথে যাবার সময় অতি ক্ষুধার্ত ও তৃষ্ণার্ত হয়ে একটি বটবৃক্ষের নীচে বিশ্রাম করার সময় ভাবলেন এই বৃক্ষে কোনো শক্তিশালী দেবতা আছেন যিনি নিশ্চয়ই আমাদের সাহায্য করবেন। সত্যি সত্যি দেবতা আবির্ভূত হয়ে তাপসদের শীতল পানীয় জল দ্বারা সেবা করলেন। তাপসগণ দেবতার ঐশ্বর্য সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি বললেন যে, তিনি শ্রাবস্তীর জেতবনে অবস্থারত বুদ্ধের সেবক অনাথপিণ্ডিকের চাকর ছিলেন। সেই চাকর কোনো উপোসথ দিবসে প্রত্যুষে কাজে গিয়ে সন্ধ্যায় প্রত্যাবর্তন করে অন্যান্য চাকরদের কাছে জানতে পারেন যে, তাঁরা সকলেই উপোসথ পালন করছেন। তিনিও অনাথপিণ্ডিকের নিকট গিয়ে উপোসথ শীল গ্রহণ করেন। তিনি অর্ধ-উপোসথ মাত্র প্রতিপালন করেছিলেন এবং এর ফলে মৃত্যুর পর উক্ত বৃক্ষের ঐশ্বর্যময় দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাপসগণ দেবতার কাছে ইহা শ্রবণ করে কোসাম্বীতে গিয়ে শ্রেষ্ঠীদের জ্ঞাত করালেন। তাঁরা বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং ধ্যান-সমাধি করে অর্হত্বফল লাভ করেন। শ্রেষ্ঠীগণও বুদ্ধের নিকট

www.pathagar.com

উপস্থিত হয়ে শরণ গ্রহণ করে বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে কোসাম্বীতে আমন্ত্রণ করলেন। শ্রেষ্ঠী তিনজন তিনখানা আরাম নির্মাণ করলেন, তন্মধ্যে একটির নাম ঘোষিতারাম।[২৪৮] কাহিনীটি নিঃসন্দেহে একটি চমৎকার ধর্মীয় উপাখ্যান।

মহাপনাদ নামক কোশলের রাজপুত্র কোনো প্রকারেই হাসত না। হাস্যকর দৃশ্য দেখেও সে হাসত না। অবশেষে রাজা ঘোষণা করলেন যে, যে তাঁর পুত্রকে হাসাতে পারবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। কৃষক থেকে আরম্ভ করে বিভিন্ন শ্রেণীর লোক কাজকর্ম ছেড়ে রাজপুত্রকে হাসাবার জন্য সমবেত হল। তারা বিভিন্নভাবে তাকে হাসাতে চেষ্টা করে ব্যর্থ হল। অবশেষে দেবরাজ শক্র দেবতাদের দ্বারা একটি স্বর্গীয় নাটক প্রদর্শন করালেন। রাজকুমার নাটক দেখে হাসলেন। সমবেত জনতা স্ব স্ব গৃহে প্রত্যাবর্তন কালে জনগণ জিজ্ঞেস করল, "কচ্চি ভো কুসলং, কচ্চি ভো কুসলং? (তোমরা কুশল তো)।" এই শব্দ থেকে কোশল দেশের নামকরণ।[২৪৯]

সারত্থপ্পকাসিনী

সারত্থপ্পকাসিনী[২৫০] নামক সংযুক্ত নিকায়ের অট্ঠকথায়ও বেশ কিছু আখ্যান রয়েছে যেগুলো উপাখ্যানের অন্তর্গত। এক সময় বহু বণিক নৌকাযোগে সমুদ্র পথে বাণিজ্যে যাবার সময় ঝড়ঝঞ্ঝায় আক্রান্ত হয়। সমুদ্রের প্রবল ঢেউয়ের জলে নৌকা পূর্ণ হয়ে ডুবে যাচ্ছিল। বণিকগণ তাঁদের স্ব স্ব দেবতাকে স্মরণ করতে লাগলেন বিপদ থেকে মুক্তি লাভের জন্য। তাঁদের মধ্যে একজন পদ্মাসনে উপবেশন করে স্বীয় পুণ্যকর্ম স্মরণ করতে লাগলেন। তাঁকে দেখে অন্য বণিকগণ এর কারণ জিজ্ঞেস করলেন। তিনি বললেন যে, তিনি ত্রিরত্নের শরণাপন্ন। বণিকগণও ত্রিরত্নের শরণ গমনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অনন্তর তিনি বণিকদের সাত ভাগে বিভক্ত করলেন এবং প্রতি বিভাগে ১০০ জন করে বণিক ছিলেন। অনন্তর তিনি তাঁদিগকে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করতে উপদেশ দিলেন। তাঁরা সকলেই ত্রিশণসহ পঞ্চশীল গ্রহণ করলেন। প্রবল ঝঞ্ঝায় নৌকা ডুবে গেল। মৃত্যুর পর সকলেই তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করলেন এবং যিনি শিক্ষা দিয়েছিলেন তিনিও মৃত্যুর পর কনকময় বিমানে জন্ম গ্রহণ করেন।[২৫১] কাহিনীটি ধর্মীয় আভরণে পরিবেশিত অতি চমৎকার উপাখ্যান।

মল্লিকার পিতা ছিলেন একজন দরিদ্র মালাকার।[২৫২] একদিন মল্লিকা দোকান থেকে একটি পিষ্টক ক্রয় করে বাড়ি ফিরছিলেন, পথে দেখা হল তথাগত বুদ্ধের। তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ ভিক্ষার জন্য গ্রামে যাচ্ছিলেন। তিনি পিষ্টকখানা বুদ্ধের পাত্রে সমর্পণ করলেন। বুদ্ধ আনন্দকে বললেন, মল্লিকা আজই রাজমহিষী হবে। সেইদিন রাজা উদয়ন মগধরাজ অজাতশত্রুর সঙ্গে কাশীগ্রামে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে কোসল রাজ্যে ফেরার পথে মল্লিকার পিতার দোকানের নিকটে অনুগামী সৈন্যদের জন্য অপেক্ষা করেছিলেন। মল্লিকা তাঁকে অতি চমৎকারভাবে সেবা করলেন। রাজা উদয়ন তাঁর সেবায় এত সন্তুষ্ট হলেন যে তিনি মল্লিকাকে রাজ-প্রসাদে নিয়ে গেলেম এবং প্রধান মহিষীরূপে অভিষিক্ত করলেম।[২৫৩]

www.pathagar.com

বুদ্ধকে একটি পিষ্টক দানের ফলে তিনি অতি দীন হয়েও রাজমহিষী হতে সক্ষম হয়েছিলেন।

শ্রাবস্তীতে এক শ্রেষ্ঠী ছিলেন।[২৫৪] তাঁর ৮০ কোটি মূল্যবান ধন ছিল। কিন্তু পুণ্য প্রহীন হওয়ায় সমস্ত সম্পত্তি কাঠকয়লায় পরিণত হয়। শ্রেষ্ঠী চিন্তা করলেন, "কোনো পুণ্যবান ব্যক্তির উপস্থিতিতে এই সকল কাঠকয়লা পুনরায় সম্পদে পরিণত হতে পারে।" এরূপ চিন্তা করে তিনি কাঠকয়লাগুলো পাত্রপূর্ণ করে একটি দোকানে রেখে দিলেন। তিনি এর পাশে উপবেশন করতেন। একদিন এক দরিদ্র বালিকা জ্বালানির জন্য সেই দোকানে এসেছিল। সে পাত্রপূর্ণ সম্পদসমূহ দেখে জিজ্ঞেস করল, "এই বিপুল সম্পত্তি কেন দোকানে রেখেছেন ? এগুলো গৃহের মধ্যে গোপন স্থানে রাখা উচিত নয় কি ?" শ্রেষ্ঠীও পাত্রসমূহ ধন-রত্নে পূর্ণ হয়েছে দেখে আশ্চার্যান্বিত হলেন এবং বুঝতে পারলেন যে, সেই বালিকার পুণ্য প্রভাবেই ইহা সম্ভব হয়েছে। শ্রেষ্ঠী অনুরোধ করলেন সম্পত্তিসমূহ সংরক্ষণে তাঁকে সহায়তা করতে। বালিকাকে শ্রেষ্ঠীর পুত্রবধূ করে বরণ করে নিলেন।[২৫৫] রূপকথার পরশ পাথরের ছোঁয়ায় যেমন সবকিছু স্বর্ণে পরিণত হয়, এখানে পুণ্যবতী বালিকার পুণ্যপ্রভাবে ছাইও স্বর্ণে পরিণত হয়েছে।

মনোরথপূরণী

আচার্য বুদ্ধঘোষ বিরচিত মনোরথপূরণী[২৫৬] অঙ্গুত্তর নিকায়ের অট্ঠকথা। মনোরথপূরণীতে প্রায় একশটি উপাখ্যান আছে। এদের মধ্যে তেরটি থেরীদের অনুপম জীবন কাহিনী।[২৫৭] মগধরাজমহিষী ক্ষেমাদেবীর জীবন-আখ্যান একটি ঐতিহাসিক উপাখ্যান। ক্ষেমাদেবী ছিলেন অপূর্ব রূপসী, তাই তিনি ছিলেন রূপের গর্বে গর্বিণী। বুদ্ধ রূপের নিত্যতা স্বীকার করতেন না। তাঁর উপদেশ ছিল- রূপ অনিত্য, ক্ষণস্থায়ী এবং ধ্বংসশীল। ক্ষেমাদেবী লোক-মুখে বুদ্ধের এরূপ রূপের অপ্রশংসা শুনে বুদ্ধের প্রতি শ্রদ্ধাহীন ছিলেন। বহু দিন পর একসময় সখিগণসহ ঘুরতে ঘুরতে বেণুবনে বুদ্ধ যেখানে ধর্মদেশনা করছিলেন সেখানে উপনীত হলেন। তিনি অনতিদূর থেকে দেখতে পেলেন এক দিব্যরূপসী তরুণী তাঁকে ব্যজন করছেন। তিনি আরও দেখলেন- সেই রূপসী তরুণী ধীরে ধীরে প্রৌঢ়া, প্রৌঢ়া হতে বৃদ্ধা, পরে জরা ও ব্যাধিগ্রস্ত হয়ে একসময় মৃত্যুবরণ করেন। মৃত্যুর পর তার দেহ পচে-গলে দুর্গন্ধময় হল। শৃগাল, কুকুর, কাক ইত্যাদি এসে তার মাংস ভক্ষণ করতে লাগল। অবশেষে অস্থি-কঙ্কালমাত্র অবশিষ্ট রইল। বুদ্ধকর্তৃক অলৌকিকভাবে সৃষ্ট এই বাস্তব দৃশ্য দেখে ক্ষেমাদেবীর জ্ঞানচক্ষুর উন্মেষ হল। তিনি রাজার নিকট বিদায় নিয়ে ভিক্ষুণী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।[২৫৮]

আর এক দিব্য সুন্দরী উপ্পলবণ্ণা। তাঁর সুন্দরের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কয়েকটি রাজ্যের রাজপুরুষগণ তাঁকে বিয়ে করার প্রস্তাব দেন। এতে উপ্পলবণ্ণার পিতা দারুণ বিপদে পড়ে যান। শেষ পর্যন্ত উপ্পলবণ্ণা প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সমস্যার সমাধান করেন। অপরূপ রূপের অধিকারিণী যুবতী রমণী স্বেচ্ছায় অনাগারিক জীবন গ্রহণ করে আত্মমুক্তির পথ বেছে নিলেন।

www.pathagar.com

পালি সাহিত্যে ক্ষেমা, উপ্পলবণ্ণা, পটাচারা, কিসাগৌতমী, ঘোষক শ্রেষ্ঠী প্রভৃতি উপাখ্যান অতি জনপ্রিয়। সম্ভবত সেই কারণে একাধিক পালি গ্রন্থে তাঁদের জীবনোপাখ্যান স্থান পেয়েছে, পটাচারা শ্রাবস্তীর এক বণিকের কন্যা। তিনি তাঁদের বাড়িতে কর্মরত এক চাকরের প্রতি প্রেমাসক্ত হয়ে তার সঙ্গে গৃহত্যাগ করেন। তিনি যখন গর্ভবতী হন, তখন পিতৃ-গৃহে যাবার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করেন, কিন্তু তাঁর স্বামী 'আজ যাব, কাল যাব' করে বিলম্ব করতে থাকে। অবশেষে পটাচারা একাকী পিতৃগৃহের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলে তাঁর স্বামীও অনুগমন করে, কিন্তু কিছুদূর যাবার পর তাঁর প্রসব বেদনা আরম্ভ হয় এবং পথিমধ্যেই সন্তান প্রসব করেন। তাঁরা মধ্যরাস্তা থেকে স্বগৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। এভাবে দ্বিতীয়বারও একই অবস্থা হয়েছিল। তখন কিন্তু প্রবল ঝড় উত্থিত হয়েছিল। স্বামী তাঁর জন্য একটি আশ্রয় নির্মাণ করার জন্য গোলপত্রাদি সংগ্রহ করার সময় সর্প দংশিত হয়ে মৃত্যুবরণ করে। তাঁর জীবনের দুঃখের সূচনা হল। তিনি দুঃখভারাক্রান্ত মনে পিতৃগৃহে যাত্রা করলেন অবোধ সন্তান দুটি কোলে করে। তিনি একটি খরস্রোতা নদীর তীরে উপনীত হলেন। দুটি সন্তান নিয়ে একবারে নদী পাড় হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। কাজেই বড় ছেলেকে পাড়ে রেখে ছোটটিকে নিয়ে অপর পাড়ে গেলেন। তাকে পাড়ে রেখে বড় ছেলেকে আনার জন্য পুনরায় অপর পাড়ে যাত্রা করলেন। নদীর মাঝখানে উপনীত হলে এক বাজপাখী এসে ছোট ছেলেকে নিয়ে গেল। তিনি পাখি তাড়াবার জন্য হাত উত্তোলন করলেন, বড় ছেলে তা দেখে মনে করল তার মা বোধ হয় তাকে ডাকছেন। সে নদীর জলে নেমে পড়ল এবং সঙ্গে সঙ্গে নদীর প্রবল স্রোতে ভেসে গেল। স্বামী এবং দুই পুত্রকে হারিয়ে অতীব ব্যথিত অন্তরে শ্রাবস্তীর দিকে যাত্রা করলেন। শ্রাবস্তী পৌঁছে তিনি শুনতে পেলেন যে, গতদিনের প্রবল ঝড়ে তাঁর মাতা-পিতা ঘরচাপা পড়ে মারা গেছে এবং এই মাত্র তাদের দাহকার্য সম্পন্ন করা হয়েছে। ইহা শুনে হতভাগ্য মহিলা উচ্চস্বরে বিলাপ করতে লাগলেন এবং স্বীয় দেহের বস্ত্র ছিড়ে ফেলে দিয়ে পাগলিনীর ন্যায় বস্ত্রহীন হয়ে সর্বত্র ঘুরাফেরা করতে লাগলেন। এক দিন বুদ্ধ ধর্মদেশনা করার সময় তিনি সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। বুদ্ধ তাঁকে দেখে তাঁর দুঃখ অনুভব করলেন, বললেন, "বোন, তোমার পূর্বস্মৃতিতে ফিরে এস, বোন, তোমার পূর্বস্মৃতিতে ফিরে এস।" বুদ্ধের একথা শুনে তাঁর পূর্বস্মৃতি জাগ্রত হল, তাঁর মনে লজ্জার উদয় হল। একজন সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে একখানা কাপড় নিক্ষেপ করে দিলেন, তিনি পরিধান করলেন। একটিমাত্র গাথা শুনে পটাচারা সদ্ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন।[২৬০] তিনি ভিক্ষুণীসঙ্ঘে অতি খ্যাতি লাভে সক্ষম হয়েছিলেন। কাহিনীটি অতি করুণ এবং রূপকথার মত হৃদয়গ্রাহী।

মনোরথপূরণীর কোনো কোনো আখ্যান বিশ্বসাহিত্যের রূপকথার মত উপভোগ্য। M. Winternitz মনে করেন যে, এসব কাহিনী ভারতবর্ষ হতে বহির্বিশ্বে প্রচারিত হয়েছে অথবা বহিঃবিশ্ব থেকে ভারতবর্ষ আমদানি করা হয়েছে।[২৬১] অতীতে পদুমাবতীর জন্ম হয় পদ্ম-পুষ্পের বুকে। সে অপূর্ব সুন্দরী রূপে গড়ে উঠে। তার পদক্ষেপে পদ্ম-প্রস্ফুটিত

www.pathagar.com

হত। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সে বারাণসীরাজের প্রধান মহিষীরূপে অভিষিক্ত হয়। সে ছিল রাজার অতি প্রিয়। রাজার অন্যান্য মহিষীগণ এতে পদুমবতীর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়। প্রধান মহিষীর গর্ভাবস্থায় রাজা প্রত্যন্ত অঞ্চলে যুদ্ধে গমন করলে অন্যান্য মহিষীগণ মন্ত্রণা করে তার জাত সন্তানদের বাক্সবন্দি করে রেখে এক খণ্ড কাষ্ঠ রক্ত মিশ্রিত করে জানাল যে, পদমুবতী একখণ্ড কাষ্ঠ প্রসব করেছে। রাজা প্রাসাদে ফিরে এসে এ বিষয়ে শুনে প্রধান মহিষীর উপর রেগে তাকে প্রাসাদ থেকে বের করে দিলেন। পরে বাক্সবন্দি শিশুদের অবস্থান প্রকাশ পেল এবং প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হল। উপাখ্যানের ক্ষেত্রে এটা একটি অতীব চমৎকার কাহিনী। ঘোষক শ্রেষ্ঠীর অনুপম জীবনোপাখ্যানও এ গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে।

পরমত্থজ্যোতিকা

পরমত্থজ্যোতিকা[২৬২] খুদ্দকপাঠের অট্‌ঠকথা। এখানেও বহু কৌতুকবহ ঘটনার অবতারণা দেখা যায়। এগুলো এক প্রকার ঐতিহাসিক উপাখ্যান হিসেবে ধরে নেওয়া যায়। বারাণসীরাজের প্রধান মহিষী গর্ভবতী হলেন। রাজাকে জ্ঞাত করা হলে তিনি গর্ভরক্ষার জন্য যাবতীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করলেন। ভবিষ্যৎ সন্তানের কল্যাণ কামনায় নানাপ্রকার পুণ্যানুষ্ঠান করতে লাগলেন। গর্ভ পূর্ণ হলে রাণী সূতিকাগারে প্রবেশ করলেন। রাত্রি অবসানে প্রত্যুষে রাণী প্রসব করলেন একটি লাক্ষা বর্ণের মাংসপিণ্ড। অন্যান্য মহিষীগণ এটা দেখে ভাবলেন, যদি রাজাকে জানানো হয় যে, মহিষী একটি মাংসপিণ্ড প্রসব করেছেন, তাহলে সকলের উপর রুষ্ট হবেন। তাঁরা ভীত হয়ে মাংসপিণ্ডটি একটি পাত্রে রেখে মুখ বন্ধ করে দিলেন, তারপর এর উপর রাজকীয় সীল দিয়ে গঙ্গার জলে ভাসিয়ে দিলেন। সঙ্গে সঙ্গে এক দেবতা এটার নিরাপত্তার জন্য পাত্রের উপরে একটি স্বর্ণপাতে লিখে দিলেন, "এটা বারাণসীর প্রধানা মহিষীর সন্তান।" তৎপর তিনি পাত্রটিকে স্রোতে ফেলে দিলেন। সেই সময়ে গঙ্গার তীর দিয়ে এক তাপস যাচ্ছিলেন। তিনি পাত্রটি দেখে ভাবলেন ছিন্নবস্ত্রের (পাংসুকল)। কিন্তু পাত্রের উপর সীল ও লেখা দেখে পাত্রটি খুলে একটি মাংসপিণ্ড দেখতে পেলেন। তিনি ভাবলেন, "এটা নিশ্চয়ই ভ্রূণ হবে।" তিনি পাত্রটি তাঁর আশ্রমে নিয়ে গেলেন এবং একটি পরিচ্ছন্ন স্থানে রাখলেন। পনের দিন পর মাংমপিণ্ড দু'ভাগে বিভক্ত হল। তাপস এদের যত্ন নিতে লাগলেন। আরও পনের দিন পর প্রত্যেক ভাগে একটি মস্তক, দুটি হাত ও দুটি পা দেখা দিল। আরও পনের দিন পর উক্ত পিণ্ড দু'টি পরম সুন্দর একটি বালক ও অন্যন্য সুন্দরী একটি বালিকায় পরিণত হল। তাপস শিশুদ্বয়কে পিতৃস্নেহে প্রতিপালন করতে লাগলেন। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলী থেকে দুধ বের হত। তিনি সেই দুধ শিশুদ্বয়কে পান করাতেন। এদের জন্মের পর যখন স্বর্ণময় পাত্রে রাখা হয়েছি ল তখন মনে হত এতে কোনো ছবি নেই (নিচ্ছবি) ; আবার কেহ কেহ বলেন, ছবি (চর্ম এবং পেটের মধ্যে (the skin and the thing in the stomach) পরস্পর এমন ভাবে সম্পৃক্ত ছিল যে (Lina–chavi) তাদের কোনো পার্থক্য বুঝা যেত না। এ কারণে তাদের নাম হয় লিচ্ছবি। তাপস দুই শিশুর পরিচর্যা ও লালন-পালন করতে

www.pathagar.com

থাকেন। তিনি প্রভাতে ভিক্ষার জন্য গ্রামে প্রবেশ করতেন এবং অনেক বেলায় প্রত্যাবর্তন করতেন। গোপালকগণ বলল, "প্রভু, শিশুদের প্রতিপালন করা একজন তাপসের পক্ষে খুব কষ্টকর। দয়া করে শিশুদ্বয়কে আমাদের দিন, আমরা এদের প্রতিপালন করব, আপনি স্বচ্ছেন্দে আপনার কাজ করতে পারবেন।" তাপস তাদের প্রস্তাব সাদরে গ্রহণ করলেন। পরদিন গোপালকগণ পরম উৎসাহে তাপসের আশ্রমে উপনীত হল। তাপস শিশুদ্বয়কে সমর্পণ করে বললেন, "এই শিশুদ্বয় অতি পুণ্যবান, এদের যথাযথ যত্ন নেবে। আর তারা বড় হলে পরস্পরের সঙ্গে বিয়ে দেবে এবং তাদের একখনণ্ড জায়গা প্রদান করবে।" তারা তাপসের সঙ্গে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়ে শিশুদ্বয়কে নিয়ে এল। তারা খেলা করার সময় অন্য ছেলেমেয়েদের প্রহার করত। তারা কেঁদে কেঁদে বাড়ি গিয়ে মাতা-পিতাকে বলত, "এ তাপসের প্রতিপালিত মাতৃ-পিতৃহীন ছেলেমেয়েদ্বয় আমাদের মেরেছে।" তখন তাদের মাতাপিতারা ঐ শিশুদ্বয়ের সঙ্গে মেলামেশা না করার জন্য অর্থাৎ বর্জন (বজ্জিতব্বা) করার জন্য বলল। তদবধি তিন যোজন পরিমিত স্থান 'বজ্জি' নামে অভিহিত হয়।

অনন্তর তাপসের নির্দেশক্রমে দুই ভাই-বোনের মধ্যে বিয়ে সম্পন্ন হল। কালক্রমে তাদের প্রতিবারে একটি ছেলে একটি কন্যা জন্মগ্রহণ করে এবং এভাবে ১৬টি পুত্র ও ১৬টি কন্যা সন্তান জন্মে। তাদের পরস্পরের মধ্যে পুনরায় বিয়ে হয়। এভাবে জনসংখ্যা বাড়তে থাকে। তারা যে নগরে বাস করত তা বিশাল আকার ধারণ করল। এ কারণে তাদের রাজ্যের নাম হল বৈশালী। এটাই বৈশালীর ইতিহাস।[২৬৩] কাহিনীটি রূপকথার মতো মনোজ্ঞ।

সুত্তনিপাতের অট্ঠকথাও পরমত্থজ্যোতিকা। এখানেও লেখকের কল্পনাপ্রসূত কৌতুকপ্রদ কিছু গল্প-কানিহী স্থান পেয়েছে। এতেও ঐতিহাসিক ও ধর্মীয় গল্পের অবতারণা করা হয়েছে। বলা হয়েছে– অতীতকালে বারাণসীতে এক আচার্য সূত্রধর বাস করতেন। তাঁর ষোলশত শিষ্য ছিল এবং প্রত্যেকের সহস্রজন অন্তেবাসিকা ছিল। তারা প্রত্যেকেই কাষ্ঠ দ্বারা গৃহাদি নির্মাণ করে জীবিকা নির্বাহ করত। একসময় আচার্য সূত্রধর উদমবর ইত্যাদি কম সারবান বৃক্ষ দিয়ে একটি কাষ্ঠ শকুণ নির্মাণ করেছিলেন। কাষ্ঠ নির্মিত এই যান্ত্রিক পাখিটির অভ্যন্তরে প্রবেশ করে আচার্য আকাশে উঠে বনাঞ্চলাদি ঘুরে এসে আবার ভূমিতে শিষ্যদের কাছে নামলেন। তিনি শিষ্যদের বললেন, "সূত্রধরদের জীবন অতি কষ্টকর, এরকম কাষ্ঠবাহন থাকলে সমগ্র জম্বুদ্বীপ অধিকার করা সম্ভব। আমাদের রাজত্ব দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করতে হবে। শিষ্যরা বারাণসীরাজ্য দখল করার জন্য আচার্যকে বললেন, কিন্তু এতে আচার্য সম্মত হলেন না। কারণ এখানে তারা সকলেই সূত্রধর হিসেবে পরিচিত। তাদের মধ্য থেকে কেহ রাজা নিযুক্ত হলেও বংশানুক্রমিক পেশা 'সূত্রধর' নাম থেকে মুক্ত হতে পারবে না। কাজেই তাদের অন্যত্র রাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে হবে।

অনন্তর তারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হয়ে কাষ্ঠবাহনে চড়ে হিমবন্ত প্রদেশে গমন করল। সেখানে হিমবতী নামে এক নগরে প্রবেশ করে রাজ্য গ্রহণ করল। তাদের আচার্যকে

www.pathagar.com

রাজপদে বসানো হল। তিনি কাষ্ঠবাহনরাজ নামে পরিচিতি লাভ করলেন। নগরীর নাম হল 'কাষ্ঠবাহননগরী' আর রাজ্যের নাম হল 'কাষ্ঠবাহনরাজ্য'। কাষ্ঠবাহনরাজা ধর্মত রাজ্য শাসন করতে থাকেন। তিনি এক উপযুক্ত শিষ্যকে যুবরাজ ও অন্যদের অমাত্যপদে বৃত করলেন। রাজার সুশাসনে রাজ্যবাসী অতীব সুখে ছিল, তারা নিরুপদ্রবে ও নিশ্চিন্তে জীবনযাপন করতে লাগল। রাজ্যটি ক্রমশ শক্তিশালী ও সমৃদ্ধশালী হয়ে উঠতে লাগল। এর মধ্যে বারাণসী রাজ্য থেকে বহু বণিক কাষ্ঠবাহন রাজ্যে বাণিজ্যার্থে আগমন করতে লাগলেন। তাঁদের মাধ্যমে উভয় দেশের রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। কাষ্ঠবাহনরাজ্য থেকেও বণিকগণ বারাণসীরাজ্যে ব্যবসা করার জন্য গমন করতে লাগলেন। উভয় রাজা বাণিজ্যের জন্য শুল্কমুক্ত ঘোষণা করলেন। তাদের হৃদ্যতা ক্রমশ দৃঢ়তর হতে লাগল।[২৬৪]

একসময় উভয় রাজা পরস্পর পত্র বিনিময়ের মাধ্যমে উভয় রাজ্যের শ্রেষ্ঠ আশ্চার্যবস্তু দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন, কাষ্ঠবাহনরাজা নিজ রাজ্যে প্রস্তুত সূর্যরশ্মির মত উজ্জ্বল বর্ণ সদৃশ রক্তকম্বল আটটি লাক্ষা গোলকের মধ্যে ভাজ করে বারাণসী-রাজের নিকট উপহার স্বরূপ পাঠালেন। বারাণসী-রাজ এগুলোকে খেলনা মনে করে অবহেলা ভরে একটি গোলক সিংহাসনে আঘাত করলেন। পাত্র ভেঙ্গে অপূর্ব বর্ণময় কম্বলগুলো দেখা গেল। প্রতিটি কম্বল আট হাত প্রস্থ ও দৈর্ঘ্যে ষোল হাত। কম্বলের বর্ণচ্ছটায় রাজঙ্গন উদ্ভাসিত হয়ে উঠল। এ দৃশ্য দেখে রাজা ও আমাত্যগণ অত্যন্ত প্রীতিলাভ করলেন। অতঃপর রাজা চিন্তা করলেন, বিনিময়ে বন্ধু কাষ্ঠবাহন রাজাকে অধিকতর শ্রেয় উপহার দিতে হবে। বুদ্ধকশ্যপ (কস্সপ) তখন বারাণসীতে বাস করছিলেন। রাজা ভাবলেন, ত্রিরত্নই শ্রেষ্ঠ রত্ন এবং এই শ্রেষ্ঠ রত্নই বন্ধুর নিকট উপহার পাঠাব। তিনি স্বর্ণপাত্রে ত্রিরত্নের আবির্ভাববার্তা লিখে মহার্ঘ সপ্তরত্নময় আধারে স্থাপন করে তা আবার মণিময় পাত্রে, পুনরায় পদ্মরাগ মণিময় পাত্রে, এটি আবার দন্তময় পাত্রে, সর্বশেষ দন্তময় পাত্রটি সারময় আধারে স্থাপন করালেন। তৎপর পেটিকাবদ্ধ করে তা স্বর্ণধ্বজা ও স্বর্ণালংকারে সুশোভিত করে হস্তীপৃষ্ঠে স্থাপন করালেন। তদুপরি শ্বেতছত্র উত্তোলিত হল। বিভিন্ন সুগন্ধযুক্ত পুষ্পদ্বারা পূজা করে কাষ্ঠবাহন রাজের নিকট তা পাঠিয়ে দেওয়া হল। কাষ্ঠবাহন পরম শ্রদ্ধাভরে পেটিকা খুললেন, প্রতিলিপি পাঠে তিনি পরম আনন্দ উপভোগ করলেন, তিনি উপলব্ধি করলেন, বুদ্ধ- তথা ত্রিরত্ন পৃথিবীতে অতি দুর্লভ বস্তু। তিনি অমাত্য ও সমাগত জনগণকে জানালেন এবং বুদ্ধ দর্শনের ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। ষোড়শ অমাত্য ও তাদের সহস্র পরিবার এবং রাজার ভাগিনেয় একরাত্রেই বারাণসীরাজ্যে উপনীত হলেন। কিন্তু ইতিপূর্বে বুদ্ধ পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। এতে তাঁরা সকলেই মর্মাহত হলেন। সকলে বুদ্ধের দেশিত ধর্মে প্রতিষ্ঠিত হলেন। ভাগিনেয় ও অমাত্য ব্যতীত সকলেই প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। অমাত্য ও ভাগিনেয় কাষ্ঠবাহনরাজ্যে প্রত্যাবর্তন করলেন।[২৬৫]

গল্পটি কাল্পনিক এবং ধর্মীয় আবরণে গ্রথিত। গল্পকার অত্যন্ত সুকৌশলে কাহিনীর ধারাকে একটি সুনির্দিষ্ট গতি দিয়েছেন, যা উপাখ্যানের সকল উপাদানে সমৃদ্ধ। এটা কল্পনাবিলাস মনকে আন্দোলিত না করে পারে না।

www.pathagar.com

এখানে পসুর পরিব্রাজক কাহিনীটি মনোজ্ঞ। শ্রাবস্তীর এই পসুর পরিব্রাজক ছিলেন মহাতার্কিক। তর্কে তাঁকে কেহ পরাস্ত করতে পারত না। তিনি তর্ক করার ইচ্ছায় রাস্তার মাঝখানে জম্বু নামক বৃক্ষ রোপণ করতেন। তাঁর পাণ্ডিত্যের খ্যাতি চারদিকে এমনভাবে ছড়িয়েছিল যে জম্বুকবৃক্ষ উৎপাটন করে তাঁর সঙ্গে তর্কে অবতীর্ণ হবার মত কোনো পণ্ডিত ছিল না। অবশেষে একদিন সারিপুত্র স্থবির উহা উৎপাটন করেন এবং তর্কে পসুর পরিব্রাজককে পরাজিত করেন। তিনি পরে জেতবনে বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন।[২৬৬] এখানে ঐতিহাসিক ঘটনাগুলোকে উপাখ্যানের ঢঙে পরিবেশন করা হয়েছে, তাই এসব কাহিনীর আবেদন সার্বজনীনভাবে স্বীকৃত ও উপভোগ্য।

থূপবংস

থূপবংস বা স্তূপবংশ সিংহলরাজ প্রথম পরাক্রমবাহুর (১১৫৩-১১৮৬ খ্রিস্টাব্দ) সময়ে সারিপুত্র স্থবিরের শিষ্য বাটিস্সর স্থবির প্রণীত একটি গদ্য বংশগ্রন্থ।[২৬৭] এ গ্রন্থে লেখক ভারতবর্ষ ও সিংহলে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন স্থানে প্রধানত বুদ্ধের সংরক্ষিত পূতাস্থির উপর স্তূপ বা ধাতুচৈত্য নির্মাণের ইতিকাহিনী লিপিবদ্ধ করেছেন। গ্রন্থটি এগার অধ্যায়ে সমাপ্ত। তবে বিষয়বস্তু অনুযায়ী এটাকে প্রধানত তিনটি পর্যায়ে ভাগ করা যেতে পারে। প্রথম পর্যায়ে বুদ্ধের অতীত জীবন কাহিনী, দ্বিতীয় পর্যায়ে বুদ্ধের জন্ম থেকে পরিনির্বাণ প্রাপ্তি পর্যন্ত জীবনেতিহাস ও বুদ্ধের অস্থিধাতু বন্টন, অজাতশত্রু কর্তৃক স্তূপ নির্মাণ ইত্যাদি এবং তৃতীয় পর্যায়ে ধাতুর ইতিহাস। এখানে সংক্ষেপে কয়েকটি ঘটনার উল্লেখ করা হল, যা আখ্যান বা উপাখ্যান হিসেবে গণ্য করা যেতে পারে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের ঘটনা। তখন বুদ্ধ দীপঙ্কর পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়েছেন। ব্রাহ্মণ সুমেধ তাপস তখন অমরাবতী শহরে বাস করতেন। তিনি ব্রাহ্মণ্য বিদ্যায় পারদর্শিতা লাভ করেন। তিনি কৈশোরে পিতৃ-মাতৃহীন হয়ে পড়েন। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি বিপুল সম্পত্তির উত্তরাধিকারী হন। তিনি উপলব্ধি করেন যে, জগৎ দুঃখময় এবং দুঃখের উৎপত্তির অন্যতম কারণ অর্থবিত্ত। তাই তিনি সমস্ত সম্পত্তি দীন-দুঃখীজনকে বিতরণ করে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে হিমালয়ে বাস করতে লাগলেন।

দীপঙ্কর বুদ্ধ তখন রম্মনগরে এসেছিলেন। শহরবাসীরা বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহার্য গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। এ উপলক্ষে উৎসাহী নগরবাসীগণ ঐ স্থান সুসজ্জিত করেছিলেন। তাঁরা রাস্তাঘাট মেরামত করতে শুরু করলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘ যে বিহার থেকে ঐ নির্দিষ্ট স্থানে যাবেন সেখানে কিছুটা রাস্তা ভগ্ন ছিল। সুমেধ তাপস হিমালয় পর্বত থেকে যাবার সময় এ বিষয় জ্ঞাত হলেন এবং তিনিও পথসংস্কারের কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। কর্দমময় রাস্তা নির্মাণ সম্পূর্ণ না হতে বুদ্ধ ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ সেখানে উপস্থিত হলেন। তাপস সুমেধ তৎক্ষণাৎ কাদাযুক্ত ভগ্ন রাস্তায় শুয়ে পড়লেন এবং বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে তাঁর দেহের উপর দিয়ে পাড় হতে অনুরোধ করলেন। বুদ্ধ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘ প্রার্থনা অনুযায়ী পাড় হলেন। সুমেধ প্রার্থনা করলেন, "ভবিষ্যতে আমি যেন

www.pathagar.com

সম্যক-সম্বুদ্ধ হতে পারি।" বুদ্ধ আশীর্বাদ করলেন, তিনি অনাগতে গৌতম নামে বুদ্ধ হবেন।[২৬৮] কাহিনী এখানে শেষ হল, বীজ অঙ্কুরিত হল নতুন এক বুদ্ধাঙ্কুরের- যিনি পরবর্তীতে গৌতম বুদ্ধ নামে খ্যাতি লাভ করেন।

গৌতম বুদ্ধ সুদীর্ঘ পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্ম প্রচার শেষে কুশীনগরে মল্লদের সালবনে মহাপরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁর দেহ তুলো ও কাপড় দিয়ে জড়ানো হল এবং তৈলপূর্ণ দ্রোণীতে রেখে অপর একটি দ্রোণী দ্বারা আবৃত করা হল। চারজন মল্ল-প্রধান বুদ্ধের শবাধারে অগ্নি সংযোগের চেষ্টা করলেন, কিন্তু ব্যর্থ হলেন। তখন অনুরুদ্ধ স্থবির বললেন, "মহাকশ্যপ স্থবির শিস্যগণসহ এখন পাবা হতে কুশীনগরের পথে রয়েছেন, তিনি এসে বুদ্ধকে বন্দনা না করা পর্যন্ত অগ্নি প্রজ্জ্বলিত হবে না।" তিনি যথাসময়ে উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে অভিবাদন করলেন। শবাধারে অগ্নি জ্বলে উঠল অলৌকিকভাবে। দেহ ভস্ম হবার পর আগুন নিভে গেল। দ্রোণী থেকে অস্থিসমূহ নেওয়া হল। কুশীনারার মল্লগণ, মগধরাজ অজাতশত্রু, বৈশালীর লিচ্ছবিগণ, কপিলাবস্তুর শাক্যগণ, অল্লকপ্পের বুলিগণ, রামগামের কোলিয়গণ, বেঠদীপকের এক ব্রাহ্মণ এবং পাবার মল্লগণ বুদ্ধের অস্থিধাতু দাবী করলেন। প্রথমে কুশীনারার মল্লগণ ধাতু-বিভাগ করতে রাজী ছিলেন না। দোণ নামক জনৈক ব্রাহ্মণ তাদের বিবাদ মীমাংসা করে অস্থিধাতু সমান আট ভাগে ভাগ করে বিতরণ করলেন। ব্রাহ্মণ দোণ সবার অলক্ষে একটি দন্তধাতু রেখেছিলেন। দেবরাজ শক্র এটা চুরি করে স্বর্গে নিয়ে যান। অস্থি বন্টনের পর দন্ত ধাতু না পেয়ে ব্রাহ্মণ দোণ ধাতুর পাত্রটি গ্রহণ করলেন।

বুদ্ধের অস্থি ধাতুসমূহ আটটি স্থানে যথাক্রমে রাজগৃহ, বৈশালী, কপিলাবস্তু, অল্লকপ্প, রামগ্রাম, বৈঠদ্বীপ, পাবা এবং কুশীনগরে নিধাহিত করে তৎস্থলে বৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করা হয়েছিল। কিন্তু রামগ্রামে রক্ষিত ধাতু নাগগণ নিয়ে গিয়ে অতি যত্নসহকারে সংরক্ষণ ও সম্মান করতে লাগলেন। এই ধাতুসমূহ পরবর্তী সময়ে সিংহলে নীত হয়েছিল।[২৬৯]

পরবর্তী সময়ে মহাকশ্যপ স্থবিরের পরামর্শক্রমে মগধরাজ অজাতশত্রু বুদ্ধের সমস্ত অস্থিধাতু বৈশালী, কপিলাবস্তু, অল্লকপ্প, বৈঠদ্বীপ, পাবা ও কুশীনারা থেকে সংগ্রহ করে রাজগৃহের দক্ষিণ-পূর্ব অংশে নিধাহিত করে তার উপরে একটি সুবৃহৎ স্তূপ নির্মাণ করেন।

দুই'শ বছর পরের ঘটনা। মৌর্য সম্রাট বিন্দুসারের একশজন পুত্র ছিল। বিন্দুসারের মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র অশোক তাঁর একশজন ভাইকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি অভিষিক্ত হন চার বছর পর। অশোক প্রথম জীবনে তাঁর পিতার ন্যায় ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অনুসারী ছিলেন। কিন্তু একদিন তাঁদের আহারের সময় অসংযত আচরণ দেখে তিনি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন। একদা তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুমনের পুত্র নিগ্রোধ শ্রামণের রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় অশোক তাঁর সংযত গমন দেখে অতীব মুগ্ধ হলেন এবং অমাত্য দিয়ে তাঁকে রাজ প্রাসাদে ডাকলেন। নিগ্রোধ তাঁকে ধর্মপদের

www.pathagar.com

অপ্পমাদগ্গ দেশনা করলে তিনি বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তদবধি তিনি তাঁর প্রাসাদে প্রতিদিন ষাট হাজার ব্রাহ্মণ ভোজনের পরিবর্তে অনুরূপ সংখ্যক ভিক্ষু ভোজনের ব্যবস্থা করেন। তিনি চুরাশি সহস্র বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করে অজাতশত্রু কর্তৃক নিধাহিত বুদ্ধের অস্থি-ধাতু সংগ্রহ করে চুরাশি হাজার চৈত্যে নিধান করেন। অতঃপর তিনি তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বৌদ্ধধর্মে দান করে ধর্মের উত্তরাধিকারী হন।

তখন মোগ্গলিপুত্ত তিস্স থের ছিলেন সঙ্ঘনায়ক। তাঁর নির্দেশে রাজা অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারত ও বহির্ভারতে বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য প্রচারক দল (মিশন) প্রেরিত হয়। মহেন্দ্র, ইত্তিয়, উত্তিয় এবং ভদ্দসাল স্থবিরকে সিংহলে প্রেরণ করা হয়। তখন সিংহলের রাজা ছিলেন দেবপ্রিয়তিষ্য।[২৭০] তিনি ছিলেন সম্রাট অশোকের পরম বন্ধু, যদিও তাঁদের কখনও পারস্পরিক সাক্ষাৎ ঘটেনি। সিংহলরাজ জানতেন যে, সেই ভিক্ষুগণ মহান বুদ্ধের শিষ্য, তিনি সসম্মানে তাঁদের স্বাগত জানালেন। সিংহলরাজ তিষ্যের সঙ্গে বহু সিংহলী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। মহেন্দ্র স্থবির বিমানবত্থু, পেতবত্থু ও সচ্চসংযুক্ত দেশনা করলে রাজা তাঁর পাঁচশ রাণীসহ স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

তারপর সুমন নামক শ্রামণেরকে বুদ্ধের ধাতু আনয়নের জন্য পাটালিপুত্রে সম্রাট অশোকের নিকট প্রেরণ করা হয়। তিনি বুদ্ধ কর্তৃক ব্যবহৃত ধাতু প্রাপ্ত হলেন। দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে বুদ্ধের দক্ষিণ চক্ষু প্রদান করলেন। ধাতু নিয়ে সুমন সিংহলে প্রত্যাবর্তন করলেন। দেবপ্রিযতিষ্য সসম্মানে ধাতু গ্রহণ করলেন এবং একটি বৃহৎ বিহার নির্মাণ করে বুদ্ধের দক্ষিণ চক্ষু প্রতিষ্ঠা করলেন।

দেবপ্রিয়তিষ্যের ভ্রাতৃবধু অনুলাদেবী প্রব্রজ্যা গ্রহণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে মহেন্দ্র স্থবিরের পরামর্শক্রমে রাজা তাঁর ভ্রাতৃপুত্র অরিট্ঠকে অশোকের নিকট প্রেরণ করলেন সঙ্ঘমিত্রা থেরী ও বোধিবৃক্ষের একটি শাখা আনয়ন করার জন্য। সম্রাট অশোক সিংহল রাজের ইচ্ছানুযায়ী বোধিবৃক্ষের শাখাসহ থেরী সঙ্ঘমিত্রাকে অরিট্ঠের সঙ্গে প্রেরণ করলেন। বোধিবৃক্ষের শাখা অতি সম্মানের সঙ্গে অনুরাধপুরে রোপণ করা হল। থেরী সঙ ঘমিত্রার নিকট পাঁচশজন যুবতীসহ অনুলাদেবী প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং তাঁরা পর্যায়ক্রমে অর্হত্ত্বলফলে উন্নীত হন। দেবপ্রিয়তিষ্য রাজা সিংহল দ্বীপে এক যোজন অন্তর অন্তর একটি করে স্তূপ নির্মান করেছিলেন।

তারপর সিংহলের রাজনৈতিক ও ধর্মীয় পরিমণ্ডলে বহু পাট পরিবর্তন হতে থাকে। কাকর্বণতিষ্য রাজের পুত্র দুট্ঠগামণি সিংহলে ব্যাপক বিবর্তন আনয়ন করেন। তখন সিংহল তামিলদের অধীন ছিল। পিতার মৃত্যুর পর দুটঠগামনি মহাগামের সিংহাসনে আরোহণ করেন। অনন্তর তিনি সিংহল থেকে তামিলদের বিতাড়িত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তিনি শক্তিশালী সেনাবাহিনীসহ তামিল আক্রমণে বহির্গত হন। প্রথমে তিনি মহিয়ঙ্গণে গিয়ে তামিলদের দমন করেন এবং সেখানে কঞ্চুকস্তূপ নির্মাণ করেন। কথিত আছে, বুদ্ধ বোধিলাভের নবম মাসে এখানে এসেছিলেন এবং তিনি সুমন নামক

www.pathagar.com

দেবরাজকে কেশধাতু অর্পন করেছিলেন। এখানে কেশধাতুর উপর সাত হাত উঁচু একটি স্তুপ নির্মাণ করা হয়েছিল। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সরভ নামে জনৈক সারিপুত্র স্থবিরের শিষ্য বুদ্ধের স্কন্ধধাতু একই স্থানে প্রতিষ্ঠা করে ১২ হস্ত উঁচু করে স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। দেবপ্রিয়তিষ্যের ভ্রাতা চূলাভয় এটা ৩০ হাত উঁচু করে নির্মাণ করেছিলেন এবং দুট্ঠগামণি তামিলদের পরাজিত করে একে ৮০ হাত উঁচু করে তৈরি করেন।

দুট্ঠগামণি এলাররাজসহ বত্রিশজন তামিলরাজাকে হত্যা করে সিংহলকে বিদেশীর শাসন থেকে মুক্ত করেন। অতঃপর তিনি সিংহলের একক শাসক হন। অনন্তর তিনি প্রজাগণের ও বৌদ্ধধর্মের উন্নতির জন্য মনোনিবেশ করেন। তিনি মারিচবট্টি বিহার নির্মাণ করেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে দান করেন।

দুট্ঠগামণি 'সোবন্নমালি' নামে ১২০ হাত উচ্চ বিশিষ্ট একটি চমৎকার মহাস্তূপ এবং নয়তল বিশিষ্ট একটি 'লোহপাসাদ' নির্মাণ করেন। এটার আকার ছিলো দেবমন্দিরের মত। এতে এক সহস্র কক্ষ ছিলো, স্তম্ভসমূহে সিংহ, ব্যাঘ্র এবং দেবতাদের আকৃতি অঙ্কিত ছিল। সর্বত্র জাতককাহিনীও অঙ্কন করা হয়েছিল। এই মনোরম বিহার তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করেন।

অনন্তর দুট্ঠগামণি প্রজাদের কর ছাড়া মহাস্তূপ নির্মাণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। এই মহাস্তূপ নির্মাণের উপকরণ কোথায় পাবেন- এ ব্যাপারে তিনি অতি উদ্বীন্ন ছিলেন। দেবগণ তাঁকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসলেন। দেবগণ সমস্ত উপকরণের যোগান দিলেন। মহাস্তূপের পাকাকরণ বৈশাখী পূর্ণিমা দিনে আরম্ভ হল। জম্বুদ্বীপের বিভিন্ন স্থান থেকে আগত নেতৃস্থানীয় ভিক্ষুদের উপস্থিতিতে এই মহাস্তূপের ভিত্তি দেওয়া হল। ধাতু কক্ষে একটি বোধিবৃক্ষ রোপণ করলেন। এর উপর একটি চমৎকার চাঁদোয়া টাঙানো হল। চাঁদোয়াটি ছিল বিচিত্র রঙ-বেরঙের। ধাতু-কক্ষে সযত্নে অঙ্কন করা হল ধম্মচক্ক পবত্তনসুত্ত, স্বর্গে দেবতাদের মধ্যে বুদ্ধের উপদেশ, মহাসময়সুত্ত, মহামঙ্গলসুত্ত, দোণ ব্রাহ্মণ কর্তৃক ধাতু বিভাজন ইত্যাদি বুদ্ধ জীবনের সঙ্গে সম্পৃক্ত জীবন কাহিনী।[২৭১]

থূপবংস অতি চমৎকারভাবে বর্ণিত সাধারণ পাঠকের নিকট চরম উপভোগ্য বেশ কিছু ধর্মীয় উপাখ্যানের সমষ্টিমাত্র। গ্রন্থে সিংহলরাজ দুট্ঠগামণির কৃতিত্ব ও মহত্ত্ব বর্ণিত হয়েছে এবং তাঁর কৃতকর্মসমুহ অলৌকিকভাবে পরপর সবই সম্পাদিত হয়েছে। কাহিনীর বিবরণে পাঠকের নিকট মনে হয় সিংহলের ইতিহাসে দুট্ঠগামণির প্রয়োজন ছিল। বৌদ্ধধর্ম প্রচার, প্রসার ও সংরক্ষণে তিনি অনন্য সাধারণ কৃতিত্ব রেখে গেছেন।

দাঠাবংস

দাঠাবংস[২৭২] বা দন্তধাতুবংস গ্রন্থখানি বুদ্ধের দন্তধাতুর উপর বর্ণিত কাব্যাকারে উপাখ্যান। এটাকে গৌতম বুদ্ধের দন্তধাতুর উপর ঐতিহাসিক উপাখ্যান বলা যেতে পারে। বহু গ্রন্থ রচয়িতা পালি ও সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত রাজগুরু ধম্মকিত্তি এটা পালি ভাষায় লেখেন। দাঠাবংশের প্রারম্ভিক গাথায় তিনি বলেছেন যে, মূল গ্রন্থটি সিংহলী ভাষায় লিখিত হয়েছিল

www.pathagar.com

এবং রাজ-সেনাপতি পরক্কমের অনুরোধে সকল দেশের পাঠকের বোধগম্যতার জন্য তিনি এটা পালি (মাগধী) ভাষায় অনুবাদ করেন। কথিত আছে রাজা কিত্তিসিরি মেঘবর্ণের সময়ে ৮৪৫ খ্রিস্টাব্দে এটা লিখিত হয়েছিল।[২৭৩] পালি সাহিত্যের ইতিহাসে দাঠাবংসের গুরুত্ব অপরিসীম। এটা বুদ্ধের দন্তধাতুর উপর একটি ঐতিহাসিক দলিল। তাই এটা দীপবংস ও মহাবংসের মত গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ।[২৭৪] বিভিন্ন ছন্দে লিখিত দাঠাবংস একটি উৎকৃষ্ট শ্রেণীর কাব্যগ্রন্থ।

দাঠাবংস পাঁচটি অধ্যায়ে বিভক্ত। মূল আলোচ্য বিষয় বুদ্ধের দন্তধাতু। এখানে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ বুদ্ধত্ব লাভের নয় মাস পর শ্রীলংকার মহানাগবন নামক বাগানে উপনীত হয়েছিলেন। তিনি সেখানে যক্ষদের সভায় উপস্থিত হন এবং ঝড়, অন্ধকার ও ভারি বৃষ্টিপাতের দ্বারা আতঙ্কের সৃষ্টি করেন। যক্ষগণ ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে বুদ্ধের সমীপে উপস্থিত হয়ে এর থেকে রক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে। তিনি সভার মধ্যস্থলে একটি চামড়ার আসনে উপবেশন করেছিলেন। অলৌকিক ঋষি প্রভাবে তিনি আসনখানা অত্যধিক গরম করে তথা হতে আলো বের করালেন। যক্ষগণ ক্রমশ অধিকতর দুর্দশাগ্রস্ত হয়ে পড়লো। বুদ্ধ চামড়াখানা এমনভাবে বিস্তৃত করলেন যে, সমগ্র লংকা দ্বীপ ছেয়ে গেল। যক্ষগণ তাপ সহ্য করতে না পেরে সমুদ্র তীরে একত্রিত হল। তারা ছায়াময় গিরিদ্বীপে আশ্রয় গ্রহণ করল অসহ্য উত্তাপের হাত থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য। এভাবে লঙ্কা যক্ষদের হাত থেকে রক্ষা পেল। তারা অতি শীঘ্রই লঙ্কা ত্যাগ করল। অতঃপর তিনি তাঁর অলৌকিক ঋদ্ধি বন্ধ করলেন। বুদ্ধের চতুর্দিকে বহু দেবতা সমবেত হলেন। তিনি ধর্মদেশনা করলেন এবং তাঁদিগকে একখানা কেশধাতু সমর্পণ করলেন। সুমন দেবতা সুমনকূট পর্বতে কেশ ধাতুর উপর চৈত্য নির্মাণ করে পূজা করেছিলেন। অতঃপর বুদ্ধ জেতবনে প্রত্যাবর্তন করেন।[২৭৫]

বুদ্ধ পুনরায় লঙ্কায় আগমন করেন বোধিজ্ঞান লাভের পঞ্চম বর্ষ পর এবং চূলোদর ও মহোদরের মধ্যে মণিময় সিংহাসন নিয়ে সৃষ্ট বিবাদ মীমাংসা করেন। অতঃপর তিনি বুদ্ধত্ব লাভের অষ্টম বর্ষে লঙ্কায় আগমন করেন মনি অক্খিক নামক নাগের আমন্ত্রণে। বুদ্ধ পাঁচশ শিষ্যসহ কল্যাণীতে মণিঅক্খিকের বাড়ি গমন করেন। সেখানে মণিঅক্খিক কর্তৃক চৈত্য নির্মিত হয় এবং নাগগণ কর্তৃক পূজিত হয়েছিল। অতঃপর বুদ্ধ সুমনকূট পর্বতে গিয়ে পদচিহ্ন স্থাপন করেন। সেখান হতে দীর্ঘবাপী গিয়ে সাধনায় বসেন। সেখান হতে অনুরাধপুরে বোধিবৃক্ষের কাছে কিছুক্ষণ সাধনায় বসেন। তৎপর থুপারাম পরিভ্রমণ করে তিনি লঙ্কা ভ্রমণ সমাপ্ত করেন। পঁয়তাল্লিশ বছর ধর্মদেশনা শেষে কুশীনারায় বুদ্ধ মহাপরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন। তাঁকে যথাসময়ে রাজচক্রবর্তী মর্যাদায় দাহ করা হয়। তাঁর দেহ এমনভাবে ভস্মিভূত করা হয় যে কোনো ছাই পর্যন্ত অবশিষ্ট ছিল না। শুধুমাত্র মুক্তা ও স্বর্ণের ন্যায় অস্থি ধাতু অবশিষ্ট ছিল। বুদ্ধের ইচ্ছানুযায়ী মস্তকের চারটি অস্থি, দুটি গ্রীবা অস্থি এবং দন্তগুলো অবশিষ্ট ছিল। সারিপুত্রের শিষ্য সরভূ স্থবির লঙ্কায় বুদ্ধের গ্রীবা ধাতু প্রতিষ্ঠা করে চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন।[২৭৬] ক্ষেম নামক অর্হৎ বুদ্ধের বাম দন্তধাতু

www.pathagar.com

নিয়েছিলেন এবং বাকী অস্থিধাতু নিয়ে আটটি দেশের রাজাগণ বিবাদ করেছিলেন। দোণ ব্রাহ্মণ অস্থিধাতুসমূহ সমান আট ভাগে ভাগ করে দিয়ে বিবাদ মীমাংসা করেন। রাজাগণ স্ব স্ব দেশে ধাতু প্রতিষ্ঠা করে চৈত্য নির্মাণ করেন এবং পূজা করেন। ক্ষেম ভিক্ষু দন্তধাতু কলিঙ্গরাজ ব্রহ্মদত্তকে প্রদান করেন। ব্রহ্মদত্ত চৈত্য তৈরি করে পূজা করেন। ব্রহ্মদত্তের পুত্র কাশীরাজও এটার যথাযথ পূজা ও সৎকার করেন। কাশীরাজের পুত্র সুনন্দও অনুরূপ পূজা করেন। সুনন্দের পুত্র গুহসীব সিংহাসনে আরোহণ করে একইভাবে দন্তধাতুর পূজা ও সম্মান করেন। গুহসীবের একজন মিথাদৃষ্টিসম্পন্ন অমাত্য ছিলেন। একদিন তিনি রাজাকে বললেন, এত অর্থ ব্যয় করে বুদ্ধের দন্তধাতুর যে পূজা করা হয়, তার কোনো অলৌকিক শক্তি আছে কি ? রাজা দন্তধাতুর গুণাবলি বর্ণনা করলেন এবং তাঁর প্রার্থনানুযায়ী দন্তধাতু ঋদ্ধি প্রদর্শন করেন। অমাত্য তাঁর মিথ্যাদৃষ্টি পরিত্যাগ করে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করেন। এসব দেখে অন্য তীর্থিকগণ অত্যন্ত রুষ্ট হল। গুহসীব রাজ্যের সকল নির্গ্রন্থদের বহিস্কার করার নির্দেশ প্রদান করেন। নির্গ্রন্থগণ পাটালিপুত্রের অধিপতি পাণ্ডুর নিকট অভিযোগ করল। পাণ্ডু ছিলেন তখনকার সময়ে জম্বুদ্বীপের খুব শক্তিশালী রাজা। তারা অভিযোগ করল যে, গুহাসীব রাজা পাণ্ডুরাজের অধীন হওয়া সত্ত্বেও এক মৃত ব্যক্তির অস্থি পূজা করছেন, অথচ পাণ্ডু যে শিব ও ব্রহ্মার পূজা করেন তিনি তা করেন না বরং পাণ্ডুরাজ কর্তৃক পূজিত দেবতাদের বিদ্রোপ করেন। পাণ্ডুরাজ তাদের কথা শুনে ক্রুদ্ধ হয়ে চিত্তয়ান নামক তাঁর অধীনস্থ রাজাকে শক্তিশালী সৈন্যবাহিনীসহ প্রেরণ করলেন- গুহসীবকে বন্দি করে দন্তধাতুসহ আনয়ন করার জন্য।[২৭৭] চিত্তয়ান গুহসীবকে তাঁদের আগমনের কারণ জানালেন, গুহসীব তাঁদিগকে সাদর আহ্বান করে বুদ্ধের দন্তধাতু প্রদর্শন করালেন এবং এর অলৌকিক ক্ষমতা সম্পর্কে বর্ণনা করলেন। চিত্তয়ান খুবই সন্তুষ্ট হলেন এবং বুদ্ধের মত গ্রহণ করলেন।

অনন্তর চিত্তয়ান গুহসীবকে পাণ্ডুরাজের আদেশ জ্ঞাত করালেন। গুহসীব বহু মূল্যবান উপঢৌকনসহ বিরাট জনতা সমভিব্যহারে দন্তধাতুকে মস্তকোপরি নিয়ে পাটালিপুত্রে পাণ্ডুরাজের নিকট উপস্থিত হলেন। নির্গ্রন্থগণ পাণ্ডুরাজকে অনুরোধ করলেন যেন গুহসীবকে কোনো আসন না দেওয়া হয়, কিংবা সম্মান না দেখানো হয়। তারা দন্তধাতুকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করার জন্য রাজা পাণ্ডুকে অনুরোধ করলেন। রাজার নির্দেশক্রমে প্রকাণ্ড গর্ত করে আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হল। সন্যাসীরা দন্তধাতু নিয়ে সেই প্রজ্জ্বলিত অঙ্গারে নিক্ষেপ করল। দন্তধাতু আগুনে পড়ামাত্র সঙ্গে সঙ্গে আগুন শীতকালীন মৃদু বাতাসের মত ঠাণ্ডা হয়ে গেল, আগুনের মধ্যখানে একটি পদ্মফুল প্রস্ফুটিত হল এবং সেই পদ্মের মাঝখানে দন্তধাতু বিরাজমান অবস্থায় চতুর্দিকে আলো বিকিরণ করতে লাগল। দন্তধাতুর এরূপ অলৌকিক প্রভাব দর্শন করে উপস্থিত জনগণ মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করলেন।[২৭৮] কিন্তু রাজা পাণ্ডু ও নির্গ্রন্থ সন্ন্যাসীরা মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করতে পারল না। রাজা দন্তধাতুকে পাথরের আঘাতে ধ্বংস করার জন্য নির্দেশ দিলেন। তখনই দেখতে পেলেন দন্তধাতু আকাশে স্থিত হয়ে আছে। নির্গ্রন্থগণ রাজাকে দন্তধাতুর অলৌকিক ক্ষমতা আর

www.pathagar.com

বৃদ্ধি না করার জন্য বলল। অনন্তর দন্তধাতুকে একটি বাক্স স্থাপন করা হল এবং নির্গ্রন্থগণকে বলা হল- বাক্স হতে দন্তুধাতু বের করে নিক্ষেপ করার জন্য। কিন্তু কেউ সমর্থ হল না। রাজা ঘোষণা করলেন যে, যে দন্তধাতু বের করতে সক্ষম হবে তাকে পুরস্কৃত করা হবে। অনাথপিণ্ডিকের প্রপৌত্র এই সংবাদ শুনে অতীব আনন্দিত হলেন এবং দন্তধাতু বাক্স থেকে বের করার জন্য গেলেন। তিনি দন্তধাতুর স্তুতিগান গাইলেন, দন্তধাতু আাকশে উত্থিত হল এবং ধীরে ধীরে অনাথপিণ্ডিকের প্রপৌত্রের মস্তকপোরি স্থিত হল। নির্গ্রন্থগণ এতেও দন্তধাতুর প্রভাব স্বীকার করল না। তারা বলল, এসব অনাথপিণ্ডিকের প্রপৌত্রের অলৌকিক প্রভাব। তৎপর চিত্তয়ানের উপদেশে পাণ্ডুরাজ বুদ্ধের ধর্মের শরণ গ্রহণ করলেন এবং দন্তধাতুর পূজা করলেন। তিনি গুহসবীকেও আন্তরিকভাবে গ্রহণ করলেন এবং উভয়ে বহু কল্যাণমূলক কাজ সম্পাদন করেন।

ক্ষীরধার নামে জনৈক রাজা দন্তধাতুর অলৌকিক কথা শুনে ধাতু কেড়ে নেবার জন্য পাণ্ডুরাজার রাজ্য আক্রমণ করলে গুহসীব তাকে দমন ও নিহত করেন। রাজ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার পর পাণ্ডুরাজ গুহসীবকে দন্তধাতুসহ কলিঙ্গ রাজ্যে প্রেরণ করেন। তখন উজ্জয়িনীর রাজপুত্র দন্তকুমার বুদ্ধের দন্তধাতু পূজা করার জন্য কলিঙ্গ রাজ্যে আগমন করেছিলেন।[২৭৯] গুহসীব আন্তরিকভাবে তাঁকে স্বাগত জানালেন এবং তাঁর গুণাবলীর বিষয় অবগত হয়ে তাঁকে স্বীয় কন্যা হেমমালাকে সম্প্রদান করলেন। দন্তধাতুর অন্তরায় অবলোকন করে রাজা গুহসীব তাঁর জামাতা ও কন্যাকে দন্তধাতু সিংহলে নিয়ে যাওয়ার জন্য বললেন। সিংহলের রাজা ও প্রজাগণ ছিলেন বৌদ্ধধর্মে বিশ্বাসী। কাজেই তিনি মনে করলেন সিংহলই হচ্ছে দন্তধাতু রক্ষা করার মত শ্রেষ্ঠ নিরাপদ স্থান। তখন সিংহলের রাজা ছিলেন গুহসীবের বন্ধু মহাসেন। জামাতা ও কন্যা দন্তধাতু নিয়ে তাম্রলিপ্ত পোতাশ্রয় থেকে ব্যবসায়ী জাহাজ যোগে সিংহলের উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। জাহাজ নিরাপদে সিংহলে পৌঁছল।

দন্তকুমার স্ত্রীসহ দন্তধাতু নিয়ে মহাদিসেনের পুত্র কিত্তিসিরিমেঘ রাজার রাজত্বের নবম বর্ষে, অনুরাধপুরের পূর্বদ্বারে একটি গ্রামে উপনীত হলেন। দন্তকুমার একজন অর্হতের সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি নিরাপত্তার জন্য দন্তধাতু হিংসলে আনয়নের বিষয় তাঁকে অবহিত করলেন। অর্হৎ এসংবাদ শুনে রাজার নিকট উপনীত হয়ে সমস্ত বিষয় জ্ঞাত করালেন। সিংহলরাজ সমাসেন ছিলেন কলিঙ্গরাজ গুহসীবের বন্ধু। কিন্তু তিনি যে ইতিমধ্যে কালগত হয়েছেন তা তাঁরা জানতেন না। দন্তকুমার ও তাঁর স্ত্রী এ বিষয় শুনে অত্যন্ত মর্মাহত হলেন। তখন মহাসেন পুত্র কিত্তিসিরিমেঘ রাজত্ব করছিলেন। অর্হৎ ভিক্ষুর নিকট দন্তধাতুর নিরাপত্তার জন্য সিংহলে আনীত হয়েছে জেনে রাজা খুবই সন্তুষ্ট হলেন। রাজা ও রাণী নগ্নপদে দন্তধাতু গ্রহণ করার জন্য অর্হতের বাসস্থান মেঘগিরিবিহারে উপনীত হলেন। তাঁরা দন্তধাতু রাজপ্রাসাদে এনে অতি শ্রদ্ধাসহকারে সিংহাসনে স্থাপন করলেন। সিংহলের জনগণ, ভিক্ষু-সঙ্ঘ এবং অর্হৎগণ ধাতু পূজার জন্য সমবেত হলেন।

www.pathagar.com

রাজা জানতেন যে, সাধারণত ধাতুর রঙ সকালবেলার তারকার মত হয়। কিন্তু এর রঙ সেরূপ উজ্জ্বল মনে হল না। রাজার মনে এরূপ সন্দেহ উৎপন্ন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধাতু দুগ্ধধবল বর্ণে বিরাজমান হয়ে স্বীয় অলৌকিক ক্ষমতা প্রদর্শন করল।[২৮০] দেখে রাজা বিশ্বাস স্থাপন করলেন এবং একটি মন্দির নির্মাণ করে সেখানে রাখলেন। সমগ্র হিংসলবাসী ভিক্ষু ও সাধারণ মানুষ দন্তধাতু পূজা করার জন্য অনুরাধপুরে সমবেত হলেন। অতঃপর দন্তধাতু স্থায়ীভাবে কোথায় রাখা হবে- এ ব্যাপারে প্রশ্ন উত্থাপিত হলে রাজা বললেন যে, দন্তধাতু নিজেই বাসস্থান খুঁজে নেবে। ধাতু নিজ বাসস্থান খুঁজে নিল- যেখানে মহেন্দ্র স্থবির সিংহলে আগমন করে সর্বপ্রথম ধর্মদেশনা করেছিলেন, সেই স্থান। সিংহলরাজ নিয়ম করলেন যে, বৎসরে একবার বসন্তকালে ধাতু শহরে প্রদক্ষিণ করা হবে। ধাতু যে বিহারে স্থাপন করা হয় সেই বিহার নয় লক্ষ টাকা খরচ করে পুনর্নির্মাণ করা হল। কিত্তিসিরিমেঘের মৃত্যুর পর তাঁর উত্তরাধিকারী বুদ্ধদাস ধাতুর পূজা ও রক্ষাণাবেক্ষণ করেন।[২৮১]

দন্তধাতুর অলৌকিক ক্ষমতার প্রভাবে কিভাবে কলিঙ্গ দেশ থেকে বহু বাধাবিপত্তি অতিক্রম করে সিংহলে স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠালাভ করে তার মনোজ্ঞ কাহিনীই দাঠাবংশ গ্রন্থের মুখ্য আলোচ্য বিষয়। কাহিনীর বিবরণ যেমন চমৎকার তেমনি এটাকে একটি হৃদয়গ্রাহী সার্থক ঐতিহাসিক উপাখ্যান হিসেবে গ্রহণ করা যেতে পারে।

ছকেস ধাতুবংস

ছকেস (ষড়কেশ) ধাতুবংস[২৮২] একটি পিটিক বহির্ভূত পালি আখ্যান। বুদ্ধের ছয়টি কেশধাতুকে কেন্দ্র করে কাহিনী। পালি বংস-সাহিত্য ইতিহাস-আশ্রয়ী রচনা হলেও বিশুদ্ধ তথ্যনিষ্ঠ আখ্যান বলা যায় না। ছকেসধাতু বংসও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে বাস্তবতা অপেক্ষা অবাস্তব কল্পনার মাধুর্যময় দিকটিই অধিকভাবে পরিস্ফুট। প্রাকৃত ও অতি প্রাকৃত এমনভাবে মিশিয়ে আছে যে স্বভাতই অনেকটা ইতিহাসের সীমানা ছাড়িয়ে গেছে।[২৮৩]

ষড়কেশ ধাতুবংসের গল্প স্বতন্ত্ররূপে পরিবেশিত। এ প্রসঙ্গে ড. আশাদাসের মূল্যায়ন অতি চমৎকার, "গল্পের ভাষা যেন অনেকটা আজকের ভাষা- মানুষের দৈনন্দিন জীবনের ভাষা, অনুভবের ভাষা। ভাষার এই সুস্পষ্ট ঋজুতা প্রকাশ পেয়েছে কথাবার্তার ভাষায় এবং গাথার সুছন্দ ব্যাপ্তিতে। লেখকের শিল্পী-নম্র ব্যক্তিত্ব আখ্যানটির রূপ ও রীতিকে স্বতন্ত্র মহিমা দিয়েছে। বেশি বর্ণনা নেই, কাহিনীর অযথা বিস্তৃতি নেই, অল্প পরিসরে ঘটনার ঠাস বুনন। এই রচনা-চাতুর্য কুশলী লেখকের কৃতিত্ব।"[২৮৪] গল্পটি এরকম- বুদ্ধ রাজগৃহের বেণুবনে কলন্দক নিবাপে চারিপরিষদে ধর্মোপদেশ দিচ্ছিলেন। তখন অনুরুদ্ধ, সোভিত, পদুমুত্তর, গুণসাগর, জ্ঞানপণ্ডিত ও রেবত প্রমুখ ছয়জন ক্ষীণাসব ভিক্ষু প্রত্যন্ত এলাকার সাধারণ মানুষের কল্যাণের জন্য তথাগতের দেহের প্রতিবদ্ধ বস্তু প্রার্থনা করলেন।

www.pathagar.com

মহাকারুণিক শাস্তা জনপদবাসীর কল্যাণের জন্য দক্ষিণ-করে মস্তক স্পর্শ করার পর উজ্জ্বল হেমবর্ণ রশ্মি সম্পন্ন ছয়টি কেশধাতু বুদ্ধের হস্ত সংলগ্ন হল। বুদ্ধ ছয়জন অর্হতকে তা প্রদান করলেন। ভিক্ষুগণ শাস্তাকে বন্দনা করে আকাশ পথে প্রত্যন্ত দেশে প্রস্থান করলেন। রাত প্রভাত হল। ক্ষীণাসবগণ সূর্যালোকের ন্যায় সমুজ্জ্বল বৃক্ষলতায় সমাচ্ছন্ন রমণীয় একটি ভূখণ্ড দেখে সন্তুষ্ট হলেন। তাঁরা চিন্তা করতে লাগলেন ধাতুর দায়ক কে হবেন ? তখন অনুরুদ্ধ কৃতাঞ্জলিসহ প্রণিধান করলেন, প্রাণ, ধন ও পুত্র-দার দান দিয়ে যদি বোধিজ্ঞান (অর্হত্ত্বফল) লাভ করে থাকি তাহলে এখানে উত্তম সেবকের আগমন হোক।[২৮৫] দেবরাজ শক্রের পাণ্ডুকম্বল শিলাসন উষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি বিদ্যনেত্রে বুদ্ধের মহাপ্রভাবশালী কেশধাতু সেবকশূন্য অবস্থায় দেখে অর্হতদের পুরোভাগে আবির্ভূত হয়ে সানন্দে কেশধাতুর দায়ক হলেন। স্তূপ নির্মাণের কাজ আরম্ভ হল। দেবরাজের ঋদ্ধি বলে অচিরে গর্ত প্রস্তুত করে তথায় অশীতি শ্রাবকগণের প্রতিকৃতি, বুদ্ধের জনক-জননীর প্রতিমা এবং বুদ্ধের সুবর্ণ প্রতিমা প্রতিষ্ঠা করলেন। মধ্যে সাতশ রত্নরশ্মি বিভাবিত করলেন এবং চতুর্দিকে সুবর্ণ জাল পরিবেষ্টিত করে শ্বেতচ্ছত্র স্থাপন করলেন। স্থবির প্রদত্ত কেশধাতু মস্তক থেকে নামিয়ে শক্র ভৃঙ্গারোদকে স্নান করালেন। অতঃপর কেশধাতু প্রতিষ্ঠা করলেন। তৎক্ষণাৎ এই সসাগরা মহাপৃথিবী কম্পিত হল, মহাসমুদ্র সংক্ষুদ্ধ হয়ে উঠল। দশ সহস্র চক্রবালবাসী দেবগণ আনন্দমনে বিবিধ মাঙ্গলিক বস্তু দ্বারা শাস্তার প্রতিমা পূজা করলেন। অনন্তর শক্র ধাতুর উপরে প্রতিষ্ঠিত চৈত্যের মণিময় নানা প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত করে চৈত্যকে সুশোভিত করলেন। সেই মণিচৈত্যের বহির্দেশে কনকময় চৈত্য প্রস্তুত করলেন। ভবিষ্যৎ অন্তরায় হতে রক্ষা করার জন্য চক্র বিন্যস্ত করে চৈত্যকে বন্দিত করে রাখলেন। একজন দেবপুত্রকে চৈত্যরক্ষার ভার অর্পণ করলেন। সকলে পঞ্চাঙ্গে চৈত্য বন্দনা করলেন।

ক্ষীণাশ্রব ভিক্ষুগণ ক্রমান্বয়ে এগুতে লাগলেন। তাঁরা নানা প্রকার বালুকারাশি পরিকীর্ণ, পরম রমণীয়, কৈলাশপর্বতসন্নিভ, সকলের কাছে অতি মনোমুগ্ধকার এক অনিন্দ্য সুন্দর স্থানে উপস্থিত হলেন। এবার ধাতুর দায়ক অন্বেষণের ভার গ্রহণ করলেন আয়ুষ্মান শোভিত। তিনি প্রার্থনা করলেন, "তথাগত, তোমার করুণাশক্তিতে সকল মানুষের মঙ্গলার্থে এখানে দায়ক আসুক"।[২৮৬] সঙ্গে সঙ্গে মেঘগর্ভ হতে অপূর্ব অলংকারে বিভূষিত পর্জন্য[২৮৭] নামক দেবপুত্র মহাপরিষদে পরিবৃত হয়ে স্বীয় বিমান হতে তাঁর সম্মুখে আবির্ভূত হলেন এবং কেশ-ধাতুর দায়ক হতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন। তৎক্ষণেই পর্জন্য দেবরাজ ঋদ্ধি দ্বারা মৃত্তিকা খনক করে তথায় ধাতু কক্ষ প্রতিষ্ঠা করলেন। সেখানে সপ্তরত্নময় পূর্বের ন্যায় সুবর্ণ নির্মিত অশীতি মহাশ্রাবকের প্রতিমা, বুদ্ধপ্রতিমা, বুদ্ধের মাতা-পিতার প্রতিমা নির্মাণ করলেন। আসনের মধ্যস্থানে সপ্তরত্নময় ধাতুর প্রকোষ্ঠ নির্মাণ করে জিনশ্রেষ্ঠের ধাতুকে ষড়রশ্মি বর্ণের উজ্জ্বলতর করে দিব্য সুগন্ধি জলে স্নান করালেন। অতঃপর সেই প্রকোষ্ঠে কেশধাতু প্রতিষ্ঠা করলেন। পূর্বোক্ত নিয়মে পৃথিবী কম্পানাদি আশ্চার্য ঘটনা সৃষ্টি হল। তৎপর পর্জন্য দেবরাজ নানা দিব্য রত্নময় ইষ্টক দ্বারা

www.pathagar.com

চৈত্য নির্মাণ করলেন। নিরাপত্তার যথাযথ ব্যবস্থা করলেন। এ চৈত্য অতি মনোরম হয়েছিলো বলে 'শোভন চৈত্য' নামে পরিচিত হল।

ক্ষীণাশ্রবগণ এবার পশ্চিম দিকে যাত্রা করলেন। তাঁরা সমুদ্র তীরে অশোকবৃক্ষ সমাচ্ছন্ন একটি স্থানে আয়ুষ্মান পদুমুত্তর ধাতুর দায়কের জন্য অধিষ্ঠান করলেন "হে লোকশ্রেষ্ঠ, জনগণের ত্রাণের জন্য তোমার আগমন, এ সত্যবাক্যে এখানে দায়ক উপস্থিত হোক।"[২৮৮] সঙ্গে সঙ্গে সমুদ্র রক্ষিতা মণিমেখলা[২৮৯] নাম্নী দেবকন্যা আবির্ভূতা হলেন। ভিক্ষুগণের নির্দেশে তিনি দেশবাসীকে বেতন দিয়ে চৈত্য প্রতিষ্ঠার কাজে নিযুক্ত করলেন। অশীতিহস্ত পরিমাণ গভীর ধাতুকক্ষ নির্মাণ করা হল। অতঃপর দেবকন্যা ঋদ্ধিবলে বৈপুল্যগিরি হতে আনীত চক্রবর্তী মণিরত্নের সদৃশ রত্নরাজি চতুর্দিকে রাশিকৃত করে প্রদীপের ন্যায় প্রজ্জ্বলিত একটি রত্নগৃহের মধ্যস্থলে মণিগর্ভে প্রতিষ্ঠা করলেন। তার উপর ধাতুকরণ্ডক স্থাপন করলেন, সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবী কম্পিত হল,বিদুৎ চমকিত হয়ে বর্ষণ শুরু হল। দেবকন্যা মণিমেখলা প্রসন্নমনে কেশস্তূপ প্রতিষ্ঠা করে সকলের উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করলেন।

ক্ষীণাশ্রবগণ উত্তরাভিমুখে যাত্রা করলেন। স্থানটি শাখা পল্লবে অলংকৃত, শীতল ছায়াঘন। আয়ুষ্মান গুণসাগর করজোড়ে অধিষ্ঠান করলেন, "তুমি যদি বুদ্ধদেহজাত হও তাহলে তোমার দায়ক সুলভ হবে, সকল প্রাণীর কল্যাণে তোমার এখানে স্থিতি হবে।[২৯০] সেক্ষণে জিনধাতুর প্রভাবে প্রতিবাতে বণিক পরিপূর্ণ একটি জাহাজ সেই প্রদেশে আনীত হল। বণিকগণ ছয়জন অর্হতকে দেখে তীরে অবতরণ করলেন এবং বন্দনা জ্ঞাপন করে ভিক্ষুগণের কাছে কেশধাতু প্রতিষ্ঠার অভিপ্রায় জানতে পারলেন। বণিকগণ মহানন্দে সম্মত হয়ে বহু অর্থ ব্যয়ে ধাতুগর্ভ নির্মাণ করলেন এবং গর্ভমধ্যে বুদ্ধ রত্নাসন স্থাপন করলেন আর সঙ্গে সঙ্গে পূর্বরূপ অত্যাশ্চর্য ঘটনার অভ্যুদয় হল। এভাবে ধনী-নাবিক স্তূপ প্রতিষ্ঠিত হল।

অনন্তর ভিক্ষু সঙ্ঘ পশ্চিম দিকে গমন করলেন। উপস্থিত হলেন ছায়াঘন অতি রমণীয় গঙ্গাতীরে। এরূপস্থানে উপনীত হয়ে জ্ঞানপণ্ডিত দায়ক অন্বেষণের ভার নিলেন। অধিষ্ঠান করলেন, "এ কেশধাতু যদি সত্যিই বুদ্ধের হয়ে থাকে তাহলে দায়ক প্রাপ্ত হব।"[২৯১] সঙ্গে সঙ্গে নাগরাজ বরুণ সপরিবারে স্থবিরের সম্মুখে প্রাদুর্ভাব হলেন এবং বন্দনাতে কেশধাতু প্রতিষ্ঠার দায়িত্ব সানন্দে গ্রহণ করলেন। তিনি ধাতুগর্ভের জন্য মাটি শোধন করলেন এবং গর্ত খননের পর দেব বিমান সদৃশ ধাতুকক্ষ নির্মাণ করিয়ে তার মধ্যে একটি রত্নময় পালঙ্ক তৈরি করালেন। অতঃপর ধাতুভাণ্ড মহামূল্যবান মণিরত্নময় করণ্ডে স্থাপন করলেন। সাথে সাথে পূর্বানুরূপ প্রতিহার্য সকল দেখা দিল। নাগরাজ মহানন্দে একটি মণিরত্ন স্বীয় গ্রীবা হতে খুলে ধাতু পূজা করলেন। বরুণ নাগরাজ কর্তৃক একটি কেশধাতু স্তূপ এভাবে নির্মিত হল।

ভিক্ষুগণ আবার পূর্বমুখি গমন করলেন। জনপদ হতে অনতিদূরে উপনীত হয়ে আয়ুষ্মান রেবত ভিক্ষুর কেশধাতুর দায়ক প্রাপ্তির আবেদন ধ্বনিত হল।[২৯২] অধিষ্ঠানের

www.pathagar.com

সঙ্গে সঙ্গে সাতজন তামিল বণিক ধাতুর প্রভাবে সেখানে উপস্থিত হলেন। ষড়রশ্মি বিচ্ছুরিত কেশ-ধাতুর প্রতিহার্য প্রদর্শিত হল। তামিল নাবিকগণ রত্নস্তূপের অভ্যন্তরে স্বর্ণময় করণ্ডের মধ্যে কেশধাতু স্থাপন করলেন। এই চৈত্যের নাম হল 'শ্রদ্ধাচৈত্য'। তৎক্ষণাৎ মহাপৃথিবী প্রকম্পিত হল। দাশসহস্র চক্রবাল দেবগণ সাধুবাদ দিলেন। বণিকগণ চৈত্যের মহাপূজা করে প্রস্থান করলেন।

কাহিনীর এখানে শেষ। নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, লেখকের ভাবগম্ভীর কল্পনায় বুদ্ধদেহের একটি ক্ষুদ্র অংশ অপূর্ব কল্পনাকাহিনীর রূপ পরিগ্রহ করেছে। কাহিনীর সার্থকতা এখানেই।

তথ্যনির্দেশ

১. Edited by V. Fausboll, Vols I–VII (Vol. VII, Index by D. Andersen), London, 1877–1897. Eng. Translation : The Jataka or stories of the Buddha's Former Births translated from the Pali by various hands under the Editorship of E.B. Cowell, Volls I–VI, Cambridge, 1895–1907. Vol. VII contains the index. ঈশানচন্দ্র ঘোষ কর্তৃক সমগ্র জাতক ছয় খণ্ডে বাংলা ভাষায় অনুদিত ও সম্পাদিত হয়েছে।

২. দান, শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, মৈত্রী, সত্য, অধিষ্ঠান ও উপেক্ষা।

৩. ভারতকোষ, ৩য়, জাতক, সুকুমার সেনগুপ্ত, পৃ. ৪৮৮।

৪. দাশ, ড. আশা ; জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোক-সাহিত্য, কলিকাতা-১৯৯৫, পৃ. ২।

৫. জাতক, ১ম খণ্ড, উপক্রমাণিকা (ঈশানচন্দ্র ঘোষ অনুদিত)।

৬. জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ.,১৮ ff।

৭. জাতক নং ৪৪৫।

৮. জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৪।

৯. জাতক নং ১৮১।

১০. জাতক নং ৫৪০, Winternitz, M; A History of Indian Literature, Vol. 11, Delhi, PP, 143–144.

১১. The legends is found already in the 3rd century B.C. in a relief of the stupa of Sanchi. A whole series of scenes is represented in the Gandhara Sculpture of Jamalgarhi, cf, A Foucher L' art greco–boudhinq du gandhara 1, 279 ff.

১২. জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮।

১৩. জাতক নং ৭৮।

১৪. জাতক নং ১৬৮।

www.pathagar.com

১৫. জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪১-৪২।
১৬. জাতক নং ৪৭৬।
১৭. জাতক নং ৫৫।
১৮. A History of Indian Literature op. cit., Vol 11. c. j 131–132.
১৯. জাতক নং ৩০৬।
২০. জাতক নং ৪৫।
২১. জাতক নং ৪৪।
২২. জাতক নং ৪৪৬।
২৩. জাতক নং ৪১৭।
২৪. জাতক নং ৪৩২।
২৫. জাতক নং ৪৮৯।
২৬. জাতক নং ৫২৯।
২৭. জাতক নং ৫১৩।
২৮. জাতক নং ৪৩২।
২৯. জাতক নং ২৪০।
৩০. জাতক নং ৩৮৪।
৩১. শিয়াল জাতক, নং ১১৩।
৩২. শিয়াল জাতক, নং ৫২।
৩৩. জাতক নং.৪৩৭।
৩৪. জাতক নং ২০৮।
৩৫. জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোক-সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৬-৬৭।
৩৬. জাতক নং ৫৭।
৩৮. জতক নং৭৩।
৩৯. তুল, তিন্নং জানানং বত্থু (১-৩), রসবাহিনী।
৩৯. জাতক নং ৫১৬।
৪০. জাতক নং ৩২২।
৪১. Edited by Paul Steinthal, London, PTS 1885, Translated into English by D.M. Strong, London 1902; উদানং (বাংলা), অনু, শ্রীমৎ জ্যোতিপাল ভিক্ষু, রেঙ্গুন, বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩০।
৪২. A History of Indian Literature op. cit, Vol. 11. P. 86.
৪৩. চৌধুরী, ড. বিনয়েন্দ্রনাথ; বৌদ্ধসাহিত্য, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৫, পৃ. ৭০।
৪৪. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬-১৭।
৪৫. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ, ৩৪-৩৬।
৪৬. সুখিনো বত যে জনা অকিঞ্চনা, বেদগুনোহি জনা অকিঞ্চনা,

www.pathagar.com

সকিঞ্চিনং পস্‌স বিহঞ্ঞমানং, জনো জনস্মিং পটিবদ্ধ বিত্তো'তি। উদানং, ১৬।

৪৭. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮-৪৬।

৪৮. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০৩; A History of Indian Literature, ibid, P. 83.

৪৯. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০৯-১১৫।

৫০. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৮; A History of Indian Literature, ibid, P. 85.

৫১. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০৪-২১২।

৫২. উদানং, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২৪-২২৬।

৫৩. সৌন্দরনন্দকাব্য, অনু-বিমলাচরণ লাহা, ১৩২৯, গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা।

৫৪. Petavatthu edited by J. Minayeff, London, PTS. 1888.

৫৫. Edited by Prof. E. Hardy, PTS.

৫৬. Law, B.C. The Buddhist Conception of Spirits, Calcutta, 1923, Delhi, reprint, 1988, P.18 ff. কম্মস্‌সকা, মানব, সত্তা কম্মদায়দা কম্মযোনি, কম্মবন্ধু, কম্মপটিসরণা, কম্মং সত্তে বিভজাতি যদিদং হীনপ্‌পণীতায়া'তি। চূলকম্মবিভঙ্গসুত্ত।

৫৭. Hazra, K.L.; Studies on Pali Commentaries, Delhi, 1991, P. 239, A History of Pali Literature Vol. 11, ibid, P. 492.

৫৮. বৌদ্ধসাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৮।

৫৯. বড়ুয়া, সুনন্দা; বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩, পৃ. ৫৮।

৬০. The Buddhist Conception of Spirits, ibid, P. 35.

৬২. The Buddhist Conception of Spirits, ibid, P. 45, মহাস্থবির, জিনবংশ; প্রেতকাহিনী, চট্টগ্রাম, ১৩৬৫ বাং, পৃ. ৬-৭।

৬৩. Ibid, P.P. 45–46, প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭-১০; Petavatthu Com. P.P. 9 ff.

৬৪. Ibid, P.P. 27 ff; প্রেতকাহিনী,, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭-১৮, Petavatthu Com. P. P. 12 ff.

৬৫. Ibid, P.P. 49 ff; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২-১৮, Petavatthu Com. P.P. 19 ff.

৬৬. Petavatthu Com. P.P. 31ff; The Buddhist Conception of Spirits, ibid, p 26, 49–50; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯-২২।

৬৭. Ibid, P.P. 36, 37, ibid P. 50; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-২৪।

৬৮. Ibid, P.P. 42 ff; ibid P. P. 51; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮-৩১।

৬৯. Ibid, P.P. 53–61; ibid, P.P. 55-57; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬-৪১।

৭০. Petavatthu Com. P.P. 78 ff; Ibid pp. 92–93; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৪-৫৭।

৭১. Ibid, P.P. 82 ff, Ibid, P.P. 94–95; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৬৪।

www.pathagar.com

৭২. Ibid, P.P. 99 ff, Ibid, P.P. 96–97; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৭৫-৭৯।

৭৩. Petavatthu Com. P.P. 111, Ibid, P.P. 89–103; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৮২-৯৫।

৭৪. Ibid,P.P. 140 ff, Ibid, P.P 89–90; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯৫-৯৮।

৭৫. Buddhist Conception of Spirits, ibid, P.P. 81-84.
প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১০১-১১০। তুল রথকার প্রেতকাহিনী। Ibid, P.P. 80–81, প্রাগুক্ত; পৃ. ১২৬-১২৮।

৭৬. Petavatthu Com. P.P. 177–186, Buddhist Conception of Spirits, ibid, P.P. 67–69; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২০-১২৬।

৭৭. Ibid, P.P. 191 ff, Ibid, P.P. 79–80; প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১৩০।

৭৮. Ibid,s. P.P. 207 ff, Ibid, P. 76; প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৭-১৩৯।

৭৯. তুল, মিগলুদ্দক পেত, Ibid, P.P. 204 ff.

৮০. Petavatthu Com. P.P. 215 ff; Buddhist Conception of Spirits, ibid, P.P. 73–75; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৩-১৬১ সেট্‌ঠিপুত্তপেতবত্থুও অনুরূপ, শেষাংশ কিছুটা পার্থক্য মাত্র।

৮১. Ibid, P.P. 257 ff, Ibid, P.P. 71–73; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৮-১৯০।

৮২. Ibid, P.P. 271 ff, Ibid P.P. 64–65; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৯-২০১।

৮৩. Ibid, P.P. 273 ff, Ibid, P.P. 63–64; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২০১-২০৫।

৮৪. Ibid, P.P., 282–286; ff, Ibid, P.P. 60–61; প্রেতকাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১০-২০৪।

৮৫. B.C. Law, Heaven and Hell in Buddhist Perspective, Bharatiya Publishing House, Varanasi, 1973, P. 1.

৮৬. Vimanavatthu Commentary, edited by E.R. Gooneratne, P.T.S. London, 1886.

৮৭. চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ ; বৌদ্ধসাহিত্য, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা-৭৩, ১৯৯৫, পৃ. ৭৬।

৮৮. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৯।

৮৯. Heavan and Hell, ibid. 88–89.

৯০. Ibid,, P.P. 2–27 Abidhammattha Sangaha, Kosambi's Ed. Chap. 5.

৯১. A History of Pali Literature Vol. 11, ibid P. 491; Studies on Pali Commentaties, ibid, P. 238.

৯২. Vimavatthus Commentary, PP. 5–6; বিমানবত্থু, শীলাঙ্কার মহাস্থবির অনু, পৃ. ৩-৭; Heaven and Hell, ibid, P.P. 36–37.

৯৩. Vimanavatthu Commentary. P.P. 27–28; বিমান বাত্থু, প্রাগুক্ত, পৃ. ৯-১০, ibid P.P. 37–38.

www.pathagar.com

৯৪. Vimanavatthu Commentary. P.P. 31 ff; বিমান বাত্থু, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪-১৭; Ibid, P.P. 38–39.

৯৫. যো বে সম্মা বিমুত্তানং সন্তানং ব্রহ্মচারিনং,
পসন্নো আসনং দজ্জা এসং নন্দে যথা অহং। -বিমানবত্থু, কুঞ্চর বিমান ১/৫/১০।

৯৬. Vimanavatthu Commentary. P.P. 45–47; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩-২৯; Ibid P.P. 41–42.

৯৭. অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুনং সাধুনা জিনে,
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং। তুল, ধম্মপদ, ১৭-৩।

৯৮. Vimanavatthu Commentary.
P.P. 62–74; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৪৩-৫৩; Heavan and Hell, ibid. P.P. 45–48.

৯৯. Vimanavatthu Commentary. P.P. 75 ff; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৫৪-৬২; Heavan and Hell, ibid P.P. 48–49.

১০০. Vimanavatthu Commentary.P.P. 91–92; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৬৮-৭২; Heavan and Hell, ibid, P. 50.

১০১. Vimanavatthu Commentary. P.P. 100-101; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৭৬-৮০; Heavan and Hell, ibid, 'P' 51–53.

১০২. Vimanavatthu Commentary PP. 109–110; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৮৪-৮৮; Heavan and Hell, ibid PP. 54–55.

১০৩. Vimanavatthu Commentary. PP. 120–121; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৯৭-১০১; Heavan and Hell, ibid PP. 54–55.

১০৪. Vimanavatthu Commentary. PP. 137–148; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ১১৪-১২৬; Heavan and Hell, ibid PP. 56–57.

১০৫. Vimanavatthu Commentary. PP. 156–159; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৩৫-১৪১; Heavan and Hell, ibid PP. 59–60.

১০৬. Vimanavatthu Commentary. P. 173; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৪৮-১৫০; Heavan and Hell, ibid PP. 61–62.

১০৭. পভস্সরং অচ্চিমন্তং বণ্ণগন্ধেন সঞ্ঞুতং
অসোক পুপ্‌ফমালাহং বুদ্ধসস উপনাময়িং। (৩/১০/৮, বি.ব.)

১০৮. Vimanavatthu Commentary. PP. 187–189; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৬১-১৭০; Heavan and Hell, ibid PP. 64–65.

১০৯. ইদং দুক্‌খন্তি মং অবোচ অযং দুক্‌খস্‌স সম্ভবো
অযং নিরোধো মগ্‌গো চ অঞ্জসো অমতোগধো। (৪/১২/২০ বি.ব.)

১১০. Vimanavatthu Commentary. PP. 206; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৮১-১৯১; Heavan and Hell, ibid P.P. 67–68.

www.pathagar.com

১১১. Vimanavatthu Commentary. PP. 217–118; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯২-১৯৪; Heavan and Hell, ibid PP. 68–69.

১১২. চিরপ্পবাসিং পুরিসং দূরতো সোত্থিমাগতং
ঞাতিমিত্তা সুহজ্জা চ অভিনন্দন্তি আগতং। তথেব কতপুঞ্ঞম্পি অস্মালোকা পরং গতং, পুঞ্ঞানি পতিগণ্হন্তি পিয়ং ঞাতিংব আগতন্তি। (৫/২/১-২ বি.বি.)

১১৩. Vimanavatthu Commentary. PP. 220 ff; বিমানবত্থু প্রাগুক্ত; পৃ. ১৯৪-২০৫; Heavan and Hell, ibid P. 69;

১১৪. Vimanavatthu Commentary. PP. 229–233; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ২০৫-২১৬; Heavan and Hell, ibid PP. 69–70.

১১৫. Vimanavatthu Commentary. PP. 259–270; বিমানবত্থু প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩১-২৩৪; Heavan and Hell, ibid PP. 73–74.

১১৬. Vimanavatthu Commentary. PP. 259–270; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৩৪-২৪৭; Heavan and Hell, ibid PP. 74–75.

১১৭. Vimanavatthu Commentary. PP. 288–289; বিমানবত্থু প্রাগুক্ত; পৃ. ২৬১-২৬৫; Heavan and Hell, ibid PP. 76–77.

১১৮. Vimanavatthu Commentary. PP. 297–298; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৭৫-২৭৬; Heavan and Hell, ibid PP. 79–80.

১১৯. Vimanavatthu Commentary. PP. 308; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৮৭-২৯২; Heavan and Hell, ibid P. 82.

১২০. Vimanavatthu Commentary. PP. 312–314; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ২৯২-২৯৮; Heavan and Hell, ibid PP. 82–83.

১২১. Vimanavatthu Commentary. PP. ff, 331; বিমানবত্থু, প্রাগুক্ত; পৃ. ৩১৪-৩৩৬; Heavan and Hell, ibid PP. 83–85; প্রেতবত্থুগ্রন্থে অনুরূপকাহিনী সেরিস্সকপেত (নং ৪-২) দ্রষ্টব্য।

১২২. Edited by H. Oldenberg and R. Pischel, London PTS, 1893.

১২৩. The Theregatha translated into English by Mrs. Rhy Davids (Psalms of Early Buddhists, I, Esalms of Sisters) London, PTS. 1909.

১২৪. থেরগাথা (অনু. স্থবির) রেঙ্গুন বৌদ্ধ মিশন প্রেস, ১৯৩৫ পৃ. ৪৮-৪৮।

১২৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৭২-১৭৪।

১২৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৫-১৮৬।

১২৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২২২-২২৪।

১২৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪-২২৬।

১২৯. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯৪-২৯৬।

১৩০. পসাদিকেন বত্তেন কল্যাণ ইরিয়াপথো,
সামণেরো, নুরুদ্ধস্স ইদ্ধিয়া চ বিসারদো।

যদা নব পব্বজিতো জাতিযা সত্তবস্সিকো,
ইদ্ধি অভিভোত্বান পন্নগিন্দং মহিদ্ধিকং।
আজানীযেন আজঞ্ঞো সাধুনা সাধুকাবিতো,
বিনীতো অনুরুদ্ধেন কতকিচ্চেন সিক্খিতো। (তেথগাথা-২১৯)

১৩১. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৫-৩০৭।

১৩২. ধম্মপদট্ঠকথা (ব্রাহ্মণ বগ্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ৫০-৫৫। এ অধ্যায়ের ধম্মপদট্ঠকথায় শিরোনাম অংশে বর্ণিত।

১৩৩. থেরগাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩১২-৩১৫।

১৩৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩৫-৩৩৮।

১৩৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৩৪৭।

১৩৬. প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৮-৩৭৩।

১৩৭. অত্তনা চোদয়ত্তানং নিব্বণমভিহারযে,
অচ্চরাদ্ধম্হি বিরিযম্হি সত্থ লোকে অনুত্তরো।
বীণোপমং করিত্বা মে ধম্মং দেসেসি চক্খুমা,
তস্সাহং বচনং সুত্বা বিহাসিং সাসনেরতো।
সমতং পটিপাদসিং উত্তমথস্স পত্তিযা,
তিস্সো বিজ্জা অনুপ্পত্তা কতম্বুদ্ধসস্ সাসনং।

১৩৮. প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬০-৪৭৫)

১৩৯. থেরীগাথা, (অনু. ভিক্ষু শীলভদ্র) মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৩৫৭, ডঃ নলিনাক্ষ দত্ত লিখিত মুখবন্ধ, পৃ. /·।

১৪০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১০০-১০৪।

১৪১. একই কাহিনী ধম্মপদট্ঠকথায় (আখ্যানভাগ ১১৪) সংকলিত।

১৪২. থেরীগাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২১-১২৭।

১৪৩. থেরীগাথা, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৬৬-৩৯৯, থেরীগাথা, অট্ঠকথা, পৃ. ২৪৫।

১৪৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৪৮-১৫৭।

১৪৫. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৮-৬২।

১৪৬. তুল, ধম্মপট্দট্ঠকথা, কুণ্ডলকেশী থেরী, সহস্সবগ্গ দ্রষ্টব্য।

১৪৭. থেরীগাথা, পৃ, ৬৩-৬৯।

১৪৮. ধম্মপদট্ঠকথা, পটাচারাথেরী, সহস্সবগ দ্রষ্টব্য।

১৪৯. বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৩।

১৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৪।

১৫১. Studies on Pali Commentaries, ibid . P. 127.

১৫২. History of Pali Literature. ibid 89–93; বুদ্ধঘোসুপত্তি, Ch–IV.

১৫৩. বৌদ্ধসাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮।

www.pathagar.com

১৫৪. বৌদ্ধসাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৮-১২৯।

১৫৫. Law, B.C. Life and works of Buddhaghosa, PP. 26–29, Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 94.

১৫৬. Malalasekera G.P. Dictionary of Pali proper Names, Part–11 P. 306.

১৫৭. Saddhammasangha, ed. by Nedimale Saddhananda, Journal of Pali Text Society, 1890. P. 53. বড়ুয়া, দীপংকর শ্রীজ্ঞান; বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৯৯৭, পৃ. ৪৮।

১৫৮. বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৬; Studies on Pali Commentaries, ibid PP.96–97.

১৫৯. বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১২৫।

১৬০. মহাস্থবির, ধর্মধারা; সাসন বংস, কলিকাতা, ১৯৬২, পৃ. ৩৩; Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 112; A History of Indian Literature Vol. 11, ibid P. 205.

১৬১. Malalasekera, G.P. The Pali Literature of Ceylon. Colombo, 1958, P. 113.

১৬২. Encyclopaedia of Religion and Ethies, ed. by J. Hastings, Edingburgh. 1908–1926, IV, P. 701.

১৬৩. Mukhopadhyay, Bandana, Life in Acnient India (As depicted in the Dhammapada Atthakatha), Sanskrit Pustak Bhandar, Calcutta (1st ed. 1996), pp 67–7.

১৬৪. A history of Indian Litureture Vol. 11. ibid, P. 192.

১৬৫. Buddhist Legends; Harvard Oriental Series (London PTS. 1969. (Vol. 28, P. 60.

১৬৬. Norman, H.C. (ed) The Commentary on the Dhammapada Vol. IV, (London PTS. 1970) P. 236.

১৬৭. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৩৫, বিহারে অধিরাজেন কারিতম্হি কতঞ্ঞ্ঞুনা পাসাদে সিরিকূটস্স রঞ্ঞো বিহারতা।

১৬৮. Jayatalaka, D.S. Intr. to the Sikhavalanda, Colombo, ed. 1923, P. VII, Pali Literature of Ceylon, ibid P. 96.

১৬৯. Studies on Pali Commentaties ibid PP. 238–239.

১৭০. Dhammapada Atthakatha, Vol 1, PP. 1–2.

১৭১. Buddhist Legends, ibid, Part 1. P. 26, Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 206.

১৭২. "The Dhammapada Atthakatha is in name and form Commentary. But in point of fact it has become nothing more or less than a huge collection of legends and folk–tales" ibid, PP. 206–207.

১৭৩. Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 216. Dhammapada Com. Vol. 1, PP. 45 ff.

www.pathagar.com

১৭৪. ধম্মপদট্‌ঠকথা, অনু. শীলালঙ্কার স্থবির, রেঙ্গুন, ১৯৩৪, পৃ. ৯৩-১০৬।

১৭৫. ধম্মপদট্‌ঠকথা প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২৩৯।

১৭৬. খুব শক্তিশালী এক প্রকার বিরাটকায় পাখি। কথিত আছে, এদের দেহে পাঁচটি হস্তীর শক্তি থাকে।

১৭৭. Studies on Pali Commentaries, ibid, PP. 209–210. Dhammapada Atthakatha, vol. 1, Pt. II.

১৭৮. বরুয়া, গিরিশ চন্দ্র, ধম্মপদ, (অনুবাদিত ও সম্পাদিত), বাংলা একাডেমী (প্রথম প্রকাশ ১৯৬৬, ২য় প্রকাশ ১৯৯৬), পৃ. ২৮৯-২৯০।

১৭৯. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৮৯-২৯০, ধম্মপদট্‌ঠকথা, গল্প নং ৩২।

১৮০. এটা থেরীগাথা অট্‌ঠককথায়ও রয়েছে। History of Pali Literature, ibid, P. 457.

১৮১. A History of Indian Literature, ibid, PP. 192–1193; Texted, Wallesser 1, P. 356 ff, trans. Burlingame. Buddhist Parables, P. 94 ff.

১৮২. Thera, Narada, The Dhammapada (Pali text and Translation with stories in brief and notes), 4th ed. 1993, Taiwan, A History of Indian Literature, ibid, Vol 11, PP. 199–200, ধম্মপদ,প্রাগুক্ত, পৃ. ৩২৭-২৮, Dhammapada Atthakatha, VIII; থেরীগাথায়ও এই কাহিনী আছে।

১৮৪. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪২-৪৩।

১৮৫. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৫, Studies on Pali Commentatirs, ibid, P. 209; A History of Indian literrature, ibid, Vol 11, p. 187.

১৮৬. Studies on Pali Commentaries, ibid, PP. 207. 208.

১৮৭. ধর্মপদ অর্থকথা (ব্রাহ্মণবর্গ), অণু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ২৮-৩০। ধর্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৮৫।

১৮৮. Dhammapada Commentary,Vol 111, P. 113 ff; A History of Pali Litureture, ibid, Vol, 11, PP. 468–460; ধর্মপদ অর্থকথা (জরাবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ৯-১৩)।

১৮৯. অলথক্‌কতাপাদো পাদুকারয্‌হতবেসিযা।
তং পি দহরা মম অহম্পি দহরা তব,
উভোপি পব্বজ্জিস্‌সাম পচ্ছা জিন্না দণ্ডপরাযণা'তি

১৯০. অর্থকথা (ব্রাহ্মণবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ৫০-৫৫।

১৯১. ধম্মপদট্‌ঠকথা, (অপ্‌পমাদ বগ্‌গো), অনু. মহাস্থবির ধর্মকীর্ত্তি, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯, পৃ. ১৮৫; Studies on Pali Commentaties, ibid, P. 213.

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮৪-১৯৪।

১৯৩. ধর্মপদ অর্থকথা (জরা ও আত্মবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ২৯।

১৯৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২৭-২৯, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭৩।

১৯৫. ধর্মপদ অর্থকথা (ভিক্ষুবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ১০-১১।

www.pathagar.com

১৯৬. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪০৫।

১৯৭. Dhammapada Atthakatha, Vol. 111, PP. 308-309, ed. H.C. Norman, A History of Pali Literature, ibid, Vol 11. P. 463, তুল, বিমাবত্থু অট্ঠকথা, পৃ. ৬২-৭৪।

১৯৮. অক্কোধেন জিনে কোধং অসাধুং সাধুনা জিনে
জিনে কদরিয়ং দানেন সচ্চেন অলিকবাদিনং, তি।

১৯৯. Dhammapada Com. Vol. 111, PP. 104 ff, History of Pali Literature, ibid, P. 463.

২০০. Dhammapada com. Vol. 11. P. 1. ff, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৩-৩০৪।

২০১. দীঘা জাগরতো রত্তি দীঘং সন্তস্স যোজনং।
দীঘো বালানং সংসারো সদ্ধম্মং অবিজানতং।
ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩০৪।

২০২. ধর্মপদ অর্থকথা (চিত্তবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ৩৪-৪০।

২০৩. নং তং মাতাপিতা কয়িরা অঞ্ঞেো বাপি ঞাতকা,
সম্মা পণিহিতং চিত্তং সেয্যা সো নং ততো করে'তি।

২০৪. History of Pali Literature, ibid, Vol 11, P. 452, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২৬৩।

২০৫. গমনাগমনাম্পি দিস্সতি বণ্ণধাতু উভয়ত্থ বীথিযো,
পেতোপন কালকতো ন দিস্সতি কো নিধ কন্দতং বাল্যতরো'তি।

২০৬. ধর্মপদার্থকথা (যমকবর্গ), অনু. শীলালঙ্কার মহাস্থবির, রেঙ্গুন, ১৯৩৪, পৃ. ৫২-৭৬; তুল, Vimanavatthus Com. PP. 321-ff, পেতবত্থু ২৫।

২০৭. ধর্মপদ অর্থকথা (ভিক্ষুবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ৪৮-৫১।

২০৮. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৭-২১৮।

২০৯. History of Pali Literature, ibid, Vol. 11, P.s 467, Dhammapada Commentary, Vol. 111, PP. 295 ff, Studies on Pali Commentaries, ibid,p. 219.

২১০. ধর্মপদ অর্থকথা (আত্মবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ২৪-২৬। ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৭১।

২১১. History of Pali Literature, ibid, Vol. 11, P. 455, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৯০-৩৯১।

২১২. কিচ্ছো মনুস্সপটিলাভো কিচ্ছং মচ্চান জীবিতং,
কিচ্ছং সদ্ধম্মসবনং কিচ্ছো বুদ্ধানং উপপ্পাদো। ১৮২।

২১৩. ধর্মপদ অর্থকথা (ব্রাহ্মণবর্গ), প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩-১৬।

২১৪. History of Pali Literature, ibid, Vol. 11, P. 464; Dhammapada Commentary, Vol. 11, PP. 15 ff।

২১৫. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৫২-৩৫৩।

www.pathagar.com

২১৬. যো অপ্পদুট্ঠস্স নরস্স দুস্সতি
সুদ্ধস্স পোস্স্স অনঙ্গনস্স
তমেব বালং পচ্চেতি পাপং
সুখুমো রজো পটিবাতংব খিত্তো। পৃ. ১২৫।

২১৭. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৮৪।

২১৮. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, PP. 467–468; Dhammapada Commentary, Vol. 111, PP. 6–9.

২১৯. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৩-৩৩৪।

২২০. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, PP. 462–463, ধম্মপদট্ঠকথা (অপ্পমাদ বগ্গো), প্রাগুক্ত, পৃ., ১৯. ৯৯-১০২; Dhammapada Commentary, Vol. 1, PP. 208 ff।

২২১. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৬৮-৪৬৯, ধর্মপদ অর্থকথা (ভিক্ষুবর্গ), প্রাগুক্ত, পৃ. ২২-৪০।

২২২. ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৪৬-৩৪৭।

২২৩. অভিত্থরেথ কল্যাণে, পাপা চিত্তং নিবারযে
দন্ধং হি করোতো পুঞ্ঞং পাপস্মিং রমতে মনো। পৃ. ১১৬।

২২৪. বিশাখার উপাখ্যানে দশবিধ উপদেশ দ্রষ্টব্য।

২২৫. সুখ, দুঃখ-লাভ, অলাভ, যশ, অযশ, নিন্দা ও প্রশংসা।

২২৬. ভিক্ষু, ভিক্ষুণী, উপাসক ও উপসিকা পরিষদ।

২২৭. ধর্মপদ অর্থকথা (প্রকীর্ণবর্গ), অনু. জিনবংশ মহাস্থবির, পৃ. ৫৮-৬৩, ধম্মপদ, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৩৮-৪৩৯।

২২৮. Dhammapada Commentaries Vol. 1, PP. 348. ff.

২২৯. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, PP. 469, Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 220.

২৩০. Ibid, Vol. 11. P. 469, Ibid, P. 220.

২৩১. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫০-৫২।

২৩২. Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 220; Dhammapada Commentaries ibid, Vol. 1, PP. 384 ff.

২৩৩. অন্তো অগ্গিবহি ন নহিরতিব্বো, বহি অগ্গি অন্তো ন পবেসতব্বো, দন্তস্স, এব দাবব্বং, অদন্তস্স ন দাতব্বং, দদন্তস্সাপি, অদদন্তস্সাপি দাতব্বং, সুখং নিসীদিতব্বং, সুখং ভুঞ্জিতব্বং, সুখং নিপজ্জিতব্বং, অগ্গিপরিচরিতব্বো, অন্তোদেবতা পি নমস্সিতব্বা, তি ইদং দসবিধং ওবাদং।

২৩৪. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, P. 469–470 Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 222.

২৩৫. Ibid, vol. 11, PP. 469–470; ibd, P. 222.

২৩৬. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫২।

www.pathagar.com

২৩৭. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, P. 449.
২৩৮. Ibid, Vol. 11, P. 45.
২৩৯. Buddhist Legends, ibid, Pt. 1. PP. 60–62.
২৪০. Edited by T.W. Rhys Davids and J. Estlin Charpentier 1, London, PTS. 1886.
২৪১. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, p 407.
২৪২. Studies on Pali Commentaries, ibid, Vol. 11, pp 177–179.
২৪৩. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, PP. 432–434.
২৪৪. Sumangalavilasini, Vol. 1, PP. 2–25.
২৪৫. Ibid, Pt. 1, PP. 244–245.
২৪৬. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, PP. 419–421.
২৪৭. Sumangalavilasini, Pt. 1, PP. 317–319.
২৪৮. History of Pali Literature ibid, Vol. 11, P. 418.
২৪৯. Studies on Pali Commentaries, ibid, Vol. 11, P. 297.
২৫০. Saratthappakasini, 1–11, ed. F.L. Woodward, PTS. London 1898–1904.
২৫১. Ibid, 1, P. 54, Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 188.
২৫২. Ibid, 1, P. 140.
২৫৩. Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 189.
২৫৪. Saratthappakasini, 1, P. 190.
২৫৫. Studies on Pali Commentaries, ibid, PP. 189–190.
২৫৬. Edited by Dr. Max Walleser, PTS, London, 1924 (part–1)
২৫৭. History of Indian Literature. ibid, PP. 191–192.
২৫৮. Ibid, P. 192.
২৫৯. Studies on Pali Commentaries, ibid, P. 196.
২৬০. Studies on Pali Commentaries, ibid, PP. 196–197.
২৬১. A History of Indian Literature ibid, Vol. 11, PP. 197.
২৬২. Paramatthajjotika Vol. 1 (Khudakapatha Commentary) has been edited of the PTS by Helmer Smith form a collection by Mavel Hunt, 1915 and Vol. 11, (Suttanipata Attakatha) Helmer Smith 1816–1918.
২৬৩. Paramatthajjotika on the khuddafapatha,P.T.S., PP. 158–158 ff; History of Pali Literature ibid, Vol. 11, PP. 445–447; Studies on Pali Commentaries, ibis, PP. 284 ff.
২৬৪. বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৫-৫৬।
২৬৫. Suttanipata Atthakatha, ibid, Vol. 11, PP. 575 ff; History of Pali Literature, ibid, Vol. 11. PP. 417–472.

www.pathagar.com

২৬৬. Ibid, Vol. 11. pp 538 ff; ibid, Vol. 11, P. 472.

২৬৭. বৌদ্ধ সাহিত্যে, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৮-১৩৯।

২৬৮. History of Pali Literatuey, ibid, Vol. 11, PP. 566–568.

২৬৯. Ibid, P. 572–573.

২৭০. Ibid, P. 574.

২৭১. Ibid, PP. 575–576.

২৭২. Edited and Translated by Coomarswamy, edited by Rhys Davids and R. Morris JPTS. 1884, P. 109 ff.

২৭৩. বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৩৯-১৪০।

২৭৪. History of Pali Literature, ibid, Vol. 11, P. 580.

২৭৫. মহাসুমনদেবস্‌স সেলে সুমনকূটকে,
দত্বা নমস্‌সিতুং কেসে অগা জেতবনং জিনো।

২৭৬. থেরস্‌স সারিপুত্তস্‌স অন্তেবাসী মহিদ্ধিকো,
সরভুনামকো থেরো পভিন্নপটিসম্ভিদো।
গীবাধাতুং গহেত্বান চিততো মহিযঙ্গনে,
পথিট্‌ঠাপেতা থীপম্‌হি অকা কঞ্চুকচেতিযং।

২৭৭. সুত্বান রচনং তেসং রাজা কোধবসানুগো,
সূরং মাসন্তভূপালং চিত্তযানং অথ'ব্রবী।
কালিঙ্গ রট্‌ঠং গন্ত্বান গুহসীবং ইধানয,
পূজিতং তং ছবট্‌ঠিং চ তেন রত্তিন্দিবং ইতি।

২৭৮. তস্মিংখণে পঙ্কজকণ্ণিকায
পতিট্‌ঠহিত্বা জিনদন্তধাতু,
কুন্দাবদাতাহি পভাহি সব্বা
দিস্বা পভাসেসি পভস্‌সরারি।
দিস্বান তং অচ্ছরিযং মনুস্‌সা।
পসন্নচিত্তা রতনাদিকেহি,
সম্পপূজযিত্বা জিনদন্তধাতুং
সকং সকং দিট্‌ঠিং অবোস্‌সজিংসু। (chap. 111, 14–15).

২৭৯. অগণিতমহিমস্‌স' উজ্জেনিরঞ্‌ঞো তনূজো
পুরবরম যেব' আরদ্ধসদ্ধাভিযোগো
দসবলতনুধাতুং পূজিতং তস্‌স রঞ্‌ঞো
পুরবরহ্‌ উপযাতো দন্তনামো কুমারো। (chap. IV, 7).

২৮০. উগ্‌গম্ম খিপ্‌পং অথ ধাতু মুনিস্‌সরস্‌স
সা পুপ্‌ফরাসিসিখরম্‌হি পতিট্‌ঠাহিত্বা,
রংসীহি দুগ্ধধবলেহি বিরোচমানা

www.pathagar.com

সম্পস্সতং অনিমিসে নয়নে অকাসি। (chap. V, 26).

২৮১. History of Pali Literature, ibid, Vol. 11, PP. 579 ff.

২৮২. Edited by prof. Miayeff, in the Journal of Pali Text Society, 1885. বাংলায় সানুবাদ করেছেন ডঃ আশা দাস, কলিকাতা-১৯৯৪।

২৮৩. ডঃ আশা দাস, প্রাগুক্ত, ভূমিকা, পৃ. ১।

২৮৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২।

২৮৫. পাণং চ ধনং চ সকং পুত্তদারং
পূব্বে তয়া দিন্নমপ্পরূপং।
তেন'এব লদ্ধং যদি বোধি ঞানং
পাতেত্বা অজ্জ'ইমস্মিং সু উপট্ঠকাযো।

২৮৬. দাযকো পতিপাত্ব অজ্জ তেজসা তব নাযক
সব্বসত্ত হিতত্থায় ইধ ঠস্সতি চে দীপং।

২৮৭. পর্জন্য বা পজ্জুন্ন বৃষ্টির দেবতা। দ্রষ্টব্য, মৎস্যজাতক (৭৫)।

২৮৮. স চে ত্বং সব্বলোকগ্গ জনোঘং তারিতুম ইধ।
তপস্সী তব তেজেন পত্থনং মে সামিজ্ঝতু।
অজ্জ থূপস্স দাযকং লভেয্যং জিনসিরজ।

২৮৯. ইনি চতুম্মাহারাজিক কর্তৃক সমুদ্রযাত্রী ধর্মপরায়ণ ব্যক্তিদের রক্ষা করার কাজে নিযুক্তা। মহাজনক জাতক (৫৩৯) দ্রষ্টব্য।

২৯০. দাযকো সুলভো হোতু স চে ত্বং মুনি বুদ্ধজং।
হিতায সব্বসত্তস্স ঠস্সতি সততং ইধ।

২৯১. লোকচরিয ভূতস্স অসমস্স মহোসিনো।
ধাতুযা দাযকো অম্মি লাভা মে বত মারিসা।

২৯২. স চে লোকহিতত্থায় অনুজান 'ইধ নাযকো।
ধাতু থূপস্স দাযকং লভেয্যং তেজসাতবা'তি।

তৃতীয় অধ্যায়
রসবাহিনীতে বর্ণিত কাহিনীগুলোর সারসংক্ষেপ

রসবাহিনীর গল্পগুলো প্রধান দুই অংশে বিভক্ত, যথা- জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) উৎপন্ন ও সিংহলে (শ্রীলংকায়) উৎপন্ন কাহিনী। জম্বুদ্বীপে উৎপন্ন কাহিনীর সংখ্যা ৪০টি। প্রতিবর্গে দশটি করে চারটি বর্গে বিভক্ত। বর্গগুলো যথাক্রমে (১) ধর্মশৌণ্ডিক, (২) নন্দিরাজ, (৩) যক্ষবঞ্চিত ও (৪) মহাসেনবর্গ। সিংহলে উৎপন্ন কাহিনীর সংখ্যা ৬৩টি। এ অংশের শেষ তিনটি গল্পকে বর্গভুক্ত করা হয়নি, গল্পগুলো হচ্ছে- বৃদ্ধমহিলার কথা (১১-১), পঞ্চশত ভিক্ষুর কথা (১১-২) ও দন্তকুটুম্বিকের কথা (১১-৩)। অবশিষ্ট ৬০টি কাহিনী প্রতিবর্গে দশটি করে ছয় বর্গে সন্নিবেশ করা হয়েছে। বর্গগুলো যথাক্রমে (৫) মৃগপোতক, (৬) উত্তরোলীয়, (৭) যোদ্ধা, (৮) দ্বিতীয় যোদ্ধা, (৯) সীলোত্ত ও (১০) চূলগল্লবর্গ।

সপ্তম ও অষ্টম বর্গ ব্যতীত সবগুলো বর্গের নামকরণ বর্গের প্রথম গল্পের শিরোনামানুসারে হয়েছে। বর্গের বিষয়বস্তুর প্রেক্ষাপটেই সম্ভবত সপ্তম ও অষ্টমবর্গের নামকরণ করা হয়েছে। গল্পকার বেশকিছু গল্পের উপাদান মহাবংস, দীপবংস, অট্‌ঠকথাসাহিত্য প্রভৃতি থেকে গ্রহণ করেছেন। কাহিনীগুলো ধর্মীয় প্রেক্ষাপটে রচিত হলেও গল্পকারের বিচরণ ক্ষেত্র বৌদ্ধধর্ম এবং ভারত ও শ্রীলংকার রাজনৈতিক অঙ্গন পর্যন্ত বিস্তৃত। তবে প্রায় সবগুলো কাহিনীরই মুখ্য উদ্দেশ্য সাধারণকে ধর্মীয় ভাবাদর্শে উদ্বুদ্ধ করা। এখানে প্রতিটি কাহিনীর সারসংক্ষেপ উপস্থাপন করা হলো ঃ

জম্বুদ্বীপে (ভারতবর্ষে) উৎপন্ন কাহিনী
১. ধর্মশৌণ্ডিক বর্গ

১.১ ধর্মশৌণ্ডিক কথা

ভদ্রকল্পে কশ্যপবুদ্ধের[১] শাসন অবসানের কিছুকাল পর বোধিসত্ত্ব[২] জন্মগ্রহণ করেন বারাণসীর[৩] রাজমহিষীর গর্ভে। ভূমিষ্ট হবার পর রাজ্যবাসীর অন্তরে ধর্মভাব জাগ্রত হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয় ধর্মশৌণ্ড। বয়ঃক্রমে যথাযথ শিক্ষায় শিক্ষিত করা হয় তাঁকে। পিতার দেহত্যাগের পর তাঁকে অভিষিক্ত করা হলো রাজপদে। অল্পকাল পরেই তাঁর অন্তরে ভাবান্তর উদয় হলো, তিনি সদ্ধর্ম শ্রবণের জন্য অত্যন্ত আগ্রহান্বিত হলেন। তিনি সমস্ত অর্থ-বিত্ত এবং রাজ্যের বিনিময়েও সদ্ধর্ম শ্রবণের আকাঙ্খা প্রকাশ করলেন।

www.pathagar.com

কিন্তু কোথাও পাওয়া গেল না সদ্ধর্মদেশক। তিনি ভাবলেন ধর্মহীন জীবন মূল্যহীন। তাই একদিন রাজ্যভার অমাত্যদের উপর দিয়ে আত্মীয়-স্বজন, ধন-সম্পত্তি ও রাজ্য ত্যাগ করে সদ্ধর্মের অন্বেষায় প্রবেশ করলেন মহাবনে। মহারণ্যে ইতস্তত ঘুরতে লাগলেন ধর্ম শ্রবণের প্রত্যাশায়। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন তপ্ত হলো। তিনি দিব্যনেত্রে মহাসত্ত্ব ধর্মশোণ্ডিকের ধর্ম শ্রবণের প্রবল প্রবৃত্তি জ্ঞাত হলেন। তিনি মুহূর্তের মধ্যে কিম্ভূতকিমাকার এক দৈত্য-বেশে রাজার সম্মুখে উপস্থিত হলেন। রাজা দৈত্যের নিকট সদ্ধর্ম যাচনা করলেন। দৈত্য বললেন, "আমি বড় ক্ষুধার্ত, আপনাকে খেয়ে ক্ষুন্নিবৃত্তির পর ধর্মদেশনা করব।" রাজা বললেন, "খাওয়ার পরে ধর্ম শ্রবণ করবে কে? তবে একটা উপায় বের করুন যাতে আমার ধর্ম শ্রবণও হয়, আপনার ক্ষুধাও নিবৃত্তি হয়।" যক্ষ বললেন, "আপনি উঁচু পর্বতশৃঙ্গ থেকে গড়িয়ে পড়বেন, ততক্ষণে আমি ধর্মদেশনা করতে থাকব, যেইমাত্র আমার হাতে পড়বেন আমি আপনাকে খেয়ে ফেলব।" রাজা তাঁর প্রস্তাবে আনন্দমনে সম্মত হলেন। প্রস্তাব মত তিনি পর্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে গড়িয়ে পড়তে লাগলেন। যক্ষ ইন্দ্রমূর্তি ধারণ করে বোধিসত্ত্বকে দু'হাতে তুলে নিলেন। অতঃপর তাঁকেসহ তুষিত স্বর্গে উপস্থিত হয়ে সুসজ্জিত আসনে তাঁকে উপবেশন করালেন। পূজা করলেন দিব্য মালাগন্ধ দিয়ে। তারপর দেশনা করলেন জগৎ জীবনের অনিত্যতা সম্পর্কে। অপ্রমত্তভাবে জীবন অতিবাহিত করার উপদেশ দিয়ে দেবরাজ রাজাকে স্বরাজ্য বরাণসীতে পৌঁছে দিলেন।

অমিত রাজশ্রী ও সুখের জীবনকে উপেক্ষা করেও সাধুব্যক্তিগণ প্রশংসনীয় ধর্মকেই অবলম্বন করেন।

১.২ মৃগলুব্ধক কথা

একত্রিশ কল্পপূর্বে সিখী[৪] নামক সম্যকসম্বুদ্ধ জগতে আবির্ভূত হয়ে সদ্ধর্ম প্রচার করেছিলেন। একদা তিনি বিমুক্তি-সুখ উপভোগ করার জন্য অরণ্যে প্রবেশ করেছিলেন। কোনো রমণীয় স্থানে তিনি স্বীয় সজ্ঘাটি পেতে উপবেশন করলেন। তখন তাঁর দেহ থেকে বেরোচ্ছিল ষড়বিধ দিব্য জ্যোতি। তাঁর চতুর্দিকে বুনো প্রাণীরা শ্রদ্ধাচিত্তে সমাগত। বহু দেব-নাগ-ব্রহ্মা-সুপর্ণাদি দিব্য-মাল্য-গন্ধ দিয়ে বুদ্ধের পূজা করলেন। বুদ্ধ সেই সমাগমে দুঃখ নিবৃত্তিকারক চতুরার্যসত্য[৫] দেশনা করছিলেন, ঠিক সেই সময়ে জনৈক মৃগ-লুব্ধক সেখানে উপস্থিত হলো। সে-ও একাগ্র মনে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করল। যথাকালে সে মৃত্যুর পর ধর্মশ্রবণজনিত পুণ্যপ্রভাবে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল। অনন্তর জন্মজন্মান্তর দেব-মনুষ্য সুখ উপভোগ করে গৌতমবুদ্ধের সময় শ্রাবস্তীর[৬] এক ধনাঢ্য কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি বুদ্ধশাসনে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অল্প সময়ের মধ্যে সদ্ধর্ম অনুশীলন করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

অল্পক্ষণের জন্য হলেও সদ্ধর্ম শ্রবণ করে এবং অধিগত বিভবের পরিণাম জেনে নিরলসভাবে দুর্লভ সুখদায়ক ধর্ম জ্ঞাত হও এবং তা গ্রহণ করে ভব-বিভব সুখ লাভ কর।

www.pathagar.com

১.৩ তিন ব্যক্তির কথা

একসময় জম্বূদ্বীপে[৭] অনাবৃষ্টি হয়। তখন নদী-নালা শুকিয়ে যায়। পানীয় জলের অভাবে বহু প্রাণী মরতে থাকে। কোনো মহাবনে এক শুক-শাবক পাহাড়ের গভীর গহ্বরে গন্ধময় জলের সন্ধানে নেমেছিল। জল অধিক পান করায় আর উপরে উঠতে পারল না। একইভাবে একটি সর্প ও একজন মানুষ ঐ গহ্বরে পতিত হলো। বারাণসীর জনৈক সৎ ব্যক্তি বনে জলের অন্বেষণ করতে গিয়ে গহ্বরে উক্ত তিন প্রাণীকে দেখতে পেলেন। তিনি রশির সাহায্যে তাদের জীবন বাঁচালেন। তারা তিনজনেই খুশী হয়ে বলল, "আজ থেকে আপনি আমাদের বন্ধু, যদি কোনো সময় দরকার হয় আমাদের কথা স্মরণ করবেন।"

একসময় সেই উপকারী ব্যক্তি অভাবগ্রস্ত হলে শুক-শাবকের নিকট গিয়ে জানাল। শুক-শাবক তাঁকে অপেক্ষা করতে বলে বের হয়ে পড়ল। সে সময় বারাণসীরাজ উদ্যান ভ্রমণ শেষে স্বীয় আভরণাদি রেখে স্নান করার জন্য নেমেছিলেন। শুক-শাবক সে সুযোগে রাজার মুক্তোর হারখানা নিয়ে বন্ধুকে দিল। বন্ধু এত মূল্যবান হার কোথায় রাখবে চিন্তা করে তাঁর মানুষ বন্ধুর হাতে জমা দিল। ঠিক সেই সময় রাজার হার চুরির খবর প্রচারিত হলো এবং চোরকে ধরিয়ে দেওয়ার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করা হলো। লোকটি পুরস্কারের লোভে তার উপকারী বন্ধুকে ধরিয়ে দিল। রাজা তাঁকে বধ করার জন্য আদেশ দিলেন। বধ্যভূতিমে নিয়ে যাওয়ার পথে ছিল সর্প-বন্ধুর আশ্রয়স্থল। তিনি স্মরণ করলেন সর্পকে। সর্প বন্ধুর বিপদ দেখে রাণীর শয়নকক্ষে প্রবেশ করে রাণীকে দংশন করল। সঙ্গে সঙ্গে মানুষের রূপ ধারণ করে প্রচার করল যে, যে ব্যক্তিকে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে সে বিষ-নিরোধ করতে জানে। রাজা তাঁকে ফিরিয়ে আনার জন্য নির্দেশ দিলেন। সর্প বন্ধুকে বলল, যেন সে রাণীর গায়ে জল ছিটিয়ে সুস্থ করে দেয়। বন্ধু তাই করল। রাণী সুস্থ হলেন। অতঃপর লোকটি আনুপূর্বিক ঘটনা রাজাকে ব্যক্ত করলেন। রাজা তাঁকে জায়গাজমি দিয়ে সুখে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন।

অসৎ বন্ধু বিপদের কারণ হয়, সৎ বন্ধু ব্যতীত উত্তম অভিবৃদ্ধি হয় না, অতএব কুশলকর্ম কর এবং সৎসঙ্গী বেছে নাও।

১.৪ বুদ্ধেনির কথা

অতীতে পাটলিপুত্র[৮] নগরে এক শ্রেষ্ঠীর 'বুদ্ধেনী' নামে এক কন্যা ছিল। সপ্তবর্ষ বয়সকালে তাঁর মাতা-পিতা পরলোক গমন করেন। বুদ্ধোনী ছিলেন অপরূপ সুন্দরী। বয়ঃক্রমকালে অনেক শ্রেষ্ঠী-সেনাপতি তাঁর পাণি প্রার্থনা করেন, কিন্তু তিনি সংসারের অসারতা দেখে তা প্রত্যাখ্যান করেন এবং তাঁর ধন-সম্পদ বুদ্ধাশাসনে দান দিতে সংকল্পবদ্ধ হন।

একদা কোন অশ্ববণিক বাণিজ্য করতে গিয়ে তাঁর বাড়িতে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তিনি যাবার সময় একটি সিন্ধুঘোটক উপহার দিয়ে যান। সেই ঘোটক আকাশমার্গে উড়তে পারত। কুমারী বুদ্ধেনী অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করে প্রতিদিন বোধিবন্দনা ও পূজা করতে

www.pathagar.com

যেতেন। এভাবে যাতায়াত করার সময় পাটলিপুত্রের রাজা সংবাদ পেলেন যে, এক সুন্দরী কুমারী রাজ্যের উপর দিয়ে গিয়ে প্রত্যহ বোধি পূজা করেন। তিনি তাঁকে অগ্রমহিষী করার জন্য মনস্থ করলেন এবং পূজা শেষে ফিরে যাবার সময় রাজা কর্তৃক নিযুক্ত লোক ধরার জন্য ধাওয়া করল। তিনি অশ্ব দ্রুত চালিয়ে আকাশে উড়ে চললেন। গতিবেগের কারণে তিনি অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে গেলেন। অশ্ব দ্রুততার সঙ্গে তাঁকে পৃষ্ঠে নিয়ে আকাশমার্গে স্বস্থানে গিয়ে পৌঁছলেন। তদবধি কুমারী সপ্তাশীতি ধন বুদ্ধ শাসনে দান করে, শীল পালন করে মৃত্যুর পর স্বর্গগামী হন।

কুশলকর্ম মহাফলদায়ক, ইহা জ্ঞাত হয়ে দানাদি সৎকর্মকে উপেক্ষা করা অনুচিত।

১.৫ অহিগুন্টিক (সাপুড়ে) কথা

ভদ্রকল্পে ভগবান কশ্যপবুদ্ধ দেব-মনুষ্যগণের হিতের জন্য ধর্মপ্রচার করে যথাসময়ে পরিনির্বাণ[৯] প্রাপ্ত হন। জম্বুদ্বীপবাসী তাঁর পরিনির্বাণস্থানে মনোরম স্তূপ নির্মাণ করে পূজা করতেন। সে সময় রাজধানীতে গমনাগমন পথে এক সাপুড়ে সর্প-ক্রীড়া প্রদর্শন করে জীবিকা নির্বাহ করত। একসময় কোনো গ্রামে গিয়ে সে সর্প-ক্রীড়া প্রদর্শন করে, গ্রামবাসী তার ক্রীড়া দেখে তুষ্ট হয়ে তাকে আহার্যাদি দেয়। সে সেখানে বসবাস করতে থাকে। সেই গ্রামবাসী ছিল ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। তারা রাত্রে শোবার সময় 'নমো বুদ্ধায়' বলত। সাপুড়ে ছিল মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন। সে প্রায় সময় পরিহাস করে বলত 'নমো বুদ্ধায়।'

একদিন সাপুড়ে ক্রীড়া প্রদর্শনকালে এক নাগরাজকে বুদ্ধের স্তূপ বন্দনা করে বল্মীকে প্রবেশ করতে দেখল। সে নাগরাজকে ধরার জন্য দ্রুত গিয়ে মন্ত্র জপ করতে লাগল। মন্ত্র শুনে নাগরাজ ক্রুদ্ধ হয়ে তাকে দংশন করার জন্য তাড়া করতে লাগল। সাপুড়ে ভীত হয়ে দৌড়ে পালাতে গিয়ে পাষাণে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেল এবং পরিহাস করে বলল, 'নমো বুদ্ধায়'। 'বুদ্ধ' শব্দ শুনে নাগরাজের মন নমিত হলো, বলল, 'তুমি ত্রিরত্ন মন্ত্রে দীক্ষিত, তোমাকে দংশন করা অনুচিত।' এরূপ বলে তিনটি স্বর্ণময় ফুল উপহার দিয়ে বলল, "একটি স্বর্ণ-পুষ্প দিয়ে তোমার ও একটি আমার পুণ্যের জন্য চৈত্য পূজা করবে এবং অন্যটি দিয়ে তোমার জীবিকা নির্বাহ করবে। হীনকর্মে লিপ্ত হবে না, মিথ্যাদৃষ্টি তাগ করবে।" সাপুড়েও নাগরাজের উপদেশ অনুযায়ী কুশলকর্ম সম্পাদন করত আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হলো।

বুদ্ধের শরণগামী সর্বত্র বিপদ হতে মুক্ত থাকেন।

১.৬ শরণ স্থবির কথা

শ্রাবস্তীতে সুমন নামে কোনো গৃহপতির এক পুত্র ও এক কন্যা ছিল। তিনি মৃত্যুর পূর্বে সম্পত্তিসমূহ পুত্রকে দিয়ে বললেন, "তোমার ছোট বোনকে যথাস্থানে পাত্রস্থ করবে।" পিতার মৃত্যুর পর সে ছোট বোনকে পাত্রস্থ করল এবং নিজেও দারপরিগ্রহ করল। পরবর্তীসময়ে কনিষ্ঠা গর্ভবতী হলে অগ্রজকে দেখার ইচ্ছা জাগ্রত হলো এবং স্বামীকে

www.pathagar.com

অবহিত করে উভয়ে উপঢৌকনাদি নিয়ে শ্রাবস্তী যাত্রা করল। পথিমধ্যে ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত তথাগত বুদ্ধকে দেখে তারা উভয়ে বন্দনা করল। বুদ্ধ তাদের উপনিশ্রয় সম্পত্তি লাভ দর্শন করে ত্রিশরণসহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠা করতঃ বললেন, "কখনও দুঃখ উৎপন্ন হলে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করবে।"

তারা বুদ্ধকে বন্দনা করে শ্রাবস্তীর ভ্রাতৃগৃহে গিয়ে পৌঁছল। স্বামী কিছুদিন পর নিজ গ্রামে চলে গেল। ভাই তার স্ত্রীকে নির্দেশ দিল বোনের যত্ন নেওয়ার জন্য। স্ত্রী সেবা করার সময় তার দেহের অলংকার দেখে লোভ উৎপন্ন হলো। সে বিছানায় পীড়িতের ভান করে শুয়ে রইল। স্বামী এসে জিজ্ঞেস করলে সে বলল, "আমি তোমার বোনের মাংস খেতে চাই, আর তা না পেলে আমি মৃত্যুবরণ করব।" স্বামী নানাভাবে বোঝাতে চেষ্টা করল মনুষ্য হত্যায় বিরত থাকতে। কিন্তু স্ত্রীকে বোঝানো গেল না। অতঃপর কামান্ধ স্বামী তার কথা রক্ষা করতে রাজী হলো।

অনন্তর ভাই ছোট বোনকে বলল, "অমুক গ্রামে আমার পিতা কিছু ঋণের টাকা পাবেন, যেগুলো তোমাকে ছাড়া দিচ্ছে না। চল, আমরা গিয়ে ঋণের টাকাগুলো নিয়ে আসি।" সে শকটে করে বোনকে নিয়ে গেল এক অরণ্যের ধারে। শকট হতে নামিয়ে টেনে টেনে নিয়ে গেল গভীর অরণ্যে। বোনের প্রসব বেদনা আরম্ভ হলো। সে একটি পুত্র প্রসব করল। ভাই তবু নিরস্ত না হয়ে বোনকে প্রহার করতে লাগল। চিৎকার করলে অন্য লোকজন এসে ভাইয়ের অনিষ্ট করতে পারে চিন্তা করে সে মৃতবৎ পড়ে রইল এবং বুদ্ধের শরণ নিতে লাগল। সেই বনে নিগ্রোধ-বৃক্ষের দেবতা তাকে রক্ষা করার জন্য স্বামীর রূপ ধারণ করে সম্মুখে উপস্থিত হলেন। ভাই ভয়ে পালিয়ে গেল। দেবতা পুত্রসহ মহিলাটিকে শ্রাবস্তীর অতিথিশালায় রেখে অন্তর্ধান করলেন। প্রভাতে স্বামী বের হলে স্ত্রীকে অতিথিশালায় দেখে বিস্মিত হলো। স্ত্রী আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করলে বুদ্ধের শরণ গ্রহণের ফল বুঝতে পারল। বুদ্ধ ধর্ম দেশনা করলেন, তাঁরা উভয়ের স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। তাঁদের পুত্রও বিশ বছর বয়সে প্রব্রজিত হয়ে শরণ স্থবির নামে অভিহিত হন এবং ধ্যান-সমাধি করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।

ত্রিরত্নের শরণাগত সর্বত্র রক্ষিত হন।

১.৭ বিশ্বমিত্রা কথা

কোসাম্বীনগরে[১০] কোসাম্বীরাজের অগ্রমহিষী ছিলেন বিশ্বমিত্রা। ভগবান বুদ্ধ ভিক্ষুসঙ্ঘসহ কোসাম্বীতে অবস্থানকালে তিনি রাজাসহ বিহারে গিয়ে বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করেন ও ত্রিশরণে[১১] প্রতিষ্ঠিত হন। কিছুকাল পরে সেই রাজার বিরুদ্ধে কোনো প্রত্যন্ত রাজা বিদ্রোহ ঘোষণা করেন। বিদ্রোহ দমনের জন্য রাজা ও রাণী সেনাবাহিনীসহ যুদ্ধশিবিরে গেলেন। রাণীকে বললেন, "যদি যুদ্ধে পরাজিত হই তাহলে পূর্বাহ্নে রঙিন পতাকা উত্তোলন করব, তুমি তা দেখে কোসাম্বীতে চলে যাবে।" যুদ্ধ করতে গিয়ে রাজা

www.pathagar.com

পরাজয়ের সম্ভাবনা দেখে রঙিন পতাকা উত্তোলন করে মৃত্যুবরণ করেন। রাণী বিশ্বমিত্রা পতাকা দেখে পলায়ন করতে লাগলেন। পথিমধ্যে বিজয়ী রাজার কর্মচারীরা তাঁকে রাজদরবারে হাজির করালেন। রাজা তাঁকে দেখে কামাসক্ত হয়ে অমাত্যদের অভিষেকের আয়োজন করতে নির্দেশ দিলেন। রাণী রাজী হলেন না। রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করতে নির্দেশ দিলেন। কর্মচারীরা রাণীর হাত-পা বেঁধে জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ করল। আগুনে নিক্ষিপ্ত হওয়ার সময় রাণী ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করলেন। রাণীকে অগ্নি দগ্ধ করল না। পদ্মগর্ভে প্রবেশ করার ন্যায় তাঁর শীত অনুভূত হলো। রাজা এরূপ বিস্ময়কর অবস্থা দেখে রোমাঞ্চ অনুভব করলেন। ত্বরিত বেগে গিয়ে রাণীকে উভয় হস্তে অগ্নি হতে উদ্ধার করে সিংহাসনে বসালেন এবং তিনি অগ্নি-দগ্ধ না হওয়ার কারণ জিজ্ঞেস করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, "ত্রিশরণ গ্রহণের ফলেই আমি দগ্ধ হইনি। ত্রিশরণাপন্ন ব্যক্তি ইহ-পরকালে সুখ লাভ করেন। হে রাজন ! আপনিও ত্রিশরণ গ্রহণ করুন, এতে আপনি নিরাপদে বাস করতে পারবেন।"

রাণীর কথা শুনে রাজা অতীব মুগ্ধ হলেন এবং তাঁর কৃতকর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করলেন। তখন হতে তিনি রাণীকে ভগ্নীপদে স্থান দিয়ে ত্রিশরণ ও পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম করে যথাকালে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হলেন।

ত্রিশরণ গ্রহণ ও শীল পালনকারী ভোগসম্পত্তি লভ করেন এবং পরমসুখপদ নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

১.৮ মহামন্ধাতা কথা

একানব্বই কল্প পর্বে ভগবান বিপস্‌সী[১২] সম্যকসম্বুদ্ধ ধর্মচক্র[১৩] প্রবর্তন করে বন্ধুমতী[১৪] নগরে অবস্থন করছিলেন। তৎকালে সেই নগরে মন্ধাতা নামে জনৈক ব্যক্তি সূচীকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একসময় নগরবাসী বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে মহাদান দিচ্ছিলেন। মন্ধাতা দরিদ্রতার কারণে দানকার্যে অংশগ্রহণ করতে না পারায় দুঃখ বোধ করলেন। তিনি সেদিন তাড়াতাড়ি সূচীকর্ম সমাপ্ত করে কিছু টাকা নিয়ে বাজারে গিয়ে রাজমাস নামে একপ্রকার ডাল ক্রয় করে বুদ্ধকে দান করার জন্য উপস্থিত হলেন। তিনি চিন্তা করলেন যে, তাঁর দানীয় বস্তু একজনমাত্র ভিক্ষুকেও দেওয়ার মত নয়, আকাশে নিক্ষেপ করলে অন্তত একটি করে হলেও ভিক্ষুদের পাত্রে পতিত হবে। অতঃপর তিনি তা উপর দিকে নিক্ষেপ করলেন। নিক্ষিপ্ত মাসসমূহ বুদ্ধানুভাব ও দেবগণের প্রভাবে প্রথমে বুদ্ধের পাত্রে ও পরে প্রত্যেক ভিক্ষুর পাত্রে পতিত হলো, একটিও বাইরে ছিল না। মন্ধাতা প্রার্থনা করলেন অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে, "এ পুণ্যপ্রভাবে আমি যেন জন্মজন্মান্তর কাম-ভোগে শ্রেষ্ঠ হতে পারি। হাততালি দিয়ে আকাশে অবলোকন করলে যেন সপ্তময় রত্ন বর্ষিত হয়।"

অতঃপর জন্ম-জন্মান্তর দেব-মনুষ্যলোকে জন্মগ্রহণ করে বহু সুখ ভোগ করতঃ ভদ্রকল্পে উপোসথের গৃহে 'মন্ধাতা'র জন্ম হয়। সেই জন্মে তিনি চতুর্বিধ ঋদ্ধি সম্পন্ন হয়ে

www.pathagar.com

চুরাশি সহস্র বছর বাল্য-ক্রীড়া করেন, সহস্র বছর উপরাজ্যের দায়িত্ব পালন করেন এবং চুরাশি সহস্র বছর চক্রবর্তী রাজ্য শাসন করেন। তিনি তবুও কামতৃষ্ণা পূর্ণ করতে না পেরে অমাত্যদের অবহিত করেন। অমাত্যদের পরামর্শক্রমে তিনি চাতুর্মহারাজিক দেবলোকে আরোহণ করে দিব্য-সুখসহকারে দেবরাজ্য শাসন করতে লাগলেন। এখানেও তিনি কামসুখে তৃপ্তি পেলেন না, আরও কামসুখের জন্য তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে উঠলেন। অমাত্যবৃন্দের পরামর্শক্রমে আরও অধিকতর কাম-সুখ সম্পন্ন তাবতিংস স্বর্গে গমনের জন্য উদ্বুদ্ধ হয়ে সপরিষদ তাবতিংস স্বর্গে আরোহণ করলেন। তাবতিংস স্বর্গের অধিপতি দেবরাজ ইন্দ্র তাঁকে স্বাগত জানিয়ে অর্ধাংশ রাজ্য সমর্পণ করলেন। ছত্রিশ জন ইন্দ্রের রাজত্বকাল পরিমাণ সময় মন্ধাতা তাবতিংস শাসন করেছিলেন এবং কামসুখ উপভোগ করেও পরিতৃপ্ত না হয়ে দেবরাজ ইন্দ্রের অর্ধাংশ রাজ্য অধিকার করতে চাইলেন। ভোগ তৃষ্ণা অত্যধিক বৃদ্ধি পাওয়ায় তাঁর আয়ুসংস্কার ক্ষয় হয়ে আসে। তিনি জরাগ্রস্ত হয়ে মনুষ্যলোকে পুনঃঅবতরণ করে যথাকালে আয়ু ক্ষয়ে দেহত্যাগ করেন।

কামতৃষ্ণা প্রাণিগণের পরম শত্রু।

১.৯ বুদ্ধবর্ম বণিক কথা

জম্বুদ্বীপের পাটলিপুত্র নগরে বুদ্ধবর্ম নামে এক বণিক ছিলেন। তিনি বহু সংখ্যক শকটে পণ্য সামগ্রী নিয়ে গ্রাম, নিগম, জনপদ ও রাজধানী সমেত বাণিজ্য করতেন। একদা তিনি ভিক্ষু-সজ্ঘ পরিবৃত হয়ে ধর্মপ্রচার করার সময় বত্রিশ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জনমণ্ডিত তথাগত বুদ্ধকে দেখলেন। বণিক উৎফুল্ল চিত্তে ভিক্ষু-সজ্ঘসহ বুদ্ধকে বিকেলে নিমন্ত্রণ করলেন। বুদ্ধ বললেন যে, তাঁরা বিকেলে কেবলমাত্র আট প্রকার পানীয়ই গ্রহণ করতে পারেন। যেমন--আম, জাম, বন্যকদলি, গ্রাম্যকদলি, মধু, আঙ্গুর,শালুক এবং দাড়িম্ব ইত্যাদির রস। এ কথা শুনে সেই বণিক বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সজ্ঘকে আঙ্গুরের রস দান করলেন। বুদ্ধ ভিক্ষু-সজ্ঘসহ সেই রস পান করে বণিককে ধর্মোপদেশ দিয়ে আবার বেরিয়ে পড়লেন। সেই বণিকও আনন্দিত হয়ে অন্যান্য বণিকদের সঙ্গে বহু গ্রাম-জনপদ পরিভ্রমণ করতে করতে মহাবত্তনি নামক কান্তারে (Wilderness) এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে এসে তাঁর এবং অন্যসকল বণিকদের পানীয় জল নিঃশেষ হয়ে গিয়েছিল। লোকজন এবং শকটবাহী বলিবর্দ্দভের জন্যও কোনো পানীয় ছিল না। বণিক তৃষ্ণার্ত হয়ে প্রত্যেকটি শকটে জলের অনুসন্ধান করতে লাগলেন। অবশেষে একটি শকটের বণিকেরা তাঁকে তৃষ্ণার্ত দেখে দয়াপরবশ হয়ে বললেন, "এ পাত্রে কিছু জল আছে। তুমি পান কর।" তিনি সেই পানীয় পান করতে গিয়ে মনে হলো আঙ্গুরের রস। তিনি বুঝতে পারলেন যে, বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সজ্ঘকে আঙ্গুরের রস দান করার ফলে পানীয় জল এরূপ মনে হচ্ছে। তাড়াতাড়ি গিয়ে তাঁর পাত্রসমূহের ঢাকনি খুলে দেখলেন সবপাত্র আঙ্গুরের রসে পূর্ণ হয়ে আছে। তিনি সকল সঙ্গীকে এ বিষয় অবহিত করলেন এবং বললেন, "প্রসন্ন মনে মুণিশ্রেষ্ঠ বুদ্ধকে পানীয় দান করার ফলে এরূপ ফল লাভ করেছি, ভগবানের মহিমা অচিন্তনীয়, আশ্চার্যজনক, সান্দৃষ্টিক এবং কালাকালবিহীন।"

www.pathagar.com

অতঃপর তিনি উপস্থিত সকল জনগণকে এবং শকটবাহী বলিবর্দ্ধভদিগকে প্রয়োজনমত আঙ্গুরের রস পান করালেন। তথাপি সেই রস শেষ হলো না। বাণিজ্য শেষে বণিক বেঠবনে ভগবান বুদ্ধের নিকট গিয়ে বন্দনা করে আনুপূর্বিক ঘটনা বিবৃত করলেন। ভগবান তাঁর উদ্দেশ্যে ধর্ম দেশনা করলেন। বণিক পর দিনের জন্য বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করলেন। এভাবে আজীবন দানাদি পুণ্য-কর্ম করে আয়ুক্ষয়ে তাবতিংস[১৫] দেবলোকে দ্বাদশযোজনিক কনক বিমানে উৎপন্ন হয়ে অপ্সরাসজ্ঞ পরিবৃত হয়ে দিব্যসুখভোগ করতে লাগলেন।

শীলবান ব্যক্তিকে দান করে বহু পুণ্যফল লাভ কর।

১.১০ রূপদেবীর কথা

বিপস্সী বুদ্ধের সময়কার ঘটনা। এক গ্রাম্য বালিকা একসময় বিহারে গিয়ে এক পীড়িত ভিক্ষুকে দেখে জিজ্ঞেস করলেন, "প্রভু, কোন রোগে আক্রান্ত ?" ভিক্ষু বললেন, "বোন আমি তীব্র বাতে আক্রান্ত।" বালিকা বললেন, "প্রভু, আমি আপনার রোগ উপশম করব।" বালিকা পরদিনের জন্য ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করলেন এবং বাড়ি গিয়ে মাতা-পিতার অনুমতি নিয়ে নানা প্রকার ভৈষজ্যাহার প্রস্তুত করলেন। ভিক্ষু পরদিন যথাসময়ে তাঁর বাড়ি গিয়ে উপস্থিত হলে তাঁকে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে বসালেন এবং শ্রদ্ধাসহকারে আহার্য পরিবেশন করলেন। ভিক্ষু আহার্য গ্রহণের পর বিহারে চলে গেলেন। তিনি একদিনেই সুস্থ হয়ে উঠলেন। পরদিন ভিক্ষু আহার্য গ্রহণের জন্য আর বালিকার বাড়ি না যাওয়ায় তিনি স্বয়ং এসে জানতে পারলেন যে, উক্ত ভিক্ষু সুস্থ হওয়ার কারণে পর দিবস আহার্য গ্রহণের জন্য যাননি। বালিকা অতি প্রসন্নচিত্তে বাড়ি ফিরে গেলেন। পরিণত বয়সে মৃত্যুর পর সেই বালিকা সুকৃতির ফলে দেবলোকে জন্মধারণ করেন। এখানে তিনি দ্বাদশযোজন পরিমিত কনক-বিমানে ছয় বুদ্ধান্তরকাল পর্যন্ত দেবৈশ্বর্য উপভোগ করে ভগবান গৌতম বুদ্ধের সময় দেবপুত্র নগরে উদীচ্য ব্রাহ্মণ বংশের জ্যেষ্ঠ ব্রাহ্মণীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তিনি ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর দিন হতে প্রতি দিন তাঁদের পরিবারে আটটি করে তণ্ডুলপাত্র উৎপন্ন হত। তিনি অত্যন্ত রূপসী ছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় 'রূপদেবী'। যথাসময়ে এক সুদর্শন যুবকের সঙ্গে তাঁর বিয়ে হয়। সেখানেও তিনি অফুরন্ত শষ্যভাণ্ডার প্রাপ্ত হন এবং ইচ্ছানুযায়ী খাদ্যবস্তু নিয়ে দান করতেন। প্রতিদিন পাঁচশ ভিক্ষু তাঁর বাড়িতে অন্ন গ্রহণ করতেন। একদা মহাসঙ্ঘরক্ষিত নামে এক অর্হৎ ভিক্ষু দিব্যনেত্রে তাঁর পুণ্যফল দেখতে পেয়ে আহারান্তে পুণ্যানুমোদন করার সময় অতীত পুণ্যকর্ম ব্যাখ্যাচ্ছলে আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করেন। তিনি বুদ্ধের ধর্মের প্রতি আরও শ্রদ্ধাশীল হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম করে স্রোতাপত্তি ফল লাভ করনে।

কর্মফল পরবর্তী জীবনে অবশ্যই উপভোগ করতে হয়।

www.pathagar.com

২. নন্দিরাজ বর্গ

২.১ নন্দিরাজ কথা

পদুমুত্তর[১৬] বুদ্ধের সময়কার কথা। তিনি দেব-মনুষ্যের কল্যাণের জন্য ধর্ম দেশনা করছিলেন। সে সময় এক কুটুম্বিক (A House holder) শাস্তার ধর্ম দেশনা শ্রবণ করে অতীব আনন্দিত হয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিয়েছিলেন। দান কার্যের দিন ধুতাঙ্গধরদের অগ্র বসভ স্থবির কুটুম্বিকের গৃহদ্বারে এসে ভিক্ষার জন্য দাঁড়ালেন। কুটুম্বিক তাঁকে ভিতরে নিয়ে গেলেন। আহারান্তে তিনি ভগবান বুদ্ধের নিকট ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষু সম্পর্কে জানতে চাইলেন। ভগবান বুদ্ধ ধুতাঙ্গধারীদের অগ্র বসভ স্থবিরের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করলেন। কুটুম্বিক ভগবানের নিকট প্রার্থনা করলেন, ভবিষ্যতে তিনিও যেন ধুতাঙ্গধারী ভিক্ষুদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করতে পারেন। ভগবান আশীর্বাদ করলেন এবং বললেন, “ভবিষ্যতে শত সহস্র কল্প পরে পৃথিবীতে গৌতম বুদ্ধ উৎপন্ন হবেন। তখন আপনি ‘কশ্যপ’ নামে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে অগ্রজ হবেন।” তারপর হতে তিনি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন। ভগবান বিপস্সী বুদ্ধের সময়ে মহাদান কার্য সম্পাদন করেন। কশ্যপ বুদ্ধের সময় তিনি শ্রেষ্ঠীকুলে জন্মগ্রহণ করে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন। এরপর একসময় কুটুম্বিক রূপে জন্মগ্রহণ করে জনৈক প্রত্যেক বুদ্ধকে উত্তরসাটিক দান করেছিলেন। যথাকালে মৃত্যুর পর তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন এবং আয়ুক্ষয়ে চ্যুত হয়ে বারাণসীর অদূরে এক নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় নন্দী। তিনি ছিলেন তাঁর সাত ভাইয়ের মধ্যে সর্বকনিষ্ঠ। নন্দী ছিলেন অলস। তাই অন্য ভাইয়েরা তাঁর উপর অসন্তুষ্ট ছিলেন।

একসময় নন্দী নক্ষত্র-ক্রীড়ায় অংশগ্রহণ করার জন্য তাঁর মায়ের কাছে নতুন সূক্ষ্ম বস্ত্র চাইলেন। কিন্তু বাড়িতে যেসব বস্ত্র ছিল সেসব তাঁর পছন্দ হলো না। তিনি অধিকতর সূক্ষ্ম বস্ত্র চাইলেন। মা বললেন, “আমাদরে এর চেয়ে উত্তম বস্ত্র নেই। পুণ্যফলেই উত্তম বস্ত্র লাভ করা যায়।” নন্দী বললেন, “মা, যথাস্থানে আমি লাভ করব।” মা বললেন, “আমি বারাণসীরাজ্য লাভ আশা করি।” নন্দি মাকে প্রণাম করে পুণ্য বিপাক প্রমাণ করার জন্য গ্রাম হতে বহির্গত হয়ে বারাণসীর সেনগুপ্ত নামে এক ব্যক্তির গৃহে অবস্থান করতে লাগলেন। একদা নন্দি ঘুরতে ঘুরতে রাজার মঙ্গল-উদ্যানে প্রবেশ করে মঙ্গলশীলায় শুয়েছিলেন। সেদিন ছিল বারাণসীরাজের মৃত্যুর সপ্তম দিবস। অমাত্যগণ পুষ্পরথ সজ্জিত করে নতুন রাজা নির্বাচনের জন্য রাজ্যে ছেড়ে দিলেন। রথ উদ্যানে প্রবেশ করে নন্দিকে প্রদক্ষিণ করে দাঁড়িয়ে রইল। পুরোহিত তাঁর পদতল অবলোকন করে বুঝতে পারলেন যে, ইনি চার মহাদ্বীপ রাজত্ব করতে সক্ষম। তাঁরা নন্দিকে তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। রাজার একটি মাত্র কন্যা ছিল। নন্দির সাথে তাঁর বিয়ে দেওয়া হলো। অভিষেকের সময় তিনি দিব্য সূক্ষ্ম বস্ত্র প্রাপ্ত হলেন। রাজবাড়ির চারদিকে ৬৪টি কল্পতরু উৎপন্ন হয়েছিল, যেখান হতে তিনি ইচ্ছানুরূপ বিষয় প্রাপ্ত হতেন। পূর্বজন্মের পুণ্য কর্মের ফলেই এত ঐশ্বর্যের অধিকারী হন। নন্দিরাজ ও রাণী এ জন্মেও প্রত্যেক বুদ্ধদিগকে প্রচুর দান

www.pathagar.com

দিতেন। প্রত্যেক বুদ্ধদের জন্য বাসস্থানের ব্যবস্থা করে আহার্যাদি দান করতেন। অতঃপর পরিণত বয়সে জ্যেষ্ঠ পুত্রকে রাজ্যভার অর্পণ করে প্রব্রজ্যা ধর্ম গ্রহণ করেন। আয়ুশেষে মৃত্যুর পর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি এক ব্রাহ্মণ কুলে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি প্রব্রজিত হয়ে ধুতাঙ্গধারীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করেছিলেন। তখন তাঁর নাম হয়েছিল কশ্যপ স্থবির। নন্দি রাজের স্ত্রীও ভদ্রকপিলানী নামে জন্মগ্রহণ করে বুদ্ধ শাসনে প্রব্রজতি হন। বুদ্ধের পরনির্বাণের পর কশ্যপ স্থবির শাসনের শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেছিলেন।

শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে বহুবিধ দান দাও এবং কল্পতরুবৎ ফল প্রাপ্ত হও।

২.২ একজন অন্যতর ব্যক্তির কথা

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর পাটলিপুত্রের কোনো এক গ্রামে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করতেন। একসময় তিনি দুটি কাপড় পরে অন্য কোনো গ্রামে যাওয়ার সময় এক অরণ্য মধ্যে উপস্থিত হলে এক চোর তাঁর কাপড় কেড়ে নেওয়ার জন্য আসছিল। তা দেখে তিনি মনে করলেন যে ঐ ব্যক্তি অনিচ্ছা সত্ত্বেও তাঁর কাড়প কেড়ে নেবে, কাজেই অনর্থক কাপড়গুলো না হারিয়ে তাকে দান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। চোর কাছে আসতেই তিনি প্রসন্নচিত্তে কাপড়গুলো তাকে প্রদান করে ভব-ভোগের জন্য কামনা করলেন। অতঃপর তিনি বন অভ্যন্তরে প্রবেশ করলে সর্প দংশিত হয়ে মারা যান। মৃত্যুর পর তিনি হিমবন্ত প্রদেশে দ্বাদশ যোজন পরিমিত কনক বিমানে বহু সহস্র অপ্সরা পরিবৃত হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর বিমানের চারদিকে তিন যোজন পরিমাণ স্থানে কল্পতরু উৎপন্ন হয়েছিল।

অনুপযুক্ত পাত্রে দান করেও তিনি বিপুল সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন, উপযুক্ত পাত্রে দান যে আরও কত মহৎ ফল লাভ করা যায়- তা অচিন্তনীয়।

২.৩ বিষমলোম কুমার কথা

ভগবান কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধ পৃথিবীতে আবির্ভূত হয়ে নৈর্বাণিক ধর্ম প্রচার করার সময় জনৈক শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন। তথায় যথায়ুষ্কাল অবস্থানান্তে ভগবান গৌতম বুদ্ধের পরিনর্বাণের পর পাটলিপুত্র নগরে সম্রাট অশোকের[১৭] অগ্রমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। ভূমিষ্ঠ হবার পর তাঁর নাম রাখা হয় 'বিষমলোম কুমার'। তিনি বয়ঃপ্রাপ্তির সাথে সাথে মহাশক্তিশালী হয়েছিলেন। একদা ধর্মাশোক চতুরাশীতি পারিষদ পরিবৃত হয়ে হিমবন্ত প্রদেশে যথাভিরুচি ক্রীড়া-বিনোদন শেষে প্রত্যাবর্তনকালে যোজন বিস্তৃত ও ত্রিগাবুত[১৮] গভীর চন্দ্রাভাগা[১৯] নামক নদীতীরে উপনীত হয়েছিলেন। নদী ছিল অত্যন্ত খরস্রোতা। এরূপ উত্তাল খরস্রোতা নদী দেখে রাজা জিজ্ঞেস করলেন, "কে এ নদী পার হতে সক্ষম ?" বিষমলোম কুমার পিতার নিকট এসে প্রণাম করে বললেন, "দেব, আমি এ নদী পারাপার করতে সক্ষম হব।" রাজা সম্মতি দান করলে কুমার উত্তমরূপে কাপড় পরে খিপ্র স্রোতস্বিনী চন্দ্রাভাগা নদী সাঁতার কেটে পার হয়ে পুনরায় ফিরে আসলেন। ফেরার সময় এক উগ্রকুমুরীকে হস্তদ্বারা

www.pathagar.com

চূর্ণ-বিচূর্ণ করে মেরে ফেলেছিলেন। রাজা পুত্রের এরূপ শক্তি দেখে ভীত হয়ে পড়লেন, ভাবলেন, "এ ছেলে কালে আমাকে হত্যা করতে পারে। সুতরাং তাকে মেরে ফেলাই সমীচীন হবে।" রাজধানীতে প্রত্যাবর্তন করে রাজা অমাত্যদের আদেশ দিলেন কুমারকে কারাগারে বন্দি করে রাখার জন্য। চার মাস ধরে কুমার বন্দিশালায় রইলেন। রাজা ইতিমধ্যে ষাট হাত দীর্ঘ বাঁশ সংগ্রহ করিয়ে গীটসমূহ পরিচ্ছন্ন করিয়ে ভিতরে লৌহরস পূর্ণ করত রাজ্যোদানে স্থাপন করলেন। অনন্তর রাজা অমাত্যদের নির্দেশ দিলেন, "কুমার এই অসি দ্বারা বংশদণ্ডসমূহ চার আঙ্গুল পরিমাণ করে কেটে ফেলবে, যদি না কাটতে পারে তাহলে তাকে হত্যা করবে।" কুমার দীর্ঘদিন কারাবাসে ছিল বিধায় ক্ষুধার্ত, দুর্বল ও ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন। তাই তিনি কিছু খেতে চাইলেন। তাঁর জন্য কোনো খাদ্য ছিল না, অমাত্যরা তাঁকে আহার্য দিতে পারলেন না। অগত্যা কুমার জল পান করতে চাইলে তাঁকে পুকুরে যেতে যেওয়া হলো। তিনি পুকুরে অতবরণ করে স্নান করলেন এবং ডুব দিয়ে প্রয়োজন মত কলল ভক্ষণ ও জল পান করে ক্ষুধা-তৃষ্ণা নিবারণ করলেন। অতঃপর মহাজনতার সামনে অসি হস্তে লাফ দিয়ে আকাশে উঠে সমগ্র বাঁশ চার আঙ্গুল পরিমাণ করে কেটে কুটরো টুকরো করে ফেললেন। রাজা তাঁর এরূপ বীরত্ব দর্শন করে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে বহু ধন-সম্পত্তি প্রদান করে উপরাজ পদে অভিষিক্ত করলেন।

বিম্বমলোম কুমার পূর্বজন্মে দান দিয়ে, শীলাদি পালন করে এবম্বিধ শক্তিশালী ও ভোগ সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। পরিশুদ্ধচিত্তে সৎকর্ম করলেই ভাবী জীবনে সুখ সমৃদ্ধি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

২.৪ কাঞ্চনদেবী কথা

জম্বুদ্বীপের দেবপুত্র নগরের জনসাধারণ ভগবান বুদ্ধের ব্যবহৃত পাত্রকে নিয়ে অনেক পূজা অর্চনা করে উৎসব করত, এ উৎসবকে বলা হত 'পাত্রোৎসব'। এ উৎসবের নিয়মানুযায়ী রাজা সর্বরত্নময় রথ সর্বালংকারে বিভূষিত করে চারটি সিন্ধুঘেটিক সংযোজন করতেন এবং শাস্তার শৈলময় পাত্র মুক্তাদি রত্ন দ্বারা অলংকৃত একটি বংশদণ্ডের মস্তকে স্থাপন করত বংশদণ্ডটিকে রথে স্থাপন করতেন। নগরকে মনোরম সাজে সজ্জিত করে প্রদক্ষিণ করতেন এবং নগরের মধ্যখানে সুসজ্জিত রথ-মণ্ডপে পাত্রধাতু স্থাপন করে পূজা করতেন, সপ্তম দিবসে ধর্ম শ্রবণ করাতেন। সে উৎসবে বহু মানব ও দেবতা, যক্ষ, নাগ-সূপর্ণাদি মানবের রূপ ধারণ করে আগমন করত। এমনিতর এক পাত্রোৎসবের ধর্মসভায় এক রূপবতী কুমারীকে দেখে এক নাগরাজের কামচিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল। সে বিভিন্ন প্রকারে কুমারীকে বশীভূত করার চেষ্টা করে বিফল হয়ে তাঁকে মেরে ফেলার জন্য নাক-বায়ু (রোষবশত নাক দিয়ে বিষাক্ত বায়ু) বিচ্ছুরণ করতে লাগল। শ্রদ্ধাবল বশত কুমারীর ক্ষতি করতে ব্যর্থ হয়ে নাগরাজ তাঁর আপাদমস্তক কুণ্ডলাকারে পেঁচিয়ে মস্তকোপরি ফণা উত্তোলন করে ভয় দেখাতে লাগল। ধর্ম শ্রবণে রত থাকায় এতেও তিনি কোনো কষ্ট

www.pathagar.com

পেলেন না। রাত্রি প্রভাত হলে তিনি সত্যক্রিয়া করলেন, "আমি আজন্ম ব্রহ্মচারী, নাগের প্রতি আসক্তিহীন, ক্রোধহীন এবং সমস্ত ধর্ম দেশনা মনোযোগের সাথে শ্রবণ করেছি- এ সত্যবাক্যের প্রভাবে নাগ আমাকে ত্বরিত মুক্তিদান করুক।"

সত্যক্রিয়ার প্রভাবে নাগরাজ তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে মুক্তি দিল এবং তাঁকে নাগরাজের ফণাগর্ভে বসিয়ে উদক পূজা করল। তা দেখে নগরবাসীরা অবাক হলো এবং তাঁকে বিপুল সম্পত্তি দান করল। তিনি আজীবন ব্রহ্মচারী হয়ে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর সেই নগরের রাজার কন্যারূপে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর জন্মদিবসে সমস্ত দেবপুত্র নগরে কাঞ্চন (রত্ন) বর্ষিত হয়েছিল বলে তাঁর নাম রাখা হয় কাঞ্চনদেবী। তাঁর রূপ ছিল অপরূপ অপ্সরা সদৃশ, তাঁর দেহ-রশ্মিতে গৃহ আলোময় থাকত। অপরূপ কাঞ্চনদেবীর রূপের সংবাদ শুনে বহু রাজা তাঁকে স্ত্রী রূপে পেতে চেয়েছিল, কিন্তু তিনি পঞ্চকামে রমিত না হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত বিদর্শন সাধনা করে অর্হত্ত্বফল লাভ করেছিলেন।

কুশলকর্মে রত ব্যক্তি বিপদমুক্ত হন এবং পরমশান্তিপদ নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

২.৫ ব্যাঘ্র কথা

বারাণসী নগরের একটি বড় রাস্তার দুদিকে ছিল বালিয়াড়ি। এখানে এক ব্যাঘ্র তার অন্ধ পিতাকে গুহা-পর্বতে রেখে প্রতিপালন করত। সেই পর্বতের বনদ্বারে বৃক্ষে বাস করত তুণ্ডিল নামে এক শুক-শাবক। তারা উভয়ে ছিল পরস্পর বন্ধু। সেই সময় প্রত্যন্তবাসী এক ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে বাণারসীর সেই বনদ্বারে উপনীত হয়েছিল। শুক-শাবক তাকে জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, সে কাঠের জন্য বনে যাচ্ছে। সে তাকে ব্যাঘ্রের কথা বলে যেতে বারণ করল। সেই দুষ্ট ব্যক্তি শুকের কথা অমান্য করে যেতে চাইলে শুক তাকে বলল, "তুমি গেলে বাঘকে আমার কথা বললে তোমার ক্ষতি করবে না।" সেই দুষ্ট ব্যক্তি শুক রাজকে মেরে আগুণে পুড়ে খেয়ে ফেলল। অতঃপর যখন বনের মধ্যে উপগত হলো তখন ব্যাঘ্র গর্জন করে তাকে মারার জন্য আসলে সে ভীত হয়ে তুণ্ডিলের কথা বলল। ব্যাঘ্র তাকে সমাদর করে বাসস্থানে নিয়ে গিয়ে আহার্যাদি খেতে দিয়ে পুনরায় বনের মধ্যে প্রবেশ করল। ইতিমধ্যে সেই দুর্জন ব্যক্তি ব্যাঘ্রের অন্ধ পিতাকে পাষাণের আঘাতে হত্যা করে ব্যাঘ্রকে হত্যা করার জন্য লুকিয়ে রইল। ব্যাঘ্র তুণ্ডিলের বাসস্থানে গিয়ে উচ্ছিন্ন পালক দেখে বুঝতে পারল যে, সে নিশ্চয়ই তার বন্ধুকে হত্যা করেছে। ব্যাঘ্র ক্ষিপ্ত হয়ে তার বাসস্থানে আসার পথে তাকে দেখে সেই দুষ্ট লোকটি ভীত হয়ে তার পাদমূলে পতিত হয়ে কৃতকর্মের ক্ষমা এবং জীবন প্রার্থনা করল। ব্যাঘ্রের মন শান্ত হলো, সে তাকে জীবন ভিক্ষা দিল। ব্যাঘ্র মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করল।

ইতর প্রাণী হয়েও মৈত্রী ভাব পোষণ করে স্বর্গ সুখ লাভ করতে সক্ষম হয়েছে। তাই সকলের প্রতি মৈত্রী ও করুণা পোষণ করা উচিত।

www.pathagar.com

২.৬ ফলকখণ্ডদিন্ন কথা

শ্রাবস্তীর জনৈক ব্যক্তি গ্রীষ্মকালে খরা তাপে উত্তরাপথে যাবার সময় ক্লান্ত হয়ে এক বৃক্ষচ্ছায়ায় একটি ফলকে উপবেশন করে পান খেতে লাগল। তারপর অনুরূপ আর একজন লোক ক্লান্ত হয়ে উক্ত ব্যক্তির পাশে উপবিষ্ট হয়ে জল চেয়ে না পেয়ে চার কার্যাপণ দিয়ে একটি পান খেয়ে তৃষ্ণা নিবারণ করল। অতঃপর উপকারীকে অর্থাৎ প্রথম ব্যক্তিকে ধন্যবাদ দিয়ে প্রস্থান করল। পরবর্তীতে তারা উভয়ে ভিন্ন ভিন্ন নৌকাযোগে বাণিজ্য করার সময় সমুদ্রের মাঝখানে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে তাদের নৌকাডুবি হয়েছিল। নৌকার সমস্ত লোক কুমীর-মৎস্যের খাদ্য হলো, কিন্তু উক্ত ব্যক্তিদ্বয় সমুদ্রে ভাসতে লাগল। দ্বিতীয়জন একটি তক্তাফলক ধরে এবং প্রথম ব্যক্তি অবলম্বনহীন ভাসতে ভাসতে সপ্তমদিবসে কাছাকাছি এল। প্রথম ব্যক্তিকে দেখে দ্বিতীয় ব্যক্তির পূর্ব উপকারের কথা স্মরণ হলো এবং তাকে স্বীয় তক্তাফলকটি প্রদান করল। প্রথম ব্যক্তি তক্তাফলকটি নিয়ে সমুদ্রের বুকে ভাসতে লাগল। দ্বিতীয় ব্যক্তি ফলকহীন হয়ে ভাসতে ভাসতে জলে ডুবে যেতে লাগল। তৎক্ষণাৎ মণিমেখলা নাম্নী সমুদ্রের দেবকন্যা তাকে ডুবে যেতে দেখে সমুদ্র তীরে তুলে আনল। অপরজনকেও সমুদ্র তীরে তুলে আনল। সে দ্বিতীয়জনকে জিজ্ঞেস করল, "আপনি কিভাবে সমুদ্র তীরে আসলেন?" উত্তরে সে বলল, "আমি জানি না।" তখন দৃশ্যমান দেহে দেবকন্যা বলল, "যে মাতা-পিতার সেবা করে, ত্রিরত্নের প্রতি প্রসন্ন, শীলাদি প্রতিপালন করে, কায়-বাক্য-মনে সুচরিত, সৎকর্মে রমিত ও কৃতবিদ্য তাকে দেবগণও জলে-স্থলে রক্ষা করেন।" এ ব্যক্তিও মিত্রতাবশত স্বীয় জীবনকে বিপন্ন করে নিজ কাষ্ঠফলক অন্যকে দিয়ে জীবন রক্ষা করেছিল বলে দেবতাও তাকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে রক্ষা করেছিলেন।

অতএব, সর্বদা অপ্রমত্তভাবে কুশল কর্ম সম্পাদন করা উচিত।

২.৭ চোরের বন্ধুর কথা

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর দেবদহ[২০] নগরে এক দরিদ্র দুর্জন ব্যক্তি বিভিন্ন স্থানে গিয়ে চৌর্যবৃত্তি করে জীবিকা নির্বাহ করত। একদা চৌর্যকর্ম করার সময় রাজকর্মচারীর হাতে ধৃত হলে রাজা তাকে জেলহাজতে বন্দি করে রাখার জন্য নির্দেশ দান করলেন। জেলে দ্বাদশ বছর কেটে গেল। তখন তার প্রত্যন্তবাসী এক বন্ধু দেবদহ নগরে এসে তার খোঁজ করতে গিয়ে বন্দিশালায় সাক্ষাৎ পেল। বন্ধুর মন কেঁদে উঠল, সে চোর-বন্ধুকে সাহায্য করতে চাইল। চোর বলল, "আমি বন্দি অসহায় ভাল খেতে না পেয়ে ক্লিষ্ট হয়ে গেছি, আমাকে আহার গ্রহণ করার সময়টুকুমাত্র বন্ধনমুক্ত করে দেবার ব্যবস্থা করে দাও।" বিপদেই বন্ধুর প্রয়োজন মনে করে সে কারারক্ষীদের নিকট অনুরোধ করল যেন আহার্য গ্রহণ করার জন্য তাকে ছেড়ে দিয়ে বিনিময়ে সে সময়ের জন্য তাকে বন্দি করে রাখে। রক্ষীগণ রাজি হয়ে তাই করল। চোর বন্ধন মুক্ত হয়ে আর ফিরে আসল না; এভাবে বার বছর কেটে গেল। অতঃপর রাজার এক পুত্র সন্তান জন্মগ্রহণ করলে সকল বন্দিকে মুক্তি

www.pathagar.com

দান করা হয়েছিল, সে সময় সেই সজ্জন ব্যক্তিও মুক্তি পেল। সে রাতের অন্ধকারে নগর হতে বের হয়ে আমক শ্মশানে গিয়ে সদ্য নিক্ষিপ্ত মৃত মানুষের মাংস ছিনিয়ে মৃত মানুষের মস্তকের খুলিতে করে শ্মশানে প্রজ্বলিত অগ্নি দ্বারা রান্না করে নামিয়ে ছেড়া কাপড় দ্বারা বাতাস রুদ্ধ করে বসেছিল। এরূপ অদ্ভুত ব্যবহার দেখে শ্মশান দেবতা এর কারণ জিজ্ঞেস করল। উত্তরে সে বলল, "ক্ষুধার সমান রোগ নেই, ক্ষুধা নিবারণের জন্য মনুষ্য-মাংস রান্না করেছি। আর এই যে বায়ু মিত্রদ্রোহীকে স্পর্শ করে পুনরায় আমাকে যেন স্পর্শ না করতে পারে তজ্জন্য ছিন্ন কাপড়ের আবরণ দিয়েছি। কারণ যে অকৃতজ্ঞ, অসৎ ব্যক্তি, প্রাণিহত্যা, চুরি, পরদারলঙ্ঘন, মিথ্যাকথন, মাদকদ্রব্য সেবন ইত্যাদি অপকর্ম করে তাঁকে দূর থেকে পরিত্যাগ করা উচিত।" এরূপ বলে তার চোর বন্ধুর ইতিবৃত্ত ব্যক্ত করল। দেবতা তার প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বীয় প্রভাবে সেই নগরের রাজ্যে অভিষিক্ত করালেন। সে যথাধর্ম রাজত্ব করে আয়ুশেষে কর্মানুযায়ী গতিপ্রাপ্ত হলো।

অসাধুর সাহচর্য ত্যাগ এবং সৎসঙ্গের সাহায্য গ্রহণ করলে সুখ ও শান্তি পাওয়া যায়।

২.৮ মরুত্ত ব্রাহ্মণ কথা

চন্দ্রাভাগা নামক গঙ্গাতীরে একটি গ্রাম ছিল, গ্রামের নাম হোমগ্রাম। সেই গ্রামে বাস করতেন মরুত্ত নামক এক ব্রাহ্মণ। একসময় তিনি বাণিজ্যকর্ম শেষে তক্ষশীলা[২১] থেকে প্রত্যাবর্তন করার পথে কোনো বিশ্রামাগারে একটি রোগাক্রান্ত কুকুরকে ঔষধের প্রলেপ দিয়ে সুস্থ করেন। কুকুর সুস্থ হয়ে ব্রাহ্মণের অনুগমন করে তার বাড়িতে বাস করতে লাগল। তখন ব্রাহ্মণী ছিল গর্ভবতী। কিন্তু যথাসময়ে সন্তান ভূমিষ্ঠ হবার সময় মাতৃগর্ভে আড়াআড়ি হয়ে মারা যায়। ফলে অস্ত্র দিয়ে কেটে কেটে মৃত সন্তানকে বের করতে হয়। এতে করে ব্রাহ্মণ কামে অনাসক্ত হয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অরণ্যে বাস করতে লাগলেন। তাঁর স্ত্রী অন্য পুরুষের সঙ্গে বাস করতে লাগল। ব্রাহ্মণের প্রতি ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য ব্রাহ্মণী তার প্রণয়ীর সঙ্গে মন্ত্রণা করল। কুকুর তাদের মন্ত্রণা শুনতে পেল। মন্ত্রণানুযায়ী প্রণয়ী তীর-ধনু নিয়ে অরণ্যে প্রবেশ করল, কুকুরও অনুসরণ করল। হত্যাকারীর অলক্ষ্যে কুকুর বারবার ধনুর গুণ কামড়ে ছিঁড়ে ফেলতে লাগল। অবশেষে ব্রাহ্মণ তাপস অরণ্যপথে আগমন লক্ষ্য করে ঐ ব্যক্তি তীর ধনু নিয়ে অগ্রসর হবার সময় কুকুর প্রথমে তার পায়ে কামড় দিয়ে মাটিতে ফেলে দিল, তারপর সর্বাঙ্গে কামড় দিয়ে ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল। এভাবে কৃতজ্ঞ কুকুর তার উপকারীর জীবন রক্ষা করেছিল।

তাপস এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে কুকুরকে স্বআশ্রমে নিয়ে যত্নসহকারে প্রতিপালন করতে লাগলেন এবং যথাসময়ে কালগত হলেন।

উপকারীর প্রত্যুপকার করা বাঞ্ছনীয়।

www.pathagar.com

২.৯ পানীয়দাতর কথা

জম্বুদ্বীপের কোনো জনপদবাসী একদা বিচরণ করতে করতে চন্দ্রভাগা নদীর তীরে উপনীত হয়ে অপর তীরে গমন করার জন্য একটি নৌকায় আরোহণ করেছিল। সেই নৌকায় অন্যান্য যাত্রীদের সঙ্গে একজন গর্ভবতী মহিলাও আরোহণ করেছিল। নৌকা মধ্যখানে পৌঁছলে গর্ভবতী মহিলার প্রসব বেদনা আরম্ভ হয়, সে কাতর হয়ে পানীয় জল প্রার্থনা করলে সেই জনপদবাসী তাকে জল দান করে, ফলে সে সুখে প্রসব করে। পর-তীরে পৌঁছেও সে তাকে সুস্থ করে তার গৃহে পৌঁছে দিয়ে জনপদে ঘুরে বেড়াতে লাগল। ঘুরাফিরা শেষে নগরদ্বারের একটি শালবৃক্ষের নিচে গিয়ে শুইয়ে রইল। দুর্ভাগ্যক্রমে সেদিন কতিপয় চোর রাজগৃহের[২২] লোকজনের গৃহে প্রবেশ করে ধন-সম্পত্তি চুরি করে নিয়ে যাবার সময় রাজকর্মচারীগণ পশ্চাদধাবন করলে তারা জিনিসপত্র বিশ্রামাগারে রেখে পালিয়ে যায়। রাজকর্মচারীগণ সেই জনপদবাসীকে চোর মনে করে রাজার হাতে সমর্পণ করল। সে রাজাকে বলল, "রাজন, আমি চোর নই, আমি আগন্তুক।" রাজা প্রকৃত চোরের সন্ধান না পেয়ে তাকেই চোর মনে করে হত্যার নির্দেশ দিলেন। রাজকর্মচারীরা তাকে দৃঢ়রূপে বেঁধে বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার পথে পূর্বোক্ত মহিলা দেখে বুঝতে পারল এবং ত্বরিত গতিতে রাজার নিকট গিয়ে বলল, "রাজন, এই ব্যক্তি অতি সজ্জন, চোর নয়, তাকে মুক্তি দিন।" অনন্তর সে আনুপূর্বিক বিষয় অবহিত করাল। রাজা তাকে মুক্তি দিলেন এবং উভয়কে প্রয়োজনীয় সম্পত্তি ও সম্মান দান করলেন।

এভাবে সৎ এবং উপকারী ব্যক্তি প্রত্যুপকার প্রাপ্ত হয়ে আসন্ন বিপদ হতে মুক্তি লাভে সক্ষম হন।

সজ্জন ব্যক্তি সর্বদা ধর্ম প্রতিপালন করেন।

২.১০ বন্ধুর জীবনদান কথা

শ্রাবস্তীতে সোমব্রাহ্মণ ও সোমদত্ত ব্রাহ্মণ নামে দুজন বন্ধু বাস করত। তারা উভয়ে দ্যূতক্রীড়া করত। একদিন ক্রীড়া করার সময় সোমদত্ত ব্রাহ্মণ সোমব্রাহ্মণকে পরাজিত করে তার উত্তরাসাটিক ও শীলমোহর নিয়ে ক্রীড়া শেষে একত্রে বাড়ি যাবার সময় সোমব্রাহ্মণ উত্তরাটিক ও শীলমোহর ব্যতীত বাড়ি যেতে চাইল না। সোমদত্ত উত্তরাসাটিক ও মোহর প্রত্যার্পণ করলে সোম বাড়ি গমন করল। এতে করে তাদের বন্ধুত্ব সুদৃঢ় হলো। পরবর্তী সময়ে সোমদত্ত ব্রাহ্মণ পরদার লঙ্ঘনজনিত অপরাধে ধৃত হয়ে রাজার নিকট আনীত হয়। রাজা তাকে পরদার লঙ্ঘন না করার জন্য উপদেশ দিয়ে ছেড়ে দেন। এভাবে তিনবার ছেড়ে দেওয়া হয়। চতুর্থবার ধৃত হলে রাজা সোমদত্তকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত করেন। রাজকর্মচারীরা তাকে বন্দি করে রাজাজ্ঞা প্রতিপালনের জন্য বধ্যভূমিতে নিয়ে যাবার সময় সোম ব্রাহ্মণ দেখতে পেল। সে ত্বরিত রাজকর্মচারীদের নিকট উপনীত হয়ে সে রাজার নিকট থেকে ফিরে না আসা পর্যন্ত অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে রাজার কাছে গিয়ে প্রণাম করে বলল, "প্রভু, সোমদত্তকে মুক্তি দিয়ে বিনিময়ে আমাকে হত্যা

করুন।" রাজা মৌনভাবে সম্পত্তি প্রদান করলে রাজকর্মচারীগণ সোমদত্তকে মুক্তি দিয়ে সোমব্রাহ্মণকে হত্যা করলো। জীবনদানের ফলে সে মৃত্যুর পর দেবলোকে দিব্যময় কনক বিমানে জন্মগ্রহণ করল। সোমদত্ত ব্রাহ্মণও তাঁর উদ্দেশ্যে বহুবিধ পুণ্য কর্ম সম্পাদন করল। সোম ব্রাহ্মণ দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে পূর্বস্মৃতি পর্যবেক্ষণ করে মনুষ্যরূপ ধারণ করে সোমদত্তের নিকট উপস্থিত হলেন এবং তাকে স্বীয় দৈব প্রভাবে সপ্তাহকাল দেব-ঐশ্বর্য প্রদর্শন ও উপভোগ করালেন। সপ্তাহকাল পরে স্বগৃহে এসে নিত্য দান দিয়ে শীল পালন করে পুণ্য কর্ম সম্পাদন করত আয়ুশেষে বন্ধু দেবপুত্রের নিকট জন্মগ্রহণ করল।

কৃতজ্ঞ ব্যক্তিরা উপকারীর জন্য জীবন পর্যন্ত দান করে প্রত্যুপকার করেন। তাই মিত্রদ্রোহী না হয়ে কল্যাণকামী হবে।

৩. যক্ষ বঞ্চিত বর্গ

৩.১ যক্ষ বঞ্চিত কথা

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর কোশল[২৩] রাজ্যের অন্তর্গত তুণ্ড গ্রামে বুদ্ধদাস নামে জনৈক বুদ্ধের শরণাপন্ন ব্যক্তি বাস করতেন। অন্য একটি গ্রামের জনৈক যক্ষাশ্রিত ব্যক্তি তুণ্ডগ্রামে এসে বুদ্ধদাসের বাড়িতে আশ্রয় নিয়েছিল। ঐ ব্যক্তির দেহে আশ্রিত যক্ষটি বুদ্ধদাসের শরণ গ্রহণজনিত পুণ্যের প্রভাবে তাঁর গৃহে প্রবেশ করতে না পেরে গ্রামের বহিঃদ্বারে তার আশ্রিত ব্যক্তির প্রত্যাগমনের প্রতীক্ষায় ছিল। সপ্তাহকাল পর সে স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করার জন্য গ্রামের বহিঃদ্বারে আসলে যক্ষ বলল, "তুমি এক সপ্তাহ যাবৎ কোথায় ছিলে? আমি যে ক্ষুধায় ক্লান্ত।" লোকটি বলল, "তুমি আমার সঙ্গে এ গৃহে যাওনি কেন?" যক্ষ উত্তর দিল, "এ গৃহে বুদ্ধের শরণাগত একজন উপাসক আছেন, তাঁর শীলগুণ প্রভাবে আমি যেতে পারি নি।" লোকটি যক্ষের কাছে জানতে পারল, শরণ কিভাবে গ্রহণ করতে হয়। তখন সে যক্ষকে বঞ্চিত করার মানসে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করল। সঙ্গে সঙ্গে যক্ষ ভীত হয়ে পলায়ন করল।

বুদ্ধের শরণাপন্ন ব্যক্তি সর্বত্র উপদ্রবহীন ও ভয়হীন হয়ে বাস করেন। সেই ব্যক্তি আজীবন শরণে প্রতিষ্ঠিত থেকে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেছিল।

সুখ ও সুগতি লাভের জন্য শীল পালন ও শরণ গ্রহণ কর।

৩.২ মিথ্যাদৃষ্টিক কথা

ভগবান বুদ্ধের পরিনর্বাণের পর রাজগৃহে একজন মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন ও একজন সম্যকদৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি বাস করত। তাদরে উভয়ের পুত্রদ্বয় খেলা করার সময় প্রথম বালক 'নমো ব্রাহ্মণ' এবং দ্বিতীয় বালক 'নমো বুদ্ধায়' বলে খেলত। খেলায় দ্বিতীয় বালক জয়ী হত। তার কাছ থেকে সে জানতে পারল যে, সে 'নমো বুদ্ধায়' বলে খেলা করে। তদবধি সেও 'নমো বুদ্ধায়' বলে খেলা করত এবং উভয় বালক সমান থাকত। একসময় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তি পুত্রসহ বনে কাঠ সংগ্রহ করে আসার সময় নগর দ্বারে শকটগুলো

www.pathagar.com

রেখে গরুগুলো তৃণক্ষেত্রে ছেড়ে দিল। কিছুক্ষণ পর পিতা গরু অন্বেষণ করতে গিয়ে নগর অভ্যন্তরে ঢুকে গেল। রাত অধিক হওয়ায় নগর দ্বার রুদ্ধ করে দেওয়া হলো, ফলে সে বের হতে পারল না। এদিকে বালকটি 'নমো বুদ্ধায়' বলে শকটের নিচে ঘুমিয়ে ছিল। সেই সময়ে দুটি যক্ষ বিচরণ শেষে আসার পথে সেই বালককে দেখতে পেল। যক্ষ দু'য়ের একটি ছিল সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন অন্যটি মিথ্যাদৃষ্টিসম্মন্ন। মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন যক্ষ বালকটিকে খেতে চাইল। সম্যকজন নিষেধ করল। শেষে খাওয়ার জন্য সে বালকের হাত ধরে টান দিলে বালক পূর্বরূপ 'নমো বুদ্ধায়' বলল। যক্ষ ভীত হয়ে হাত ছেড়ে দিয়ে তার শিয়রে দাঁড়িয়ে রইল। সম্যকদৃষ্টিসম্পন্ন যক্ষ বলল, "সে বুদ্ধের শরণগত, সে ক্ষুধার্ত, তাকে আহার্য দিয়ে তোমার প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত।" তখন সে যক্ষশক্তি দ্বারা অলক্ষ্যে রাজা বিম্বিসারের স্বর্ণপাত্রে রক্ষিত রসযুক্ত খাদ্য এনে বালককে খাওয়াল। থালার উপর এ বিষয় লিখে দিয়ে তারা চলে গেল। এদিকে রাত্রি প্রভাত হলে চোরের অন্বেষণ করতে গিয়ে শকটে বালক এবং থালা পেয়ে রাজার নিটক নীত হলে রাজা লেখা পাঠ করে বালকের গুণে মুগ্ধ হলেন এবং তাঁকে শ্রেষ্ঠীপদ দান করলেন।[২৪]

সবসময় বুদ্ধের গুণাবলী স্মরণ ও ত্রিশরণ গ্রহণ করবে, তাতে কোন প্রকার ভয় থাকবে না।

৩.৩ পাদপীঠ কথা

মহাবোধির দক্ষিণপার্শ্বে এক প্রত্যন্ত নগরে বাস করতেন জনৈক শ্রদ্ধাবান উপাসক, সে সময় এক ক্ষীণাসব ভগবানের ব্যবহৃত পাদপীঠ (Foot-stool) উপবিষ্ট অবস্থায় পা রাখার জন্য ছোট টুল বিশেষ থলের মধ্যে রেখে যেখানে যেতেন সেখানে পূজা করতেন। একসময় তিনি সেই নগরে উপনীত হলে উক্ত উপাসক তাঁকে সেখানে অবস্থান করার জন্য আমন্ত্রণ করে পর্ণশালা নির্মাণ করে দিয়েছিলেন। স্থবিরও ভগবানের পাদপীঠ সেখানে নিধান করে বালুকা দ্বারা স্তূপ তৈরি করে নিত্য পূজা করতেন। উপাসকের ঈশ্বরভক্ত একজন সঙ্গী ছিল, সে প্রতিদিন নিজ দেবতাকে নমস্কার করত। উপাসক তাকে মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করতে বললেন, কিন্তু সে ঈশ্বরের প্রতি এত বিশস্ত ছিল যে, সে তার সংস্কার ত্যাগ করতে পারল না, ববং ঈশ্বরের বিভিন্ন গুণের কথা উল্লেখ করল যেগুলো নির্গুণেরই নামান্তর। উপাসকও বুদ্ধের গুণাবলি বর্ণনা করলেন। এভাবে উভয়ের মধ্যে বির্তকের সৃষ্টি হলো। অবশেষে মীমাংসার জন্য রাজার নিকট উপস্থিত হলো। রাজা বললেন, উভয়ের উপাস্যের শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদনের জন্য প্রতিহার্য (অলৌকিক ঋদ্ধি) প্রদর্শন করতে। ঈশ্বরভক্ত তাঁর ঈশ্বরের মহানুভবতা প্রদর্শন করার জন্য মহাপূজার আয়োজন করল, কিন্তু কোন ফল হলো না।

উপাসকও ভগবান বুদ্ধের মহানুভবতা প্রদর্শন করবার জন্য বালুকাস্তূপে গিয়ে গন্ধ-মাল্য, দীপ-ধূপাদি দ্বারা পূজা করে সত্য ক্রিয়া করলেন, "আমি আজীবন বুদ্ধ-ধর্ম-সঙ্ঘের শরণাপন্ন- এ সত্য বাক্যের দ্বারা এই ধাতু প্রতিহার্য প্রদর্শন করুক।" এভাবে তিনি ভগবান

www.pathagar.com

বুদ্ধের নানা প্রকার গুণস্মরণ করে সত্যক্রিয়া করলেন। অতঃপর সেই সত্যক্রিয়ার প্রভাবে বালুকাস্তূপ দ্বিধা বিভক্ত হয়ে পাদপীঠ-ধাতু আকাশে উত্থিত হয়ে ষড়বিধ রশ্মি বিকিরণ করতে করতে স্থিত হলো। তথায় সমবেত মহাজনতা ধাতু পূজা করল। ঈশ্বরভক্তও মিথ্যাদৃষ্টি ত্যাগ করে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করল।

ক্ষীণাসব বুদ্ধের মহানুভবতা অচিন্তনীয়।

৩.৪ উত্তর শ্রামণের কথা

উত্তর শ্রামণের জন্ম জন্মান্তর বহু পুণ্য কর্ম সম্পাদন করে সুমেধ[২৫] সম্যক সম্বুদ্ধের সময় একজন ব্যক্তি হিসাবে খ্যাতি লাভ করে হিমালয়ে বাস করতেন। তিনি সুমেধবুদ্ধকে ত্রিবিধ স্বর্ণময় পুষ্প দ্বারা পূজা করে আয়ুশেষে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন। গৌতম বুদ্ধের সময় তিনি রাজগৃহে ব্রাহ্মণ মহাসালের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে বিদ্যা ও চরিত্রগুণে খ্যাতি অর্জন করেন। তখন তাঁর নাম হয় উত্তর। তখনকার মগধের মহাপাত্র বর্ষাকার নিজকন্যা উত্তরাকে সম্প্রদান করতে চাইলেন। কিন্তু উত্তর সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে সারিপুত্রের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে তাঁর সেবা করতেন। এক সময় তিনি অসুস্থ হলে ঔষধ অন্বেষণ করতে গিয়ে শ্রামণ এক হ্রদের সন্নিকটে উপনীত হয়ে পাত্রটি রেখে মুখ-হাত প্রক্ষালনের জন্য হ্রদে অবতরণ করেন। সেদিন এক চোর কোনো বাড়ি হতে চুরি করে পালাবার সময় রাজকর্মরাচীগণ তাকে অনুধাবন করলে সে ধাবিত হয়ে উক্ত শ্রামণের পাত্রে চুরি করা জিনিসগুলো রেখে পলায়নে করে। রক্ষীগণ সেখানে এসে পাত্রে জিনিসগুলো দেখে তাঁকে চোর মনে করে মহাপাত্র বর্ষাকারের কাছে নিয়ে যায়। তখন বর্ষাকার বিচারক। তিনি শ্রামণকে দেখে পূর্ব বিষয় স্মরণ করে তাঁর প্রতি ঈর্ষান্বিত হয়ে শূলে দেওয়ার জন্য আদেশ দেন।

শ্রামণকে শূলে দেওয়া হলে তাঁর উপাধ্যায় সারিপুত্রকে স্মরণ করলেন। সারিপুত্র দিব্যদৃষ্টিতে শ্রামণের এরূপ অবস্থা জ্ঞাত হয়ে বুদ্ধকে অবহিত করলেন। বুদ্ধ শ্রামণের অর্হত্ব প্রাপ্তির লক্ষণ জ্ঞাত হয়ে সশিষ্য তাঁর নিকট উপস্থিত হলেন। বুদ্ধ তাঁর মস্তকে হাত রেখে উপদেশ দিলেন এবং আদি-মধ্য-অন্ত কল্যাণকর ধর্ম ব্যাখ্যা করলেন। শাস্তার উপদেশ শেষে শ্রামণ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। তিনি শূল হতে উত্থিত হয়ে প্রতিহার্য ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। তাঁর ক্ষতস্থান সুস্থ হয়ে গেল। অবাক হলো সমাগত জনতা।[২৬] তিনি ভিক্ষুগণকেও বিদর্শন ভাবনায় রত হবার জন্য উপদেশ দিলেন, "যারা হীন তারা পাপকর্ম ত্যাগ করতে পারে না, অনিত্য সম্পর্কে জ্ঞাত ব্যক্তির পক্ষে বিন্দুমাত্র পাপও বর্জনযোগ্য।"

৩.৫ কাবীর পট্টন কথা

জম্বুদ্বীপের চোলরাজ্যে[২৭] কাবীর পট্টন নামক গ্রামে বহু মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন লোক বাস করত। তখন দেবলোকে ঈশ্বর কর্তৃক বুদ্ধকে বন্দনারত অবস্থায় একটি চিত্রকর্ম ছিল। বহু উপাসক সেখানে গমন করে এ চিত্রকর্মটি দেখে বললেন, ভগবান বুদ্ধ ত্রিজগতে শ্রেষ্ঠ,

www.pathagar.com

পর্বতের ন্যায় স্থির, সাগরের ন্যায় গম্ভীর, আকাশের ন্যায় অনন্ত এবং পৃথিবীর ন্যায় সহিষ্ণু। তিনি জগতের সকল প্রাণিগণের পূজ্য।" তারা বুদ্ধের শ্রেষ্ঠত্বের বিষয় রাজাকে অবহিত করল এবং বহু প্রকারে বুদ্ধের গুণাবলী প্রকাশ করল। রাজা সকলকে আহ্বান করে নিজ নিজ আরাধ্যদেবতার মহানুভবতা ব্যাখ্যা করতে বললেন। উপাসকেরা রাজাকে অনুরোধ করলেন যে, উক্ত চিত্রায়িত চিত্রকর্মটিকে যেন যথাযথভাবে সংরক্ষণ করা হয়। রাজা চিত্রকর্মটি যথাযথ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করলেন। উপাসকগণ সেখানে উপস্থিত হয়ে সপ্তাহ যাবৎ দান দিলেন, শীল পালন ও উপোসথশীল রক্ষা করলেন এবং সমস্ত প্রাণীর প্রতি মৈত্রী পোষণ করে কৃত পুণ্যানুমোদন করলেন। অতঃপর সত্যক্রিয়া করলেন যে, চতুর্লোকপাল[২৮] দেবতাসহ সমস্ত শক্তিশালী দেবগণ যেন সেই চিত্রকর্মটি রক্ষা করেন। তাঁদের পুণ্য প্রভাবে দেবরাজ ইন্দ্রের আসন তপ্ত হলো। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে মনুষ্যলোক পর্যবেক্ষণ করে দেখলেন ঈশ্বরভক্তগণ চিত্রকর্ম পরিবর্তনের চেষ্টায় রয়েছে, তিনি উদ্বিগ্ন হয়ে সেখানে গিয়ে ঈশ্বরকে ভগবান বুদ্ধের পাদতলে বন্দনারত অবস্থায় রেখে উপাসকদিগকে অবহিত করে প্রস্থান করলেন। উপাসকগণ রাজাকে এ বিষয় অবহিত করলে তিনি রাজ্যে ভেরি বাজিয়ে জনগণকে সন্নিবেশ করালেন এবং তাদের সম্মুখে রুদ্ধ দ্বার খুলে চিত্রকর্মের চাদর অনাবৃত করলেন, সকলে দেখতে পেল ঈশ্বর বুদ্ধের পাদতলে বন্দনারত অবস্থায় আছেন। এরূপ মহাপ্রতিহার্য দর্শন করে রাজা ও মহাজনতা বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করলেন। অতঃপর রাজা স্বরাজ্যে মহাবিহার নির্মাণ করে যাবজ্জীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে দেবলোকে উৎপন্ন হন।

বুদ্ধ ত্রিলোকে শ্রেষ্ঠ এবং সকল সত্ত্ব কর্তৃক পূজ্য।

৩.৬ চোর ঘাতক কথা

তখন ভগবান গৌতম বুদ্ধ শ্রাবস্তীর উপকণ্ঠে জেতবনে অবস্থান করে জনগণকে সদ্ধর্ম উপদেশ দিচ্ছিলেন। সে সময় পাঁচশ চোর রাত্রিবেলায় চৌর্যকর্ম করে জীবিকা নির্বাহ করত। এক রাতে সেই চোরগণ চুরি করার জন্য নগরে প্রবেশ করে এক দরিদ্র জনপদবাসীর সাক্ষাৎ পেল। তারা তাকে চৌর্যকর্ম করে সুখে জীবন নির্বাহ করার জন্য আহ্বান জানাল। সেও রাজী হয়ে তাদের সঙ্গে একত্রে চৌর্যকর্ম করে জীবিকার্জন করতে লাগল। একসময় তারা সকলে রাজকর্মচারীর হাতে ধৃত হয়ে রাজদরবারে নীত হলো। রাজা চোরদের বললেন, "যে তোমাদের মধ্যে অন্য সকল চোরকে হত্যা করতে পারবে তাকে জীবন দান করা হবে।" তাদের মধ্যে জনপদবাসী রাজার প্রস্তাবে রাজী হয়ে অন্য সকল চোরকে হত্যা করল। রাজা তুষ্ট হয়ে তাকে চোর-ঘাতক হিসেবে নিযুক্ত করলেন। সে তখন হতে পঁচিশ বছর পর্যন্ত চোর হত্যা করেছিল। সে বৃদ্ধ হওয়ার কারণে আর চোর হত্যা করতে না পারায় রাজা তাকে বিদায় দিয়ে অন্য লোক নিযুক্ত করলেন।

চোরঘাতক যে গ্রামে বাস করত সেখানে এক ব্যক্তি নাক-বায়ু নিক্ষেপ করে মানুষ মারার মন্ত্র জানত। সে তার নিকট গিয়ে সেই মন্ত্রটি শিক্ষা করে রাজার নিকট গিয়ে জানাল যে, সে নাক-বায়ু দ্বারা মানুষ মারতে পারে। রাজা পুনরায় তাকে চোরঘাতক-পদ

www.pathagar.com

প্রদান করলেন। এ পদেও পঁচিশ বছর কাজ করে অতিবৃদ্ধ হয়ে পড়ল এবং শয্যাশায়ী হয়ে দুর্বিসহ মরণ-যন্ত্রণা ভোগ করতে লাগল। তার বীভৎস আর্তনাদ শুনে পাশের লোকজনও অন্যত্র চলে যেতে লাগল। সেসময় একদিন সারিপুত্র দিব্যনেত্রে দেখতে পেলেন যে, "এই চোরঘাতকের নিকট যদি আমি উপস্থিত হই তাহলে সে নিশ্চিত নরক যন্ত্রণা হতে অব্যাহতি লাভ করে উর্ধ্বগতি প্রাপ্ত হবে।" তখন তিনি প্রত্যুষে পাত্রচীবর নিয়ে তার গৃহদ্বারে উপস্থিত হলেন। সে স্থবিরকে দেখে ক্রুদ্ধ হয়ে নাসিকা-বায়ু নিক্ষেপ করল, কিন্তু তাঁর কিঞ্চিৎমাত্র ক্ষতি করতে না পেরে তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে স্বীয়-পায়েস দান করল। স্থবির তার প্রতি করুণা বৃদ্ধি করে প্রস্থান করলেন। চোরঘাতক প্রদত্ত দানের বিষয় স্মরণ করে তৎক্ষণাৎ মৃত্যুবরণ করে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করল।

দান দুঃখ হতে ত্রাণ করে, দুর্গতি বন্ধ করে, দান ইহ-পর উভয়লোকে সুখ প্রদান করে। কাজেই শ্রদ্ধার সঙ্গে দান করা সমীচীন।

৩.৭ শ্রদ্ধোপাসক কথা

কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের সময় জনৈক শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি গুরের ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি সেই জন্মে একজন পীড়িত ভিক্ষুকে একচামচ ঘি ও গুরুপিণ্ড দান করেছিলেন ; এছাড়া এক সময় ধর্ম শ্রবণান্তে দেড়শ ভিক্ষুকে কাপড় দান এবং আরও বহুবিধ দান করে প্রার্থনা করেছিলেন, "আমি সেন ইচ্ছানুযায়ী বস্তু সামগ্রী প্রাপ্ত হই।" যথাসময়ে তাঁর মৃত্যু হলে তিনি স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন এবং গৌতম বুদ্ধের সময় স্বর্গ হতে চ্যুত হয়ে শ্রাবস্তীর এক ধনাঢ্য গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি একসময় বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অচিরে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন। পরবর্তীতে তিনি পাঁচশ ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে শাস্তাকে বন্দনা করে উগ্‌গনগরে পৌঁছলেন। তথায় শ্রেষ্ঠী ভার্যার প্রার্থনাক্রমে যথাভিরুচি অবস্থান করে পট্টন নগরে উপনীত হলেন। সেখানেও যথেচ্ছা অবস্থান করে উক্ত পাঁচশ ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ নৌকাযোগে সমুদ্র পাড়ি দিয়েছিলেন। পথিমধ্যে জনৈক ভিক্ষু উদরবায়ু দ্বারা আক্রান্ত হয়ে পড়েন। স্থবিরকে অবহিত করা হলে তিনি বললেন, "এ রোগের জন্য ঘি-এর প্রয়োজন, আমিই এর ব্যবস্থা করছি।" অতঃপর তিনি পাত্রটি জনৈক ভিক্ষুকে অর্পণ করলেন এবং সমুদ্র হতে জল আনতে বললেন। ভিক্ষু তাই করলেন, পাত্রস্থ জল ঘি-এ পরিণত হলো। সেই ঘি পান করিয়ে রুগ্ন ভিক্ষুকে সুস্থ করলেন। স্থবিরের এরূপ আশ্চার্যজনক পুণ্য-বিপাক দর্শন করে সমস্ত সঙ্ঘ অবাক হলেন। স্থবির তাঁর আরও পুণ্য-বিপাক প্রদর্শন করলেন, তাঁর ইচ্ছানুযায়ী সমুদ্র জল ঘিয়ে পরিণত হলো, পর্বতসমূহ গুরপিণ্ডে পরিণত হলো, সমস্ত দৃষ্টবস্তু অন্ন-ব্যঞ্জনে পরিণত হলো, হিমবন্ত সুবর্ণে পরিণত হলো। ভিক্ষুগণ স্থবিরের এরূপ প্রতিহার্য দর্শন করে তাঁর পূর্ব পুণ্যকাহিনী জানতে চাইলেন। স্থবির কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে দান দেওয়ার বিষয় ব্যক্ত করলেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘকে ধর্মদেশনা দ্বারা প্রসন্ন করলেন।

অপ্রমত্ত হয়ে শ্রদ্ধাচিত্তে স্বল্প পরিমিত দানও মহৎ ফল প্রসব করে।

www.pathagar.com

৩.৮ কপণ কথা

তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বারাণসী নগরে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি পরগৃহে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। সে সময়ে নগরবাসী প্রায় সময় মণ্ডপ তৈরি করে মহাদান দিতেন। তা দেখে তিনি চিন্তা করলেন যে, আমি পূর্বজন্মে পুণ্যকর্ম সম্পাদন করিনি বিধায় এজন্মে দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করেছি এবং অতিকষ্টে জীবিকা নির্বাহ করছি। এখন বুদ্ধ উৎপন্ন হয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সৃষ্টি করেছেন, আমার উচিত পরজন্মের সুখের জন্য ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দেওয়া।" অনন্তর তিনি তদবধি নির্ধারিত কাজ সমাপন করে বাড়তি কিছু কাজ করতে লাগলেন এবং সেই অর্থের বিনিময়ে চালের গুরা সংগ্রহ করে মণ্ডপ তৈরি করালেন। সেই মণ্ডপে ভিক্ষু-সঙ্ঘ নিমন্ত্রণ করে পায়েস দান করলেন।

মৃত্যুর সময় তিনি সেই পুণ্যকর্মের বিষয় স্মরণ করে মৃত্যুর পর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় দেবলোকে জন্মগ্রহণ করলেন। তাঁর কনকময় বিমান উৎপন্ন হলো। ত্রিগাবুত পরিমিত স্থানে দেবগণ নানাবিধ বাদ্য-যন্ত্রসহকারে তাঁর মনোরঞ্জনে রত থাকত, অপ্সরাগণ তাঁর সেবায় নিয়ত রত থাকত। তিনি এভাবে দেব ঐশ্বর্য উপভোগ করার সময় সুবর্ণসেল বিহারের মহাসঙ্ঘরক্ষিত স্থবির প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়ে দেবলোকে বিচরণ করার প্রাক্কালে দেখতে পেলেন। স্থবির তাঁর এবম্বিধ অনুপম দৈবৈশ্বর্য অবলোকন করে তাঁর পূর্বজন্মের কৃতকর্ম সম্পর্কে জানতে চাইলেন। দেবপুত্রও তাঁর পূর্বজন্মের কাহিনী ব্যক্ত করলেন। স্থবির মনুষ্যলোকে গিয়ে এই বিষয় জনগণকে অবহিত করলে অনেকে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন এবং মৃত্যুর পর স্বর্গপ্রাপ্ত হন।

সমস্ত লোভ ধ্বংস করে স্বর্গমোক্ষাদির প্রত্যাশায় দান করা উচিত।

৩.৯ দেবপুত্র কথা

পৃথিবীতে নারদ[২৯] সম্যকসম্বুদ্ধের উৎপত্তিকালে জম্বুদ্বীপে এক সময় দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। সে সময় নারদবুদ্ধের জনৈক শিষ্য ভিক্ষু অন্য গ্রামে ভিক্ষার জন্য গিয়েছিলেন। সে গ্রামে একটি দরিদ্র পরিবার তুণ্ডুলগুড়া মাত্র রান্না করে জীবন ধারণ করত। তারা স্থবিরকে দেখে সেই তণ্ডুল গুড়া রান্না করে দান করল। তাদের শ্রদ্ধা এত প্রবল ছিল যে, সেই ক্ষুদ্র পাত্র অন্নে পূর্ণ হলো, তারা বহুলোক নিমন্ত্রণ করে ভোজন করাল। তারা আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হলো।

সেই স্থবির অন্নগ্রহণ করে নির্জনে এক বৃক্ষমূলে উপবেশন করে আহার করতে লাগলেন। সেই বৃক্ষে ছিল এক দেবতা। সে ছিল বহুদিনের উপোস ও ক্লান্ত। স্থবিরকে আহাররত দেখে এক দরিদ্রের বেশ ধারণ করে স্থবিরের সামনে এসে দাঁড়াল এবং কেঁসে স্বীয় আগমন সংকেত জানাল। স্থবিরের পাত্রে ছিল শেষ গ্রাসটি মাত্র। তিনি শেষ গ্রাসটি দেবপুত্রকে প্রদান করলেন। দেবপুত্র তা নিয়ে চিন্তা করতে লাগলেন, "পূর্বজন্মে আমি কিঞ্চিৎ পরিমাণও দান করি নি বিধায় এই জন্মে আমি দেবতা হয়েও খাদ্যাভাবে কষ্ট

পাচ্ছি। আমি এই অন্ন-গ্রাস স্থবিরকে দান করব, এতে আমার পরম সুখের হেতু হবে।" এরূপ চিন্তা করে স্থবিরের পাত্রে অন্ন-গ্রাসটি দান করে প্রার্থনা করলেন, "আমি যেন পরজন্মে প্রভূত লাভ-সৎকারের ভাগী হই।" পাত্রে অন্ন-পিণ্ড দান করার সঙ্গে সঙ্গে ত্রিগাবুত পরিমিত স্থান দিব্যময় অন্নপাত্রে পরিণত হলো। দেবপুত্র দিব্য অন্ন প্রথমে স্থবিরকে দান দিয়ে পরে নিজে আহার করলেন। পরবর্তীতে সেই অন্ন বহু ভিক্ষু-সঙ্ঘ ও জনসাধরণকে দান দিয়ে যথাসময়ে আয়ুক্ষয়ে চ্যুত হয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হন। দেবলোকে প্রভূত দিব্য-সম্পত্তি উপভোগ করে পদুমুত্তর বুদ্ধের সময়ে মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন এক কুটুম্বিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। বয়ঃপ্রাপ্তির পর তাঁর মাতা-পিতার মৃত্যু হলে তিনি সমস্ত ধন-সম্পত্তি দান করে ঋষি প্রব্রজ্যা অবলম্বন করত ধ্যানরত হলেন এবং পঞ্চ-অভিজ্ঞা[৩০] ও অষ্টমসাপত্তি[৩১] প্রাপ্ত হলেন। একদা হংসবতী নগরীর উপর দিয়ে আকাশ-মার্গে গমন কালে বহু জনতাসহ ভগবান পদুমুত্তর বুদ্ধকে ধর্মদেশনা করতে দেখে তিনি অবতরণ করত ধর্ম শ্রবণ ও বুদ্ধকে বন্দনা করেন। অতঃপর তাঁর আশ্রমে প্রত্যাবর্তন করে যথাসময়ে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন। তিনি তাবতিংস দেবলোকে ত্রিশকল্প দিব্য-সুখ অনুভব করেন, একান্নবার দেবরাজ হয়ে দেবরাজ্য শাসন করেন এবং একুশবার চক্রবর্তী রাজা হয়ে মনুষ্য-সম্পত্তি উপভোগ করেন। সবশেষে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর শ্রাবস্তীর এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। সপ্তবর্ষ বয়সে জনৈক ভিক্ষুর নিকট ধর্ম শ্রবণ করে তিনি অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হন। তিনি প্রতিসম্ভিদা প্রাপ্ত হয়ে স্বীয় পুণ্যকর্ম অবলোকন করে তাঁর অনুগামীদের মাঝে পূর্বানুরূপ কথিত বিষয় ব্যক্ত করেছিলেন। তাঁর পূর্ব জন্মকাহিনী শ্রবণ করে অনেকে পুণ্যকর্মে অভিরমিত হলেন।

দানের দ্বারা ত্রিবিধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৩.১০ সীবলী স্থবির কথা

বহুকল্প পূর্বে পৃথিবীতে পদুমুত্তর শাস্তা উৎপন্ন হয়ে একদা হংসবতী নগরীতে[৩২] সমবেত ভিক্ষু-সঙ্ঘদের মধ্য হতে একজন ভিক্ষুকে লাভীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেছিলেন। সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন সপরিষদ সে রাজ্যের রাজা। তিনি এটা অবলোকন করে সেই স্থান প্রাপ্তির কামনায় বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিয়েছিলেন। তথাগত পদুমুত্তর আশীর্বাদ করে বললেন, "ভবিষ্যতে গৌতম বুদ্ধের সময়ে তুমি সেই স্থান প্রাপ্ত হবে।" অতঃপর তিনি জন্মান্তর পরিভ্রমণ করে বিপস্সী বুদ্ধের সময় বন্ধুমতী নগরে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সে সময় সেনুগুপ্ত নামক স্থানে রাজকর্ম সাধন করতেন। একদা নগরবাসী বিপস্সী বুদ্ধকে নিমন্ত্রণ করে ভিক্ষুসঙ্ঘের জন্য পরিবেণ নির্মাণ করত মহাদানের ব্যবস্থা করেন। কিন্তু দানীয় সামগ্রীর মধ্যে দধি ও মধু সংগৃহীত না হওয়ায় সহস্র মুদ্রা দিয়ে তা সংগ্রহের জন্য লোক প্রেরণ করলেন। তাঁরা দধি-মধু অন্বেষণ করতে গিয়ে পথিমধ্যে উক্ত রাজকর্মচারীর সাক্ষাৎ প্রাপ্ত হন, তখন তাঁর হাতে ছিল দধি ও মধু। তাঁরা সহস্র অর্থের বিনিময়ে উক্ত দধি-মধু ক্রয় করতে চাইলে তিনি এর কারণ জিজ্ঞেস

করলেন। তাঁরা বুদ্ধের কথা বললে তিনি নিজ হাতে দান দেওয়ার ইচ্ছায় সেখানে গমন করে পরম শ্রদ্ধাসহকারে উক্ত দধি-মধু বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করলেন। সেই দানের প্রভাবে তিনি তখন হতে দেব-মনুষ্য সম্পত্তি উপভোগ করে আমাদের গৌতম বুদ্ধের সময়ে লিচ্ছবি রাজ্যে সুপ্রভার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করেন। তিনি সাত বছর সাত মাস মাতৃগর্ভে বাস করে সাতদিন অসীম যন্ত্রণা ভোগের পর মাতৃগর্ভ হতে নির্গত হন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় সীবলীকুমার। সবীলীকুমার কোনো এক জন্মে রাজা হয়েছিলেন। তিনি সেই জন্মে শ্রক্রদের জব্দ করার জন্য মাতার সঙ্গে মন্ত্রণা করে শক্রদিগকে নগরে প্রবেশ করিয়ে দ্বার রুদ্ধ করে অমানুষিক কষ্ট দিয়েছিলেন এবং সপ্তম দিন পর দ্বার উন্মুক্ত করে দিয়েছিলেন। সেই পাপ-কর্মের ফলে তাঁকে এবং মাতা সুপ্রভাকে অবর্ণনীয় র্গভ-যন্ত্রণা ভোগ করতে হয়েছিল।

সীবলীকুমার সপ্তম বর্ষ বয়সে সারিপুত্র স্থবিরের নিকট প্রব্রজিত হন। তিনি মস্তক মুণ্ডন করার সময় অর্হত্ত্বফল লাভ করেন। তিনি যেখানে যেতেন প্রভূত লাভ-সৎকার প্রাপ্ত হতেন। কথিত আছে- একদা বুদ্ধ সীবলীস্থবির ও অন্যান্য ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ ত্রিশ যোজন বিস্তৃত বিপদ সঙ্কুল পথ অতিক্রম করার সময় সীবলীস্থবিরকে অগ্রভাগে রেখে যাত্রা করায় প্রভূত অন্নপানীয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন। ভগবান বুদ্ধ জেতবনে প্রত্যাবর্তন করে সীবলীস্থবিরকে লাভীগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান প্রদান করেন।[৩৩]

ভব-বিমুক্তির জন্য পুণ্যময় কর্ম অনুশীলন কর।

৪. মহাসেন বর্গ

৪.১ মহাসেন রাজার কথা

তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর পাটলিপুত্র নগরে মহাসেন[৩৪] নামক জনৈক রাজা ধর্মত রাজ্য শাসন করতেন। তাঁর পূর্ব পুরুষগণ দানাদি পুণ্যকর্মে বিরত থেকে বহু ধন-সম্পত্তি রেখে গিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন অতীব ধর্মপরায়ণ। প্রতিদিন তাঁর প্রাসাদে দশ সহস্র ভিক্ষুকে অন্ন-পানীয় দান করা হত। একদা তিনি নিজের কষ্টে অর্জিত ধন বা বস্তু দান করার মনস্থির করলেন। অনন্তর রাজ্যভার অমাত্যদের উপর ন্যস্ত করে তাঁর অনুজসহ একদিন রাজপ্রাসাদ হতে বর্হিগত হয়ে উত্তরমধুর নামে গ্রামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির কাছে চাকরি গ্রহণ করলেন।

তাঁরা তিন বছর শ্রেষ্ঠীর বাড়িতে কাজ করার পর শ্রেষ্ঠীকে তাঁদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন যে, তাদের কিছু উত্তম সালিধানের প্রয়োজন। শ্রেষ্ঠী এক সহস্র সকটপূর্ণ সালি ধান পাটলিুপত্রে পাঠিয়ে দিলেন। মহাসেন রাজা স্বহস্তে ধান ভেঙ্গে চাল এবং চাল ভেঙ্গে গুড়া করলেন। সেই গুড়া চাল দিয়ে অম্লভাত তৈরি করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহ্বান করলেন। পাঁচশ ভিক্ষু আকাশ মার্গে এসে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলে রাজা স্বহস্তে পরিপূর্ণ তৃপ্তিসহকারে আহার করালেন। তন্মধ্যে মহাসীব স্থবির নামে এক অর্হৎ সকলের দৃশ্যমান হয়ে আকাশ পথে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে[৩৫] গিয়ে পাঁচশ ভিক্ষুকে সেই আহার্য দান করলেন। তাঁর

www.pathagar.com

অলৌকিক প্রভাবে সকল ভিক্ষু পরিতৃপ্ত ও পরিপূর্ণভাবে আহার করেছিলেন। রাজা তাঁর অনুজসহ এ দৃশ্য দেখে অতীব আনন্দিত হলেন। পরবর্তী সময়ে তাঁরা উভয়ে দানের কথা স্মরণ করে স্রোতাপত্তি[৩৬] মার্গ ফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

সৎভাবে উপার্জিত বস্তু বা আহার্য স্বহস্তে সুপাত্রে দান করবে, এতে মহাফল লাভ হয়।

৪.২ সুবর্ণতিলক কথা

লঙ্কাদ্বীপের অনুরাধপুর[৩৭] নগরে এক মহিলা প্রতিদিন অভয়ুত্তর চৈত্যে পুষ্পপূজা করতেন। একদা তিনি কন্যাসহ পুষ্পপজা করতে গিয়েছিলেন। মহিলা কন্যার হাতে পুষ্পরাশি রেখে ঘট নিয়ে পুকুরে গেলে কন্যা অধৌত আসনে পুষ্পপূজা করে প্রার্থনা করলেন, "এই পুষ্পপূজার প্রভাবে আমি যেন পৃথিবীতে অনিন্দ্যসুন্দরীরূপে জন্মগ্রহণ করি, আমার বাক্য যেন সুমধুর হয়, সমস্ত পুরুষ যেন আমার প্রতি আসক্ত হয়।" মহিলা জল নিয়ে এসে কন্যাকে পূজা করতে দেখে 'চণ্ডালিনী' বলে গালি দিলেন। কন্যাও মাতাকে 'চণ্ডালিনী' বলে প্রতিগালি দিল। অনন্তর যথাকালে কন্যার মৃত্যুর পর জম্বুদ্বীপের উত্তর মধুর নামক স্থানে জনৈক চণ্ডাল যাদুকরের কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করল। বয়ঃক্রমে সে উত্তম রূপবতী হলো, তাঁর দেহ হতে আলো বের হত, পুরুষেরা দেখে মুদ্ধ হয়ে যেত। তার কপালে সুবর্ণবর্ণের একটি তিলক ছিল, তাই তার নাম রাখা হলো সুবর্ণতিলকা।

সুবর্ণতিলকার রূপে মুগ্ধ হয়ে বহু যুবক পাণি গ্রহণ করতে চাইলেও যখন জানত যে, সে চণ্ডালকন্যা, তখন কেউ জাতকলঙ্কের ভয়ে বিয়ে করত না। অবশেষে জ্যৈষ্ঠ চণ্ডালপু[illegible] তার পাণি গ্রহণে আগ্রহী হলো, কিন্তু সুবর্ণতিলকা রাজী হলো না। অবশেষে পঞ্চমধুর নগরের উচ্চবংশীয় উড্ডাল ব্রাহ্মণ নামে এক যুবকের সাথে তার বিয়ে হলো। উড্ডাল ব্রাহ্মণ ছিল পাঁচশ জন শিক্ষার্থীর শিক্ষক। বিয়ের পর হতে সে সুবর্ণতিলকার প্রতি এমন কামাসক্ত হয়েছিল যে, আর শিক্ষার্থীদের শিক্ষা দেবার জন্য আসত না। শিক্ষার্থীরা সুবর্ণতিলকার প্রতি রুষ্ট হয়ে উঠল। তারা সকলে যুক্তি করে রাজাঙ্গনে প্রথমে উড্ডাল ব্রাহ্মণকে আনয়ন করল, পরে সুবর্ণতিলকাকে আনয়ন করল। পরদিন লোক নিয়োগ করে সুবর্ণতিলকাকে হত্যা করল। ব্রাহ্মণও স্ত্রী বিয়োগে শোকাহত হয়ে আত্মহত্যা করল।

মায়া মরীচিকাময়, ইহা মৃত্যু পর্যন্ত ঘটায়।

৪.৩ দরিদ্র কথা

ভগবান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর বহু ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকা মহাবোধিকে বন্দনা করার জন্য গমন করতেন। একদিন কতিপয় ভিক্ষু মহাবোধিকে বন্দনার্থে যাবার সময় পথিমধ্যে একটি গ্রামে ভিক্ষাচরণ করে আসনশালায় (A hall with sitting accomodation) গিয়ে আহারান্তে বিশ্রাম করছিলেন। সেই সময় এক দরিদ্র-দুঃস্থ মহিলা উক্ত ভিক্ষুদিগকে দেখে তথায় উপস্থিত হয়ে বন্দনাতে জিজ্ঞেস করলেন, "ভন্তে, আপনারা কোথায় গমন করছেন?" ভিক্ষুগণ বললেন, "যে বৃক্ষের নিচে উপবিষ্ট হয়ে বুদ্ধ সসৈন্য

www.pathagar.com

মারকে পরাজিত করে বোধিজ্ঞান লাভ করেছিলেন, যার পাদতলে দাঁড়িয়ে সপ্ত দিবা-রাত্রি সকৃতজ্ঞ নয়নে দর্শন করেছিলেন, সেই সর্বজন পূজ্য জয়বোধিকে বন্দনা করার জন্য যাচ্ছি।" মহিলা অতীব খুশী হয়ে বললেন, "আমি অতি দীন, আমার এমন কিছু নেই যদ্বারা মহাবোধিকে পূজা করি। আমার এই চাদরখানা বোধিবৃক্ষের উপরে ধ্বজা করে দেবেন।" এরূপ বলে চারদরখানা ধৌত করে ভিক্ষুদিগকে দিলেন। তিনি চাদরখানা দান করে প্রীতিফুল্ল অন্তরে প্রত্যাবর্তন করে সেই রাত্রেই অকস্মাৎ রোগাক্রান্ত হয়ে মৃত্যুমুখে পতিত হন। মৃত্যুর পর তিনি ভিক্ষুগণের গমনের পথে এক রমণীর বনে ভূমিদেবতা হয়ে জন্মগ্রহণ করেন। পুণ্যপ্রভাবে তাঁর তিন যোজন পরিমিত সুরম্য বিমান, বিমানে বিচিত্র ধ্বজা-পতাকা ও দেবদেবী উদ্ভব হয়েছিল। ভিক্ষুগণ দ্বিতীয় দিন সায়াহ্নকালে সেই বনে উপনীত হয়ে রাত্রি যাপন করার জন্য বাসস্থান গ্রহণ করেছিলেন। রাত্রিকালে বিমানাদি দেবৈশ্বর্য দেখে দেবকন্যাকে জিজ্ঞেস করলেন, "এসব কোন কর্মের প্রভাবে উৎপন্ন হয়েছে।" দেবকন্যা পূর্বদিনের সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করলেন। ভিক্ষুগণ দেবকন্যার কথা শুনে আশ্চর্যান্বিত হলেন। দেবকন্যা ভিক্ষুদিগকে দিব্য খাদ্যভোজ্য দ্বারা স্বহস্তে আহার করালেন। দেবকন্যা সেই জন্মেও নানাপ্রকার দিব্য বস্ত্রাদি দান করে যথাসময়ে চ্যুত হয়ে তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

দরিদ্র হলেও শ্রদ্ধাসহকারে দান করলে দিব্য সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৪.৪ ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির কথা

তথাগত বুদ্ধের পরনির্বাণের পর জম্বুদ্বীপের পাটলিপুত্র নগরে অশোক নামে এক মহাঋদ্ধিসম্পন্ন চক্রবর্তী রাজা রাজত্ব করতেন। সমগ্র জম্বুদ্বীপে ঊর্ধ্ব-নিম্নদিকে যোজন পরিমিত স্থানের অধিবাসী ও চুরাশি সহস্র রাজা তাঁর আজ্ঞাবহ ছিল। একসময় দেবপুত্র নগরের দেবপুত্র রাজা সম্রাট অশোকের সেবায় আগমন করলে তাঁর রাজ্যে কোন বহুশ্রুত গুণবান ব্যক্তি আছেন কিনা জানতে চাইলেন। দেবপুত্র জানালেন যে, তাঁর রাজ্যে বহু সহস্র ভিক্ষু বাস করেন, তন্মধ্যে ইন্দ্রগুপ্ত নামে একজন বহুশ্রুত, শীলবান ও ত্রিপিটকধর মহাজ্ঞানী রয়েছেন। অশোক ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরকে দেখার ইচ্ছা প্রকাশ করলে দেবপুত্র গিয়ে স্থবিরকে অবহিত করলেন, স্থবির সম্মতিদান করলে সম্রাট অশোক অত্যন্ত আনন্দিত হয়ে নির্দেশ দিলেন যেন দেবপুত্র নগর হতে পাটলিপুত্র নগর অবধি পঞ্চান্ন যোজন রাস্তা সমতল করে তোরণ, ধ্বজা, ফুল, কদলিবৃক্ষ ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত করা হয়। সমগ্র নগর অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হলো, যোলজন যক্ষ অশোক কর্তৃক নির্দেশিত হয়ে গঙ্গা নদীতে চন্দন কাষ্ঠ দিয়ে সেতু নির্মাণ করল। রাস্তা ও নগর সজ্জিত হলে স্থবিরকে আনয়নের জন্য দূত প্রেরণ করা হলো। ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির ষাট হাজার ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে পাটলিপুত্র নগরে যাত্রা করলেন। পথিমধ্যে বহুবিধ পূজা ও সম্মান প্রাপ্ত হলেন, ক্রমান্বয়ে গঙ্গার সেতু সমীপে উপনীত হয়ে উত্তম পূজার আয়োজন দেখে ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির ভাবলেন, "এরূপ উত্তম পূজা আমার জন্যই আয়োজন করা হয়েছে।" এক ক্ষীণাসব ভিক্ষু তাঁর চিত্তবিতর্ক জ্ঞাত হয়ে

www.pathagar.com

তাঁকে বন্দনা করে বললেন, "ভন্তে, আপনি অহংকার ত্যাগ করুন, অহংকার তৃষ্ণার জন্ম দেয়, তৃষ্ণা জন্মান্তর ঘটায়, অহংকার ত্যাগের মাধ্যমে অমৃতময় নির্বাণপ্রাপ্ত হওয়া যায়।" উপদেশ শুনে ইন্দ্রগুপ্ত স্থবিরের সম্বিৎ ফিরে এল। তিনি তথায় স্থির হয়ে কায়িক অনুধ্যানের মাধ্যমে প্রতিসম্ভিদাসহ[৩৮] অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। ধর্মাশোক মহাবিহার নির্মাণ করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে চর্তুপ্রত্যয়াদি[৩৯] দ্বারা পূজা করলেন। স্থবির অর্থকথাসহ ত্রিপিটক দেশনা করে সেখানে অবস্থান করত যথাসময়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

অহংকার ত্যাগ ও তৃষ্ণাক্ষয়ের মাধ্যমে চিরশান্তি নির্বাণ লাভ সম্ভব।

৪.৫ শাখমাল-পূজিকার কথা

গৌতম বুদ্ধ দশ-পারমী[৪০] পরিপূরণের পর তুষিত স্বর্গ[৪১] হতে শাক্য-কুলে জন্ম গ্রহণ করে সম্বোধি প্রাপ্তির পর পঁয়তাল্লিশ বছর ধরে অমৃতময় নির্বাণমুখী ধর্ম প্রচার করে কুশীনারার মল্লদের যমক-শালবৃক্ষের তলে অনুপাদিশেষ নির্বাণ লাভ করলে মল্ল ও কুশীনারাবাসী বুদ্ধের প্রতি মহাপূজা ও গৌরব প্রদর্শন করে মল্লদের মুকুটবন্ধন চৈত্যের সকাশে রাজচক্রবর্তীর ন্যায় মহাসম্মানের সাথে তাঁর শবদাহ কার্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করেছিলেন। সর্বপ্রকারের সুগন্ধ দ্রব্যাদি দ্বারা চিতা সজ্জিত করে বুদ্ধের দেহ চিতার উপর স্থাপনের পর মহাকশ্যপস্থবির বুদ্ধের পাদতলে শির রেখে বন্দনা করার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র চিতা একসঙ্গে প্রজ্বলিত হয়েছিল। দেহ জ্বলে জুঁইফুলের মত ধাতু অবশিষ্ট ছিল মাত্র। সেই সময়ে কোশল রাজ্যের জনৈক মহিলা শাস্তার শ্মশানে ধাতু-শরীরে তিনটি শাখা- পুষ্প দিয়ে পূজা ও বন্দনা করে গৃহে প্রত্যাগমন করার পর ব্যাধি দ্বারা আক্রান্ত হয়ে রাত্রির মধ্যম-যামে মৃত্যুবরণ করেন এবং ধাতু পূজার প্রভাবে সর্ব ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ তাবতিংস স্বর্গে উৎপন্ন হন। তাবতিংস স্বর্গে বিপুল ভোগৈশ্বর্য দেখে তিনি পূর্ব জন্মার্জিত পুণ্যকর্মের বিষয় অবলোকন করে তিনটি মাত্র শাখাপুষ্প দ্বারা ধাতু পূজার বিষয় দেখতে পেলেন। তিনি পুনরায় মহাচক্র পরিমাণ শাখাপুষ্প নিয়ে বুদ্ধের ধাতু পূজা করতে গেলেন। সেখানে জনগণ তাঁর রূপসম্পদ ও বৃহৎ শাখা পুষ্প দেখে তাঁর বাসস্থান ও শাখাপুষ্প সম্পর্কে জানতে চাইলে তিনি অতীত জীবনের আনুপূর্বিক ঘটনা ব্যক্ত করলেন। অনন্তর দেবী পুষ্প দ্বারা ধাতু পূজা করে লোকগণ কর্তৃক দৃশ্যমান হয়ে দেবলোকে প্রত্যাগমন করলেন।

স্বর্গসুখ ইচ্ছা করলে উত্তম পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর।

৪.৬ মোরিয় ব্রাহ্মণ কথা

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর মগধরাজ্যের[৪২] মচল গ্রামে মোরিয় নামক জনৈক শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্রাহ্মণ বাস করতেন। তাঁর স্ত্রী সেনাও ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীলা। তাঁরা উভয়ে শীলাদি পালন করতেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দানাদি দিতেন। অনন্তর তাঁদের সম্পত্তি পরিক্ষীণ হয়ে আসল। তখন ব্রাহ্মণ বনে গিয়ে ফলমূলাদি সংগ্রহ করে বিক্রি করতেন এবং সেই অর্থ দিয়ে দানকার্য সম্পাদন করতেন।

www.pathagar.com

একদিন ব্রাহ্মণ বনে গিয়ে ফল-মূল সংগ্রহ করে গৃহে প্রত্যাবর্তনের সময় পথিমধ্যে স্বচ্ছ সলিলা একটি নদী দেখতে পেয়ে ফলের পাত্রটি নদীর তীরে রেখে স্নান করার জন্য নামলেন। নদীর তীরে একটি বৃক্ষে বসবাসরত এক দেবতা দিব্যনেত্রে ব্রাহ্মণের অবস্থা অবলোকন করতে গিয়ে তাঁর দীনতার বিষয় অবগত হলেন। তিনি অধিষ্ঠান করলেন যেন পাত্রস্থ ফলমূল স্বর্ণে পরিণত হয়। সঙ্গে সঙ্গে দৈব প্রভাবে ফলমূলসমূহ সুবর্ণে পরিণত হলো। অতঃপর দেবতা স্বর্ণস্তূপের উপরভাগে একটি সর্বকামদ মহামণিরত্ন রেখে অন্তরীক্ষে সরে দাঁড়ালেন। ব্রাহ্মণ স্নানান্তে পাত্রস্থ মণিরত্ন দেখে স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। তখন দেবপুত্র দৃশ্যমানদেহে বললেন, "ব্রাহ্মণ, ভয় পাবেন না, এসব আপনার জন্য তৈরি করেছি, নিয়ে যান।" ব্রাহ্মণ অঞ্জলিবদ্ধ হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "দেব, এই মণিরত্ন কি কারণে আমাকে দিচ্ছেন ? দয়া করে বলুন।" দেবপুত্র বললেন, "আমি কাকেও কিছুমাত্র দিতে পারি না, ইহা আপনার পূর্বজন্মকৃত ফল। আপনি কশ্যপ সম্বুদ্ধের সময় এক বস্ত্রহীন প্রব্রজিতকে এক জোড়া চীবর দান দিয়েছিলেন। সেই অমোঘপুণ্যপ্রভাবে বর্তমানে আপনার জন্য এগুলো উৎপন্ন হয়েছে। এই সম্পত্তি আপনি যথেচ্ছ ব্যবহার করতে পারবেন। এই সর্বকামদ মণি হতে আপনি ইপ্সিত বস্তু লাভে সক্ষম হবেন।"

ব্রাহ্মণ উক্ত মণিরত্নাদি দ্বারা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিয়ে আজীবন শীলপালন করে যথাসময়ে মৃত্যুর পর স্বর্গলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

দানে কখনও প্রমাদগ্রস্ত হবে না।

৪.৭ পুত্র কথা

এক সময় লঙ্কাদ্বীপবাসী ষাটজন ভিক্ষু জয়মহাবোধিকে বন্দনা করার জন্য জম্বুদ্বীপে পাটলিপুত্র নগরে উপনীত হয়েছিলেন। তখন জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে শ্রদ্ধাসম্পন্ন হয়ে দান দিতে চাইলেন। কিন্তু তাঁর বাড়িতে দান দেবার মত কিছুই ছিল না। স্ত্রীসহ পরামর্শ করলেন, আমাদের পুত্রকে যদি মেরে ফেলি তাহলে আত্মীয়-স্বজন, বন্ধুবান্ধব তাকে দেখতে এসে দান করবে, আমরা তা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দেব।" অতএব পুত্রকে মেরে ফেলার জন্য সিদ্ধান্ত নিয়ে প্রথমে মাতা চেষ্টা করলেন, কিন্তু পুত্রস্নেহ বশত হত্যা করতে পারলেন না। পরে পিতাও চেষ্টা করলেন, তিনি ও পুত্রস্নেহের কারণে সক্ষম হলেন না। অতঃপর উভয়ে পরামর্শ করে স্থির করলেন যে, "বাড়ির পিছনে বল্মীকে এক বিষধর সর্প রয়েছে, পুত্রকে সেখানে প্রেরণ করবে।" সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পুত্রকে একটি বল দিয়ে বাড়ির পিছনে খেলা করতে বললেন। পুত্র বলটি নিয়ে খেলা করার সময় হঠাৎ গর্তের মধ্যে পতিত হলো। বালক বল নেওয়ার জন্য গর্তে হাত দিতেই বিষধর সর্পটি শোঁ শোঁ শব্দ করে ফণা তুলে গর্ত হতে বের হলো। কুমার কিছুই না বুঝে সার্পের গ্রীবা শক্ত করে ধরল। মাতাপিতার শ্রদ্ধাবলে নাগরাজ কুমারের হাতে অষ্টবিধ ইচ্ছাদায়ক একখণ্ড মণিরত্ন প্রদান করল। মাতাপিতা এ দৃশ্য দেখে তড়িৎ গিয়ে পুত্রসহ মণিরত্ন গৃহে এনে রত্নটি

www.pathagar.com

সজ্জিত আসনে রেখে যথা ইচ্ছা প্রার্থনা করলেন। তাঁরা তদবধি বহু দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিলেন।

দান ব্যতীত কেউ সমৃদ্ধশালী হতে পারে না।

৪.৮ মধুবণিক তিন ভ্রাতার কথা

বারাণসীতে তিন ভ্রাতা মধু ব্যবসা করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। এক ভ্রাতা প্রত্যন্ত অঞ্চল থেকে মধু সংগ্রহ করতেন। এক ভ্রাতা নগরে আনয়ন করতেন, অপর ভ্রাতা বারাণসীতে মধু বিক্রয় করতেন। সেই সময়ে গন্ধমাদন পর্বতে অবস্থানরত জনৈক প্রত্যেক বুদ্ধ ক্ষতরোগে আক্রান্ত হয়ে মধু সংগ্রহ করার জন্য বারাণসীতে আগমন করেছিলেন। তখন এক দরিদ্র বালিকা কলসি নিয়ে জল আনতে গেলে প্রত্যেক বুদ্ধকে দেখে মধু বিক্রেতার দোকান দেখিয়ে দিল। বুদ্ধ বিক্রেতার নিকট মধু যাচনা করলে তিনি পাত্রপূর্ণ করে মধু দান করলেন এবং প্রার্থনা করলেন যেন ভবিষ্যতে তিনি একচ্ছত্র অধিপতি হয়ে আকাশ পাতাল যোজন পরিমিত স্থান শাসন করতে পারেন। প্রত্যেক বুদ্ধ আশীর্বাদ করে প্রস্থান করার সময় উক্ত বালিকা স্বীয় পরিধেয় জীর্ণ বস্ত্রখানি ধৌত করে বুদ্ধকে দান করে প্রার্থনা করল, যেন ভবিষ্যতে উক্ত মধু দাতার মহিষী হয়ে জন্মগ্রহণ করে। বুদ্ধ তাকেও আশীর্বাদ করে গন্তব্যস্থানে প্রস্থান করলেন।

পরবর্তী সময়ে তিন ভ্রাতা একত্রিত হলে মধুদাতা মধুদানের বিষয় অবহিত করলেন। দুই ভ্রাতার একজন প্রত্যেক বুদ্ধকে 'চণ্ডাল অভিহিত করলেন, অপরজন তাঁকে সমুদ্রের পরপারে নিক্ষেপ করতে বললেন। অবশ্য পরে তাঁরা এ দানকে অনুমোদন করেছিলেন। এ পুণ্যের ফলে মৃত্যুর পর মধুদাতা রাজা অশোক রূপে, জলদাতা বালিকা অশোকমহিষী অসন্দিমিত্রাদেবী[৪৩], চণ্ডালবাদী সুমনরাজকুমারের পুত্র নিগ্রোধ[৪৪] এবং পরপারবাদী লংকাদ্বীপে তিষ্যরাজ[৪৫] রূপে জন্মগ্রহণ করেন।

সুমন রাজকুমারে কথা

বিন্দুসার[৪৬] রাজার মৃত্যুর পর অশোক কুমার সিংহাসন হস্তগত করে তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুমন কুমারকে হত্যা করলে তাঁর গর্ভবতী স্ত্রী সুমনাদেবী[৪৭] অজ্ঞাতবেশে রাজপ্রাসাদ ত্যাগ করে এক চণ্ডাল গ্রামে একটি নিগ্রোধবৃক্ষ মূলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। সেই বৃক্ষের দেবতার প্রভাবে একটি কুটির নির্মিত হলে দেবী সেই কুটিরে প্রবেশ করলেন এবং দিবাবসানে একটি পুত্রসন্তান প্রসব করলেন। তার নাকমরণ করা হয় নিগ্রোধকুমার। তাঁর বয়স সপ্তবর্ষ পূর্ণ হলে মহাবরুণ স্থবির[৪৮] তাঁকে প্রব্রজ্যা দান করেন। প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় কুমার অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। একদিন নিগ্রোধ শ্রামণ রাজপ্রাসাদের পাশ দিয়ে যাবার সময় চংক্রমণরত অশোক তাঁকে ধীর-মন্থর গতি ও আনত নয়নে গমন করতে দেখে তাঁর প্রতি প্রসন্ন ও প্রেমচিত্ত উৎপন্ন হলো। রাজা শ্রামণকে প্রাসাদে আহ্বান করে উপবেশন করতে বললে তিনি সিংহাসনে উপবেশন করলেন। অনন্তর রাজার জন্য আনীত আহার্য শ্রামণকে

www.pathagar.com

দান করলেন। শ্রামণের আহারকৃত সমাপন হলে রাজা অনুরোধ করলেন, "আপনার শাস্তার ধর্মবাণী শ্রবণ করান।" শ্রামণ ধর্মপদের অপ্রমাদবর্গ দেশনা করলেন। এই ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে রাজা অশোক বৌদ্ধধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং এরপর হতে নিত্য ষাট হাজার ভিক্ষুর আহার্যের ব্যবস্থা করেন। অতঃপর রাজা অশোক সপরিষদ ত্রিশরণসহ পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সমগ্র সাম্রাজ্যে চুরাশি সহস্র বিহার প্রতিষ্ঠা করেছিলেন।

মধুবণিক দেবলোক হতে চ্যুত হয়ে জম্বুদ্বীপের একচ্ছত্র রাজা প্রিয়দর্শীরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

বিন্দুসার রাজের একশ পুত্র ছিল। অশোক তিষ্য ব্যতীত সকলকে হত্যা করে সমগ্র জম্বুদ্বীপের শাসনভার গ্রহণ করার চতুর্থ বছরে বুদ্ধের পরিনির্বাণের দুইশ আঠার বছর পর রাজ্যাভিষিক্ত হন। অসন্দিমিত্রা ছিলেন তাঁর অগ্রমহিষী। তিনি ছিলেন একচ্ছত্র অধিপতি, তাঁকে রাজ্যের সমস্ত প্রাণী এমনকি পশু-পাখিরাও কর প্রদান করত। নাগ-দেবগণও কর প্রদান করত। একদা নাগরাজকে বুদ্ধরূপ প্রদর্শন করতে বললে তিনি বত্রিশ লক্ষণ ও অশীতি অনুব্যঞ্জন মণ্ডিত বুদ্ধরূপ ধারণ করে রাজাকে প্রদর্শন করেছিলেন।

অশোক চতুর্থ বছরে সিংহাসনে অভিষিক্ত হওয়ার পর তীর্থিক শ্রমণ-ব্রাহ্মণদের দুর্বিনীত স্বভাব লক্ষ্য করে তাদের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে পড়েন এবং নিগ্রোধ শ্রামণের বিনীতভাব দর্শন করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন এবং চুরাশি সহস্র বিহার নির্মাণ করে দান করেন। অতঃপর বুদ্ধের ধাতু কোথায় নিহিত আছে খোঁজ নিয়ে রাজ্যগৃহের জনৈক একশ বিশ বছর বয়স্ক মহাস্থবিরের নিকট একটি পুরাতন স্তূপের সন্ধান প্রাপ্ত হন। স্তূপ খনন করে ধাতুর সন্ধান পাওয়া গেল। ধাতু উত্তোলন করে সম্রাট অশোক সমগ্র জম্বুদ্বীপে চুরাশি সহস্র বিহারে প্রতিষ্ঠা করালেন। এই বিহারাদি প্রতিষ্ঠা করতে ব্যয় হয়ছিল সর্বমোট ছিয়ানব্বই কোটি মুদ্রা। এরপরও তিনি বুদ্ধ শাসনের দায়াদ না হওয়ায় স্বীয় পুত্র মহেন্দ্র[৪৯] ও কন্যা সংঘমিত্রাকে[৫০] শাসনে দান করেন এবং তাঁরা উভয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। রাজা অশোক তৃতীয় সঙ্গীতির পৃষ্ঠপোষকতা করেছিলেন এবং সেই সময় ষাট হাজার দুঃশীল ছদ্মবেশী তীর্থিককে বুদ্ধশাসন হতে বহিষ্কার করা হয়েছিল।

অপরজন (বণিক) 'প্রত্যেক বুদ্ধকে অপরপারে নিক্ষেপ কর' এরূপ বলার অপরাধে সমুদ্রের অপরপারে লঙ্কায় জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা মুটসীবের দশ পুত্রের মধ্যে তিনি ছিলেন দ্বিতীয় এবং পুত্রদের মধ্যে তিনি ছিলেন তীক্ষ্ণ মেধাসম্পন্ন। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর তিনি (নাম - তিষ্য) রাজ্যাভিষিক্ত হন। তিনি রাজ্যাভিষিক্ত হওয়ার পর হতে রাজ্যে নানা প্রকার ধন-সম্পত্তির উদ্ভব হয়েছিল।

জম্বুদ্বীপের সম্রাট অশোক ও লংকার অধিপতি তিষ্যের মধ্যে অদৃষ্টেও বন্ধুত্বভাব গড়ে উঠেছিল। তাঁরা পরস্পর পরস্পরের জন্য নানা প্রকার উপঢৌকন প্রেরণ করতেন। মোগ্‌গলিপুত্ততিস্‌স[৫১] স্থবির কর্তৃক লঙ্কাদ্বীপে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠার জন্য মহেন্দ্র স্থবিরকে প্রেরণ করা হয়েছিল। তিনি সঙ্গীসহ আকাশ মার্গে লঙ্কাদ্বীপে গমন করে প্রিয়তিষ্য রাজা এবং রাজ্যবাসীকে সদ্ধর্মে দীক্ষা দেন। কথিত আছে, মহেন্দ্র স্থবির যেদিন লঙ্কা দ্বীপে উপস্থিত

www.pathagar.com

হন, সেদিন ছিল লঙ্কাবাসীদের কোনো উৎসবের দিন। রাজা সপারিষদ পাহাড়ে মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। মহেন্দ্র স্থবির পাহাড়ে উপনীত হয়ে রাজাকে সদ্ধর্ম দেশনা করেছিলেন। তিনি সসঙ্ঘ মহেন্দ্র স্থবিরকে রাজপ্রাসাদে নিমন্ত্রণ করলেন। পরদিন রাজপ্রসাদে গিয়ে আহারান্তে অনুলাদেবী[৫২] ও তাঁর সহচরী পাঁচশত মহিলাকে ধর্ম দেশনা করেছিলেন। তাঁরা সকলে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। এভাবে তিনি সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধধর্মের জয় পতাকা উড্ডীন করেছিলেন। সংঘমিত্রা কর্তৃক আনীত জয়মহাবোধির দক্ষিণ শাখা প্রতিষ্ঠা করা হলো এবং পাত্রপূর্ণ ধাতু প্রতিষ্ঠা ও নিধান করে 'থূপারাম' স্তূপ প্রতিষ্ঠা করা হয়েছিল।

পাপ ও পুণ্যের ফল অবশ্যই ভোগ করতে হবে। এমন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে যাতে জন্মগ্রহণ করলে অনুশোচনা করতে না হয়।

৪.৯ বোধিরাজকন্যার কথা

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পরের কথা। তখন লঙ্কাদ্বীপে বুদ্ধশাসন প্রতিষ্ঠিত। সেই সময়ে হকুরেল নামে একটি গ্রামে জনৈক বালিকা সাথিদের সঙ্গে খেলা করত। গ্রামের কাছে ছিল সপুষ্পিত একটি মরুত্ত বৃক্ষ। মানুষেরা জলাশয় পার হয়ে বৃক্ষ হতে ফুল সংগ্রহ করে বুদ্ধ পূজা করত। সুখে ফুল সংগ্রহ করার জন্য কুমারী জলাশয়ের উপর একটি সেতু নির্মাণ করে দিয়েছিল। সেই পুণ্যের প্রভাবে মৃত্যুর পর তিনি পাটালীপুত্র নগরে সোমদত্ত রাজার কন্যা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর নামকরণ করা হয় বোধিরাজকুমারী। তিনি ছিলেন অপ্সরা সদৃশ রূপসী। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে 'সুবীরক' নামে এক আকাশচারী সিন্ধুঘোটক উৎপন্ন হয়েছিল। পিতা সোমদত্ত প্রতিদিন সিন্ধুঘোটক করে আকাশপথে গিয়ে বোধিবন্দনা করে আসতেন। কন্যা একদিন পিতাকে জিজ্ঞেস করলেন, "পিত, আপনি প্রতিদিন কোথায় গমন করেন?" পিতা বললেন, "আমি ভগবান বুদ্ধ যেখানে উপবিষ্ট হয়ে মহাজ্ঞান লাভ করেছিলেন সেই জয়বোধিকে বন্দনা ও সেবা করার জন্য গমন করি।" কুমারীও তাঁর সঙ্গে বোধিপূজা করতে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অতঃপর প্রতিদিন পিতার সঙ্গে তিনি বোধিবন্দনা করার জন্য যেতেন। পিতার পরিণত বয়স হলে তিনি সিন্ধুঘোটকে বললেন, "আমার মৃত্যুর পর কন্যার যাতে কোনো বিপদ না হয়, তাকে রক্ষা করার দায়িত্ব তোমার।" যথাকালে পিতার মৃত্যু হলো। কুমারী প্রতিদিন সিন্ধুঘোটকে আরোহণ করে ত্বরিতগতিতে গিয়ে বোধিবন্দনা করে আসতেন। অন্য রাজ্যের উপর দিয়ে যাতায়াত করার সময় মানুষেরা কুমারীকে দেখে সেই রাজ্যের রাজাকে অবহিত করল। রাজা এরূপ সুন্দরী কুমারীর বিষয় অবগত হয়ে তাকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কুমারীকে ধরে আনার জন্য সৈন্যবাহিনী ও প্রহরী নিয়োগ করলেন।

একদিন রাজকুমারী বোধি পূজা শেষে প্রত্যাগমনের সময় উক্ত বিষয় বুঝতে পেরে ঘোটককে ইঙ্গিত করলেন। ঘোটক অতি দ্রুত বেগে আকাশমার্গে গমন করার সময় কুমারী বেগ সামলাতে না পেরে অশ্বপৃষ্ঠ হতে পড়ে যাচ্ছিলেন। অশ্ব দ্রুতগগিতে গিয়ে

www.pathagar.com

কুমারীর চুল মুখে ধারণ করে স্বীয় পৃষ্ঠে উপবিষ্ট করে দিল এবং পাটলীপুত্র নগরে স্বরাজবাড়িতে নিয়ে পৌঁছল।

তির্যক প্রাণিগণও উপকারীর উপকার স্মরণ রাখে এবং প্রত্যুপকার করে।

৪.১০ কুণ্ডলী কথা

লঙ্কাদ্বীপে রোহণজনপদ[৫৩] নামে এক বৃহৎ গ্রামে তিষ্যবিহার নামে একটি বিহার ছিল। সেই বিহারে বহু ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ তিষ্য নামে জনৈক শ্রামণ বাস করতেন। এক সময় তিনি পাষাণবাসী গ্রামে ভিক্ষাচরণ করে ককুবন্ধকন্দর নামক নদীতে স্নানান্তে সমতল বালুকায় উপবেশন করে আহারকৃত সম্পাদন করছিলেন। সেই সময় একটি কুক্কুরী বাচ্চা প্রসবান্তে ক্ষুধায় ক্লান্ত দেহে একান্তে শুইয়েছিল। সে আহার্যের গন্ধ পেয়ে শ্রামণের কাছে গিয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে দাঁড়িয়ে রইল। শ্রামণ কুক্কুরীর প্রতি করুণার্দ্র হয়ে স্বীয় আহার্যের অংশ দান করলেন। কুক্কুরী খুশীমনে আহার করল। শ্রামণও আহারান্তে তুষ্ট হৃদয়ে প্রস্থান করলেন।

কুক্কুরী শ্রামণ যাবার সময় তাঁর প্রতি শ্রদ্ধাচিত্ত উৎপন্ন করেছিল বলে মৃত্যুর পর জম্বুদ্বীপের দেবপুত্রনগরের রাজমহিষীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করে। ভূমিষ্ট হবার পর তার নামকরণ করা হলো 'কুণ্ডলা'। কুণ্ডলা ক্রমান্বয়ে ষোড়শ বর্ষে উপনীত হলে তিষ্য শ্রামণ বোধিসবন্দনা করার জন্য নৌকাযোগে জম্বুদ্বীপে উপগত হয়ে ভিক্ষাচরণ করতে করতে দেবপুত্রনগরে উপস্থিত হয়েছিলেন। কুণ্ডলা রাজপ্রাসাদ হতে শ্রামণকে দেখতে পেয়ে পূর্বজন্মের স্নেহহেতু প্রসাদ উৎপন্ন হলো। তিনি শ্রামণকে আহ্বান করে রাজগৃহে আসন প্রজ্ঞাপ্ত করে উপবেশন করালেন এবং উত্তম আহার্যাদি ভোজন করালেন। কুণ্ডলা পূর্বজীবন বৃত্তান্ত স্মরণ করতে পারতেন। পূর্বে কোনো জীবনে তিনি ভিক্ষুণীব্রত গ্রহণ করে দান দিয়ে জাতিস্মর জ্ঞান প্রাপ্তির জন্য প্রার্থনা করেছিলেন। শ্রামণের আহারান্তে কুণ্ডলা বন্দনা করে পূর্বে কুক্কুরী জীবনের বিষয় শ্রামণকে অবহিত করলেন এবং তাঁর উপকারের কথা স্মরণ করিয়ে বললেন, "ভন্তে, আমার প্রতি অনুগ্রহ করে এখন হতে এখানে বাস করুন।" শ্রামণ সম্মত হলে তিনি একখানা বিহার নির্মাণ করালেন। বহুশত ভিক্ষুসহ শ্রামণ বিহারে বাস করার সময় কুণ্ডলা চতুর্প্রত্যয়াদি দ্বারা ভরণ-পোষণ করতেন। শ্রামণও তাঁর দান স্মরণ করে সাধনা করতে করতে অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করলেন এবং সেই বিহারে আয়ুক্ষয়ে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হন।

সত্ত্বগণের পরমার্থিক ইচ্ছাপূরণ করতে পারে একমাত্র ত্রি-রত্নের শরণ, কাজেই শ্রদ্ধাচিত্তে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করা উচিত।

জম্বুদ্বীপে উৎপন্ন কাহিনী সমাপ্ত

www.pathagar.com

লঙ্কাদ্বীপে (শ্রীলংকায়) উৎপন্ন কাহিনী

৫. মৃগপেতক বর্গ

৫.১ মৃগপোতক কথা

সিংহল দ্বীপে উদ্দলোলক নামে এক মনোরম বিহার ছিল। সেই বিহার সন্নিকটস্থ বনে বহু মৃগ ও শূকর বাস করত। একদা এক ব্যাধ সেই বনে মৃতা গমনাগমনপথে ধনুকলাপ নিয়ে ওৎ পেতে বসেছিল। সেই সময় একটি মৃগ আহারান্তে জল পানের জন্য গমনকালে বিহার থেকে ধর্ম শ্রবণের ঘোষণা শুনে গ্রীবা-কর্ণ প্রসারিত করে সুর শুনছিল। ঠিক তখন ব্যাধ শরের আঘাতে তাকে মেরে ফেলল। মৃত্যুর পর সেই মৃগ সেই বিহারে বসবাসকারী মহাভয় স্থবিরের কনিষ্ঠার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করল। যথাসময়ে ভূমিষ্ঠ হলে সপ্তবর্ষ বয়সকালে তাকে অভয়স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা প্রদান করা হলো। মৃগ জন্মে ধর্ম শ্রবণজনিত পুণ্যের প্রভাবে প্রব্রজ্যা গ্রহণের সময় তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। কিন্তু তাঁর মাতুল মহাভয় স্থবির তখনও অর্হত্ত্ব প্রাপ্ত হতে সক্ষম হননি।

অনন্তর একদা শ্রামণ প্রত্যন্ত এলাকায় উপাধ্যায়ের নিকট গিয়েছিলেন। উপধ্যায় হাত দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল পরিমর্দন করতে করতে দাঁড়িয়েছিলেন। তিনি শ্রামণের অর্হত্ত্ব প্রাপ্তি সম্বন্ধে অবহিত ছিলেন না। শ্রামণ বললেন, "ভন্তে, শত সহস্র চন্দ্র ধারণ করার চেয়ে তৃষ্ণাকে ক্ষয় করা শ্রেয়। কারণ সমুদ্রের তীরে উপস্থিত হয়ে সমুদ্র দর্শন করা যায় না, অনুরূপ ক্লেশের অন্ত সাধন না করে অভিজ্ঞান লাভ করা যায় না। তৃষ্ণার বিনাশ সাধন ব্যতীত মুক্তি অসম্ভব, যে ভিক্ষু তৃষ্ণা ক্ষয় করতে সক্ষম তিনি মারবন্ধন মুক্ত"। শ্রামণের উপদেশ শ্রবণ করে স্থবির বিদর্শন সাধনা করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। দ্বিতীয় দিবসে স্থবিরের কনিষ্ঠা স্থবিরসহ শ্রামণকে নিমন্ত্রণ করলেন। স্থবির ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুসহ পর দিন বোনের গৃহে উপনীত হলেন। দু'জনের জন্য প্রজ্ঞাপ্ত আসন বিস্তৃত হয়ে গেল, ত্রিশ সহস্র ভিক্ষু সেই আসনে উপবেশন করলেন, দু'জনের নিমিত্ত প্রস্তুত আহার্য বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে গেল, ত্রিশ সহস্র ভিক্ষু আহার গ্রহণ করলেন। আহারান্তে শ্রামণ মাতাপিতা ও উপস্থিত উপাসক-উপাসিকাদিগকে ধর্ম দেশনা করলেন। তাঁরা সকলে স্রোতাপত্তিফল লাভ করেছিলেন।

বন্য মৃগ পর্যন্ত ধর্ম দেশনার শব্দ শ্রবণ করে মনুষ্য জীবন লাভ করেছিল। সদ্ধর্ম শ্রবণ ব্যতীত স্বর্গমোক্ষ লাভ করা যায় না।

৫.২ ধর্মসুত উপাসিকা কথা

লঙ্কাদ্বীপে রোহণজনপদে মহাগ্রাম[৫৪] নামে রমণীর বহু বিহার ছিল এবং সেখানে বহু শত ভিক্ষু-ভিক্ষুণী বাস করতেন। সেই বিহার অঙ্গনে মণ্টিচৈত্য নামে একটি মনোরম চৈত্য ছিল। সেখানে মহাদ্বার সমীপে সজ্জিত ধর্মমণ্ডপে প্রতিদিন ধর্মদেশনা হত। একদা ধর্ম শ্রবণের জন্য জনৈক উপাসিকা পুত্রসহ সেই ধর্মমণ্ডপে আগমন করে একাগ্র মনে ধর্ম শ্রবণ করছিলেন। তাঁর পুত্র প্রাকারের কাছে খেলা করার সময় একটি সর্প দ্বারা দংশিত হয়েছিল। মাতা তা দেখে ভাবলেন, "পুত্রের চেয়ে সদ্ধর্ম শ্রবণ দুর্লভ, কাজেই ধর্ম

www.pathagar.com

শ্রবণান্তে যা হোক হবে।" পুত্র বিষ ক্রিয়ায় সংজ্ঞাহীন হয়ে পড়ল। ধর্মদেশনা শেষে মাতা পুত্রের নিকট গিয়ে মস্তক ক্রোড়ের উপর নিয়ে সত্যক্রিয়া করলেন, "আমি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণাগত এবং ক্ষণিকের জন্য হলেও আমি ধর্ম শ্রবণ করেছি, বুদ্ধ নৈয়ায়িক, ধর্ম সংদৃষ্টিক ও কালাকালহীন, সঙ্ঘ সুপ্রতিপন্ন ও চতুর্বিধ ফলে প্রতিষ্ঠিত এবং বুদ্ধ শাসন পাঁচ সহস্র বছর স্থায়ী হবে। এই সত্যক্রিয়ার দ্বারা আমার পুত্র বিষহীন হয়ে সুস্থ ও সুখী হোক।"

সত্য ক্রিয়ার পর পুত্র সুস্থ হয়ে উঠল। অনন্তর উপাসিকা পুত্রসহ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে আজীবন ধর্মাচারণ করত আয়ুক্ষয়ে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেছিলেন।

উত্তমরূপে সদ্ধর্ম শ্রবণ ও আচরণ কর, এতে মনুষ্যসম্পত্তি ও নির্বাণসম্পত্তি লাভ করবে।

৫.৩ কুড্ডরাজ্যবাসী স্থবির কথা

হিংসলদ্বীপে মহাগ্রামে একটি বিহারে বহু শত ভিক্ষু বাস করতেন। সেই বিহারে প্রতি বছর আর্যবংশ ধর্মদেশনা অনুষ্ঠিত হত। সেই ধর্মসভায় বহু লোকের সমাগম হত। এক সময় কুড্ডরাজ্যবাসী জনৈক স্থবির ধর্ম শ্রবণের জন্য সেই ধর্মসভায় উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি স্থানাভাবে সভার বাইরে একটি তৃণ-স্তূপের কাছে দাঁড়িয়ে ধর্ম শ্রবণ করতে লাগলেন। এমন সময় তৃণ-স্তূপ হতে একটি গোণস সর্প বের হয়ে স্থবিরের পায়ে কাপড় দিল। তখন স্থবির ভাবলেন, "আমি যদি এখান থেকে সরে যাই তাহলে ধর্ম শ্রবণের অন্তরায় হবে।" এরূপ চিন্তা করে সর্পের গ্রীবা ধরে পাদুকার নিচে রেখে একাগ্র মনে ধর্ম শ্রবণ করতে লাগলেন। ধর্ম শ্রবণের কারণে তাঁর দেহে বিষ বিস্তার করতে পারে নাই। ধর্ম দেশনা শেষে প্রভাতে লোকজন গৃহে প্রত্যাবর্তন করার সময় তিনি সর্প দংশনের বিষয় প্রকাশ করলেন। উগ্রবিষযুক্ত সর্পদংশিত হয়েও তিনি যে সারারাত ধর্ম শ্রবণে সক্ষম হয়েছেন তা দেখে জনগণ আশ্চর্যান্বিত হলেন। অনন্তর স্থবির সত্যক্রিয়া করলেন, "বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম আমা কর্তৃক শ্রুত হয়েছে, আমি বুদ্ধের সদ্ধর্ম অন্তরে ধারণ করেছি, বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত ধর্ম বহুগুণসম্পন্ন- বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের প্রভাবে আমার দেহের বিষ শীঘ্র বিনাশ প্রাপ্ত হোক।" সত্যক্রিয়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর দেহ বিষহীন হলো। তিনি উপদেশ দিলেন, "বুদ্ধ ত্রিলোক শ্রেষ্ঠ, তাঁর দেশিত ধর্ম জরামৃত্যু সকল বিষ বিনাশ করতে পারে, ধর্ম ব্যতীত ত্রাণের জন্য অন্য কেহ নেই।"

স্থবির এভাবে সদ্ধর্মের গুণাবলীর প্রশংসা করে স্বস্থানে প্রত্যাগমন করত বাস করতে লাগলেন এবং আয়ুক্ষয়ে স্বর্গে গমন করলেন।

ধর্মাচরণই স্বর্গ-মোক্ষ লাভের একমাত্র উপায়। সুতরাং অপ্রমত্তভাবে ধর্মাচরণ কর।

www.pathagar.com

৫.৪ অরণ্যমহাভয় স্থবির কথা

সিংহল দ্বীপের 'মহানলাক' নামক বিহারের সন্নিকটে গ্রামবাসী দ্বারা নির্মিত পর্ণশালায় অভয় স্থবির নামে একজন ত্রিপিটক পারগূ ভিক্ষু বাস করতেন। এক উপাসক তাঁকে বার বছর যাবত চতুর্প্রত্যাদি দ্বারা সেবা করার জন্য নিমন্ত্রণ করেছিলেন। তিনি চীবরের জন্য কাপড় দান করেছিলেন। হরন্তিক নামে এক চোর চীবরের কাপড়সমূহ চুরি করে নিয়ে যেত। ফলে স্থবির জীর্ণ চীরবই পরিধান করতেন। উপাসক তা লক্ষ্য করে একদা গোপনে রাত্রিবেলায় চোর ধরার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলেন। সেই রাত্রে চোর স্থবিরকে প্রদত্ত কাপড়গুলো চুরি করে নিয়ে যাবার সময় দ্রুত গিয়ে চোরের চুল ধারণ করে জিজ্ঞেস করলেন, "তুমিই কি আর্য্যের কাপড় চুরি করছ ?" চোর স্বীকার করল। তখন উপাসক তাকে উত্তম-মধ্যম দিয়ে আমক শ্মশানে নিয়ে গেলেন এবং একটি মৃত মানুষকে অধোমুখী করে তার শরীরের সঙ্গে দৃঢ় রূপে বেঁধে ছেড়ে দিলেন এবং গ্রামবাসীকে বললেন, "গ্রামে এক অমনুষ্য এসেছে, অতএব, কেউ বাড়ি থেকে বের হবে না।" ইহা শুনে গ্রামবাসীরা দ্বার রুদ্ধ করে লুকিয়ে রইল। সেই চোর মৃতদেহ-আবদ্ধ শরীরে স্বগৃহে গিয়ে স্ত্রীকে ডেকে বলল, "আমি হরন্তিক।" তার স্ত্রী ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে গৃহের অভ্যন্তরে লুকিয়ে রইল। আত্মীয়-স্বজনের কাছে গিয়ে চেষ্টা করল, কিন্তু কেই দ্বার খুলল না। অবশেষে স্থবিরের নিকট প্রার্থনা করল, "প্রভু, আমি আপনার শরণ নিচ্ছি, আমার দেহে সংলগ্ন মৃতদেহটি মোচন করে দিন।" স্থবির করুণাপরবশ হয়ে মৃতদেহটি মোচন করে দূরে ফেলে দিলেন এবং চোরের পরিচর্যা করতে লাগলেন। উপাসক দেখে তাকে তাড়িয়ে দেবার জন্য বললেন। স্থবির বললেন, "অকৃতজ্ঞের প্রতি মৈত্রী পোষণ করতে না পারলে কার প্রতি মৈত্রী পোষণ করবে।"

অনন্তর স্থবির পরিচর্যা করে চোরকে সুস্থ করলেন। চোর কিছু দিন পর স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে সাধনা দ্বারা অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিল।

প্রথম জীবনে অপকর্মে লিপ্ত হলেও পরে সৎকর্ম দ্বারা স্বর্গমোক্ষ প্রাপ্ত হওয়া সম্ভব।

৫.৫ সিরিনাগ কথা

সিংহলদ্বীপে সিরিনাগ নামে জনৈক ব্রাহ্মণ পুত্র ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করে যোদ্ধা যোগাড় করে অনুরাধপুর জয় করে রাজা হবার অভিপ্রায়ে দক্ষিণ মহাবিহারের চৈত্য ভেঙ্গে ধন-সম্পত্তি সংগ্রহ করার জন্য লোক নিয়োগ করেছিল। কিন্তু তারা চৈত্যের সংযোগস্থলের খোঁজে না পেয়ে বহুল নামে এক বহুদর্শী চণ্ডালকে ডেকে চৈত্যের সন্ধিস্থল প্রদর্শনের জন্য বলল। চণ্ডাল বলল, "আমি বুদ্ধের শরণাপন্ন উপাসক, আমার পক্ষে বুদ্ধের ধাতু প্রতিষ্ঠিত চৈত্য ভেঙ্গে আনন্তরিক কর্ম করা কোনো প্রকারেই সম্ভব নয়।" সিরিনাগ রুষ্ট হয়ে তাকে জীবন্ত শূলে দিল। চণ্ডালের সাতজন পুত্র ছিল। তাদের ডেকে চৈত্যের সন্ধিস্থল অন্বেষণ

www.pathagar.com

করে দিতে বলল। তারাও অস্বীকার করলে তাদেরকে শূলে দিয়ে হত্যা করল। পিতা-পুত্রের মৃত্যুর পর তাদের পুণ্যের প্রভাবে দেবগণ স্বর্গ হতে দৃশ্যমান অবস্থায় রথ এনে তাদেরকে তুষিত স্বর্গে নিয়ে গেলেন। মহাজনতা এই দৃশ্য অবলোকন করে সিরিনাগকে চৈত্য ভাঙ্গতে নিষেধ করল। সিরিনাগ চৈত্য ত্যাগ করে মহাগঙ্গা মধুপৃষ্টক গ্রাম লুট করে সেখানকার মধুপৃষ্টক চৈত্য ভেঙ্গে ধনসম্পদ আহরণ করে সেই সম্পত্তির বিনিময়ে মহাসেনাবাহিনী যোগাড় করে রাজ্য জয় করল। চৈত্যে ভাঙ্গার পাপে সিরিনাম ভীষণ রোগে আক্রান্ত হয়ে অচিরে মৃত্যুবরণ করে মহানিরয়ে উৎপন্ন হলো।

পাপমূলক কর্ম দ্বারা মহানিরয়াদি দুঃখময় স্থানে জন্মগ্রহণ করতে হয়, আর পুণ্যকর্ম সম্পাদনের দ্বারা স্বর্গলাভ করা যায়। কাজেই পাপকাজ ত্যাগ কর এবং সৎকাজ সম্পাদন কর।

৫.৬ শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্য কথা

লঙ্কাদ্বীপে রাজা শ্রদ্ধাতিষ্যের[৫৫] রাজত্বকালে কোনো ক্ষুদ্র রাজ্যে তিষ্য নামে এক শ্রদ্ধাসম্পন্ন অমাত্য ছিলেন। তিনি অনুরাধপুরে গিয়ে রাজার পরিচর্যা করতেন। একদা রাজকর্ম সম্পাদনান্তে গৃহে প্রত্যাবর্তনকালে রাস্তায় তিষ্যস্থবির নামে জনৈক পিণ্ডচারী ভিক্ষুকে দেখতে পেয়ে তাঁর পাত্রটি নিয়ে স্বগৃহে গেলেন। কিন্তু গৃহে কোনো অন্ন না থাকায় পথিমধ্যে জনৈক পথচারীর কাছ থেকে আট কার্যাপণের বিনিময়ে অন্ন ক্রয় করে স্থবিরকে দান করলেন। স্থবির অন্ন গ্রহণ করে নিজেকে উপদেশ দিতে লাগলেন, "এই উপাসক তোমার কোনো আত্মীয় কিংবা বন্ধু নন, শীলবান মনে করে তিনি আহার্য দান করেছেন। তুমি যদি তাঁর বিপুল আনিসংস কামনা কর তাহলে অনুরক্ত না হয়ে ভোজন কর।" এভাবে নিজেকে উপদেশ প্রদান করে ধ্যানস্থ হয়ে আসবক্ষয় করলেন এবং পরে আহারকৃত সমাপন করলেন। এটা অবলোকন করে দেবগণ সাধুবাদ দান করলেন। রাজা এবিষয় জ্ঞাত হয়ে তাঁর পিতামাতাকে একটি নগর উপহার দিলেন।

অনন্তর লঙ্কাদ্বীপে একসময় অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। জনগণ পানীয় জলের অভাবে পড়লে তিষ্য অমাত্যদের পুণ্যপ্রভাবে হ্রদ হতে পানীয় জল সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। তিষ্য সেই জল ত্রিশ সহস্র ভিক্ষুকে দান করেছিলেন। অন্য একসময় তিষ্য ময়ূরের মাংস দ্বারা বহু সংখ্যক ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সেবা করেছিলেন। তখনও দেবগণ সাধুবাদ দিয়ে তাঁর দান অনুমোদন করেছিলেন। রাজা এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে তখনও বহু সম্পত্তি তিষ্য অমাত্যকে প্রদান করেছিলেন। অতঃপর ভিক্ষু-সঙ্ঘকে ত্রিচীবর দান করেছিলেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ চৈত্য বন্দনা করেছিলেন। সেই সময় তিনি স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এভাবে পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করে যথাসময়ে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন।

সর্বদা যথাশক্তি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করবে।

www.pathagar.com

৫.৭ শ্রমণগ্রাম কথা

লঙ্কার চৈত্য পর্বতে বসবাসকারী বারজন ভিক্ষু কোনো সময় লঙ্কার বিভিন্ন চৈত্য বন্দনা করে শ্রমণ গ্রামে উপনীত হয়েছিলেন। সন্ধ্যা সমাগত হলে তাঁরা গ্রামের পূর্বপার্শ্বে পর্বতপাদের ছায়াসমৃদ্ধ মাতুলবৃক্ষের নিচে রাত্রিযাপন করার সময় একজন ভিক্ষু কশ্যপ বুদ্ধের দেশিত ধর্ম পর্যালোচনা করেছিলেন। সেই বৃক্ষের অধিষ্ঠিত দেবতা সেই ধর্মদেশনা শ্রবণ করে প্রসন্ন হয়ে প্রভাতে ভিক্ষুদিগকে দুপুরে আহার্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ করলেন। কিন্তু সেই দেবপুত্রের আহার্য উৎপাদন করার মত কোনো পুণ্যকর্ম ছিল না। তিনি বদালতা (এক প্রকার মধুময় লতার পত্র) আহার করতেন। ভিক্ষুদিগকেও সেই লতা আহারের জন্য দান করলেন। ভিক্ষুগণ আহারের সময় দেবপুত্রকে বললেন, "দেবপুত্র আমরা এখন যাব।" দেবপুত্র বললেন, "প্রভু, আগামীকাল আমার এক দেবপুত্র বন্ধু এখানে আগমন করবেন, তিনি আপনাদিগকে দিব্যাহার দান করবেন। আপনারা দিব্যাহার গ্রহণ করে প্রস্থান করবেন।" ভিক্ষুগণ নিমন্ত্রণ গ্রহণ করলেন। পরদিন দেবপুত্র এসে অতি উত্তম দিব্যাহার দ্বারা ভিক্ষুদিগকে ভোজন করালেন। আহার শেষে ভিক্ষুগণ দেবপুত্রকে এরূপ দিব্যাহার ও সুখ সমৃদ্ধি প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞেস করলেন।

দেবপুত্র তাঁর অতীত জীবনের পুণ্যকর্ম সম্বন্ধে বললেন, "আমি পূর্বজন্মে চৈত্য পর্বতের মনোরম বিহারে শ্রমণ হয়ে স্বীয় আহার্য হতে সঙ্ঘকে দান করেছিলাম। আমি সেই পুণ্যের ফলে ভূমিদেবতা হয়ে প্রচুর ভোগ সম্পত্তি প্রাপ্ত হই। প্রদ্ধাচিত্তে অল্প দান করলেও বিপুল পরিমাণ ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।" ভিক্ষুগণ দেবপুত্রের পুণ্যকর্মের বিষয় অবগত হয়ে প্রস্থান করলেন এবং যেখানে যেখানে গমন করেছিলেন সেখানেই দেবপুত্রের দানের বিষয় জনসাধারণের নিকট ব্যাখ্যা করে তাঁদিগকে অনুপ্রাণিত করেছিলেন।

অল্প হলেও উত্তম ক্ষেত্রে দান করলে বিপুল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়। কাজেই সুশীল পাত্রে দান করে বিপুল পুণ্যের অংশীদার হও।

৫.৮ অভয় স্থবির কথা

লঙ্কার পশ্চিম পার্শ্বে ছিল পুষ্পবাস নামে একটি মনোরম বিহার। তার পাশে দেবগ্রামে ছিলেন দেব অমাত্য নামে একজন অমাত্য। তিনি একদিন দরিদ্রদিগকে নিমন্ত্রণ করে আহারের ব্যবস্থা করেছিলেন। সে সময় এক ক্ষুধার্ত কুকুর খাদ্য পাবার আশায় সেখানে আসলে অমাত্য প্রসন্ন চিত্তে আহার্য প্রদান করেন। সেই পুণ্যের ফলে তিনি পরবর্তী জন্মে সেই গ্রামে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। যথাসময়ে দার পরিগ্রহ করে বৃদ্ধ বয়সে তিনি পুষ্পবাস বিহারে ভিক্ষুদের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হয় মহাভয় স্থবির। অনন্তর পরবর্তী সময়ে সেই এলাকায় অনাবৃষ্টির কারণে মহা দুর্ভিক্ষ ও চোরের উপদ্রব হয়েছিল। সেখানকার সাধারণ মানুষ জীবিকার্জনে অসমর্থ হয়ে অন্যত্র চলে যাবার জন্য মনস্থির করে স্থবিরকেও তাদের সঙ্গে গমন করার জন্য অনুরোধ করল। কিন্তু স্থবির চৈত্য ও বোধিবৃক্ষ ত্যাগ করে অন্যত্র যেতে অস্বীকৃতি জানালে তারা তাদের পছন্দমত স্থানে

চলে গেল। স্থবির অনাহারে চৈত্য ও বোধিবৃক্ষের সেবা করতে লাগলেন। তিনি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে পড়ছিলেন। তৃতীয় দিনও নিত্যকর্ম সম্পাদন করে বিহার অঙ্গনে দাঁড়ালে সেই বিহারে অধিষ্ঠিত দেবতা স্বীয় রূপ ধারণ করে স্থবিরকে বন্দনা করত যাবজ্জীবন তাঁর বিমানে আহার্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ করলেন। তদবধি স্থবির দেবপুত্রের নিকট আহার্য গ্রহণ করে বাস করতেন। সেই সময় কতিপয় নরমাংস খাদক লোক স্থবিরকে হত্যা করে মাংস খাবার অভিপ্রায়ে মুদগর নিয়ে তাড়া করছিল। তখন স্থবিরের পুণ্যপ্রভাবে বিহার অঙ্গনে বৃহৎ পর্বতের সৃষ্টি হয় এবং স্থবির সেই পর্বতের অভ্যন্তরে প্রবেশ করেছিলেন। তারা স্থবিরকে দেখতে না পেয়ে "ইনি ভবিষ্যতে অর্হৎ হবেন" চিন্তা করে পলায়ন করল। অতঃপর স্থবির বিদর্শন সাধনা বর্দ্ধিত করে অর্হত্বফল প্রাপ্ত হন। সেই বিহারে সর্বমোট চব্বিশ বছর দেবপুত্র প্রদত্ত আহার্য গ্রহণ করে তিনি পরিনির্বাণ লাভ করেন।

সর্বদা দান করবে, দানের দ্বারা ক্রমান্বয়ে নির্বাণাভিমুখে অগ্রসর হওয়া যায়।

৫.৯ নাগকথা

বুদ্ধ জেতবনে[৫৬] বাস করার সময় প্রত্যুষে পৃথিবী অবলোকন করে দেখতে পেলেন যে, নাগদ্বীপে[৫৭] চূলোদর ও মহোদর নামে দুই মামা-ভাগ্নে বিবাদে লিপ্ত আছে। তাদের বিবাদ মীমাংসা করা সমীচীন মনে করে বুদ্ধ জেতবন-দ্বারের পার্শ্বে রাজায়তনবৃক্ষমূল ও বৃক্ষদেবতাসহ লঙ্কার নাগদ্বীপে গমন করলেন। বুদ্ধ নাগরাজদের সংগ্রামস্থলে আকাশে স্থিত হয়ে প্রথমে বৃষ্টি, বায়ু, ঘন-অন্ধকার সৃষ্টি করে সন্ত্রাস ও ভয়ের উদ্রেক করলেন, পরে অন্ধকার বিদূরীত করে বুদ্ধরশ্মি বিচ্ছুরিত করে নিজেকে প্রকাশ করলেন। তারা বুদ্ধকে দেখে অস্ত্র ত্যাগ করে নতশিরে বন্দনা করল। বুদ্ধ দেশনা করে তাদের শান্ত করলেন, সকলে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করল। সেখানে রাজায়তন বৃক্ষ প্রতিষ্ঠা করে বুদ্ধ প্রত্যাগমন করলেন। নাগগণ সেখানে চৈত্য প্রতিষ্ঠা করে বন্দনা ও পূজা করতে লাগল। এটা রাজায়তন চৈত্য নামে প্রসিদ্ধি লাভ করে।

একদা ষাটজন ভিক্ষু নাগদ্বীপের রাজায়তন চৈত্য বন্দনা ও পূজা করার নিমিত্ত উপস্থিত হয়েছিলেন। তাঁরা প্রাতে বন্দনা ও পূজা শেষে ভিক্ষাচরণে গ্রামে বের হলেন। ভিক্ষান্ন না পেয়ে রিক্তপাত্রে প্রত্যাবর্তন করার সময় সেই গ্রামের নাগা নাম্নী এক দাসী ভিক্ষুদিগকে দেখতে পেলেন। তিনি ভিক্ষুদিগকে অপেক্ষা করার জন্য অনুরোধ করে তাঁর প্রভুর নিকট গিয়ে রাত্রিবেলায় অতিরিক্ত কাজ করে দেবার বিনিময়ে ষাট কার্যাপণ সংগ্রহ করলেন এবং ষাটটি গৃহ হতে ষাট কার্যাপণের বিনিময়ে অন্ন ক্রয় করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করলেন। ভিক্ষুগণ আহারের জন্য মুচলিন্দ বনে প্রবেশ করলে সঙ্ঘনায়ক ভিক্ষুগণকে আহ্বান করে বললেন, "এই মহিলা আমাদের আত্মীয় কিংবা বন্ধু নহে, সে পরগৃহে দাসীবৃত্তি করে আমাদের প্রতি শ্রদ্ধাচিত্তে দান করেছে, এই আহার্য সরাগে ভোজন করা অনুচিত, আসবক্ষয় করে ভোজন করা সমীচীন।"

www.pathagar.com

অনন্তর ভিক্ষুগণ মুচলিন্দবনে প্রবেশ করে বিদর্শন সাধনা বর্ধিত করত প্রতিসম্ভিদাসহ অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। অতঃপর আহার্য গ্রহণ করার সময় দেবগণ সাধুবাদ প্রদান করতে লাগলেন। রাজা সাধুবাদের কারণ জানতে চাইলে দেবগণ পূর্বোক্ত বিষয় অবহিত করলেন। রাজা সমস্ত বিষয় অবগত হলে দাসীকে ঋণমুক্ত করে বহু বিভব প্রদান করেছিলেন। দাসী তদবধি বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

শ্রদ্ধাচিত্তে দান দাও, দানে দুর্গতি নিবারিত হয়, দুঃখমুক্ত হওয়া যায়।

৫.১০ বক্কুল পর্বত কথা

এক সময় লঙ্কা দ্বীপে অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অমনুষ্যের উপদ্রব হয়েছিল। অনাহারে বহু লোক মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল। ফলে মহামারী ও অমনুষ্যের ভয়ে মানুষেরা ইতঃস্তত গমন করে জীবন বাঁচাতে লাগল। সেই সময় কিছুলোক বখুপর্বতপাদে গিয়ে বাস করছিল। সেই পর্বতপাদ হতে জনৈক দম্পতি জীবিকা নির্বাহের জন্য পর্বত শিখরে আরোহণ করে 'কারবৃক্ষ' দেখে এর নিকটে গৃহ নির্মাণ করে বাস করতে লাগলেন। কারবৃক্ষের তিনটি শাখা ছিল। তাঁরা স্থির করেছিলেন, "কার বৃক্ষের একটি শাখা দ্বারা নিজেদের জীবিকা নির্বাহ করবে, একটি শাখা দ্বারা অতিথি সৎকার করবে এবং অন্য শাখা দ্বারা দান করবে।" তাঁরা নিজেদের জন্য রক্ষিত শাখার পত্র দ্বারা জীবিকা নির্বাহ করে বাস করছিলেন। অনন্তর একদিন জনৈক ভিক্ষু ভিক্ষাচরণ করতে গিয়ে উক্ত পর্বত শিখরে ধোঁয়া দেখতে পেয়ে ভিক্ষার জন্য সেখানে গমন করলেন। উক্ত ব্যক্তি ভিক্ষুকে দেখে প্রসন্নমনে পাত্র গ্রহণ করে উপবেশন করালেন। ভিক্ষুকে পত্র দান করার জন্য বৃক্ষের নিকট গিয়ে দেখতে পেলেন বৃক্ষের সমস্ত পত্র পোকা খেয়ে ফেলেছে। তিনি অতি বিষন্ন মনে রিক্ত হস্তে প্রত্যাগমন করে স্ত্রীকে অবহিত করলেন। স্ত্রী স্বীয় দেহের মাংস কেটে রান্না করে ভিক্ষুকে দান করার মনস্থির করে গৃহ অভ্যন্তরে প্রবেশ করলেন। স্বামীও অনুরূপভাবে মাংস দান করার অভিপ্রায়ে একই গৃহে প্রবেশ করলেন। তাঁরা উভয়ে নিজ নিজ দেহের মাংস দান করতে চাইলেন। তাঁদের শ্রদ্ধাবলে দেবরাজ ইন্দ্রের সিংহাসন উষ্ণ হয়ে উঠল। তিনি অন্তর্দৃষ্টি দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে উক্ত দম্পতির শ্রদ্ধা সম্পর্কে অবহিত হলেন। তখনই তিনি প্রচুর পরিমাণে সালি চাল, মাংস, দধি, তৈল ইত্যাদি পাত্র পূর্ণ করে তাঁদের গৃহে উপস্থিত হলেন এবং মানুষের বেশ ধারণ করে তাঁদের হাতে সমর্পণ করে বললেন, "এগুলো রন্ধন করে ভিক্ষুকে দান করুন এবং আপনারাও ভোজন করুন।" এরূপ বলে দেবরাজ প্রত্যাগমন করলেন। তাঁরা উক্ত সামগ্রী রান্না করে ভিক্ষুকে দান করলেন এবং নিজেরাও ভোজন করলেন, তবুও সেই সামগ্রীর কিছুমাত্র ঊণতা প্রাপ্ত হলো না। অতঃপর বহু ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহ্বান করে দান করলেন, দীন-দরিদ্রকেও ভোজন করালেন। এভাবে দান দিয়ে শীল পালন করে তাঁরা উভয়ে আয়ুক্ষয়ে দেবলোকে জন্ম লাভ করেন।

শ্রদ্ধা থাকলে দরিদ্র ব্যক্তিও অভীষ্ট কার্য সমাধান করতে পারেন।

www.pathagar.com

৬. উত্তরোলীয় বর্গ

৬.১ উত্তরোলীয় কথা

তখন সিংহলদ্বীপে বুদ্ধ-শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত। সেখানে উত্তরোলীয় নামক গ্রামের কাছেই ছিল গোপাল নামক একটি গ্রাম। সেই গ্রামের গোপাল নামে এক রাখাল বালক গরু চড়াবার জন্য বনে গমন করলে জনৈক পারিবাসি খাওয়ার জন্য একখণ্ড আলুব (এক প্রকার খাদ্য) প্রদান করেছিল। সে আলুব খণ্ডটি নিয়ে যাবার সময় একজন ভিক্ষাচারী ভিক্ষুর সাক্ষাৎপ্রাপ্ত হয়। বালক বন্দনা করে আলুব খণ্ডটি ভিক্ষুর পাত্রে দান করলো। ভিক্ষু বালকটির প্রতি মৈত্রীভাব উৎপাদন করে সেখানে স্থিত হয়ে বিদর্শন বর্ধিত করলেন এবং অর্হত্বফল প্রাপ্ত হয়ে আহার করলেন।

সেই বালক আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর একই গ্রামে এক মহিলার গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করল। আলুব খণ্ড দানের ফলে সেখানে একটি নিধিকুম্ভ উৎপন্ন হয়েছিল। নিধিকুম্ভটিকে জলাশয়ে ভাসমান অবস্থায় দেখে জনৈক মহিলা গ্রহণ করার চেষ্টা করলে এটা জলের অভ্যন্তরে অন্তর্হিত হয়ে গেল। মহিলাটি এ বিষয় গ্রামবাসীকে অবহিত করলে উপরোক্ত গর্ভবতী মহিলা একটি পুত্রসহ বহুলোক উক্ত জলাশয়ের কাছে সমবেতন হলো। নিধিকুম্ভ জলের অভ্যন্তর হতে উত্থিত হয়ে ভাসতে লাগল। প্রত্যেকে নিধিকুম্ভ লাভের কামনায় জলাশয়ের চারপাশে দাঁড়িয়েছিল। নিধিকুম্ভটি উক্ত মহিলার কাছে এসে স্থির হলো। সে প্রথমে অঙ্কস্থ পুত্রের প্রভাবে নিধিকুম্ভ নিকটে আসবার জন্য কামনা করল, কিন্তু আসল না। অতঃপর গর্ভস্থ সন্তানের পুণ্যপ্রভাবে কাছে আসার ইচ্ছা পোষন করলে কুম্ভ তার খুব সন্নিকটে এসে স্থির হলো এবং জল হতে উত্থিত হয়ে মাটির উপর দিয়ে গড়িয়ে গড়িয়ে তার গৃহে যথাস্থানে স্থিত হলো। যথাসময়ে মাতৃকুক্ষি হতে উক্ত বালক ভূমিষ্ট হলো। যথাসময়ে শিক্ষা-দীক্ষার ব্যবস্থা করা হলো। কুমারের মাতা উক্ত নিধিকুম্ভ হতে দিব্যবস্ত্র নিয়ে পরিধান করত। একদা বস্ত্র ব্যবসায়ী এ বিষয় অবহিত হয়ে তার নিকট এসে বলল, "এটা রাজকীয় সম্পত্তি, রাজাকে না জানিয়ে আত্মসাৎ করছ, এটা হলাহল বিষ ও সর্বদাহ্য হুতাশন সদৃশ। অচিরেই তুমি রাজরোষে পতিত হয়ে ধ্বংস হবে।"

উক্ত ব্যক্তি এভাবে ভয় দেখায়ে সমস্ত বিষয় রাজাকে অবহিত করল। রাজা নিধিকুম্ভ থেকে ধন নির্গত করাতে বললে কুম্ভ হতে ধনরাশি নির্গত হতে লাগল। ইহা দর্শন করে রাজা বিস্মিত হলেন। রাজা মাতাপুত্রকে নিধিকুম্ভসহ বহু সম্পত্তি ও জনপদ প্রদান করে পাঠিয়ে দিলেন। তদবধি মাতাপুত্র দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর উভয়ে স্বর্গবাসী হয়েছিলেন।

শ্রদ্ধাসহকারে কিঞ্চিৎ পরিমাণ দানও বিপুল পরিমাণ ফল প্রদান করে।

৬.২ তম্বসুমন স্থবির কথা

লঙ্কায় রাজা শ্রদ্ধাতিষ্যের রাজত্বকালে জনৈক রাজকর্মচারী রাজকীয় কর্মোপলক্ষে কোট্ঠসাল নামক গ্রামে গিয়েছিলেন। গ্রামবাসী তাঁকে বহু উপাদেয় খাদ্য প্রদান করত।

www.pathagar.com

একদা তিনি আহার গ্রহণের জন্য উপবিষ্ট হলে এক ভিক্ষু ভিক্ষা গ্রহণের জন্য সেখানে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি তাঁর জন্য আনীত অন্ন ও ঘৃত ভিক্ষুর পাত্রে দান করলেন। ভিক্ষু অন্ন আহার করে ঘৃত ঔষধের জন্য নিয়ে গেলেন। রাজকর্মচারী আয়ুশেষে মৃত্যুর পর সেই কৃতপুণ্যের প্রভাবে বল্লবহ নামক গ্রামে জনৈক গৃহস্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় সুমন। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে দার পরিগ্রহ করেন, কিন্তু গৃহাবাসে তাঁর মন রমিত হলো না। তিনি গৃহত্যাগ করে ব্রাহ্মণাম নামক বিহারে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে বিদর্শন ভাবনা করে অর্হত্ত্ব ফল লাভ করেন। সেই বিহারে নিমবৃক্ষে এক দেবপুত্র বাস করতেন। তিনি দিব্যাহার দ্বারা সুমন স্থবিরের সেবা করতেন। এভাবে দ্বাদশ বছর অতিক্রান্ত হলে সেই গ্রামে দুর্ভিক্ষ আর মহামারির আবির্ভাব হয়েছিল। সকলে প্রাণ বাঁচাবার জন্য বিভিন্ন স্থানে চলে যেতে লাগল। সেখানকার ভিক্ষুগণও সুমন স্থবিরসহ জম্বুদ্বীপে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিতে লাগলেন। দেবপুত্র এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে পঞ্চশত ভিক্ষুসহ সুমন স্থবিরকে সেখানে বসবাস করতে অনুরোধ করলেন। দেবপুত্র প্রতিদিন দিব্য আহার্য দ্বারা ভিক্ষুদিগকে ভোজন করাতেন। এভাবে দ্বাদশ বছর অতিক্রান্ত হলে দুর্ভিক্ষের উপদ্রব নিরশন হবার পর পঞ্চশত ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ কণ্ডরাজিক নামক গ্রামে উপনীত হয়েছিলেন। সেই গ্রামে ভিক্ষাচরণ শেষে আহারের নিমিত্ত উপবেশন করলে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন থাকার দরুণ সূর্যের অবস্থান নির্ধারণ করা যাচ্ছিল না বিধায় কতিপয় ভিক্ষু সময় অতীত হয়েছে মনে করে আহার গ্রহণে অসম্মতি জ্ঞাপন করেছিলেন। তখন সুমন স্থবির একখণ্ড পাথর আকাশে নিক্ষেপ করলে পাথরখানা সূর্যের অবস্থান নির্দেশ করেছিল। ভিক্ষুগণ সন্দেহমুক্ত হয়ে আহার গ্রহণ করেছিলেন। এক সময় তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘসহ গঙ্গার ধারে চুল্লত নামক স্থানে ভিক্ষাচরণ করে অল্প পরিমাণ ব্যঞ্জন ও মোটা অন্ন লাভ করেছিলেন। সুমন স্থবির তাঁর পুণ্য প্রভাবে গঙ্গার জল ব্যঞ্জনে রূপান্তরিত করে আহার করেছিলেন। অলৌকিকভাবে তিনি এসব প্রাপ্ত হয়েছিলেন। এর কারণ অতীত জীবনে একজন ভিক্ষুকে ঘি ও অন্ন দানের ফল।

শ্রদ্ধার সাথে দান দিলে বিপুল ফল প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬.৩ পূর্বপর্বতবাসী তিষ্য স্থবির কথা

কশ্যপ বুদ্ধের সময়ে এক ব্যক্তি বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি একদা মনসিলাচূর্ণ (একপ্রকার রং করার পাউডার) বিক্রয় করার জন্য গ্রাম-জনপদে বিচরণকালে কোনো এক গ্রামের জনৈক যুবতী স্ত্রী তার কাছ থেকে মনসিলাচূর্ণ ক্রয় করে তাঁকে সুস্বাদু তরকারী ও ময়ূরের মাংসসহ সালি ভাত খেতে দিয়েছিল। তখন একটি ক্ষুধার্ত কুকুর তাঁর সামনে এসে দাঁড়ালে তিনি তাঁর খাদ্যের অংশ কুকুরকে দান করে কামনা করেছিলেন, "আনির্বাণ আমি যেন এরূপ উত্তম খাদ্য প্রাপ্ত হই।" বণিক যথাকালে মৃত্যুবরণ করে এক বুদ্ধান্তর কাল দেব-মনুষ্যলোকে সঞ্চরণ করে বহু উত্তম আহার্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অনন্তর বর্তমান বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর সিংহল দ্বীপে পূর্বগল্ল নামক গ্রামে এক গৃহে জন্মগ্রহণ

করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় তিষ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি পূর্বগল্ল বিহারে গিয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পাদা গ্রহণ করেন এবং বিদর্শন ভাবনায় রত হয়ে অল্প সময়ের মধ্যে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তিনি অতি পুণ্যবান, প্রজ্ঞাবান ও পরিয়ত্তিগামী রূপে সমগ্র সিংহল দ্বীপে খ্যাতি লাভ করেন। যিনি তাঁর পাত্র গ্রহণ করতেন তিনি ময়ূরের মাংসসহ সালি ভাত দ্বারা পাত্র পূর্ণ করে দান করতেন। তাঁর এরূপ পুণ্যসম্পদ পরীক্ষা করার জন্য জনৈক অমাত্য পুত্র তিষ্য স্থবিরকে নিমন্ত্রণ করে স্ত্রীকে বললেন, "স্থবির আসলে তাঁকে শাক-ঝোল ও মোটা ভাত দিয়ে আহার্য দান করবে।" এরূপ বলে তিনি অন্যত্র চলে গেলেন। তাঁর গৃহে অধিষ্ঠিত দেবতা ইহা জানতে পেরে এক বৃদ্ধের বেশ ধারণ করে সালি ধানের চাল, ঘৃতকুম্ভ এবং ময়ূরের মাংস নিয়ে অমাত্যের স্ত্রীকে দিয়ে বললেন, "আর্যপুত্র এগুলো স্থবিরের জন্য প্রেরণ করেছেন।" স্থবির যথাসময়ে উত্তম আহার্য দ্বারা ভোজন করে প্রত্যাবর্তন করলেন। যথাসময়ে অমাত্যপুত্র এসে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে উপলব্ধি করতে পারলেন যে, কৃতপুণ্যের প্রভাব রুদ্ধ করা যায় না। তদবধি অমাত্যপুত্র দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। অনন্তর তিষ্য স্থবির আয়ুসংস্কার বর্জনের সময় ঘোষণা করলে ভিক্ষু-সঙ্ঘ সমবেত হয়ে তাঁর পুণ্যকর্মের হেতু জিজ্ঞেস করলেন। তিষ্য স্থবির আনুপূর্বিক বিষয় ব্যক্ত করার পর পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

যথার্থরূপে দান দিলে ফলও যথার্থরূপে প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬.৪ চূলতিষ্য কথা

লঙ্কাদ্বীপে দুট্‌ঠগামণি[৫৮] অভয়রাজের রাজত্বকালে তিষ্য নামক জনৈক কর্মচারী প্রাসাদের অভ্যন্তরে কাজ করতেন। একদা হস্তীশালা থেকে একটি দুরন্ত হস্তী শিকল ছিন্ন করে বিচরণ করতে করতে মহানিজ্ঝর নামক বিহারে উপনীত হল। সেই বিহারের বহু ভিক্ষু বৃক্ষমূলে শূন্যাগারে ভাবনা করতেন। হস্তী ভাবনারত ভিক্ষুদিগকে দেখে অতীব প্রসন্ন হলো এবং বিভিন্ন প্রকার ফলমূল সংগ্রহ করে সেবা করতে লাগল। এদিকে রাজা হস্তী অন্বেষণে চতুর্দিকে লোক প্রেরণ করলেন। তিষ্য গ্রাম-জনপদ সন্ধান শেষে উক্ত বিহারে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বন্দনা করে একান্তে উপবেশন করলেন। দুরন্ত হস্তীকর্তৃক ধ্যানরত সংযতেন্দ্রিয় ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সেবা করতে দেখে তিনি বিস্মিত ও অভিভূত হয়ে পড়লেন। এ অদ্ভূত বিষয় রাজাকে অবহিত করা হলে তিনি হস্তীকে আনয়ন করার জন্য নির্দেশ দিলেন। অমাত্যও উত্তম পানীয় দ্বারা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করে হস্তী নিয়ে নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন। অমাত্য যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করে লঙ্কাদ্বীপের আম্রবিট্‌ঠি নামক গ্রামে এক কুলগৃহে জন্মগ্রহণ করেন। নাম রাখা হয় তিষ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিস্য গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করত সদ্ধর্ম অনুশীলনে রত হন। তিনি পরবর্তী সময়ে মহাবোধি বন্দনার জন্য কতিপয় ভিক্ষু উপাসক-উপাসিকাসহ নৌকাযোগে জম্বুদ্বীপে যাত্রা করেন। পথিমধ্যে তাঁর সঙ্গীরা তৃষ্ণার্থ হলে সমুদ্রের জল পান করেছিলেন। তাঁর পুণ্যপ্রভাবে লবণাক্ত জল মিষ্টি জলে রূপান্তরিত হয়েছিল। সেই জল ছিল দিব্য পানীয় সদৃশ রসযুক্ত ও শক্তিযুক্ত। তাঁরা অনুরূপ দিব্য পানীয় পান করে জয়বোধি বন্দনা শেষে

www.pathagar.com

স্বদেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তদবধি যথায়ুষ্কাল পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করে আয়ুশেষে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পর সহস্র অপ্সরা পরিবৃত মহাদিব্য সম্পত্তি সমন্বিত দ্বাদশ যোজন পরিমাণ কনক বিমানে জন্মগ্রহণ করেন। সেখানেও তিনি প্রভূত দিব্য পানীয় প্রাপ্ত হয়েছিলেন।

শ্রদ্ধাচিত্তে অল্প পরিমাণ দানেও বহু বিভবের ভাগী হওয়া যায়।

৬.৫ তিষ্যা কথা

মহারাজ শ্রদ্ধাতিষ্যের রাজত্বকালে রোহজনপদে তিষ্যস্বতীর্থ নামে গ্রামে মুগ্ধগুপ্ত নামে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল তিষ্যা। তাঁরা উভয়ে কোনো ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে ষাট কার্যাপণ অর্থের বিনিময়ে কাজ করতেন। তখন একদা গ্রামবাসী বহু ভিক্ষু-সঙ্ঘ নিমন্ত্রণ করে দানাদি পুণ্যকর্মে রত ছিলেন। তাঁদের গৃহস্বামীও দানাদি পুণ্যকর্মে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ইহা দেখে স্ত্রী বললেন, "আমরা পূর্বজন্মে কিছু দান করি নাই বলে ইহজন্মে দুর্গত হয়ে কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করছি, যেকোনো উপায়ে আমাদের দান দেওয়া উচিততরর তেফ ণধ ডডরদথ্তল যদতর/ নেই যা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দেব।" অনন্তর স্বামী কাজে চলে গেলে তিষ্যা মোটা চালের ভাতের সঙ্গে সবজি মিশ্রিত করে পাত্রসহ নিয়ে বিহারে উপগত হলেন এবং বৃদ্ধ বয়সে প্রব্রজিত জনৈক ভিক্ষুর পাত্রে দান করলেন। ভিক্ষু এরূপ খাদ্য দেখে অতি রুষ্ট হয়ে খাদ্যসমূহ কুকুরের খাদ্যপাত্রে নিক্ষেপ করে দিলেন।

তিষ্যা ইহা দর্শন করে অতি ভারাক্রান্ত মনে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে বিছানায় শুয়ে রইলেন। স্বামী প্রত্যাগমন করে স্ত্রীর নিকট পুরো ঘটনা অবহিত হয়ে উভয়ে পরামর্শ করে তাদের একমাত্র সন্তানকে আট কার্যাপণে বিক্রী করে তদ্বারা একটি গাভী ক্রয় করে আনলেন। গাভী পরদিনই বাচ্চা প্রসব করল। পুণ্যকর্ম করার ইচ্ছায় ক্রীত হয়েছিল বলে সেই গাভী প্রতি সকালে চার নালী ও বিকালে চার নালী পরিমাণ সুগন্ধময় ঘি দিত। তদবধি তারা সকালে ঘি দ্বারা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে ঘি-ভাত ও বিকালের ঘি দ্বারা পূজা দিতেন। ক্রমান্বয়ে এই সংবাদ প্রচারিত হলে জনৈক রাজকর্মচারী রাজাকে এ বিষয় অবহিত করেন। রাজা উক্ত গাভীসহ একশটি গাভী নগর হতে রাজবাড়িতে নিয়ে আসার নির্দেশ দান করেন। নির্দেশমত গাভী রাজাঙ্গনে আনা হলো। রাণীকে গাভী দোহনের ভার দেওয়া হলো, কিন্তু একবিন্দু ঘিও নির্গত হলো না। অনন্তর রাজা গাভীর মালিক তিষ্যাকে আনালেন এবং সর্বালংকারে ভূষিত করে গাভী দোহন করতে নির্দেশ দিলেন। তিষ্যা গাভীর স্তনে স্পর্শ করার সাথে সাথে প্রচুর পরিমাণে তৈল (ঘি) স্তন হতে বের হলো। রাজা এদৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে জিজ্ঞেস করলেন, "এতদিন এত বিপুল পরিমাণ তৈল তোমরা কি করতে?" তিষ্যা আনুপূর্বিক বিষয় রাজাকে অবহিত করলেন। রাজা সন্তুষ্ট হয়ে তাঁর স্বামীকে রাজকর্মচারী হিসেবে নিয়োগ করলেন। তাঁরা সেখানে অবস্থানকালে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ও দানশীল হও, দারিদ্র্য বিদূরীত হবে।

www.pathagar.com

৬.৬ আর্যগালতিষ্য কথা

রোহণ জনপদে কোনো এক ব্যক্তি বোধি অঙ্গনে বোধিবৃক্ষ ও ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বন্দনা ও সেবা করতেন। সুগন্ধ জল দ্বারা বোধি অঙ্গন ধৌত করে দিতেন ও দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। অতঃপর আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর সেই জনপদে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় তিষ্য। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি বুদ্ধ শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু মন সংযত করতে অসমর্থ হয়ে শাসন ত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিলেন। অনন্তর তিনি চীবর ত্যাগ করে উলঙ্গ হয়ে গঙ্গার জলে পড়ে চীৎ হয়ে কাষ্ঠফলকের ন্যায় নদীর নিম্নদিকে ভেসে যেতে লাগলেন। সে সময় দু'জন কুমারী নদীতে স্নান করতে গিয়ে কাষ্ঠরূপ ভাসমান অবস্থায় তিষ্যকে দেখে উভয়ে গ্রহণ করার জন্য তাঁর নিকট উপনীত হল। তাঁকে নগ্ন দেখে একজন কাপড়ের জন্য বাড়ি গেল অপরজন স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র থেকে এক খণ্ড ছিঁড়ে তাকে পরিয়ে বাড়ি নিয়ে গেল। সেই কুমারীর নাম ছিল সুমনা। সুমনার মাতাপিতা তাঁর সঙ্গে বিয়ে দিলেন। তিষ্য কোন কাজকর্ম করত না বলে সকলে নিষ্কর্মা তিষ্য নামে ডাকত। সুমনার মাতাপিতা কিছুদিন পর তাদের উভয়কে চাল ও একটি পাত্র দিয়ে পৃথক করে দিলেন। অসহায় অবস্থায় পড়ে সুমনা ক্রন্দন করতে লাগল। তিষ্য সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, "আমি যে কোনো উপায়ে জীবিকা নির্বাহ করব, তুমি কোনো চিন্তা করো না। আমি উপার্জনে যাচ্ছি, যতদিন পর্যন্ত না আসি ততদিনে যে কোনোভাবে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দেবে।" এরূপ বলে তিনি তাঁর পিতার বন্ধুর বাড়ি গিয়ে কাজ নিলেন। তিনি পাঁচশ করীস (A square measure of land) পরিমিত জমির শস্য একদিকে কেটে ফেললেন এবং শস্যরাশি মর্দন করে পৃথক করে দিলেন। গৃহকর্তা তার এরূপ কর্মকুশলতা দেখে অতি প্রসন্ন হয়ে তাকে বহু শস্য ও অর্থ প্রদান করলেন। তিষ্য সেগুলো নিয়ে স্বগৃহে প্রত্যাগমন করলেন। তখন থেকে তিনি দৈনন্দিন আটজন ভিক্ষুকে আহার্য দান করতেন। তিনি ক্রমান্বয়ে ভিক্ষুসংখ্যা বৃদ্ধি করে পাঁচশ ভিক্ষুকে প্রত্যেক দিন দান দিতেন।

অনন্তর অনুরাধপুর হতে পাঁচশ ভিক্ষু তিষ্যের গ্রামে উপস্থিত হয়েছিলেন। তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহার্য দান করে জিজ্ঞেস করে জানতে পারলেন যে চেতিয়ম্বর বিহারে, অনুরাধপুরে ও নাগদ্বীপে এই তিন স্থানে বহুশত ভিক্ষু-সঙ্ঘ বাস করেন। তিনি উক্ত তিন স্থানে গমন করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিয়েছিলেন এবং তখন হতে আর্যগালতীর্থ নামক স্থানে বাস করতে লাগলেন। তিনি আর্যগালতীর্থে বাস করতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল আর্যগালতিষ্য। আর্যগালতিষ্য একদা গঙ্গাধারে বাস করার সময় দেবরাজ শক্র তার পুণ্যকর্ম পরীক্ষা করার জন্য উপস্থিত হয়ে ব্রাহ্মণের রূপধারণ করে নৌকায় বসে রইলেন। তিষ্য তাঁকে অপর তীরে পৌঁছালেন। ব্রাহ্মণ বললেন, "ওহে, আমি অপর পারে যষ্ঠি ফেলে এসেছি।" তিনি পুনরায় পরপারে গিয়ে যষ্ঠি এনে দিলেন। এভাবে কয়েকবার পারাপার করালেন। কিন্তু তিষ্য বিন্দুমাত্র অসন্তুষ্টিবোধ করেনি। অতঃপর দেবরাজ স্বরূপ ধারণ করে তাঁকে বহুবিধ ধন-সম্পত্তি প্রদান করে অপ্রমত্তভাবে বাস করার উপদেশ দিয়ে

www.pathagar.com

প্রস্থান করলেন। তদবধি তিষ্য বহুবিধ দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে সেখানে বাস করতে লাগলেন।

অনন্তর একসময় প্রিয়ঙ্গুদ্বীপবাসী ভিক্ষুদের মধ্যে আলোচনা হচ্ছিল যে, বর্তমানে সর্বাধিক শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি কে? কেহ বললেন যোনক রাজপুত্র, কেহ বললেন আর্যগালতিষ্য। পরীক্ষা করার জন্য সতিসম্বোধি স্থবির আর্যগালতিষ্যের গৃহে গমন করলেন আর বুদ্ধরক্ষিত স্থবির গেলেন যোনক রাজপুত্র সমীপে। তখন সুমনা দেবী দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুকে দশবার দান দিয়ে দানের বিষয় স্মরণ করে উপবিষ্ট ছিলেন। সতিসম্বোধি স্থবিরকে দেখে অতি তড়িৎ বেগে ভিক্ষুর জন্য উৎকৃষ্ট আহার্যের ব্যবস্থা করলেন এবং তা ভিক্ষুর পাত্রে অর্পণ করে ভিক্ষুর হাতে সমর্পণ করতে গেলে স্থবির বললেন, "আপনার পুণ্য প্রভাব স্মরণ করে পাত্র আকাশে নিক্ষেপ করুন।" তিনি তাই করলেন এবং তাঁর পুণ্য প্রভাবে পাত্র আকাশে স্থিত হল, স্থবির পাত্র নিয়ে বিহারে প্রত্যাবর্তন করে বুদ্ধরক্ষিত স্থবির ফেরার পূর্বে ভিক্ষুদের কাছে পাত্র দিয়ে আহার করতে লাগলেন। বুদ্ধরক্ষিত স্থবিরসহ অন্য ভিক্ষুগণ এ দৃশ্য দেখে সাধুবাদ প্রদান করলেন।

এভাবে আর্যগালতিষ্য ও সুমনাদেবী বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে উভয়ে তাবতিংস স্বর্গে জন্মলাভ করেন।

পূতপবিত্র ক্ষেত্রে দান করলে ইপ্সিত বস্তু লাভ করা যায়।

৬.৭ গ্রাম্য বালিকার কথা

লঙ্কার দক্ষিণ পার্শ্বে ব্রহ্মলোক নামে একটি গ্রাম ছিল। সেই গ্রামের লোকজন মাঠে পক্ক ফসল (মাস কলাই) সংগ্রহের জন্য গমন করলে সেই গ্রামে জনৈক ভিক্ষু এসে পানীয় জল অন্বেষণ করার সময় এক বালিকা কোনো গৃহে সঞ্চিত জল এনে ভিক্ষুকে দান করেছিল। গৃহস্বামী যথাকালে গৃহে প্রত্যাগমন করে পানীয় জল না পেয়ে বালিকাটিকে জিজ্ঞেস করে পূর্বোক্ত বিষয় জানতে পারল। এতে গৃহস্বামী রুষ্ট হয়ে তাকে ভৎর্সনা করে বলল, "আমরা সারাদিন মাঠে কাজ করে তৃষ্ণার্থ হয়েছি, আমাদের জন্য পানীয় জল আন।" বালিকা তাদের প্রতি রুষ্ট না হয়ে কলসি নিয়ে তাদের জন্য জল 'আহরণ করব' বলে তার শ্রদ্ধাবল স্মরণ করে মাঠের দিকে তাকাল। তার শ্রদ্ধাবলে মাটি ভেদ করে জলরাশি উত্থিত হয়ে পৃথিবী পৃষ্ঠ প্লাবিত হতে লাগল। বালিকা উক্ত জলে স্নান করে জলে কলসি পূর্ণ করে তৃষ্ণার্থ জনগণকে দান করতে লাগল। জনগণ বালিকার নিকট স্নান করার ইচ্ছা প্রকাশ করল। তখন বালিকা সত্যক্রিয়া করল, "এই জলরাশি যদি আমার পুণ্যপ্রভাবে উৎপন্ন হয়ে থাকে তাহলে সকলে ব্যবহার উপযোগী হোক।" তৎক্ষণাৎ সেই জলরাশি বিস্তার প্রাপ্ত হয়ে সকলে ব্যবহার করার মত হয়ে গেল। মানুষেরা তথায় স্নানাদি করে জল আহরণ করল। পরবর্তী সময়ে এখানে মাসপৃষ্ঠ নামেও একটি গ্রাম প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। বালিকা আজীবন শীল রক্ষা করে, দানাদি

www.pathagar.com

সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর বহু বিভবময় তাবতিংস দেবলোকে উৎপন্ন হয়ে ঐশ্বর্য ভোগ করেছিল।

শ্রদ্ধাসহকারে দান দিলে প্রভূত ফলের অধিকারী হওয়া যায়।

৬.৮ ধর্ম কথা

সিংহল দ্বীপে লজ্জিতিষ্য[৫৯] মহারাজের রোহণ জনপদে সিব নামে এক গ্রাম ছিল। সেই গ্রামে ধর্মা নাম্নী জনৈক মহিলা পরের গৃহে কাজ করে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করত। তখন গিরিতিম্বিলতিষ্য বিহার হতে পাঁচশ ভিক্ষু ভিক্ষার জন্য সিব গ্রামে আগমন করেছিলেন। ধর্মা ভৃত্যের কাজ করে বিনিময়ে একখানা কাপড় প্রাপ্ত হয়েছিল। সে শ্রদ্ধান্বিত হয়ে উক্ত কাপড় খানা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করল এবং যাঁর প্রয়োজন তাঁকে ব্যবহার করার জন্য প্রদান করতে অনুরোধ করল। ভিক্ষুদের মধ্যে সকলে উক্ত কাপড় পরিধান করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। অবশেষে কাপড় খানাকে কপ্পবিন্দু করে চীবরে পরিণত করলেন এবং প্রত্যেক ভিক্ষু কিছু সময়ের জন্য পরিধান করার সিদ্ধান্ত নিলেন। যিনি পরিধান করেন তিনি অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হতে লাগেলেন। এভাবে পাঁচশ ভিক্ষু সকলেই অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। অতঃপর বর্ষা শেষে উক্ত চীবরখানিকে বিহারের সম্মুখে ধ্বজা করে উত্তোলন করে দিলেন। প্রবারণা উপলক্ষে সমগ্র জনপদ বিভিন্ন রঙবেরঙের পতাকা দ্বারা সজ্জিত করা হয়েছিল। রাজ্যের বিহার দ্বারে সেই চীবর-ধ্বজা প্রত্যক্ষ করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে জিজ্ঞেস করলেন, "আমি অতি মনোরম ধ্বজা প্রেরণ করেছি, অথচ এইরূপ ধ্বজা উত্তোলন করা হলো কেন?" ভিক্ষুগণ বললেন, "এই অর্হৎ ধ্বজা অতি উপকারী, পাঁচশ ভিক্ষু এর দ্বারা আসবমুক্ত হয়েছেন।" এরূপ বলে ভিক্ষুগণ আনুপূর্বিক বিষয় রাজাকে অবহিত করলেন। রাজা সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে ধর্মাকে ডেকে বহু সম্পত্তি ও সিব গ্রাম দত্তক হিসেবে দান করলেন। ধর্মাও তদবধি শীল পালন ও দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হয়েছিল।

দৈন্যের মধ্যেও সামান্য পরিমাণ শ্রদ্ধাচিত্তে দান দিলে প্রচুর ভোগ সম্পত্তি প্রাপ্ত হওয়া যায়।

৬.৯ কিঞ্চিসজ্ঝা কথা

তখন লঙ্কাদ্বীপের রাজা ছিলেন কাকবর্ণ তিষ্য।[৬০] তাঁর সঙ্ঘ নামে এক অমাত্য ছিলেন। রাজা তাঁকে রোহণ নামক মহাগ্রাম দত্তক হিসাবে প্রদান করলে তিনি তাঁর কনিষ্ঠ চূলসঙ্ঘকে অমাত্যপদের ভার অর্পণ করে উক্ত মহাগ্রামে বসবাস করতে লাগলেন। তাঁর কিঞ্চিসজ্ঝা নাম্নী অতি সুন্দরী ও কর্মনিপুনা এক কন্যা ছিল। সে সবসময় ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহার্যদি দ্বারা সেবা করত। সঙ্ঘমাত্য ছিলেন প্রজা উৎপীড়ক। তাঁর উৎপীড়নে অতিষ্ট হয়ে প্রজাবৃন্দ তিষ্যরাজকে অবহিত করল। রাজা চুল্লসঙ্ঘকে সঙ্ঘমাত্যের নিকট এই বলে প্রেরণ করলেন যে, সে যেন প্রজা উৎপীড়ন বন্ধ করে, অন্যথা তার সমূহ ক্ষতি হবে।

www.pathagar.com

কনিষ্ঠের মুখে রাজা কর্তৃক প্রেরিত সংবাদ প্রাপ্ত হয়ে সঙ্ঘমাত্য ভীত হয়ে স্ত্রী কন্যা ও ধন-সম্পত্তি নিয়ে পলায়ন করতে লাগলেন। ক্রমান্বয়ে নিগ্রোধসালে উপগত হয়ে ভাবতে লাগলেন, "আমাদের একমাত্র অন্তরায় এই কন্যা। তার কারণে পথিমধ্যে আমাদের ভয়ের উদ্ভব হতে পারে।" তিনি স্ত্রীর সঙ্গে পরামর্শ করে কন্যাকে বলল, "আমরা প্রত্যাগন না করা পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা কর, আমরা খাদ্যান্বেষণে যাচ্ছি।" এরূপ বলে কন্যাকে সেখানে দাঁড়িয়ে রেখে তাঁরা পলায়ন করলেন।

কিঞ্চিসজ্ঘা পথিমধ্যে সাতদিন দাঁড়িয়ে রইল। অনেকে তাকে ঘরে নিয়ে যেতে চাইল কিন্তু পিতার কথা স্মরণ করে কোথাও গেল না। অনন্তর দেবরাজ ইন্দ্র পৃথিবীতে বিচরণ করার সময় 'এই কুমারীকে পরীক্ষা করব' চিন্তা করে এক রূপবান শক্ত সমর্থ যুবকের রূপ ধারণ করে তার নিকট উপগত হয়ে প্রেম যাচনা করলেন এবং বিয়ের প্রস্তাব দিলেন। উত্তরে সজ্ঘা বলল যে, তার মাতাপিতার মত সাপেক্ষে এটা সম্ভব। ইন্দ্র তার হাতে একটি ভাতের পাত্র আহারের জন্য দিয়ে প্রস্থান করলেন। সে পাত্র হাতে নিয়ে ভাবল যে, এখনও ভিক্ষুগণের আহারের সময় আছে। সে তখন সময় ঘোষণা করলে চিত্তলপর্বত[৬১] বিহারবাসী এক অর্হৎ আকাশমার্গে এসে তার সামনে উপস্থিত হলেন। সে প্রসন্ন চিত্তে পাত্র গ্রহণ করে অন্ন দ্বারা পূর্ণ করে দিল, অন্তরালে গিয়ে গাছের পাতা পরিধান করে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র ধৌত করে চুম্বটক (ভিক্ষাপাত্র নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত) তৈরি করে ভিক্ষাপাত্রটি চুম্বটকে রেখে স্থবিরকে দান করলেন। স্থবির আকাশপথে স্বীয় বিহারে প্রত্যাগমন করলেন। কিঞ্চিসজ্ঘা অবশিষ্ট অন্ন ভোজন করে দানের বিষয় মনন করছিলেন। তখন রাজপ্রাসাদে অধিষ্ঠিত দেবতা সাধুবাদ দিয়ে দান অনুমোদন করলে রাজা দেবতাকে সাধুবাদের কারণ জিজ্ঞেস করলেন। দেবতা সমস্ত বিষয় ব্যক্ত করলে সজ্ঘাকে আনবার জন্য রথসহ অমাত্যকে পাঠিয়ে দিলেন। অমাত্য এসে তাকে রথে আরোহণের জন্য আহ্বান করলে সে নদীতে স্নান করে সূক্ষ্ম কাপড়ের জন্য হাত বাড়াল, তার পুণ্য প্রভাবে পাঁচটি অক্ষয় দিব্যবস্ত্রের উৎপন্ন হলো। সে একখানা নিজে পরিধান করল, একখানা ভিক্ষুদের চীবরের জন্য দান করল। অন্যগুলো পরিবার পরিজনকে দান করল। অতঃপর রাজপ্রাসাদে উপনীত হলে রাজা তার প্রতি তুষ্ট হয়ে তাকে প্রচুর ধন-সম্পদ দান করলেন এবং স্বীয় পুত্রের সঙ্গে বিয়ে দিলেন। অতঃপর রোহণ জনপদ তাদের দত্তক দিয়ে সেখানে বাসের ব্যবস্থা করে দিলেন। কিঞ্চিসজ্ঘা তদবধি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর স্বর্গবাসী হয়।

দানের দ্বারা স্বর্গপ্রাপ্ত হওয়া যায়, দানের দ্বারা দুর্গতি নিবারিত হয়, তাই সর্বদা দান দেওয়া উত্তম।

৬.১০ শ্রদ্ধাবতী সুমনার কথা

অনুরাধপুরের বালুকাবীথিতে সুমনা নাম্নী এক শ্রদ্ধাবতী মহিলা ছিল। সে নিত্যদিন চৈত্য ও বোধিবৃক্ষ পুষ্প দ্বারা পূজা করত এবং ধর্মশ্রবণ ও ভিক্ষুগণের সেবা করত। শ্রদ্ধার কারণে

www.pathagar.com

সে শ্রদ্ধাসুমনা নামে পরিচিতি লাভ করে। একদা রোহণ জনপদের মহাগ্রামের জনৈক ব্যক্তি কোনো কর্মোপলক্ষে বালুকাবীথিতে অবস্থান করার সময় সুমনার সঙ্গে পরিচয় হয়। সুমনা তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে বিয়ে করে। বিয়ের পর উভয়ে মহাগ্রামে স্বামীর গৃহে গিয়ে বাস করতে থাকে। সুমনা প্রতিদিন আটজন ভিক্ষুকে দান দিত, ধর্ম শ্রবণ করত এবং বোধি-চৈত্য বন্দনা করত। তার স্বামী ছিল শ্রদ্ধাহীন। একসময় সে বিরক্ত হয়ে সুমনাকে গৃহ হতে তাড়িয়ে দিল। সুমনা সাত দিন বাইরে অতিবাহিত করার পর নিরুপায় হয়ে অনুরাধপুরে মাতাপিতার নিকট প্রত্যাগমন করেছিল। ক্রমান্বয়ে চৈত্যাদি বন্দনা করে নিগ্রোধসালখণ্ডদ্বারে উপনীত হলে দেব মনুষ্যলোকে বিচরণকারী ইন্দ্র মানুষের রূপ ধারণ করে তাকে একপাত্র অন্ন প্রদান করলেন। সুমনা কোনো ভিক্ষু আগমনের জন্য কাল ঘোষণা করলো। সেই মুহূর্তে ধ্যান হতে উত্থিত হয়ে নলঙ্গ সমুদ্র পর্বতবাসী মহাধর্মদিন্ন স্থবির তার ঘোষণা শ্রবণ করে পাত্রচীবর নিয়ে তার অদূরে দাঁড়ালেন। সুমনা তাঁর পাত্র গ্রহণ করে অন্তরালে গিয়ে গাছের পাতা পরিধান করে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র দ্বারা চুম্বকট তৈরি করে পাত্র অন্নে পূর্ণ করে স্থবিরকে দান করল। স্থবির পাত্র নিয়ে দৃশ্যমান অবস্থায় আকাশপথে প্রস্থান করলেন। সুমনা সেই বৃক্ষমূলে আহার গ্রহণ করল। তখন সেই বৃক্ষের দেবতা আটটি দিব্য বস্ত্র ও দিব্য আহার্যের একটি থলে নিয়ে একটি শকটযোগে সেই পথ দিয়ে যাবার সময় সুমনা কোথায় যাবে জানতে চাইলেন। সুমনাও তার গন্তব্যস্থানের কথা বললে দেবতা বললেন, "তাহলে গাড়িতে আরোহণ কর, আমিও অনুরাধপুরে যাব।" দেবতা দৈবশক্তিতে মুহূর্তের মধ্যে অনুরাধপুরে পৌঁছে দিয়ে তাকে থলেটি দিয়ে শকট থেকে নামিয়ে দিলেন। সে অনুরাধপুরে উপনীত হয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দেখে দিব্যবস্ত্র ও আহার্য দান করলো। রাজা বিহারে গিয়ে প্রচুর পরিমাণে বস্ত্র ও আহার্য দেখে 'এসব কে দান করেছে' জানতে চাইলেন। শ্রদ্ধাসুমনা কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে জেনে তিনি অতি তুষ্ট হলেন এবং তাঁকে অগ্রমহিষী করে নিলেন।

শ্রদ্ধাবানকে দেবগণও সাহায্য করেন এবং তিনি বহু সম্পত্তির অধিকারী হন।

৭. যোদ্ধা বর্গ

৭.১ কাক কথা

সিংহল দ্বীপে রোহণ জনপদের মহাগ্রামের অনতিদূরে কাকবোধি নামে একটি বৃক্ষে একটি কাক বাস করত। সে একদা বিচরণ করতে গিয়ে নাগদ্বীপের কোনো তালবৃক্ষে বসবাসরত একটি কাকীকে স্ত্রী করে নিয়ে আসে। কিছুদিন পর কাক অন্য একটি কাকীর সঙ্গে যৌনকর্মে লিপ্ত হতে দেখে তার স্ত্রী ক্রুদ্ধ হয়ে নাগদ্বীপে চলে যায়। কয়েক দিন পর কাক স্ত্রীর জন্য শোকাহত হয়ে তাকে আনবার জন্য যাবার পথে রোলিয় জনপদে মাতুল বিহারে উপনীত হয়। সেই সময় ভিক্ষুগণ আহারকৃত্য সম্পাদন করছিলেন। কাক অনতিদূরে একটি বৃক্ষে বসে স্বীয় ক্ষুন্নিবৃত্তি করার জন্য আহার প্রার্থনা করল। স্থবির কাকের শব্দ বুঝতেন। তিনি শ্রামণকে আহ্বান করে কাককে আহার্য দিতে বললেন। কাক

www.pathagar.com

আহার ভক্ষণ করে 'যাবার সময় দেখা করব' বলে নাগদ্বীপে স্ত্রীর নিকট চলে গেল। স্ত্রীর সঙ্গে কয়েক দিন অতিবাহিত করার পর স্ত্রীসহ প্রত্যাবর্তন কালে উক্ত বিহারে উপগত হয়ে তাদের আগমনের বিষয় স্থবিরকে জানাল। স্থবিরও পূর্ববৎ খাদ্য প্রদান করলেন। আহারান্তে কাক বলল, "আর্যগণ এখানে অতিকষ্টে বাস করছেন, আপনারা আমার সঙ্গে গমন করুন যেখানে পর্যাপ্ত আহার্য ও চীবরাদি পাওয়া যায়।" কাকের কথায় পঁচিশজন ভিক্ষু মাতুল বিহার হতে চুয়াল্লিশ যোজন দূরবর্তী মচল বিহারে যাবার পথে কাক জনগণকে উৎসাহিত করে দানাদি প্রদানের ব্যবস্থা করে। কাক পূর্বাহ্নে জানিয়ে দিত যে কোথায় কোথায় ভিক্ষান্ন সুলভ এবং কোথায় কোথায় শ্রদ্ধাবান দায়ক-দায়িকা আছে। এভাবে ভিক্ষুগণ মহাবিহারে বর্ষা তিন মাস অতিক্রান্ত করে প্রবারণা করার জন্য পূর্বোক্ত বিহারে প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে কাক গোঠসমুদ্রের কাছে এক উপাসিকা বহু চীবর ও অষ্টপরিষ্কার তৈরি করে দান করার জন্য অপেক্ষা করেছেন বলে জানাল এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘকে সেখানে নিয়ে গেল। ভিক্ষুগণ তথায় প্রয়োজনীয় চীবর ও সামগ্রী প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কাক এভাবে ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি প্রসন্ন হবার কারণে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে।

উপকারীর প্রতি কৃতজ্ঞ থাকা উচিত।

৭.২ কাকবর্ণ তিষ্যমহারাজ কথা

ভগবানের আবির্ভাবের পূর্বে জম্বুদ্বীপের মিলক্ষ[৬২] জনপদের প্রত্যন্ত গ্রামে এক ব্যাধ বাস করত। সে এক সময় জনৈক প্রত্যেক বুদ্ধকে যাগূভাত দ্বারা সেবা করেছিল। সে একদা কাঁঠালের বীজ বপন করেছিল এবং উক্ত বীজ অচিরে বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে বৃক্ষে কাঁঠাল ধরেছিল। সে প্রত্যেক দিন বুদ্ধকে আহার্য দান করত। একদিন সে কার্যোপলক্ষে বাইরে যাবার সময় স্ত্রীর উপর দানের ভার প্রদান করেছিল। প্রত্যেক বুদ্ধ যথাসময়ে গৃহে আগমন করলে তাঁর স্ত্রী উত্তম খাদ্য দিয়ে আহার করাল। বুদ্ধের প্রতি তার কামচিত্ত উৎপন্ন হয়েছিল, তাই আহারান্তে সে কাম যাচনা করল। প্রত্যেক বুদ্ধ কামের অপকারিতা সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে প্রস্থান করলেন। উক্ত বিষয় প্রকাশ পেলে তার জীবননাশের আশঙ্কা করে স্ত্রী শরীর নখ দ্বারা ক্ষত-বিক্ষত করে পীড়িতের মত বিছানায় শুয়ে রইল। তার স্বামী আসলে বুদ্ধের নামে মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বলল, "আমি তাঁর কামলিপ্সা পূরণ করিনি বলে আমাকে আহত করে চলে গেছে।" সে অতীব ক্রুদ্ধ হয়ে প্রত্যেক বুদ্ধকে হত্যা করার জন্য তীর-ধনু নিয়ে তড়িৎ বেগে আশ্রমে গেল। তখন প্রত্যেক বুদ্ধ স্নান করে শূন্যে স্থিত হয়ে চীবর পরিধান করছিলেন। তাঁর এরূপ অলৌকিক ঋদ্ধি দেখে সে ভাবল, "এই মহাপুরুষ কখনও কথিত খারাপ কাজ করতে পারেন না।" তখন সে সমস্ত বিষয় বর্ণনা করে বুদ্ধের পাদমূলে বন্দনা করে ক্ষমা প্রার্থনা করল। তদবধি প্রত্যেক বুদ্ধের সেবা করে সে যথাসময়ে মৃত্যুবরণ করে কামাবচর ব্রহ্মলোকে উৎপন্ন হয়ে দিব্য সুখ ভোগ করে মনুষ্য লোকে লংকাদ্বীপের মলয়দেশে[৬৩] অমরুৎপল সমীপে ব্যাধগ্রামে ব্যাধ (শিকারী) রূপে জন্মগ্রহণ করে। অল্প বয়সে খেলা করার সময় হতে সে ভিক্ষুদের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন

www.pathagar.com

কয়ে উঠে। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে ভিক্ষু-সঙ্ঘের সেবা করে যাবজ্জীবন অতিবাহিত করে এবং মৃত্যুর পর গোঠাভয় রাজার পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে। তখন তার নাম হয় কাকবর্ণতিষ্য। তার অগ্রমহিষীর নাম বিহারদেবী। তিনি ছিলেন কল্যাণতিষ্য রাজ্যের কন্যা। তাঁর আনুপূর্বিক কাহিনী নিম্নরূপ ঃ

সিংহলদ্বীপে কল্যাণতিষ্য[৬৪] নামে এক রাজা রাজত্ব করতেন। তাঁর কনিষ্ঠ উত্তিয় ছিলেন উপরাজ। রাজমহিষীর সাথে উপরাজের আন্তরিকতা হয়। কল্যাণতিষ্য এ বিষয় অবগত হলে উত্তিয়কে বন্দি করতে আদেশ দেন। উত্তিয় ভীত হয়ে অজ্ঞাতবেশে অন্যত্র পলায়ন করেন। একদা তিনি একখানা পত্র লিখে দেবীকে দেওয়ার জন্য এক যুবককে ভিক্ষুর বেশে পাঠিয়েছিলেন। ছদ্মবেশী ভিক্ষু রাজগুরু কল্যাণীয় স্থবিরের সঙ্গে রাজপ্রসাদে প্রবেশ করে। স্থবির মনে করেছিলেন যে, সে রাজাপ্রাসাদে নিমন্ত্রিত। আর রাজকর্মচারীরা মনে করেছিল, সে স্থবিরের অন্তেবাসিক। মধ্যাহ্ন আহার শেষে স্থবিরসহ প্রত্যাগমন করার সময় ঐ ছদ্মবেশী ভিক্ষু চিঠিখানা রাণীর দৃষ্টিগোচরে নিক্ষেপ করল। চিঠির পতন শব্দ শুনে রাজা কল্যাণতিষ্য দেখতে পলেন। তিনি চিঠিখানা গ্রহণান্তে পাঠ করে বুঝতে পারলেন, "এটা রাণীকে লেখা প্রেমপত্র।" এবং চিঠির হস্তাক্ষর ছিল স্থবিরের হস্তাক্ষরের ন্যায়। রাজা স্থবিরের প্রতি ভীষণ রুষ্ট হয়ে তাঁকে তৎক্ষণাৎ তপ্ত তৈলাধারে নিক্ষেপ করার নির্দেশ দেন। নির্দেশ মত স্থবিরকে ফুটন্ত তৈলাধারে নিক্ষেপ করা হলো। সে সময় উক্ত স্থবির বিদর্শন ধ্যান বর্ধিত করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। ফলে উত্তপ্ত তৈলাধারে নিক্ষিপ্ত হয়েও নদীতে রাজহংসবৎ বেঁচে রইলেন।[৬৫] অমাত্যগণ রাজাকে নিবৃত্ত করার চেষ্টা করেও ব্যর্থ হলেন। তখন দেবগণ কুপিত হয়ে জলোচ্ছ্বাসের সৃষ্টি করলেন। অবশেষে রাজা ভীত হয়ে স্বীয় দ্বাদশ বর্ষীয় কন্যাকে একটি পাত্রে রেখে তার উপর 'কল্যাণতিষ্যের কন্যা' এই বাক্যটি লিখে সমুদ্রের দেবতার বলির জন্য ভাসিয়ে দিলেন। পাত্র নিম্নমুখী ভাসতে ভাসতে রোহণের কোট্‌টাল তীরে স্থির হলো। জনগণ এ বিষয় কাকবর্ণতিষ্য রাজাকে অবহিত করল। রাজা তাঁকে উদ্ধার করে সহধর্মিণী করে নিলেন এবং নাম রাখলেন বিহারদেবী। তাঁদের গামনিকুমার ও তিষ্যকুমার নামে দুটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। তাঁরা চৌষট্টি বছর ধরে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন। কথিত আছে এই রাজা ভবিষ্যৎ মৈত্রেয়বুদ্ধের পিতা এবং বিহারদেবী মাতা হবেন।

সুচরিত কর্ম 'আচরণের দ্বারা' সুগতি লাভ করা সম্ভব।

৭.৩ দুট্‌ঠগামণি অভয়মহারাজ কথা

রোহণরাজ কাকবর্ণতিষ্য ও স্ত্রী বিহারদেবী[৬৬] মহাগ্রামে গিয়ে তিষ্যবিহারের ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিয়েছিলেন। তাঁরা ছিলেন নিঃসন্তান। সেই বিহারে জনৈক পীড়িত (মরণাসন্ন) শ্রামণের নিকট গিয়ে বিভিন্ন প্রকার বস্তুসামগ্রী দিয়ে দান করত মৃত্যুর পর তাঁদের সন্তানরূপে জন্মগ্রহণ করার জন্য অনুরোধ জানালেন। শ্রামণও সম্মত হয়ে বিহারদেবীর গর্ভে প্রতিসিদ্ধ গ্রহণের ইচ্ছা পোষণ করলেন। সেদিনই শ্রামণ মৃত্যুবরণ করে বিহারদেবীর গর্ভে প্রতিসন্ধি গ্রহণ করলেন।

www.pathagar.com

রাণী গর্ভবতী হবার পর দোহদের উৎপন্ন হলো, তাঁর ইচ্ছা হলো যে, এক উসভ পরিমাণ মধুভাণ্ড হতে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুকে মধুদান করেন এবং এলার[৬৭] র‍্যাজর রাজ্য হতে আনীত উৎপলমাল্য ধারণ ও তামিল সৈন্যের শিরধৌত জলে স্নান করবেন।

উসভ পরিমাণ পাত্র পূর্ণ করার মধু পাওয়া গেল। রাণী সেই মধু দ্বারা দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুকে দান দিলেন। এলার রাজ্য হতে উৎপল, জল ও তামিল সৈন্যের শির সংগ্রহের ভার দেওয়া হলো বেলুসুমনকে। বেলুসুমন[৬৮] মাথা মুণ্ডন করে দুটি গৈরিক বস্ত্র পরিধান করে এলার-রাজের নিকট উপনীত হয়ে বলল, "আমি আপনার যশকীর্তি বর্ণনা করায় তিষ্যরাজ আমাকে মস্তক মুণ্ডন করে তাড়িয়ে দিয়েছেন।" আমি আপনার অধীনে কাজ করব এবং অল্প সময়ের মধ্যে কাকবর্ণতিষ্যকে বন্দি করে আপনার কাছে নিয়ে আসব। রাজা খুশী হয়ে তাঁকে অশ্বসহিসের প্রধান রূপে নিয়োগ দিলেন। তিনি কিছুদিনের মধ্যে বৃহৎ পাত্রে জল এবং তৈল পূর্ণ করে একদিন দ্রুততম অশ্ব 'রণমর্দন'কে নিয়ে দ্রুত প্রস্থান করতে লাগলেন। রাজাও সৈন্যবাহিনী প্রেরণ করলেন তাঁকে ধরার জন্য। সুমন দ্রুত ছুটে গিয়ে গোপনে অশ্বের পৃষ্ঠে অসি উন্মুক্ত করে স্থিত হলে সৈন্যগণ যাবার সময় মস্তক দ্বিখণ্ডিত করে সৈন্যের দুটি শিরসহ মহাগ্রামে এসে উপস্থিত হলেন। আনীত জলে শির সিক্ত করে দেবীকে স্নান করা হলো এবং উৎপলমাল্য পরিয়ে দেওয়া হলো। অতঃপর রাণীর দোহাদ উপশম হলো।

যথাসময়ে বিহারদেবী একটি পুণ্যলক্ষণ সম্পন্ন পুত্র প্রসব করলেন। রাজা বহুবিধ দানাদি কার্য সম্পাদন করলেন। তার নাম রাখা হলো গামণি অভয়। রাণী বছরান্তে আর একটি পুত্র সন্তান প্রসব করলেন। তার নাম রাখা হয় তিষ্য। রাজা পুত্রদ্বয়কে বিভিন্ন শিক্ষায় শিক্ষিত করে গড়ে তুললেন। অতঃপর তিষ্যকুমারকে জনপদ শাসন করার জন্য সৈন্য সামন্তসহ দীর্ঘবাপি[৬৯] প্রেরণ করলেন, আর গামণি পিতার সঙ্গে রইলেন। তিনি তামিলদের পরাজিত করে শাসন প্রতিষ্ঠা করার জন্য পিতার অনুমতি প্রার্থনা করলেন। যুদ্ধ জয় করা সম্ভব কিনা চিন্তা করে পিতা কোনো মত প্রকাশ না করায় পুত্র দ্বিতীয় তৃতীয়বারও যুদ্ধ করা জন্য পিতার নিকট প্রস্তাব পাঠালেন। চতুর্থবার পিতাকে স্ত্রী অলংকার পরিধান করার জন্য সংবাদ পাঠালেন। পিতার সঙ্গে এরূপ দুষ্টুমি করেছিলেন বলে তাঁর নাম হয় দুট্ঠগামণি বা দুষ্টগামণি অভয়। অনন্তর অভয় রাগ করে মলয়ে চলে গেলেন।

পিতার মৃত্যুর পর তিষ্যকুমার দীর্ঘব্যাপি হতে এসে অন্তেষ্টিক্রিয়া সমাপ্ত করে মাতা ও কণ্ডুল হস্তীসহ পুনরায় দীর্ঘব্যাপি প্রত্যাবর্তন করেন। তখন অমাত্যগণ দুট্ঠগামণিকে মহাগ্রামে আহ্বান করে রাজপদে অভিষিক্ত করলেন। অতঃপর দুট্ঠগামণি কনিষ্ঠের নিকট বারবার দূত প্রেরণ করলেন যে, যেন মাতা এবং কুণ্ডলকে তাঁর নিকট পাঠিয়ে দেওয়া হয়। কিন্তু কনিষ্ঠ অগ্রজের সংবাদে কর্ণপাত করলেন না। উভয় ভ্রাতা সৈন্য বৃদ্ধি করে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। যুদ্ধে জ্যেষ্ঠ পরাজিত হয়ে কপ্পকন্দর নদীর[৭০] জবমাল নামক পোতাশ্রয়ে উপগত হন। সেখানে তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহার্য দান করে পুনরায় মহাগ্রামে প্রত্যাবর্তন করে ষাট হাজার সৈন্য সংগ্রহ করেন এবং কনিষ্ঠের সঙ্গে যুদ্ধে লিপ্ত হন। সেই

www.pathagar.com

যুদ্ধে কনিষ্ঠ পরাজিত হয়ে পলায়ন করে এক বিহারে আশ্রয় গ্রহণ করেন। বিহারের ভিক্ষুদের সহায়তায় কনিষ্ঠ দুট্ঠগামণির নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করেন। অনন্তর রাজা কনিষ্ঠকে দীর্ঘবাপি গিয়ে শস্যাদি উৎপাদনের জন্য আদেশ দিলেন, নিজেও ধন-সম্পত্তি বৃদ্ধির কাজে আত্মনিয়োগ করলেন। সৈন্যবাহিনী শক্তিশালী হলে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন এবং তামিলদের পরাজিত করে রাজকীয় অঙ্গন অধিকার করে তথাকার মহিয়ঙ্গন স্তূপ অশীতি হস্ত উঁচু করে নির্মাণ করেন।

এর আনুপূর্বিক কাহিনী ঃ বুদ্ধ বোধিলাভের নবম মাসে লঙ্কার মহানাগব উদ্যানে যেখানে যক্ষগণ মন্ত্রণা করছিল সেখানে উপস্থিত হয়ে অন্তরীক্ষ হতে বৃষ্টি-বায়ু-অন্ধকার দ্বারা ভীতির সঞ্চার করলে যক্ষগণ অভয় প্রার্থনা করে। বুদ্ধ তাদের উপবিষ্ট স্থানের বিনিময়ে অভয় দান করেন। বুদ্ধ উক্ত স্থানে প্রথমে চর্মখণ্ড বিস্তার করেন। পরবর্তী সময়ে সমস্ত যক্ষদিগকে বিতাড়িত করেন এবং উক্ত স্থানে দেবগণের সমাগম হয়। এখানে ভগবান বুদ্ধ ধর্মদেশনা করলে বহু প্রাণীর ধর্মজ্ঞান উৎপন্ন হয়। বুদ্ধ পরিনির্মাণের পর বসভ স্থবির বুদ্ধের গ্রীবাধাতু এনে ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে ঐস্থানে (যেস্থানে বুদ্ধ প্রথম উপবেশন করেছিলেন অর্থাৎ মহিয়ঙ্গন নামক স্থান) দ্বাদশ হস্ত উচ্চ একটি স্তূপ নির্মাণ করেন। পরে চূলাভয় এটাকে ত্রিশ হস্ত উচ্চ করে নির্মাণ করেন। পরবর্তীতে দুট্ঠগামণি অভয় তামিলদের পরাজিত করে এটাকে আশি হস্ত উচ্চ করে নির্মাণ করেন।

তামিল সেনারা ছিল অত্যন্ত শক্তিশালী। দুট্ঠগামণি অভয়কে দীর্ঘসময় অত্যন্ত সুকৌশলে যুদ্ধ করে তামিলদের পরাজিত করতে হয়েছিল। তাঁর সেনাবাহিনীর মধ্যে শ্রেষ্ঠ ছিলেন নন্দিমিত্র, গোটয়িম্বর, সুরনির্মল, মহাসেন ও গজরাজ কুণ্ডল। চার মাস যুদ্ধ করে দুট্ঠগামণি তামিল সেনাদের পরাজিত ও হত্যা করেছিলেন। এলার নামক রাজাকে জয় করতে আরও চার মাস সময় লেগেছিল। যুদ্ধে এলাররাজ নিহত হন। তাঁর মৃতদেহ সসম্মানে সৎকারের ব্যবস্থা করেন।

তামিল সেনা ও রাজা এলারকে যুদ্ধে নিহত করে দুট্ঠগামণি অভয়রাজ লঙ্কাদ্বীপে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি ঊনবিশতি কোটি ধন ব্যয়ে সমগ্র রাজ্যে বহু বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দেন। তিনি চব্বিশ বছর রাজত্ব করার পর আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুবরণ করে তাবতিংস দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

যাঁরা বুদ্ধ শাসনের কল্যাণ সাধনে তৎপর এবং কুশলকর্ম সম্পাদন করেন তাঁরা মৃত্যুর পর স্বর্গসুখ লাভ করেন।

৭.৪ নন্দিমিত্র কথা

এলার রাজা লঙ্কাদ্বীপে রাজত্ব করার সময় মিত্র নামে এক সেনাপতি ছিলেন। তাঁর কনিষ্ঠা ভগ্নির যথাসময়ে বিয়ে হবার পর তাঁদের একটি পুত্র জন্মগ্রহণ করে। মাতুলের নামের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে পুত্রের নাম রাখা হয় মিত্র। মিত্র অল্প বয়স থেকে অতি শক্তিশালী হয়ে উঠে। মাতা-পিতা মাঠে যাবার সময় মিত্রকে পাষাণের সাথে রশি দিয়ে বেঁধে

যেতেন। সে হামাগুড়ি দিয়ে রশি ছিঁড়ে ফেলত। অনন্তর মাতাপিতা মাঠে যাবার সময় পুত্রকেও নিয়ে যেতেন এবং একটি বাঁশ ঝাড়ের সঙ্গে রশি দিয়ে বেঁধে মাঠে কাজ করতেন। সেই ছেলে বাঁশঝাড় সমেত উত্তোলন করে হামাগুড়ি দিয়ে মাঠে নেমে আসত। অল্প বয়সে রশি (নন্দি) ছিঁড়ে ফেলত বলে তার নাম হয় নন্দিমিত্র।[৭১]

নন্দিমিত্র দ্বাদশ বছর বয়সে অনুরাধপুরে মামার নিকট গিয়ে দেখতে পান যে, তামিলগণ বুদ্ধ শাসনের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করছে ও অগৌরব পোষণ করছে। তখন তাঁর দেহে দশ হস্তীর শক্তি ছিল। তিনি এক এক করে তামিলদের হত্যা করতে লাগলেন। এ সংবাদ রাজাকে অবহিত করা হলে রাজা নন্দিমিত্রকে বন্দি করার জন্য নির্দেশ দেন। তিনি এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে রোহণ জনপদে ক্ষত্রিয় বৌদ্ধ রাজার শরণাপন্ন হন। রাজা তাঁর পরিবার-পরিজনকে মহাগ্রামে বসবাস করার ব্যবস্থা করে দিলেন। তিনি আঠারজন সেনাধ্যক্ষসহ বহু সহস্র সৈন্যবাহিনী নিয়ে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হলেন। নন্দিমিত্র সকটপঞ্জর নিয়ে বহু তামিল সেনাকে হত্যা করেন। তামিলদের পরাজিত করে লঙ্কাদ্বীপ তামিল মুক্ত করে তিনি অনুরাধপুরে বাস করেছিলেন। রাজা তাঁকে জজ্জর নদীর তীরে একটি গ্রাম দত্তক হিসাবে প্রদান করেছিলেন। অনন্তর তিনি যাবজ্জীবন দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন।

সৎ ব্যক্তিরা নিজের শক্তিকে সৎ কাজে ব্যবহার করেন।

৭.৫ সুরনির্মল কথা

তথাগত কশ্যপ বুদ্ধের সময় কোনো প্রত্যন্ত গ্রামের এক ব্যক্তি মৃগয়া করে জীবিকা নির্বাহ করত। এক সময় সে জনৈক ভিক্ষুকে বিভিন্ন উপাদেয় খাদ্য সামগ্রী দিয়ে ভোজন করিয়ে ধর্ম যাচনা করলে তিনি পঞ্চবিধ শীল সম্বন্ধে বিশদ ব্যাখা করেছিলেন। তিনি উপদেশ দিলেন, প্রাণিহত্যা হতে বিরত থাকতে, প্রাণিহত্যাকারী অল্পায়ু, দুর্দশাগস্ত, দূরারোগ্য ব্যাধিগ্রস্ত হয়। অদত্ত বস্তু গ্রহণ থেকে বিরত থাকতে, অদত্ত বস্তু গ্রহণকারী অতি দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে, ভিক্ষবৃত্তি কিংবা অপরের অনুগ্রহে জীবিকা নির্বাহ করতে হয় এবং জনগণ কর্তৃক নিন্দিত হয়। পরদার গমন থেকে বিরত থাকতে, পরদার গমনকারী সকলের অপ্রিয়ভাজন হয়, কঠিন রোগে আক্রান্ত হয়, মৃত্যুর পর নপুংসক ও দরিদ্র হয়ে জন্মগ্রহণ করে। মিথ্যা কথন থেকে বিরত থাকতে, মিথ্যুক সকলের নিকট অপ্রিয় হয়, পরম আত্মীয় ব্যক্তিও তার কথা বিশ্বাস করে না, মৃত্যুর পর বিকৃতশ্রী হয়ে জন্মগ্রহণ করে, মুখ হতে সর্বদা দুর্গন্ধ বের হয় এবং নিরয়গামী হয়ে থাকে। মাদক দ্রব্য সেবনে বিরত থাকতে, মদ্যপ ক্ষিপ্ত হয়, মস্তিষ্ক বিবৃতি ঘটে, হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বিচরণ করে, মৃত্যুর পরও নরক যন্ত্রণা ভোগ করে।

উক্ত ব্যক্তি এবম্বিধ ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে মৃগয়া ত্যাগ করে পঞ্চশীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত আয়ু অবসানে মৃত্যুর পর স্বর্গ লাভ করেন। গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে খণ্ডবিট্‌ঠি গ্রামে সজ্ঘকুটুম্বিক নামে জনৈক গৃহে জন্মগ্রহণ

www.pathagar.com

করেন। তাঁর নাম রাখা হয় নির্মল। নির্মল ক্রমান্বয়ে অতি শক্তিশালী হয়ে উঠেন। দুট্‌ঠগামণি অভয় রাজকুমার কর্তৃক ষোড়শ পাত্রপূর্ণ সুরা পান করেছিলেন বলে তাঁকে সুরনির্মল নামে অভিহিত করা হয়।

কাকবর্ণতিষ্য তামিলদের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার জন্য প্রতি গৃহ হতে একজন করে যুবক আনার নির্দেশ দান করলে নির্মলকে তাঁর পিতা সঙ্ঘকুটুম্বিক দেশরক্ষার কাজে প্রেরণ করেছিলেন। নির্মল যথাসময়ে রাজসমীপে উপস্থিত হলে রাজা তাঁর নিপুণতা পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলেন যে, এই যুবক অতি বিচক্ষণ যোদ্ধা। তাঁকে প্রভূত ধন-সম্পত্তি দিয়ে রাজকর্মে নিয়োগ দান করলেন। পরবর্তী সময়ে দুট্‌ঠগামণিসহ তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে তামিলদের নিহত এবং রাজ্য অধিকার করে দুট্‌ঠগাগামণিকে অভিষিক্ত করে সদ্ধর্ম-শাসন প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। অনন্তর পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হন।

শক্তিশালী ব্যক্তিরা সদ্ধর্মের হিতসাধনে রত হন।

৭.৬ মহাসোণ কথা

জনৈক ব্যক্তি কশ্যপ বুদ্ধের ধর্মোপদেশ শ্রবণ করে প্রসন্ন চিত্তে সঙ্ঘের উদ্দেশ্যে এক ক্ষীরশলা অন্ন দান করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে তিনি দেব-মনুষ্যলোকে বহু বিভব সুখ উপভোগ করে গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে হুন্দরিবাপি[৭২] নামক গ্রামে তিষ্য নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির অষ্টম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তার নামকরণ করা হয় সোণ। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি অসীম দৈহিক শক্তির অধিকারী হন। তাঁর অসম শক্তির বিষয় সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে প্রচার লাভ করে। তাঁর এরূপ দৈহিক শক্তির সংবাদ পেয়ে কাকবর্ণতিষ্যরাজ সহস্র টাকা ও প্রচুর উপঢৌকনের বিনিময়ে তাঁর পিতামাতার কাছ থেকে রাজঙ্গনে আনয়ন করেন। পরবর্তীকালে তিনি অভয়রাজ দুট্‌ঠগামণিসহ তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করেন। যুদ্ধে তিনি শত্রুপক্ষের আঠার হস্ত উঁচু প্রাচীর লঙ্ঘন করে তামিলদের হত্যা করে তামিল রাজ্য জয় করেছিলেন। এভাবে তিনি লঙ্কায় সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করে দুট্‌ঠগামণিকে রাজ্যাভিষিক্ত করেছিলেন। অতঃপর যথায়ুষ্কাল ধর্মত জীবন অতিবাহিত করে মৃত্যুর পর কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেন।

পুণ্যকর্মের দ্বারা বিভব লাভ করা যায়।

৭.৭ গোঠইম্বর কথা

গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে রোহণ জনপদে তিট্‌ঠিল বিট্‌ঠিল নামক গ্রামে নাগ নামক জনৈক ধনবান ব্যক্তির গৃহে গোঠইম্বরের জন্ম হয়। তার দৈহিক আকৃতি খাট ছিল বিধায় সকলে তাঁকে গোঠক ডাকত। গোঠক অল্প বয়স থেকে প্রবল দৈহিক শক্তির অধিকারী হন। এক সময় তাঁকে জমির আগাছা উত্তোলনের দায়িত্ব দেওয়া হলে তিনি ইম্বর বৃক্ষের পরিমাণ আগাছা উত্তোলন করেছিলেন বলে গোঠইম্বর নামে অভিহিত হন।

www.pathagar.com

সেইসময় অভয়রাজ দুট্‌ঠগামণি তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়ে অনুরাধপুর তামিল মুক্ত করার জন্য মহাগ্রামের সমস্ত যোদ্ধাকে আহ্বান জানালে গোঠইম্বর রাজার নিকট উপগত হয়ে যুদ্ধ করার অভিপ্রায় প্রকাশ করেন। রাজা গোঠইম্বরসহ বত্রিশজন মহাযোদ্ধা নিয়ে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। গোঠইম্বর অতি বিচক্ষণতার সঙ্গে তামিলদের যুদ্ধবূহ্য ভেদ করে অভ্যন্তরে প্রবেশ করত বহু তামিলসৈন্য নিহত করে অনুরাধপুর তামিল মুক্ত করতে সাহায্য করেছিলেন। যুদ্ধ শেষে রাজা তাঁকে বহু সম্পত্তি ও বাসস্থান প্রদান করেছিলেন।

একদা তিনি স্ত্রীসহ সুরাদি পান করে সর্বালংকারে ভূষিত হয়ে প্রাসাদে মত্ত ছিলেন, বহু সুন্দরী কর্তকী তাঁদের মনোরঞ্জর করছিল নৃত্য-বাদ্য-গীত ইত্যাদি দ্বারা। সুরা পানরত অবস্থায় অরিট্‌ঠপর্বত[৭৩] বাসী জয়সেন নামে জনৈক যক্ষ বহু যক্ষ পরিবেষ্টিত হয়ে তাম্রপর্ণী শ্মশানে যাবার পথে সুগন্ধ পুষ্পাদির ঘ্রাণ পেয়ে আকাশ হতে অবতরণ করে সভামণ্ডপে প্রবেশ করল। সেখানে গোঠইম্বরের সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি কামাসক্ত হয়ে তাঁর দেহে অদৃশ্যভাবে আশ্রয় নিল। দেবী সঙ্গে সঙ্গে সুরাপান অবস্থায় মুর্ছিত হয়ে গেলেন। তখন গোঠইম্বর বুঝতে পেরে ক্রুদ্ধ হয়ে বললেন, "তুমি কাপুরুষের মত অদৃশ্য অবস্থায় কেন আমার স্ত্রীকে কষ্ট দিচ্ছ, তুমি দৃশ্যমান হয়ে আমার সঙ্গে যুদ্ধ কর, দেখি তোমার পৌরুষত্ব।" যোদ্ধার কথা শুনে যক্ষ স্ত্রীর দেহ হতে নির্গত হয়ে কিম্ভুত কিমাকার দেহে বলল, "তুমি তো অতি তুচ্ছ প্রাণী, কত বৃহৎ প্রাণীকে যুদ্ধে পরাজিত করে আমি জয়সেন যক্ষ নামে অভিহিত হয়েছি। তাম্রপর্ণী শ্মশানে যক্ষ সমাগমে তোমার সঙ্গে আমার যুদ্ধ হবে।" এরূপ বলে যক্ষ প্রত্যাগমন করল। গোঠইম্বরও যথাসময়ে তাম্রপর্ণী শ্মশানে উপস্থিত হয়ে যক্ষকে যুদ্ধে আহ্বান করলেন। উভয়ে তুমুল যুদ্ধ আরম্ভ করল। গোঠইম্বর আকাশে উত্থিত হয়ে পায়ের আঙ্গুলি দ্বারা যক্ষের পৃষ্ঠে প্রবলভাবে আঘাত করলেন, যক্ষ মৃত্যুবরণ করল।

অনন্তর গোঠইম্বর পরিবারের করণীয় কর্ম সম্পাদন করে বিদায় নিয়ে গুণবান বুদ্ধ পুত্রের সন্ধানে হিমালয়ের বারযোজন ঢালু স্থানে উপগত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন। তিনি বিদর্শন ধ্যান করে অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করে যথাসময়ে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

সৎ ব্যক্তিরা বিভিন্নভাবে শাসনের কল্যাণ সাধন করে অন্তিমে নিজেও অমৃদপদ লাভে সক্ষম হন।

৭.৮ থেরপুত্রাভয় কথা

বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে রোহণ কোটপবর্তের[৭৪] নিকটে কত্তি গ্রামে রোহণ গৃহপতির এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। পিতামাতা তাঁর নাম রাখেন গোঠকাভয়রাজ। পূর্বজন্মে কশ্যপবুদ্ধকে ক্ষীরন্ন দান করার ফলে গোঠকাভয় এই জন্মে অসম দৈহিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তাঁর পিতা মহাসুমনস্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যান দ্বারা অর্হত্ত্বফল লাভ করেছিলেন। তিনি পুত্র গোঠকাভয়কেও প্রব্রজ্যা দান করেছিলেন। তখন

www.pathagar.com

থেকে তাঁর নাম হয় থেরপুত্র অভয়। তিনি পরবর্তী সময়ে কপ্‌পকন্দর বিহারে বাস করার সময় ভিক্ষু-সঙ্ঘের জন্য একটি বৃহৎ নারকেল বাগান করেছিলেন।

একদিন থেরপুত্র অভয় কোনো কর্মোপলক্ষে বিহারের বাইরে গিয়েছিলেন, সে সময় গোঠইম্বর রাজা দুট্‌ঠগামণিকে দর্শন করতে যাবার পথে উক্ত বিহারে প্রবেশ করে নারকেল ফল খেয়েছিলেন এবং বহু নারকেল বিহারঙ্গনে ছড়িয়ে রেখে ঘুমোচ্ছিলেন। শ্রামণ বিহারে প্রত্যাবর্তন করে গোঠইম্বরের এরূপ কর্ম দেখে রুষ্ট হলেন এবং তাঁকে উপযুক্ত শাস্তি দেবার জন্য তাঁর বামপায়ের দুই আঙ্গুল দ্বারা গোঠইম্বরের পা ধরে সমগ্র বিহারঙ্গনে ঘুরাতে লাগলেন। তিনি শত চেষ্টা করেও নিজেকে মুক্ত করতে পারলে না। অবশেষে জনসাধারণের অনুরোধে তাঁকে মুক্তিদান করেন। পরে দুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব গড়ে উঠল। গোঠইম্বর যথাসময়ে রাজা দুট্‌ঠগামণির নিকট উপগত হয়ে অভয় শ্রামণের বীরত্বের বিষয় অবহিত করলেন। রাজা অভয় শ্রামণকে আনয়ন করার জন্য তাঁকে প্রেরণ করলেন। গোঠইম্বর শ্রামণের নিকট উপস্থিত হয়ে রাজার ইচ্ছা ব্যক্ত করে বললেন, "এখন তামিলগণ বুদ্ধশাসনের সমূহ ক্ষতি সাধন করছে, বোধিবৃক্ষ, বিহার, মন্দির, বুদ্ধমূর্তি ধ্বংস করছে। আপনি গৃহবাসী হয়ে তামিলদের দমন করে বুদ্ধশাসনকে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করুন।"

গোঠইম্বরের অনুরোধক্রমে অভয় শ্রামণ চীবর ত্যাগ করে দুট্‌ঠমগামণির সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। তামিলদের সাথে যুদ্ধ করার সময় অভয়ও সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে তামিলদের ধ্বংস করতে সাহায্য করেছিলেন। লঙ্কা তামিলমুক্ত হবার পর তিনি পুনরায় প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে ধ্যানানুশীলন দ্বারা অচিরে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন।

সৎ ব্যক্তিরা দেশ ও শাসনের উন্নতি সাধনে তৎপর হন।

৭.৯ ভরণ কথা

লোকনায়ক কশ্যপ সম্যকসম্বুদ্ধের শাসনকালে কোন কুটুম্বিক ধর্ম শ্রবণ করে বুদ্ধ শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে ক্ষীর মিশ্রিত অন্ন দান করেছিলেন। সেই পুণ্য প্রভাবে তিনি এক বুদ্ধান্তরকাল দেবলোকে দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করে গৌতম বুদ্ধের সময়ে লঙ্কাদ্বীপে কাকবর্ণতিষ্য রাজার রাজত্বকালে কপ্‌পকন্দর গ্রামে এক কুটুম্বিকের গৃহে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর হতে গৃহে বহু নিধিকুম্ভের উদ্ভব হয়েছিল। তখন তাঁর নাম রাখা হয় ভরণতিষ্য। তিনি অল্প বয়স থেকে অসীম দৈহিক শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন এবং যোদ্ধা হিসেবে খ্যাতি লাভ করেছিলেন। রাজা তাঁর দৈহিক শক্তির বিষয় জ্ঞাত হয়ে রাজঙ্গনে অর্থ-বিত্ত ও বাসস্থান দিয়ে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। তিনি রাজাসহ তামিলদের সঙ্গে আটাশটি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিলেন। তিনি আজীবন অনুরাধপুরে বাস করেছিলেন এবং দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হন।

কুশল কর্ম সম্পাদন কর, কুশলকর্মে রত ব্যক্তি অসীম শক্তির অধিকারী হন।

www.pathagar.com

৭.১০ বেলুসুমন কথা

গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর স্থবির মহামহিন্দ কর্তৃক লঙ্কার সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠিত হবার পর কাকবর্ণতিষ্য রাজার রাজত্বকালে গিরি[৭৫] জনপদের কুটুম্বিয়ঙ্গন নামক গ্রামে বসভ নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে এক পুত্র জন্মগ্রহণ করেন। বসভের বেলু ও সুমন গিরিভোজক নামে দুই বন্ধু নবজাতককে দেখতে আসেন। দুই বন্ধুর নামের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে তাঁর নাম রাখা হয় বেলুসুমন। বেলুসুমন পিতৃবন্ধু গিরিভোজকের কাছে প্রতিপালিত হতে লাগলেন। গিরিভোজকের একটি দুষ্টপ্রকৃতির সিন্ধুঘোটক ছিল। কেউ এটার পৃষ্ঠারোহণ করতে পারত না। সুমন বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর একদিন সিন্ধঘোটক তাঁকে দেখতে পেয়ে হ্রেষারব করতে লাগল। গিরিভোজক এর মর্ম উপলব্ধি করে বললেন, "সুমন, তুমি এর পৃষ্ঠে আরোহণ কর।" বেলুসুমন অশ্বের পৃষ্ঠে আরোহণ করে মাঠে দৌঁড়াতে আরম্ভ করলেন। গতি ক্রমান্বয়ে এমন বাড়াতে লাগলেন যে, তাঁকে তখন জ্বলন্ত কাষ্ঠখণ্ডের মত মনে হচ্ছিল। তাঁর এরূপ অশ্বপরিচালনা দেখে মহাজনতা আনন্দে চিৎকার করে উঠল। গিরিভোজক বেলুসুমনের এরূপ অপূর্ব অশ্বপরিচালনা দেখে তাঁকে রাজার নিকট প্রেরণ করলেন। রাজা তাঁকে অর্থ ও বাসস্থান দিয়ে নিজের কাছে বসবাসের ব্যবস্থা করলেন। তদবধি বেলুসুমন রাজার একান্ত সহচর হিসাবে কাছে থাকতেন। তিনি বত্রিশজন যোদ্ধা ও রাজার সঙ্গে একত্রে তামিলদের সাথে যুদ্ধ করে অনুরাধপুর তামিল মুক্ত করতে সাহায্য করেছিলেন। অনন্তর তিনি রাজার সঙ্গে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন।

প্রমত্ত ব্যক্তি সঠিক বস্তুর সন্ধান পায় না, অপ্রমত্ত ব্যক্তিরাই সঠিক লক্ষে পৌঁছুতে সক্ষম হন।

৮. দ্বিতীয় যোদ্ধাবর্গ

৮.১ খঞ্জদেব কথা

কশ্যপ বুদ্ধের সময় জনৈক কুটুম্বিক সদ্ধর্ম শ্রবণ করে শাসনের প্রতি প্রসন্ন হন। তিনি একটি পর্ণশালা তৈরি করে একজন ভিক্ষুকে বর্ষা তিন মাস চর্তুপ্রত্যয়াদি দ্বারা সেবা করেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে মৃত্যুর পর তিনি দেবলোকে দ্বাদশ যোজন পরিমিত কনক বিমানে জন্মগ্রহণ করে বহু দিব্য সুখ উপভোগ করেন। তথা হতে চ্যুত হয়ে আমাদের গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে গিরিজনপদে মহিন্দদোনি নামক গ্রামে মহাবিভব সম্পন্ন অভয় নামক কুটুম্বিকের সপ্তম পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঈষৎ খঞ্জ ছিলেন বলে তাঁর নাম রাখা হয় খঞ্জদেব। খঞ্জদেব বয়ঃপ্রাপ্ত হলে অসম দৈহিক শক্তির অধিকারী হন। তিনি যুদ্ধবিদ্যায়ও পারদর্শিতা অর্জন করেন এবং যোদ্ধা নামে খ্যাতি লাভ করেন।

রাজা কাকবর্ণতিষ্য তাঁর দক্ষতার বিষয় অবগত হয়ে তাঁকে রাজাঙ্গনে আনয়ন করেন। পরবর্তী সময়ে গামণি রাজাসহ তিনি তামিলদের যুদ্ধে পরাজিত করে লঙ্কায় সদ্ধর্মের

শাসন প্রতিষ্ঠা করতে সহায়তা করেছিলেন। রাজাকে লঙ্কায় অভিষিক্ত করে তিনি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদনান্তে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হন।

সুকর্ম সাধনকারী স্বর্গমোক্ষাদি লাভে সক্ষম হন। তাই সৎকর্ম অনুশীলন করা বাঞ্ছনীয়।

৮.২ ফুষ্যদেব কথা

তখন পৃথিবীতে কশ্যপ বুদ্ধ ধর্ম প্রচার করছিলেন, সভায় উপস্থিত ছিলেন জনৈক কুটুম্বিক। তিনি সদ্ধর্ম শ্রবণ করে শাসনের প্রতি প্রসন্ন হয়ে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বিভিন্ন প্রকার আহার্য দান করেছিলেন। এ ছাড়া শয়নাসন, ভৈষজ্য ও চীবরাদিও দান করেছিলেন। তিনি আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর সেই পুণ্যের প্রভাবে দেবলোকে জন্মগ্রহণ করে এক বুদ্ধান্তরকাল দিব্যসম্পত্তি উপভোগ করেন। অনন্তর গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে কবিট্ঠ নামক গ্রামে উৎপল নামক জনৈক কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। ফুষ্য নক্ষত্রে জন্ম হওয়ায় তাঁর নাম রাখা হয় ফুষ্যদেব। সপ্তবর্ষ বয়সকালে তিনি খেলার সাথীসহ বোধিয়ঙ্গনে রক্ষিত শঙ্খে ফুঁ দিয়েছিলেন। সেই শঙ্খের শব্দ এত বিকট ছিল যে তাঁর সঙ্গীরা ভয়ে মাটিতে শুইয়ে পড়েছিল এবং বনের পশু-পাখিরা ভীত সন্ত্রস্ত হয়েছিল। তদবধি তিনি উন্মাদফুষ্যদেব নামে পরিচিতি লাভ করেন। দ্বাদশ বর্ষ বয়সে তাঁর পিতা তাঁকে ধনুর্বিদ্যা শিক্ষা দেন। তিনি ধনুর্বিদ্যায় অতিশয় পারদর্শিতা লাভ করেন। তাঁর বীরত্ব সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে ছড়িয়ে পড়েছিল। লঙ্কেশ্বর কাকবর্ণতিষ্য তাঁর বীরত্বের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে তাঁকে রাজমহলে এনে বসবাসের ব্যবস্থা করান। পরবর্তীতে দুট্ঠগামণিসহ বত্রিশজন তামিল সেনাপতি ও সৈন্যদের যুদ্ধে পরাজিত করে লঙ্কায় সদ্ধর্ম প্রতিষ্ঠা করতে সাহায্য করেন। তাঁর গগনবিদারী শঙ্কের শব্দে তামিল সেনাগণ ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়েছিল। দুট্ঠগামণি রাজা লঙ্কায় অভিষিক্ত হবার পর তিনি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে কর্মানুযায়ী গতি লাভ করেন।

পরজন্মে বিপুল বিভবের প্রত্যাশা করলে ইহজন্মে কায়-বাক্য-মনে সৎকর্ম সাধন করা উচিত।

৮.৩ লভিয় বসভ কথা

অতীতে কশ্যপবুদ্ধের সময়কালে জনৈক কুটুম্বিক সদ্ধর্ম শ্রবণ করে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাশীল হয়ে ঘি-মধু-শর্করা মিশিত সুস্বাদু পায়সান্ন ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করেছিলেন। তিনি যথায়ুষ্কাল পঞ্চশীল সুচারুরূপে প্রতিপালন ও দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবকুলে জন্মগ্রহণ করেন। তথায় এক বুদ্ধান্তরকাল দেবৈশ্বর্য উপভোগ করার পর গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে কাকবর্ণতিষ্যের রাজত্বকালে বাপি গ্রামের মত্ত নামক জনৈক কুটুম্বিকের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নামকরণ করেন বসভ। তিনি অতীত জন্মে সুষ্ঠুরূপে পঞ্চশীল প্রতিপালনের ফলে বর্তমান জন্মে অতি সুদর্শন ও

মনোরম দেহসৌষ্ঠবের অধিকারী হয়েছিলেন। তাছাড়া তিনি বয়সকালে প্রবল দৈহিক শক্তির অধিকারী হন। তিনি অসিবিদ্যায় পারদর্শিতা অর্জন করে যোদ্ধা রূপে খ্যাতি লাভ করেন। তাঁর বীরত্বের সংবাদ জ্ঞাত হয়ে কাকবর্ণতিষ্যরাজ রাজঙ্গনে বসবাসের ব্যবস্থা করেন। পরবর্তীকালে দুট্ঠগামণি বত্রিশজন তামিলরাজ ও বহু তামিল সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় বসভ সক্রিয় সাহায্য করেন এবং লঙ্কাদ্বীপকে তামিল মুক্ত করতে সাহায্য করেন। অতঃপর দুট্ঠগামণি লঙ্কার অধীশ্বররূপে অভিষিক্ত হলে বসভও দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে তথায় বাস করতে লাগলেন। আয়ুশেষে মৃত্যুর পর তিনি স্বর্গবাসী হন।

পঞ্চশীল প্রতিপালনকারী রূপ, শক্তি ও যশের অধিকারী হন।

৮.৪ দাঠাসেন কথা

গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর লঙ্কাদ্বীপে কাকবর্ণতিষ্য রাজার রাজত্বকালে রোহণ জনপদের কুবুবন্ধ গ্রামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তির গৃহে দাঠাসেনের জন্ম হয়। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তিনি প্রবল দৈহিক শক্তির অধিকারী হন। অতীতে কশ্যপবুদ্ধের সময় তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে চতুর্প্রত্যয়াদি দান দিয়ে সুচারুরূপে পঞ্চশীল রক্ষা করার ফলে বর্তমান জন্মে এরূপ শক্তির অধিকারী হয়েছিলেন। তখন লঙ্কায় তামিলগণ বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক ক্ষতি ও অত্যাচার করছিল। এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে দাঠাসেন মাতাপিতার নিকট বিদায় নিয়ে মহাগ্রামে উপস্থিত হয়ে রাজাকে স্বীয় অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন। রাজা তাঁর বীরত্ব পরীক্ষা করে সেনাাবহিনীতে নিয়োগ করলেন। রাজা দুট্ঠগামণি অন্যান্য ীর সেনাসহ দাঠাসেনকে নিয়ে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করার সময় তিনি অমস সাহসিকতা ও বীরত্বের পরিচয় দেন। তিনি তামিলদের সুউচ্চ প্রাকার ভেদ করে শত শত তামিল সেনাদের পরাস্ত ও নিহত করেন। লঙ্কা তামিল মুক্ত হবার পর দুট্ঠাগামণিকে অভিষিক্ত করে দাঠাসেন দানাদি পুণ্যকর্ম করে রাজধানীতে বসবাস করতে লাগলেন।

অনন্তর পরবর্তী সময়ে তাঁর এক শত্রু রাজার নিকট অভিযোগ করল যে, দাঠাসেন লঙ্কার অধীশ্বর হতে ইচ্ছুক হয়েছেন। রাজা তার কথায় বিশ্বাস স্থাপন করে ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে হত্যা করার জন্য ষড়যন্ত্র করলেন। একদিন দাঠাসেন সহচর পরিবৃত হয়ে স্নান করতে গেলে রাজার সৈন্যগণ উন্মত্ত হস্তী নিয়ে তাঁকে আক্রমণ করতে গেল। উন্মত্ত হস্তী তাঁকে আক্রমণ করার জন্য সম্মুখে আসলে হস্তীর দাঁত দুটি ঝাঁকুনি দিয়ে উৎপাটন করে ফেললেন, তারপর শুঁড় ধরে মস্তকোপরি ঘুরাতে ঘুরাতে মাটিতে নিক্ষেপ করলেন। দাঠাসেনের এরূপ শক্তি দেখে রাজসৈন্যরা পলায়ন করল। অতঃপর দাঠাসেন চিন্তা করলেন, "আমার পক্ষে রাজ্য জয় করা অতি সহজ। এটা কায়-বল মাত্র। আমি প্রজ্ঞাবলের দ্বারা লোভ-দ্বেষ-মোহ রূপ অরিকে জয় করব; অতএব আমি এ স্থান ত্যাগ করে আত্মজয়ের সন্ধানে গমন করব।" এরূপ চিন্তা কর তিনি গৃহত্যাগ করে সমুদ্র তীরে উপস্থিত হলে এক কৈবর্তের সাক্ষাৎ লাভ ঘটে। বৈকর্তের সঙ্গে তাঁর মিত্রতা গড়ে উঠে। একদিন তিনি সমুদ্রের অপর পাড়ে যাবার ইচ্ছা পোষণ করলে কৈবর্ত নৌকাখানা তাঁকে

প্রদান করল। তিনি নৌকায় আরোহণ করে এক পা দিয়ে মাটিতে আঘাত করলেন। নৌকা বায়ুবেগে ধাবিত হয়ে নাগদ্বীপ পোতাশ্রয়ে পৌঁছল। দাঠাসেন নাগদ্বীপ হতে সমুদ্র পথে চোলরাজ্যের[৭৬] কাবীর পোতাশ্রয়ে[৭৭] উপগত হলেন। তিনি সেখানকার জনগণকে জিজ্ঞাসা করে জানতে চাইলেন বুদ্ধপুত্রগণ কোথায় অবস্থান করেন। জনগণ বলল, "এখান থেকে দ্বাদশ যোজন দূরে তক্কনগরীর পাশে একটি বিহারে অর্হৎ ভিক্ষু বাস করেন।" দাঠাসেন দীর্ঘপথ অতিক্রম করে সেই নগরে উপনীত হয়ে জনগণের কাছে জানতে পারলেন যে, অদূরে বহু ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে মহাবরুণ স্থবির নামক অর্হৎ অবস্থান করেন। তিনি মহাবরুণ স্থবির সমীপে উপস্থিত হয়ে বন্দনা করে স্বীয় আগমনের বিষয় অবহিত করলেন। স্থবির তাঁকে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা প্রদান করে কর্মস্থান অনুশীলনের নির্দেশ দিলেন। কিন্তু তিনি চিত্তে একাগ্রতা আনয়নে সমর্থ হলেন না। তিনি এ বিষয় আচার্যকে জ্ঞাত করালে তিনি দাঠাসেনকে ষাট যোজন দূরে অবস্থিত হেরম্বলক নামে বিহারের অর্হৎ স্থবিরের নিকট প্রেরণ করলেন। তিনি ষাট যোজন পথ অতিক্রম করে পর্বর্তোপরি বিহারে আরোহণ করতে অসমর্থ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন। অর্হৎ স্থবির তাঁকে দেখে বিহারের শ্রামণকে ডেকে বললেন, যেন এ ভিক্ষুর যথোপযুক্ত কর্মস্থানের ব্যবস্থা করা হয়। দাঠাসেনকে বিহারে এনে তার ব্যবস্থা করা হলো। এখানেও তাঁর মন রমিত হলো না। অতঃপর স্থবিরের নির্দেশক্রমে তাঁকে আরও পনের যোজন দূরে লৌহকূট বিহারে প্রেরণ করলেন। তিনি সেই বিহারে উপগত হয়ে ধ্যানে মগ্ন হলেন এবং চতুর্থ দিবসে অর্হত্বফল লাভ করলেন। তিনি অর্হত্বফল প্রাপ্ত হয়ে অলৌকিক শক্তি বলে উপাধ্যায় মহাবরুণ স্থবিরের পাদ বন্দনা করে পুনরায় লৌহকূট পর্বতে এসে আনির্বাণ বাস করেছিলেন।

উত্তম পুণ্যকর্ম সম্পাদন করলে সম্পদ ও স্বর্গ লাভ করা যায়, সুতরাং তোমরাও পুণ্যময় কর্ম সম্পাদন কর।

৮.৫ মহাতেল কথা

সিংহলদ্বীপে রোহণ জনপদের কাছে কপ্‌পকন্দর নদীর তীরে একটি বৃহৎ বিহার ছিল। সেই বিহারে বহু শত ভিক্ষু বাস করতেন। সেখানে কুরুদেব নামে এক বিঘাসাদ (নিষ্কর্মা পেটুক) ভিক্ষুদের আহার্যের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে অতি দীনভাবে বিহার অঙ্গনে যত্রতত্র শুয়ে থাকত। সে ছিল অত্যন্ত অলস। একদা সেই বিহারের সঙ্ঘস্থবির চক্রমণকালে বিহার অঙ্গনে বৃক্ষছায়ায় ঘুমন্ত কুরুদেবকে দেখে বিদ্যজ্ঞানে দেখতে পেলেন যে, সে সপ্তাহান্তে মৃত্যুর পর নরকে উৎপন্ন হবে। তখন স্থবির তাকে ডেকে বললেন, "তুমি পূর্বজন্মে কোনো পূর্ণকর্ম সম্পন্ন করনি বলে ইহজন্মে অতি দীন-হীন ও ভিক্ষাজীবী হয়ে জীবিকা নির্বাহ করছ। এজন্মে সীমাহীন কষ্টভোগ করেও কেন আত্মহিতমূলক কোনো পুণ্যকাজ করছ না? কুরুদেব বলল, "ভন্তে, আমি ধনহীন অতি দরিদ্র, কিভাবে কুশল কর্ম সম্পাদন করব?" স্থবির বললেন, "তোমার আহার্যের উচ্ছিষ্টাংশ নদীতে মাছের উদ্দেশ্যে দান

করবে আর সুষ্ঠুরূপে পঞ্চশীল প্রতিপালন করবে।" কুরুদেব স্থবিরের উপদেশ অনুযায়ী পঞ্চশীল পালন করত, আর আহারের অবশিষ্টাংশ নদীতে মাছের উদ্দেশ্যে দান করত। সপ্তাহ পর তার মৃত্যু হলো। মৃত্যুর পর সে মহাগ্রামের নিকটে এক ধনশালী ব্যক্তির গৃহে জন্মগ্রহণ করল। তখন তার নাম হয় মহাতেল। তারা সাত ভ্রাতার মধ্যে সে ছিল কনিষ্ঠ। সে কোনো কাজকর্ম করত না। তার মাতাপিতা চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে রাজা দুটঠগামণির নিকট তাকে দিয়ে আসেন। সে অতি সুখে রাজঙ্গনে বাস করতে লাগল। মহাতেল জ্যোতিষ গণনা করে রাজার মঙ্গলামঙ্গল বিষয় অগ্রীম বলে দিত।

একসময় রাজা দুটঠগামণি তাকে অনুরাধপুরে স্বীয় বন্ধু বণিকের নিকট একখানা পত্রসহ উপঢৌকন আনয়নের জন্য প্রেরণ করেছিলেন। সে বণিকের প্রদত্ত প্রচুর উপঢৌকন স্কন্ধে ঝুলিয়ে অতি অল্পসময়ের মধ্যে এনে দিয়েছিল। রাজা এজন্য অতি তুষ্ট হয়ে তাকে ষোল হাজার অর্থ ও একখানা গ্রাম দত্তক দিয়েছিলেন। সে রাজার সঙ্গে তামিল দমনেও সহায়তা করেছিল। অতঃপর সে শীলপালন ও দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ু অবসানে কর্মানুযায়ী গতি লাভ করে।

শ্রদ্ধাচিত্তে স্বল্প পরিমিত দান দিয়েও পরবর্তী জীবনে বিপুল সম্পত্তি লভ করা যায়।

৮.৬ সালিরাজ কুমার কথা

লঙ্কার মহাবালুক গঙ্গার নিকটে মুণ্ডবাক নামক গ্রামে তিষ্য নামে জনৈক কর্মকার বাস করতেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল সুমনা। তাঁরা উভয়ে ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান না করে কিছু আহার করতেন না। একদা এক ব্যক্তি তাঁকে শূকরের মাংস দিয়েছিল। তিনি সেই মাংস পাঁচ প্রকারের রান্না করে ঘোষণা করলেন, "এই লঙ্কাদ্বীপে যে সমস্ত ঋদ্ধিশালী অর্হৎ আছেন তন্মধ্যে আটজন অর্হৎ আমার গৃহে আগমন করুন।" তখন রোহণ জনপদে তলঙ্গরবাসী মহাধর্মদিন্ন স্থবির তাঁর শ্রদ্ধাসম্পত্তি অবলোকন করে ছয়জন শক্তিধর ঋদ্ধিসম্পন্ন অর্হৎ ভিক্ষু-সহ আকাশ মার্গে গমন করে সেই গ্রামের দ্বারে অবতরণ করলেন। কর্মকার তিষ্য তাঁকে সাদর আহ্বান করে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করালেন এবং বহুবিধ দানীয় সামগ্রীসহ সুস্বাদু আহার্য দান করলেন। অনন্তর কর্মকার যাবজ্জীবন পুণ্যকর্মাদি সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর লঙ্কেশ্বর দুটঠগামণি অভয়রাজের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর জন্মের পর বিভিন্ন প্রকারের শষ্যভাণ্ডার সালিশষ্যে রূপান্তরিত হয়েছিল। এ কারণে তাঁর নাম রাখা হয় সালিকুমার।[৭৮]

বয়ঃপ্রাপ্ত হলে সালিকুমারকে যুবরাজপদে অভিষিক্ত করা হয়। তিনি সর্বদা দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে রাজপ্রসাদের দক্ষিণদ্বারে বাস করতেন। অনন্তর তিনি একদিন উপোসথ অধিষ্ঠান করে বিহারে গিয়ে শীল গ্রহণান্তে অবস্থান করছিলেন। তখন দক্ষিণ মলয়ের মানুষ একশ শকটে বহু উপঢৌকনসহ অনুরাধপুরে আগমন করে উক্ত বিহার সমীপে উপনীত হয়েছিল। সেখানে শকটের গরু আর সামনে না গিয়ে স্থির হয়ে রইল। একটি গরু গাড়ি থেকে ছুটে গিয়ে বিহারে প্রবেশ করে যুবরাজের নিকটে দাঁড়াল।

www.pathagar.com

লোকজন দেখতে পেল তাঁদের প্রিয় যুবরাজকে। তারা সমস্ত উপঢৌকন তাঁকে প্রদান করল। তিনি সেসব সামগ্রী ভিক্ষু-সঙ্ঘের নিকট দান করে দিলেন। কর্মচারীরা রাজাকে এ বিষয় অবহিত করলে কুমারের জন্য নির্ধারিত করা হলো পশ্চিম পার্শ্বের প্রাসাদ।

পশ্চিম প্রাসাদে বাস করার সময়েও বহু উপঢৌকন কুমারের জন্য বিভিন্ন স্থান হতে প্রতিনিয়ত আসত। তিনি একদিন উদ্যানক্রীড়া করতে গিয়ে ঘুরতে ঘুরতে এক সুপুষ্পিত অশোক বৃক্ষের নিচে উপবেশন করলেন। তখন তিনি কুসুম আহরণরতা এক চণ্ডালকন্যা দেবীকে দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে জানতে চাইলেন যে, সে দেবী কি মানবী, বিবাহিতা কি অবিবাহিতা। উত্তরে দেবী জানাল, সে হোল্লোল গ্রামপতি কর্মকার কন্যা, সকলে চণ্ডালকন্যা বলেই জানে। সে অনিন্দ্যসুন্দরী ছিল। যুবরাজ তাকে সঙ্গে করে নগরে প্রত্যাবর্তন করলেন। অশোকবৃক্ষের নিচে দেখেছিলেন বলে তার নাম হয় অশোকমালাদেবী। সে অতীতে একজন্মে তার মাকে রাগ করে চণ্ডালিনী বলে অভিহিত করেছিল। সেই পাপের ফলে সে মুদ্ধবাক গ্রামে চণ্ডালকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে কর্মকার তিষ্যের স্ত্রী হয়ে একত্রে বহু পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেছিল। মৃত্যুর পর দ্বিতীয়বার হোল্লোল গ্রামে চণ্ডালকন্যারূপে জন্মগ্রহণ করে। সমগ্র লঙ্কাদ্বীপে তার ন্যায় রূপসী কন্যা ছিল না। পূর্বজন্মে সালিকুমার ছিলেন তিষ্যকর্মকার।

রাজা ও রাজ্যবাসী প্রথমে কেউ কুমার চণ্ডালকন্যাকে বিয়ে করাতে তুষ্ট হতে পারেননি। রাজা পুত্রবধূর রূপগুণ পরীক্ষা করার জন্য সপারিষদ একদিন কুমারের বাসস্থানে উপস্থিত হলেন। উভয়ে পিতাকে প্রণাম করে দেবী সকলকে উত্তম আহার্য দ্বারা পরিবেশন করলেন। তাঁর রূপ ও গুণ দেখে সকলে মুগ্ধ হলেন এবং ভূয়সী প্রশংসা করলেন। তদবধি যুবরাজ সস্ত্রীক প্রাসাদে মিলেমিশে বাস করতে লাগলেন।

পরবর্তী সময়ে কুমারের জন্য নির্মিত উত্তর প্রাসাদে বাস করার সময়ও উত্তরপার্শ্বের প্রজাগণ তাঁর জন্য উপঢৌকন আনত। তিনি একদা পাঁচশ ক্ষীণাশ্রবকে মহাদান দিয়ে ভিক্ষুদের বসবাসের জন্য একখানা সুবৃহৎ বিহার নির্মাণ করে দান করেছিলেন। এরপর কুমারকে পশ্চিম প্রাসাদে বাস করতে দেওয়া হয়। তখনও তিনি জনগণ কর্তৃক আনীত উপঢৌকন লাভ করতেন এবং ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিতেন। একসময় দেবী ও রাজকুমার উভয়ে তাঁদের স্ব স্ব পুণ্য পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিলেন। রাজকুমার নিজ পুণ্যফল পরীক্ষা করার জন্য একাকী উপবিষ্ট হয়ে অবস্থান করছিলেন। তখন দেব-মনুষ্যগণ শত শত গাড়ি উপেঢৌকন রাজঙ্গনে এনে স্তূপীকৃত করে রাখতে লাগল। কুমার তাঁর পুণ্যফল দেবীকে প্রদর্শন করালেন। দেবীও বললেন, "অপেক্ষা করুন, আমিও পুণ্যবতী, আমার পুণ্যপ্রভাবও দেখতে পাবেন।" এ সময়ে তাঁর পিতৃগৃহের গৃহদেবতা এ বিতর্ক জ্ঞাত হয়ে একটি দিব্যৌষধি যাগু পাত্র এনে দম্পদির সম্মুখে রাখলেন। এই যাগুর গুণ ছিল অদ্ভুত। এটার স্পর্শে সর্বপ্রকার রোগ দূর হয়ে যেত, এমনকি অন্ধ, খঞ্জ, বধির পর্যন্ত এটার স্পর্শে সুস্থ হয়ে যেত। উক্ত পাত্র হতে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষুকে যাগু দান করে রোগী ও দুঃখী মানুষকে প্রদান করেছিলেন। এর ফলে সমস্ত দুঃখ ও উপদ্রব উপশম হয়েছিল।

www.pathagar.com

দুট্ঠগামণি সালিরাজকুমারকে রাজ্যাভিষিক্ত করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু কুমার অস্বীকৃত হওয়ায় তাঁর অনুজ শ্রদ্ধাতিষ্যকে রাজ্যভিষিক্ত করেছিলেন।

সালিরাজকুমার ও অশোকমালাদেবী আজীবন দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

সজ্জনেরা শাসনের কল্যাণ সাধন করেন। কল্যাণ কর্ম সম্পাদন কর এবং চিরসুখময় নির্বাণ মার্গ অধিগত কর।

৮.৭ চুল্লনাগ স্থবির কথা

লঙ্কার অনুরাধপুরে দেবপ্রিয়তিষ্য বুদ্ধের দক্ষিণস্থ অক্ষকাস্থি প্রতিষ্ঠা করে একটি বৃহৎ মনোরম স্তূপ নির্মাণ করেছিলেন। এটার দ্বার-সন্নিকটে ছিল প্রাকার বেষ্টিত পরিবেশ। সেই পরিবেশে বহু শত ভিক্ষু বাস করতেন। তথায় অবস্থানরত চুল্লনাগস্থবির নামে একজন ভিক্ষু একসময় ভিক্ষাচরণ শেষে আহারান্তে দিবাস্থানে (আহারান্তে যেখানে বসে বিশ্রাম করা হয়) উপবেশ করেছিলেন। তখন একটি কুকুরী সদ্য বাচ্চা প্রসব করে ক্ষুধার জ্বালায় অস্থির হয়ে খাদ্য অন্বেষণ করতে করতে উক্ত স্থানে স্থবিরের কাছে এসে দাঁড়াল। ক্ষুধার্ত কুকুরীকে দেখে স্থবিরের দয়া উৎপন্ন হলো। তিনি মাটি পা দ্বারা পরিষ্কার করে ভুক্ত আহার্য আঙ্গুল ঢুকিয়ে বমি করে কুকুরীকে খেতে দিলেন। পাত্র করে কিছু জলও এনে দিলেন। কুকুরী তৃপ্তিসহকারে অন্নপানীয় আহার করে প্রীতিফুল্ল হয়ে লেজ নাড়তে নাড়তে স্থবিরকে পর্যবেক্ষণ করে দাঁড়িয়ে রইল। তখন স্থবির প্রার্থনা করলেন, "এ পুণ্যের প্রভাবে আমি যেন নিরোগী ও সুখী হই এবং আমি যেন নির্বাণ প্রাপ্ত হই।" তদবধি কুকুরী প্রতিদিন সেখানে আসত, স্থবিরও যথাসাধ্য আহার্য দান করতেন। স্থবিরের এই পুণ্যের ফল ধীরে ধীরে প্রদান করতে লাগল। প্রতিদিন বহু উপাসক-উপাসিকা এসে তাঁকে নানাবিধ আহার্য দান করত। তিনি তা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিতেন, নিজেও আহার করতেন। দেবগণও তাঁকে দিব্য আহার্য দান করতেন। এভাবে প্রতিদিন তিনি দান লাভ করতেন, আবার তা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করে দিতেন। অনন্তর চুল্লনাগ স্থবির বিদর্শন বর্ধিত করে অর্হত্ত্বফল লাভ করেন।

অতঃপর পঞ্চশত ভিক্ষু পবিত্র বোধিবৃক্ষ বন্দনা করার ইচ্ছায় চুল্লনাগ স্থবিরকে অনুরোধ করলেন, "ভন্তে, আমরা বোধিবন্দনা করার জন্য ইচ্ছুক হয়েছি। আপনি আমাদের সঙ্গে চলুন, যাতে নিরুপদ্রবে যেতে পরি।" স্থবির সম্মত হয়ে একত্রে যাত্রা করলেন। সুদীর্ঘ পথ অতিক্রম করার সময় স্থবিরের পুণ্যপ্রভাবে কোনো অন্তরায় হয়নি, আহার্যের অভাবও হয়নি। বোধি বন্দনা শেষে প্রত্যাবর্তন করার সময় চুল্লনাগ স্থবির অসুস্থ হয়ে পড়েন। ভিক্ষু-সঙ্ঘ চিন্তিত হলে স্থবির বললেন, "বন্ধুগণ, চিন্তার কোনো কারণ নেই। আমি পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হলে সৎকার করে ধাতুসহ স্বরাজ্যে প্রত্যাগমন করবে, এতে তোমাদের সকল অন্তরায় দূরীভূত হবে।" স্থবির পরিনির্বাণ লাভ করলে তাঁর নির্দেশ অনুযায়ী ভিক্ষুগণ ধাতু নিয়ে নিরাপদে স্বদেশে পৌঁছলেন।

www.pathagar.com

পরিশুদ্ধ অন্তরে দান করলে অনন্ত পুণ্যের ভাগী হওয়া যায়। তোমরা চিত্তকে প্রসারিত করে দান করবে।

৮.৮ মেঘবর্ণ কথা

সিংহলদ্বীপে মহাগ্রামের কাছে ছিল হল্লোল নামে একটি বড় গ্রাম। সেই গ্রামে জনৈক দরিদ্র ব্যক্তি সস্ত্রীক পরের গৃহে কাজ করে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। একদা উভয়ে চাষ করে কিঞ্চিৎ পরিমাণ ধান্য প্রাপ্ত হয়েছিলেন। সেই ধান্য ঋণে খাটিয়ে ক্রমান্বয়ে বর্ধিত করে বহু সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিলেন। অনন্তর সেই ধন দ্বারা নীলপর্বত বিহারের ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহ্বান করে দান দিয়েছিলেন। তদবধি তাঁরা যথাসাধ্য দান দিতেন, শীল পালন ও ধর্মশ্রবণ করতেন। এভাবে জীবন অবসানে তাঁরা উভয়ে উদুম্বর পর্বতে ভূমিদেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন স্বামীর নাম হয় মেঘবর্ণ আর স্ত্রীর নাম হয় চন্দ্রমুখী। তাঁদের দিব্যময় কনক বিমান উৎপন্ন হয়েছিল, সেই বিমানে দেবরাজ ইন্দ্র সদৃশ বিভিন্ন প্রকার ভোগৈশ্বর্যের মধ্যে অতি সুখে অবস্থান করতে লাগলেন। সেই সময়ে ধর্মরক্ষ পর্বতে চন্দ্রমুখ নামে গুহায় বহু ভিক্ষু-সঙ্ঘ পরিবৃত হয়ে মলিয় মহাদেব নামে স্থবির বাস করতেন। তিনি একদিন ধর্ম শ্রবণের জন্য ঘোষণা করলে মেঘবর্ণদেব বহু দেবপরিষদ সমভিব্যাহারে দিব্যময় পুষ্পগন্ধ ইত্যাদি নিয়ে উপস্থিত হলেন। মলয় স্থবির তাঁদের দেবৈশ্বর্য দেখে জিজ্ঞেস করলেন যে, কি পুণ্যপ্রভাবে তাঁরা এরূপ মহা ঐশ্বর্যের অধিকারী হয়েছেন। মেঘবর্ণ তাঁদের পূর্ব জীবন বৃত্তান্ত স্থবিরের কাছে ব্যক্ত করলেন। দেবপুত্র আরও বললেন যে, এখানে দিব্যসুখ ভোগ করে তাঁরা চ্যুত হয়ে তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করবে। এই সুদীর্ঘকাল সুখপ্রাপ্তির কারণ মনুষ্য জন্মে কৃত পুণ্যকর্মের ফল।

অতঃপর স্থবির কর্তৃক দেশিত ধর্মশ্রবণ করে তাঁকে বন্দনা ও প্রদক্ষিণ কর স্বীয় ভবনে প্রস্থান করলেন।

দান স্বর্গসম্পত্তি ও দিব্য সম্পত্তিদায়ক, দান সমস্ত শত্রুকে বিনাশ করে, কাজেই তোমরা দানে রমিত হও।

৮.৯ ধর্মদিন্ন স্থবির কথা

লঙ্কার তলঙ্গর[৭৯] পর্বতের কাছে তিষ্যমহাবিহারে ধর্মদিন্ন স্থবির[৮০] নামে অর্হৎ পাঁচশ ক্ষীণাসব ভিক্ষু পরিবৃত হয়ে বাস করতেন। একদা তিনি পাঁচশ ভিক্ষুসহ নাগদ্বীপে চৈত্য বন্দনা করার জন্য যাবার সময় সাগিরি নামক মহাবিহারে উপনীত হয়েছিলেন। সেই বিহারেও বহুলমস্সুতিষ্য নামক স্থবির পাঁচশ ভিক্ষুসহ বাস করতেন। রাত্রি অবসানে সহস্র ভিক্ষুসহ স্থবির পুর্ণ-সালকোট্টক নামে গ্রামে স্বীয় সেবক শ্রেষ্ঠীপুত্রের নিকট উপস্থিত হলেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র ভিক্ষু-সঙ্ঘকে অতীব আনন্দের সঙ্গে আহ্বান করে উপবেশন করালেন এবং শশমাংস, যাগু, সালি-অন্ন ও আরও বহুবিধ উপাদেয় আহার্য দ্বারা ভোজন করালেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘ প্রাতে ও দুপুরে আহারান্তে পুণ্য অনুমোদন করলেন। এতগুলো ভিক্ষু-সঙ্ঘকে

www.pathagar.com

এক সঙ্গে আহার্য দান করায় সকলে আশ্চার্যবোধ করলেন। শ্রেষ্ঠীপুত্র আগন্তুক ভিক্ষুগণের আগমনের কারণ অবগত হয়ে পরের দিনও বাড়িতে আহার্য গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ভিক্ষুগণ বিহারে প্রত্যাবর্তন করে শশহত্যা করে দান দেওয়ায় সমালোচনা করে তিষ্য স্থবিরকে বললেন যেন তিনি শ্রেষ্ঠীপুত্রকে প্রাণিহত্যা থেকে বিরত রাখেন। পরদিন ভিক্ষু-সঙ্ঘ শ্রেষ্ঠীর গৃহে উপস্থিত হলে পূর্ববৎ উপাদেয় আহার্য দিয়ে ভোজন করালেন। আহারন্তে ধর্মোপদেশ প্রদানকালে প্রাণিহত্যায় বিরত থেকে শীলরক্ষা করতে বললেন। তখন শ্রেষ্ঠীপুত্র বললেন, "ভন্তে, আমাদের গৃহে কখনও শশকের মাংস শেষ হয় না, এর কারণ আমি জ্ঞাত নই। ভন্তে, আপনি দিব্যনেত্রে এর কারণ অবগত হয়ে বলুন।"

অনন্তর ধর্মদিন্ন স্থবির দিব্যনেত্রে তাঁর অতীত জীবন পর্যবেক্ষণ করে জানতে পারলেন যে, অতীতে শত সহস্র কল্প পূর্বে জগতে পদুমুত্তর নামক সম্যকসম্বুদ্ধ উৎপন্ন হলে শ্রেষ্ঠীপুত্র জনৈক গৃহস্থের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন, বয়ঃপ্রাপ্ত হবার পর বুদ্ধের ধর্ম শ্রবণ করে পিণ্ডচারী (অন্ন ভিক্ষাকারী) ভিক্ষু-সঙ্ঘকে শশ-মাংসসহ বহু সুস্বাদুযুক্ত আহার্য দান করেছিলেন। সেই দানের পুণ্যপ্রভাবে এখন পর্যন্ত সুখভোগ করছে এবং শশ-মাংস অক্ষয় হয়ে রয়েছে। স্থবির সকলের সামনে শ্রেষ্ঠীপুত্রের এরূপ পুণ্যকর্মের বিষয় প্রকাশ করে এবং সদ্ধর্মদেশনান্তে প্রস্থান করলেন। তদবধি শ্রেষ্ঠীপুত্রও দান দিয়ে শীল পালন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

পুণ্যকর্ম কল্পান্তরেও বিনাশ হয় না। বিজ্ঞগণ সারা জীবন কুশলকর্মে রত থাকেন।

৮.১০ রাষ্ট্রপুত্র কথা

সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ দিকে কোনো গ্রামে এক রাষ্ট্রপুত্র (রাজকর্মচারীর পুত্র) বাস করতেন। একদিন তিনি আহার গ্রহণের পূর্ব মুহূর্তে জনৈক ভিক্ষাচারী ভিক্ষুকে দেখে প্রসন্নচিত্তে সেই আহার্য তাঁকে দান করেছিলেন। সেই পুণ্যের প্রভাবে মৃত্যুর পর তিনি কদলিসালগ্রামে এক ধনবান ব্যক্তির পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করেন। মাতাপিতা তাঁর নাম রাখেন বিলস। তিনি বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী হন। তাঁর এত বিপুল পরিমাণ সম্পত্তি ছিল যে, সেরূপ আর কারও ছিল না।

সিংহলরাজ তাঁর ধনসম্পত্তির বিষয় জ্ঞাত হয়ে তাঁকে পরীক্ষা করার জন্য নির্দেশ পাঠালেন, "আমার জন্য সালি (উত্তম ধান বা চাল) পাটাও।" বিলস রক্তবর্ণের পাঁচশ সকট আর পমাল বর্ণের পাঁচশ সকট মোট এক সহস্র সকট সালি প্রেরণ করলেন। এরপর রাজা উত্তম মাস, কাল মাস চাইলে তাও অনুরূপভাবে সহস্র সকট পুর্ণ করে পাঠিয়ে দিলেন। রাজা তাঁর এত সম্পদ দেখে অতীব তুষ্ট হয়ে তাঁকে সেই জনপদ দত্তক দিলেন এবং গাড়িগুলো যেখানে অবস্থান করেছিল সেখানে একটি সুবৃহৎ বিহার নির্মাণ করালেন। বিলস আজীবন দানাদি পুণ্যকর্ম সাধন করে যথাসময়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

পুণ্যকর্ম সাধন কর, পুণ্যে ইহ-পরলোকে সুখ-সমৃদ্ধি আনে।

www.pathagar.com

৯. সীলোত্ত বর্গ

৯.১ ঘরসর্প কথা, (Rat Snake)

সিংহল দ্বীপে রোহণ জনপদের মহাগ্রামে কাকবর্ণতিষ্য রাজ্যের রাজত্বকালে তলঙ্গরতিষ্য পর্বতবাসী মহাধর্মদিন্ন স্থবির মহারুম্ভক নামক গুহায় বাস করতেন। সেই গুহার নিকটে একটি বৃহৎ বল্মীকে একটি ঘরসর্প বাস করত। সর্প খাদ্য অন্বেষণে গিয়ে একদিন চোখে আঘাত প্রাপ্ত হয়ে বল্মীকের বাইরে অভূক্ত ছটফট করছিল। তখন মহাধর্মদিন্ন স্থবির সর্পের প্রতি দয়ার্দ্র চিত্তে মহাস্মৃতিপ্রস্থান সূত্র দেশনা করে শুনালেন। সর্প স্থবিরের কণ্ঠস্বরের প্রতি একাগ্রচিত্ত ও প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করে শ্রবণ করার সময় এক গোধ মেরে খেয়ে ফেলল।

সর্প স্থবিরের সূত্রের প্রতি মনঃসংযোগ করেছিল বলে সেই পুণ্যের ফলে দুট্‌ঠগামণি রাজার এক অমাত্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করল। তখন তার নাম রাখা হয় তিষ্যামাত্য। মাত্র স্বর নিমিত্ত গ্রহণ করার ফলে সে বহু সম্পত্তির অধিকারী হয়েছিল। সে আজীবন পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর তুষিত স্বর্গে মনোরম কনক বিমানে জন্মগ্রহণ করেছিল।

এই অমৃতময় ধর্মবাণী স্বর্গ ও নির্বাণ লাভে সাহায্য করে। তাই সদ্ধর্ম অনুশীলন কর।

৯.২ ব্যাধ কথা

রোহণ জনপদের মহাগ্রামে বিধল নামে এক ব্যাধ নানা প্রকার পশু-পাখি প্রতিপালন, শিকার ও পশুপাখি হত্যা করে মাংস বিক্রি করত। সে প্রতিদিন পশুপাখির রক্ত-মাংস ভক্ষণ করত। তার গৃহে বড়শি, তীর-ধনু ইত্যাদি মারণাস্ত্র সজ্জিত থাকত। কোনো এক সময় সে ইতস্তত অন্বেষণ করে কোনো শিকার না পেয়ে এক মুঠি তৃণ একটি গোবাছুরের সামনে ধরল, বাছুর খাওয়ার জন্য জিহ্বা বের করলে সে ছোরা দিয়ে জিহ্বা কেটে রান্না করে খেয়েছিল। সেই রাত্রেই তার গাত্রদাহ উৎপন্ন হলো, সারারাত তীক্ষ্ণ বর্শাহত হরিণের ন্যায় যন্ত্রণায় ছটফট করতে লাগল। সকালে সে মহাগ্রামের তিষ্য বিহারে গিয়ে উপস্থিত হলে ভিক্ষুগণ তার উদ্দেশ্যে দেবদূত সূত্র দেশনা করলেন। তদবধি সে প্রাণিহত্যা বর্জন করে শীলাদি পালন করতে লাগল। এক সময় সে সমুদ্রে ক্রীড়া করতে নামলে এক নাগ তাকে খাওয়ার জন্য আগমন করতে দেখে তার শ্রুত দেবদূত সূত্র স্মরণ করল, "ভগবান বুদ্ধ কর্তৃক দেশিত দেবদূতসূত্র আমা কর্তৃক শ্রুত হয়েছে, সুতরাং কে আমার অন্তরায় করতে সক্ষম।" নাগরাজ তাকে হত্যা করতে পারল না, নিজ ভবনে নিয়ে গেল। নাগরাজ জিজ্ঞেস করে জানতে পারল যে, সে বুদ্ধবাণী শ্রবণের কারণে ভীত হয় নাই। নাগরাজও বুদ্ধবাণী শ্রবণের ইচ্ছা প্রকাশ করলে সে সংক্ষেপে পাপকথা ও নরককথা বলল, নারকীরা কিভাবে নিদারুণ কষ্ট ভোগ করে তার বিবরণ দিল।

নাগরাজ ধর্মকথা ও নরক বর্ণনা শেষে বিধল ব্যাধকে একটি সর্বকামদ মণিরত্ন দান করে স্বগৃহে প্রেরণ করল। ব্যাধ তখন থেকে দানদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত। পরবর্তী

www.pathagar.com

জীবনে সে মণিরত্নটি স্ত্রী-পুত্রদিগকে সম্প্রদান করে তিষ্য মহাবিহারে উপসম্পদা গ্রহণ করত ধ্যান অনুশীলনের মাধ্যমে অর্হত্ত্ব ফলে উপনীত হয়েছিল।

প্রমত্ত ব্যক্তি দুঃখে জীবন কাটায় আর অপ্রমত্তব্যক্তি সুখের সন্ধান লাভ করেন; তাই অপ্রমত্ত হতে চেষ্টা কর।

৯.৩ হেমাসুন্দরী কথা

তাম্রপর্ণীদ্বীপে[৮১] অনুরাধপুরের পশ্চিম পার্শ্বে একটি গ্রামে জনৈক কুলপুত্রের হেমা নাম্নী এক অনিন্দ্য রূপসী কন্যা ছিল। সে ছিল তীক্ষ্ণ মেধার অধিকারিনী, একবার মাত্র শ্রুত বিষয় হুবহু স্মরণ রাখতে পারত। সে একসময় পিতাসহ বিহারে গমন করে ধর্মচক্র সূত্র শ্রবণ করেছিল। সে অর্থকথাসহ ধর্মচক্র সূত্র উত্তমরূপে আয়ত্ত করে গৃহে প্রত্যাগমন করল। পরবর্তী সময়ে মহাতীর্থবাসী এক বণিকপুত্র সেখানে বাণিজ্য করতে এসে হেমার প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ে, হেমাও তার প্রতি অনুরক্ত হয়ে উভয়ে একত্রে কিছুকাল অবস্থান করেছিল। অনন্তর বণিকপুত্র কিছুদিন পর কোনো কর্মোপলক্ষে মহাতীর্থে গমন করে আর প্রত্যাবর্তন করল না। বহুদিন প্রতীক্ষা করার পর হেমা কাম ও মোহাবিষ্ট হয়ে প্রেমিকের সন্ধানে সকলের অজ্ঞাতে রাত্রিবেলায় মহাতীর্থ গমনের জন্য সমুদ্রতীরে উপস্থিত হলো। সে দৃঢ়রূপে কাপড় পরে সমুদ্র পাড়ি দিল। সমুদ্রের উত্তাল তরঙ্গ কিংবা জলচর প্রাণীর আক্রমণ কোনো ভয় তাকে বাধা দিতে পারল না। সে সমুদ্রের মাঝখানে উপগত হয়ে এক নাগরাজ এসে সমুদ্র পাড়ি দেবার কারণ জানতে চাইল। হেমা পূর্বোক্ত বিষয় নাগরাজকে অবগত করাল। অনন্তর নাগরাজ জানতে চাইল যে, তার কোনো ধর্মপদ জানা আছে কিনা। হেমা তার জ্ঞাত ধর্মচক্র সূত্রের বিষয় অবহিত করলে নাগরাজ স্বীয় প্রভাবে মণ্ডপ প্রস্তুত করত প্রজ্ঞাপ্ত আসনে হেমাকে উপবেশন করাল। হেমা উপবিষ্ট হলে অর্থকথাসহ ধর্মচক্র সূত্র আবৃত্তি করল। নাগরাজ অতীব তুষ্ট হয়ে সর্বকামদমণি দিয়ে হেমাকে মহাতীর্থে বণিকের কাছে পৌঁছে দিল। হেমার কাছে সর্বকামদ মণিরত্ন দেখে জনগণ রাজাকে জানালে রাজা তাকে ডেকে মণিরত্নটি কোথায় প্রাপ্ত হয়েছে জিজ্ঞেস করলেন। হেমা আনুপূর্বিক বিষয় বর্ণনা করল। রাজা রত্নটি হাতে নিলেন, সঙ্গে সঙ্গে পাথরে পরিণত হয়ে গেল, পুন হেমার হাতে দিলেন রত্নে পরিণত হলো। রাজা এভাবে তিনবার পরীক্ষা করে তুষ্ট হয়ে তাকে সহস্র মুদ্রা অর্পণ করে স্বগ্রামে পাঠিয়ে দিলেন। হেমা তখন হতে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন ও ধর্মত জীবন অতিবাহিত করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর স্বর্গ প্রাপ্ত হয়।

ধর্মচারীকে দেব-মনুষ্য সকলেই পছন্দ করে, কাজেই তোমরা ধর্মাচারী হও।

৯.৪ একচক্ষু শৃগাল কথা

সিংহল দ্বীপে গণ্ডগোণ নামক গ্রামে একদা এক শৃগাল একটি সজারুকে ধরবার জন্য অনুধাবন করতে গিয়ে সজারুর একটি কাটা বিদ্ধ হয়ে এক চোক অন্ধ হয়ে গিয়েছিল।

www.pathagar.com

তাই এটাকে একচক্ষু শৃগাল বলা হত। কোনো সময় শৃগাল খাদ্য অন্বেষণ করতে গিয়ে এক অজগর সর্প কর্তৃক আক্রান্ত হয়। অজগর শৃগালের দেহ কুণ্ডলাকারে পেঁচিয়ে ধরে। সেই সময় এক রাখাল অজগর কর্তৃক শৃগালকে জড়ানো অবস্থায় দেখে শৃগালকে মুক্ত করে। অজগর শৃগালকে ছেড়ে রাখালকে শক্ত করে জড়িয়ে ধরে। শৃগাল শত চেষ্টা করেও তাকে মুক্ত করতে না পেরে অদূরে কর্মরত চাষীদের নিকট গিয়ে উচ্চ শব্দ করতে লাগল এবং তাদের রক্ষিত একটি কাপড় মুখে নিয়ে অজগরের কাছে রাখল। কর্মরত লোকেরা দ্রুত ধাবিত হয়ে উক্ত স্থানে গমন করে অজগরকে হত্যা করে রাখালকে মুক্ত করল। তির্যকপ্রাণিগণও উপকারীর প্রত্যুপকার করে।

প্রকৃত মিত্র সেই যে মনেপ্রাণে মিত্রের কল্যাণ সাধন করে, সৎকাজে উৎসাহিত ও মন্দ কাজে বাধা দেয়। তখন হতে রাখাল ও শৃগাল মিত্রধর্ম রক্ষা করে জীবন অতিবাহিত করে কর্মানুযায়ী গতি প্রাপ্ত হয়েছিল।

মিত্রকল্যাণকারী সর্বদা সর্বত্র নন্দিত হয়। তাই সর্বদা মিত্রধর্ম অনুশীলন করবে।

৯.৫ নন্দিবণিক কথা

সিংহল দ্বীপে মহাতীর্থ পোতাশ্রয়ে[৮২] নন্দি নামক জনৈক বণিক বাণিজ্য করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি অতীব শ্রদ্ধাশীল। তিনি গৃহে সুন্দরী স্ত্রী রেখে তিন বছরর জন্য নৌকাযোগে দূরদেশে বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। সেই সময়ে রাজা সিব নামক এক ব্যক্তিকে মহাতীর্থ অঞ্চলের প্রধানপদে নিয়োগ করেছিলেন। সিব রাস্তাঘাট পরিচ্ছন্ন ও অলঙ্কৃত করাবার সময় একদিন সর্বালংকারে বিভূষিতা অপ্সরা সদৃশ সুন্দরী নন্দি বণিকের স্ত্রীকে প্রাসাদের উপরে দেখতে পেয়ে প্রেমাসক্ত হয়েছিল। সে লোকের নিকট সংবাদ নিয়ে জানতে পারল যে, তার স্বামী তিন বছর ধরে বিদেশে বাণিজ্যরত আছেন। তখন সে গৃহে গিয়ে এক পরিচারিকাকে সহস্র মুদ্রা দিয়ে প্রেম নিবেদনের বিষয় জানানোর জন্য নন্দি বণিকের স্ত্রীর নিকট প্রেরণ করল। পরিচারিকা গিয়ে তাকে নানাভাবে প্রলোভিত করে সিবের প্রেম নিবেদনের বিষয় অবহিত করল। বণিকের স্ত্রী ছিলেন সতী-সাধ্বী রমণী। তিনি সেই প্রস্তাব বিনীতভাবে অস্বীকার করে বললেন, "মানুষের রূপযৌবন একান্ত ক্ষণিকের। এই দেহে বত্রিশ প্রকার অশূচি নবদ্বারে প্রতিনিয়ত বহির্গত হচ্ছে।"

পরিচারিকা সিবকে জানালে যে আরও অধিকতর মোহান্ধ হয়ে দ্বিগুণ অর্থ দিয়ে পাঠাল। তখনও প্রত্যাখ্যাত হয়ে সিবকে জানাল। এভাবে তৃতীয়বার পাঠাল। চতুর্থবারও যখন পরিচারিকা একই প্রস্তাব করল তখন বণিক স্ত্রী বললেন, "আমার স্বামী জীবদ্দশায় কারও সঙ্গে সম্পর্ক হবে না। স্বামী জীবিত না থাকলে তোমাকে জানাব।" পরিচারিকার কাছে এই সংবাদ শুনে নন্দি বণিককে হত্যা করার উদ্দেশ্যে শক্তিশালী তান্ত্রিক ও ব্যাধকে আহ্বান করে তার ইচ্ছা ব্যক্ত করল। তন্মধ্যে একজন শক্তিশালী তান্ত্রিক বৈদ্য রাজী হলো। সে রাত্রির মধ্যম যামে আমক শ্মশানে গিয়ে পূজাদি সমাপন কর একটি সদ্য

মৃতদেহে মন্ত্রজপ করে জল ছিটিয়ে দিল। সেই মৃতদেহে অমুনষ্য প্রবেশ করে তার সামনে দাঁড়িয়ে জিজ্ঞেস করল, "আমি তোমাদের জন্য কি করতে পারি?" তান্ত্রিক বৈদ্য তার হাতে একখানা অসি দিয়ে বলল, "তুমি এই অসিখানা নিয়ে নন্দি বণিককে হত্যা করে আস।" বণিক তখন নৌকাযোগে সঙ্গীসহ গৃহে প্রত্যাগমন করছিলেন। সেই অমনুষ্য বীভৎস রূপ ধারণ করে সমুদ্রের উত্তাল ঢেউয়ের উপর দিয়ে অসিখানা উত্তোলন করে নৌকার দিকে ধাবিত হলো। বণিকের সঙ্গীরা তাকে দেখে ভীত হয়েছিল। বণিক সঙ্গীদের মৈত্রী ভাবনা করতে ও বুদ্ধের শরণ নিতে উপদেশ দিলেন। সকলেই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করল। অমনুষ্য বুদ্ধগুণের প্রভাবে সম্মুখে অগ্রসর হতে না পেরে প্রত্যাবর্তন করে পূর্ববৎ মৃত হয়ে পড়ে রইল। বৈদ্য দ্বিতীয় ও তৃতীয়বার পূর্বরূপে অমনুষ্যকে জাগ্রত করে প্রেরণ করল। তৃতীয়বারও তাঁকে হত্যা করতে না পেরে প্রত্যাবর্তন করে বৈদ্য ও সিবের মস্তক অসি দ্বারা দ্বিধাবিভক্ত করে পূর্ববৎ মৃতদেহে রূপান্তরিত হলো। এভাবে অমাত্য অন্যের ক্ষতি করতে গিয়ে নিজেই মৃত্যুবরণ করল।

বণিক এসব বিষয় অবগত হয়ে দানাদি পুণ্যকর্ম করে জীবন শেষে স্বর্গ লাভ করেছিলেন।

পণ্ডিতেরা বিপত্তিমূলক কর্ম ত্যাগ করেন এবং সৎকর্ম সম্পাদন করেন।

৯.৬ নকুল উপাসক কথা

লঙ্কায় কাকবর্ণতিষ্য রাজের রাজত্বকালে রোহণ জনপদে নকুল নামে জনৈক উপাসক স্ত্রী পরিজন নিয়ে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তিনি এক কন্যাকে দ্বাদশ কার্যাপণের বিনিময়ে মহাগ্রামের একটি কুলগৃহে কাজে দিয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে তিনি দ্বাদশ কার্যাপণ যোগাড় করে কন্যাকে মুক্ত করে আনবার জন্য মহাগ্রামে যাবার পথে চূলতিষ্য নামে জনৈক ভিক্ষুকে ভিক্ষাচরণ অবস্থায় দেখতে পেলেন। তখন নকুল অন্নের পাত্র হাতে এক পথচারীকে দেখতে পেয়ে দ্বাদশ কার্যাপণের বিনিময়ে অন্ন ক্রয় করে ভিক্ষুর ভিক্ষাপাত্রে দান করলেন। চুলতিষ্য অন্ন গ্রহণ করে উপাসকের পুণ্য প্রবৃদ্ধির জন্য একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করে বিদর্শন সাধনা করে অর্হত্ত্ব ফল প্রাপ্ত হয়ে অন্ন ভোজন করলেন।

অনন্তর নকুল উপাসক মহাগ্রামে গিয়ে কন্যার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে বললেন, "তোমাকে মুক্ত করার জন্য যে কার্যাপণ এনেছিলাম, তা দিয়ে অন্ন ক্রয় করে একজন ভিক্ষুকে দান করেছি। এখন তুমি পুণ্য অনুমোদন কর।" কন্যাও পুণ্যানুমোদন করল। তিষ্যস্থবির বিহারে উপনীত হয়ে পূর্বাপর সমস্ত বিষয় ভিক্ষুদিগকে ব্যক্ত করে বললেন, "আমি পরিনির্বাপিত হলে আমার দেহ নকুল উপাসক ব্যতীত আর কারো দ্বারা উত্থিত হবে না।" তিনি যথাসময়ে অনুরূপ অধিষ্ঠান করে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হলেন। জনগণ কূটাগার সজ্জিত করে স্থবিরকে শায়িত স্থান হতে উত্তোলন করতে সক্ষম না হয়ে রাজা কাকবর্ণতিষ্যকে অবহিত করল। রাজা বৃহৎ সেনাবাহিনী নিয়োগ করে চেষ্টা করলেন, কিন্তু

www.pathagar.com

তারাও সক্ষম না হয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে জানাল। ভিক্ষু-সঙ্ঘ স্থবিরের অধিষ্ঠান ব্যক্ত করলে নকুল উপাসককে আহ্বান করা হলো। তিনি এসে দেহ স্পর্শ করা মাত্র শূণ্যে উত্থিত হয়ে সজ্জিত চিতায় স্থাপিত হলো। এই আশ্চার্য বিষয় দেখে সমবেত জনগণ ও রাজা তাঁকে বিপুল সম্পত্তি ও সেই গ্রাম দত্তক হিসাবে প্রদান করলেন। তদবধি নকুল শীল প্রতিপালন ও দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর দেবলোকে উৎপন্ন হন।

দানে ভোগসম্পত্তি বৃদ্ধি পায়। তোমরা দান করে শীল প্রতিপালন করে নির্বাণের অধিকারী হও।

৯.৭ অম্রামাত্য কথা

সিংহল দ্বীপে চূলনাগ নামক একটি গ্রামে বেণীগ্রাম নামক জনৈক বিত্তবানের অম্রামাত্য নামে এক পুত্র ছিলেন। এক সময় সেই জনপদে অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। জনগণ অনাহারে অর্ধাহারে অতি কষ্টে জীবন কাটাতে লাগল। আম্রামাত্যের গৃহেও খাদ্যের অভাব হয়েছিল। চাকর কর্মচারী সবাইকে বিদায় করে দিলেন। অনন্তর একদিন গৃহে অবশিষ্ট অল্পমাত্র চাল রান্না করে খেতে বসেছিলেন, ঠিক সেই সময়ে একজন ভিক্ষাচারী ভিক্ষুকে দেখে সেই অন্ন ভিক্ষুর পাত্রে দান করে দিলেন। স্থবিরও তাঁর প্রসন্ন চিত্ত অবলোকন করে ভাবলেন, "তাঁর এই দানের বিনিময়ে তাঁকে অধিকতর প্রসন্ন করা উচিত।" এরূপ চিন্তা করে বনে গিয়ে একটি বৃক্ষমূলে উপবেশন করে বিদর্শন ভাবনা বৃদ্ধি করত অর্হত্ত্ব ফলে উন্নীত হলেন, অতঃপর অমাত্য কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন আহার করলেন।

অমাত্য দান দিয়ে গৃহে এসে কিছুক্ষণ বিশ্রাম করে ক্ষুধার তীব্র জ্বালায় অধীর হয়ে স্ত্রীকে পাত্রে অন্ন আছে কিনা দেখতে বললেন। রান্নার পাত্র খালি আছে জেনেও স্বামীর কথায় সে পাত্রের ঢাকনা খুলে দেখল। সে পাত্রপূর্ণ ভাত দেখে স্বামীকে বলল, "স্বামীন, উঠুন, ভাতে পাত্র পূর্ণ হয়ে আছে, আহার করুন।" স্বামী-স্ত্রী উভয়ে পরিপূর্ণভাবে আহার করার পরও পাত্র পূর্ণ রয়ে গেল। সেই অন্ন সমগ্র গ্রামবাসীকেও খাওয়ালেন। অমাত্যের দানের প্রভাবে তাঁর শষ্য ভাণ্ডার পূর্ণ হয়ে গেল। সেই শষ্য ভাণ্ডার হতে বীজ নিয়ে চাষারা চাষ করে শষ্য উৎপাদন করল, এভাবে দুর্ভিক্ষ বিদূরিত হয়ে গেল। অমাত্য সস্ত্রীক দানের প্রত্যক্ষ ফল দর্শন করে দানাদি পুণ্যকর্ম দ্বারা জীবন অতিবাহিত করেছিলেন এবং মৃত্যুর পর সস্ত্রীক দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

দান স্বর্গের সোপান, শীলানুশীলন নির্বাণ লাভের উপায়। অতএব দান দাও, শীল পালন কর।

৯.৮ বানর কথা

সিংহল দ্বীপের দক্ষিণ পার্শ্বে বিল্ল নামক গ্রামে এক ব্যক্তি মধু আহরণ ও প্রাণিহত্যা করে সস্ত্রীক জীবিকা নির্বাহ করত। একদা সে বনে একটি ফলন্ত বৃক্ষে ফাঁদ এঁটেছিল। একটি

www.pathagar.com

বানর ফল খেতে গিয়ে ফাঁদে আটকে গেল। অতঃপর লোকটি এসে প্রথমে শর নিক্ষেপ করে বানরকে দুর্বল করে বানরটি নেওয়ার জন্য বৃক্ষে আরোহণ করল। আচমকা বৃক্ষশালা হতে সে মাটিতে পড়ে গেল। বানর লোকটিকে শুশ্রূষা করে সুস্থ করল। সুস্থ হয়ে সেই দুর্জন ব্যাধ বানরটিকে হত্যা করে মাংস নিয়ে গৃহে প্রত্যাগমন করে সমস্ত বিষয় স্ত্রীকে বলল। স্ত্রী স্বামীর এরূপ ব্যবহারের কথা শুনে রুষ্ট হয়ে বলল, "অহো। তুমি মিত্রদ্রোহীমূলক কাজ করছে। যারা মিত্রদ্রোহী তারা ইহলোকে শান্তি পায় না, মৃত্যুর পরও চতুর্বিধ অপায়ে[৮৩] জন্মগ্রহণ করে মহা দুঃখ ভোগ করে।" এরূপ বলে সে ভিক্ষুর নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল। তারপর বিদর্শন ভাবনা করে অচিরে অর্হত্ত্বফল লাভ করেছিল। উক্ত ব্যাধও স্বীয় কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হয়ে প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করে বিদর্শন অনুশীলনের মাধ্যমে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিল।

মিত্রদ্রোহী হবে না, কৃতজ্ঞ হবে, কুশল কর্ম সম্পাদন করে অনিন্দিত হও।

৯.৯ দম্পতি কথা

সিংহল দ্বীপে রূবকবৃষ্টি নামক গ্রামে ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন পাঁচশ পরিবার বাস করত। গ্রামের অনতিদূরে রূবকবৃষ্টি মহাবিহারে বহু সহস্র ভিক্ষু বাস করতেন। প্রত্যেক পরিবার প্রতিদিন পাঁচশ ভিক্ষুকে আহার্য দান করতেন। একদা লঙ্কায় ভীষণ দুর্ভিক্ষের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল, জনসাধারণ অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করতে লাগল। পাঁচশ পরিবার প্রতিদিন পাঁচশ ভিক্ষুর আহার্য দানে অসমর্থ হয়ে ক্রমান্বয়ে ভিক্ষুর সংখ্যা কমিয়ে একজন মাত্র ভিক্ষুকে প্রতি গৃহে আহার্য দান করতে লাগল। সেই গ্রামে এক ব্যক্তি সস্ত্রীক পরগৃহে মজুরী করে অতি কষ্টে জীবিকা নির্বাহ করত। গ্রামবাসীরা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিতে দেখে সেই দম্পতি পরস্পর পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত নিল, "আমরা পূর্বজন্মে অন্ন-পানীয়-বস্ত্র দান করি নি বলে ইহজন্মে অতি দরিদ্র হয়ে সীমাহীন কষ্টভোগ করছি। ভবিষ্যৎ সুখের জন্য আমরা সাধ্যানুযায়ী দান করব।"

অতঃপর তাঁরা শাকান্ন রন্ধন করে ভিক্ষুগণের আহারের স্থানে গিয়ে পাত্র হাতে অদূরে দণ্ডায়মান হলো। তাদের গায়ে ছিল ছিন্ন বস্ত্র, তাই ভিক্ষু-সঙ্ঘের সম্মুখে উপস্থিত হওয়া সম্ভব ছিল না। সঙ্ঘস্থবির ছিলেন ক্ষীণাশ্রব, তিনি দম্পতিদের প্রতি করুণাবশত পাত্রসহ দম্পতির সামনে দাঁড়ালেন। দম্পতি পাত্রে কিছু অন্ন দিয়ে বাকী অন্ন ভিক্ষুদের পাত্রে দান করল। দান দিয়ে প্রার্থনা করল, "এই দানের প্রভাবে আমরা যেন ভবিষ্যতে দম্পতি হতে পারি এবং প্রভূত ধনসম্পত্তির অধিকারী হয়ে মৈত্রেয়বুদ্ধের সান্নিধ্য লাভ করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হই।"

অনন্তর সেই দম্পতি যথায়ুষ্কাল বাস করে মৃত্যুর পর লঙ্কাদ্বীপে উদুম্বর গিরির নিকটে ঘর সল পর্বতে দেবতারূপে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁরা বহু দেব-অপ্সরা পরিবৃত হয়ে দিব ঐশ্বর্য প্রাপ্ত হলেন। একদা দম্পতি উক্ত দানের পাত্র ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দর্শন করার জন্য বিহারে উপনীত হলে সঙ্ঘস্থবির জিজ্ঞেস করলেন, "দেব, তোমরা কোন পুণ্যকর্ম

www.pathagar.com

সম্পাদনের কারণে এরূপ প্রভূত দিব্য-সম্পত্তির অধিকারী হয়েছ ? এবং কতকাল এখানে অবস্থান করবে ?”

দেবতা দম্পতি পূর্বজন্মের আনুপূর্বিক বিষয় অবহিত করে বললেন, “ভন্তে, ভবিষ্যতে মৈত্রের বুদ্ধের উৎপত্তিকাল পর্যন্ত আমরা এখানে দিব্যসুখ উপভোগ করে বুদ্ধের উৎপত্তিকালে কেতুমতি নগরে ধনী গৃহে জন্মগ্রহণ করব এবং বুদ্ধের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে নির্বাণ লাভে সক্ষম হব।”

সুজন ব্যক্তি পাপমূলক কাজ পরিহার করে সৎকাজে রত হন। সৎকাজ সাধন কর, নির্বাণ অধিগত কর।

৯.১০ বৃক্ষদেবতা কথা

এক সময় লঙ্কা দ্বীপের দ্বাদশ বছর ধরে দুর্ভিক্ষ চলছিল। দুর্ভিক্ষে বহু লোক মৃত্যুবরণ করেছিল। যারা জীবিত ছিল তাদের দুঃখ কষ্টের সীমা ছিল না। সেই সময় এক গৃহের লোকেরা একপাত্র চাল বস্ত্র দ্বারা আবৃত করে গরম জল নিক্ষেপ করে চালের জল খেত আর চালগুলো রোদে শুকিয়ে পাত্রে রেখে মাটির নিচে রেখে দিত। এভাবে দিন কাটতে লাগল। একদিন গৃহপতি জনৈক ভিক্ষুকে শূন্য পাত্রে বিচরণ করতে দেখে চালগুলো রন্ধন করে দান করেছিল। দান দেবার পর দেখল তাদের ভাতের পাত্র পূর্ণ আছে। তারা দানের প্রত্যক্ষ ফল প্রাপ্ত হয়ে বহু লোককে খাওয়াল এবং নিজেরাও পরিপূর্ণরূপে আহার করল। এভাবে যথায়ুষ্কাল অতিবাহিত করে মৃত্যুর পর স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে।

এদিকে স্থবির অন্ন-পাত্র নিয়ে মহাইন্দ্রিবরুণ বৃক্ষমূলে উপবেশ করে আহার করতে লাগলেন। সেই বৃক্ষে বাস করত এক দেবতা। সেও ছিল ক্ষুধার্ত। ভিক্ষুকে আহাররত দেখে দেবতা এক বৃদ্ধের বেশ ধারণ করে ভিক্ষুর সামনে দণ্ডায়মান হলো। ভিক্ষু শেষ গ্রাস মুখে দেবার পূর্বে দেবতাকে দেখে অনুতপ্ত হলেন এবং শেষ গ্রাসটি তাকে দান করলেন। দেবতা অন্নপিন্ডটি হাতে নিয়ে ভাবতে লাগল, “আমি দেবকূলে জন্মগ্রহণ করেও পরিপূর্ণ পুণ্যের অভাবে আহার্য লাভ করছি না। এই ভাতের পিণ্ডটি আমি স্থবিরকে পুনঃ দান করব।” এরূপ চিন্তা করে অন্নপিণ্ডটি স্থবিরের পাত্রে দান করল। সঙ্গে সঙ্গে দেবতার জন্য আটটি দিব্য অন্ন-পাত্রের উদ্ভব হলো। দানের তাৎক্ষণিক ফল প্রত্যক্ষ করে দেবতা আশ্চার্য হয়ে গেল। সেই অন্ন বহু জনতাকে দান করে নিজেও আহার করল। তদবধি দেবতার আহার্যের অভাব দূর হয়ে গেল।

শ্রদ্ধাপ্রসূত দানের ফল অবর্নণীয়। শ্রদ্ধার সঙ্গে দান দিয়ে ভোগ সম্পত্তির অধিকারী হও।

১০. চুল্লগল্ল বর্গ

১০.১ চুল্লগল্ল কথা

লঙ্কার জর্জর[৮৪] নদীর সন্নিকটে চুল্লগল্লক নামে একটি সুবৃহৎ বিহারে বহু ভিক্ষু-সঙ্ঘ বাস করতেন। সেখানে জনৈক শ্রদ্ধাবান উপাসক একখানা সুবিশাল আসনশালা (বিশ্রামাগার)

নির্মাণ করে খাদ্য, পানীয়, দন্তকাষ্ঠ, শীতোষ্ণ জল, ভেসজ্জ ইত্যাদি আগন্তুকদের জন্য সংগ্রহ্ করে রেখেছিলেন। সেই সময়ে বেরিয় বিহারে বসবাসরত মলিয় মহাদেব নামে জনৈক ক্ষীণাশ্রব স্থবির উদরাময় রোগে আক্রান্ত হন। তিনি ইতিপূর্বে উক্ত রোগে আক্রান্ত হয়ে একাদশ যাগূ পান করে সুস্থ হয়েছিলেন। স্থবির দিব্যনেত্রে অবলোকন করে উক্ত উপাসকের নিকট একাদশ যাগূ প্রাপ্ত হবেন জেনে আকাশমার্গে সেই আসনশালায় উপনীত হলেন। স্থবির প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করলে উপাসক তাঁর রোগের বিষয় অবগত হয়ে একাদশ যাগূ প্রস্তুত করার জন্য কর্মচারীদের নির্দেশ দিয়ে স্থবিরের সকাশে উপবেশন করে ব্যাক্যালাপ করছিলেন। তখন স্থবির উপাসককে তাবতিংস স্বর্গে চুলামণিচৈত্য পূজা করার জন্য সঙ্গে যেতে বললেন। উপাসক সম্মত হলে স্থবির স্বীয় ঋদ্ধি বলে উপাসককে নিয়ে চুলামণি চৈত্যের সপ্তরত্নময় দ্বার সমীপে উপগত হলেন। তখন তাঁরা দেখতে পেলেন, মৈত্রেয় বোধিসত্ত্ব ছয়দেবলোকের দেবরাজকে পূর্বে রেখে বৃহৎ দেবপরিষদ পরিবৃত হয়ে নানাপ্রকার পূজোপকরণ নিয়ে চৈত্য বন্দনার জন্য আগমন করছেন। তাঁর চারদিকে শ্বেতবস্ত্র পরিহিত শ্বেত ধ্বজা-পতাকা-ছত্র ধারণ করে শ্বেত রথে আরোহণ করে দেব-অপ্সরাগণ নানাবিধ বাদ্য বাজনাসহকারে আসছিলেন। মৈত্রেয় দেবপুত্রের এরূপ বিভূতি দর্শন করে উপাসক স্থবিরের নিকট জানতে চাইলেন "কি পুণ্যের ফলে তিনি এসবের অধিকারী হয়েছেন।" স্থবির বললেন, "এই দেবপুত্র অতীত জন্মে লঙ্কাদ্বীপে কম্মার গ্রামে গোপালকরূপে জন্মগ্রহণ করে একদা গোচারণ হতে প্রত্যাগমন করার সময় কিছু বুনো ফল নিয়ে মালা তৈরি করে বুদ্ধের উদ্দেশ্যে একটি বল্মীকে পূজা করেছিলেন। সেই পুণ্যপ্রভাবে এই দেবলোকে এবম্বিধ দিব্য সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।"

এই দেবপুত্র প্রস্থান করার পর অন্য দেবপুত্র প্রবালবর্ণের বস্ত্রালঙ্কারে সজ্জিত প্রবালবর্ণের ধ্বজা-পতাকা, প্রবালবর্ণের বস্ত্রালংকার পরিহিত প্রবালবর্ণের রথে আরোহণ করে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হয়ে আগমন করতে লাগলেন। উপাসক এই দেবপুত্রের পুণ্যপ্রভাব জানতে চাইলে স্থবির বললেন, "ইনি অতীত জন্মে লঙ্কাদ্বীপে চৈত্যবিহারের কাছে একটি গ্রামে গোপালকরূপে জন্মগ্রহণ করে কৈশোর বয়সে খেলার সাথিদের নিয়ে খেলার ছলে বালুকাস্তূপ তৈরি করে বনের ফুল নিয়ে ত্রিরত্নের উদ্দেশ্যে পূজা করেছিলেন। সেই পুণ্যের ফলে ইনি এরূপ দিব্যবিভবের অধিকারী হয়েছেন।"

এই দেবপুত্র চলে যাবার পর অন্য এক দেবপুত্র কাঞ্চনবর্ণ বস্ত্রালংকারে পরিমণ্ডিত হয়ে সহস্র কাঞ্চনবর্ণ ধ্বজা-পতাকা উত্তোলন করে বহু দেব পরিষদসহ হেমময় রথে আরোহণ করে চৈত্য বন্দনা করার জন্য আগমন করতে দেখে উপাসক স্থবিরের নিকট জানতে চাইলেন, এই দেবপুত্রের পূর্বজন্মের কৃতকর্মের বিষয়। স্থবির বললেন, "এই দেবপুত্র অতীত জন্মে লঙ্কাদ্বীপে মহাগঙ্গার কাছে নিদ্রক নামক রাখাল রূপে জন্মগ্রহণ করে একদা গোচারণ ভূমিতে গিয়ে বন হতে কিছু পুষ্প সংগ্রহ করে গঙ্গাতীরে একটি স্তূপ তৈরি করে বুদ্ধের উপলক্ষে পূজা করেছিলেন, সেই পুণ্যের প্রভাবে এইরূপ দিব্যসম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছেন।"

www.pathagar.com

এই দেবপুত্র চৈত্য বন্দনা করে প্রস্থানের পর অন্য এক দেবপুত্র মণিময় বস্ত্রালংকারে পরিবৃত হয়ে, সহস্র মণিময় ধ্বজা-পতাকা উত্তোলন করে, মণিময় রথে আরোহণ করে মহাঋদ্ধিসম্পন্ন হয়ে আগমন করতে দেখে উপাসক স্থবির সেই দেবপুত্রের কৃত পুণ্যের বিষয় জিজ্ঞেস করলেন। স্থবির বললেন, "ইনি পূর্বজন্মে লঙ্কা দ্বীপে মহাতিষ্য নামক গ্রামে রাখাল বালক রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। সেই জন্মে তিনি গোচারণে গিয়ে বন থেকে ফুল সংগ্রহ করে বালুকা স্তূপ তৈরি করত পূজা করেছিলেন, সেই পুণ্য প্রভাবে এখন এরূপ দিব্য বিভূতির অধিকারী হয়েছেন।"

সেই দেবপুত্র চৈত্য বন্দনা করে অতিক্রান্ত হলে অপর এক দেবপুত্র সপ্তরত্নময় বস্ত্রালংকারে প্রতিমণ্ডিত হয়ে সপ্তরত্নময় সহস্র ধ্বজা-পতাকা উত্তোলন করে সপ্তরত্নময় সিন্ধব সংযোজিত সপ্তরত্নময় রথে আরোহণ করে আগমন করতে দেখে উপাসক স্থবিরের নিকট উক্ত দেবপুত্রের অতীত জীবন জানতে চাইলে তিনি বললেন "এই দেবপুত্র অতীত জন্মে সিংহলদ্বীপে কপ্‌পকন্দর নামক স্থানে ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তিরূপে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখন আসনশালা নির্মাণ ও অন্যান্য পুণ্যময় কর্ম সম্পাদন করেছিলেন, সেই পুণ্যের প্রভাবে এরূপ দিব্যময় সম্পত্তির অধিকারী হয়েছেন।"

অনন্তর সেই দেবপুত্র চৈত্যবন্দনা করে প্রস্থান করলে বহুবিধ রত্নময় অলংকারে সজ্জিত হয়ে বৃহৎ দেবপরিষদ পরিবৃত হয়ে ধর্মদেশক আগমন করতে দেখে উপাসক তাঁর পরিচয় জানতে চাইলেন। স্থবির বললেন, "ইনি ষোড়শ অসংখ্য পারমী পূরণকারী মৈত্রেয় বুদ্ধাংকুর।" অনন্তর মৈত্রের বুদ্ধাংকুর তাঁদের সামনে এসে স্থবিরকে বন্দনা করে উপাসকের পরিচয় এবং আগমনের কারণ জানতে চাইলে স্থবির বিস্তারিত অবহিত করলেন। বোধিসত্ত্ব উপাসককে দিব্য সাটকযুগল অর্পণ করে অপ্রমত্ত হবার জন্য উপদেশ দিয়ে তিনজনে চুলামণিচৈত্য বন্দনা ও পূজা করলেন। অতঃপর স্থবির উপাসকসহ চুল্লগল্ল বিহারে প্রত্যাগমন করে স্থবির একাদশ যাগূ ভোজন করে রোগমুক্ত হলেন। উপাসক তদবধি বিবিধ প্রকার পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুশেষে মৃত্যুর পর সুপ্তোত্থিতের ন্যায় তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

সর্বগুণান্বিত ব্যক্তি স্বর্গ লাভ করেন, তাই সর্ববিধ গুণে গুণবান হও।

১০.২ পণ্ডরঙ্গ কথা

সিংহল দ্বীপে কোনো একগ্রামে বেণিসাল নামে জনৈক ব্যক্তির তিষ্য নামে এক পুত্র ছিল। বয়ঃপ্রাপ্ত হলে তার মাতাপিতা অস্ত্রবিদ্যায় পারদর্শী করে রাজার নিকট প্রেরণ করেছিলেন। তিষ্য অল্প সময়ের মধ্যে রাজার প্রিয়ভাজন হয়ে উঠেন। রাজা তাঁকে অমাত্য পদে বৃত করে মহাগ্রাম দত্তক দিয়েছিলেন। তিষ্য সদ্ধর্মের প্রতি অতিশয় শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। একদা তিনি মহাবিহারের কুলগুরুর নিকট মহাবিভঙ্গ সূত্র শ্রবণ করেন। তদবধি তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দিতেন, কোন জিনিস দান না দিয়ে আহার করতেন না। একদিন তিনি গৃহে মহাদানের আয়োজন করেছিলেন। ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নানাবিধ খাদ্য দিয়ে ভোজন করালেন।

অনন্তর তিনি খেতে বসলে তাঁর জন্য উত্তম খাদ্য বস্ত্র সামনে আনা হলো। কিন্তু সেই খাদ্যরস ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দেওয়া হয় নাই। অমাত্য বললেন, "আমি দান না করে কোনো আহার্য বস্তু আহার করি না। এই খাদ্যরস সঙ্ঘকে দাও নি কেন?" তখন উপস্থিত এক ঈশ্বর ভক্ত বলল, "গ্রামের কাছে শ্মশানে একজন শ্বেতবস্ত্র পরিহিত পণ্ডরঙ্গ পরিব্রাজক আছেন। তিনি ধ্যানী, জটাধারী, ভিক্ষাচারী, তৃষ্ণাক্ষয়কারী ও সর্বগুণের অধিকারী, তাঁকে এই দান দেওয়া উচিত।" অমাত্য তাকে আহ্বান করতে নির্দেশ দিলে কর্মচারীরা পরিব্রাজকের আবাসস্থলে গেল। তারা দেখল যে, পরিব্রাজক ভোগী, কামে আসক্ত ও মদ্যপায়ী। পুকুরে বড়শি নিয়ে মাছ শিকারে রত অবস্থায় কর্মচারীগণ সেখানে উপগত হলে সে তাড়াতাড়ি মাছ ও বড়শি জলে ডুবিয়ে পা দ্বারা চেপে রাখল। কর্মচারীরা সমস্ত বিষয় অমাত্যকে অবহিত করলে তিনি বললেন, "তার কিছুমাত্র লজ্জাবোধ আছে বিধায় বড়শি জলে লুকিয়ে রেখেছে, এই আহার্য আমি তাকে দান করব।" অনন্তর সেই চরিত্রহীন পরিব্রাজককে গৃহে এনে পরপর দু'দিন দান করলেন। পরবর্তীতে মৃত্যুর সময় মহাদান কার্য সম্পাদন করেছিলেন। মৃত্যুর পর সপ্তবর্ষী বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা রূপে জন্ম নেন এবং প্রভূত খাদ্যভোজ্য ও ধনসম্পত্তি লাভ করেন।

প্রসন্ন অন্তরে দান করবে, প্রসন্ন অন্তরে দান দিলে প্রচুর ফলপ্রাপ্ত হওয়া যায়।

১০.৩ দুব্বিটি্‌ঠি মহাতিষ্য কথা

অনুরাধপুরের অনতিদূরে মহেল নামক গ্রামে দুব্বিটি্‌ঠি মহাতিষ্য নামে জনৈক ধনাঢ্য ব্যক্তি বাস করতেন। তিনি ও তাঁর স্ত্রী উভয়ে ছিলেন ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধাসম্পন্ন। উভয়ে কুশল কর্মে রমিত থাকতেন। একদা তাঁর পরিবারে হলকর্ষণ উৎসব সম্পাদন হচ্ছিল। বহুলোক কাজে নিযুক্ত হয়েছিল, বলিবর্দভকে স্নান করিয়ে অলংকারাদি পরিয়ে জমি কর্ষণ ও বীজ বপন ইত্যাদি কাজ অতি উৎসাহের সাথে চলছিল। গৃহের সকলেই হলকর্ষণ উৎসবে আনন্দরত ছিল। এমন সময় মহাতিষ্যের এক ঋণগ্রাহক শত্রু তাঁর মঙ্গলের অন্তরায় সাধনের জন্য পূর্ব দিন অভয়োত্তর বিহারে গিয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাতিষ্যের গৃহের জন্য নিমন্ত্রণ করে প্রত্যাবর্তন করল। পর দিন যথাসময়ে পাঁচশ ভিক্ষু-সঙ্ঘ মহাতিষ্যের গৃহদ্বারে উপনীত হলেন। সেই সময়ে মহাতিষ্য কর্মচারীসহ মাঠে হলষকর্ষণ উৎসবে আর মহিলাগণ গৃহে বিভিন্ন কাজকর্মে রত ছিলেন। তিষ্যের স্ত্রী পঞ্চশত ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দেখে খুশী হয়ে বন্দনা করে গৃহে উপবেশ করালেন। সঙ্ঘস্থবির তাঁদের দানের কোনো উৎসাহ না দেখে বললেন, "গৃহে কোলাহল, আজ অন্য কোনো উৎসব আছে কি?" উপাসিকা বললেন, "ভন্তে, আপনারা উপবেশন করুন।" ভিক্ষু-সঙ্ঘ প্রত্যাবর্তন করতে চাইলে উপাসিকা বললেন, "অন্ন রন্ধন হলে ভোজ করে গমন করুন।" রান্না করে পাঁচশ ভিক্ষুকে দান দিতে আরম্ভ করলেন। তখন মহাতিষ্য মাঠ থেকে প্রত্যাগমন করে জানতে পারলেন যে, "অমুক আপনাদের জন্য নিমন্ত্রণ করেছে, আপনাদের মঙ্গলানুষ্ঠান আছে জানলে আসতান না।" উপাসক বললেন, "সে আমার ঋণী, আমার হলকর্ষণ উৎসবের অন্তরায়

www.pathagar.com

করার জন্য এরূপ করেছে। সে আমার ক্ষতি করতে গিয়ে উপকারই করল। কারণ তার কারণেই আজ আপনাদের মত শীলবানদের সাক্ষাৎ ও দান করার সুযোগ পেয়েছি। সে আমার প্রকৃত মিত্রই বটে।" এরূপ বলে সেই ব্যক্তিকে ঋণ হতে মুক্তি দিয়ে তার সঙ্গে বন্ধুত্ব স্থাপন করে বহু সম্পত্তি প্রদান করলেন। তাঁরা ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মধ্যাহ্ন ভোজন দিয়ে বহুবিধ দান দিয়েছিলেন।

সৎ পাত্রে দান দিয়ে নির্বাণ অধিগত কর।

১০.৪ তিষ্য শ্রামণ কথা

সিংহল দ্বীপে উত্তর পার্শ্বে নাগবিহার[৮৫] নামে একটি বিহার ছিল। সেই বিহারে প্রবীণ শ্রামণ দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর সেই বিহার সংলগ্ন একটি নিগ্রোধ বৃক্ষে বৃক্ষদেবতা রূপে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম হলো তিষ্য। তিনি মহাবিভবের অধিকারী হন। বহু দেবঅপ্সরা তাঁর সেবায় নিয়োজিত থাকত। একদিন ভিক্ষুগণ ভিক্ষাচরণে গিয়ে খালি পাত্রে প্রত্যাবর্তন করার সময় তিনি দেখে চিন্তা করলেন, "আমি পূর্বজন্মে ভিক্ষু-সঙ্ঘের সান্নিধ্য পেয়ে ইহজন্মে এবম্বিধ সম্পত্তি প্রাপ্ত হয়েছি, এজন্মেও ভিক্ষুগণকে দান দেব।" এরূপ বলে স্ত্রীসহ ভিক্ষু-সঙ্ঘের কাছে গিয়ে বন্দনা করে ষাটজন ভিক্ষুকে নিমন্ত্রণ করে স্বীয় বিমানে নিয়ে গেলেন। তিষ্য স্বীয় অনুসারী দেবগণকে দিব্যময় অন্ন, পানীয় ও বিভিন্ন আহার্য আনয়ন করতে নির্দেশ দিলেন। তারা খাদ্যবস্তু আনার সময় মহাসুমন নামক দেবপুত্র সপরিষদ রাজায়তন চৈত্য বন্দনা করে প্রত্যাবর্তন করার প্রাক্কালে দেখতে পেয়ে সুমন দেবপুত্রও দানীয় সামগ্রীসহ সেখানে উপনীত হয়ে একসঙ্গে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে মহাদান দিলেন। ভিক্ষুগণের আহারান্তে সঙ্ঘস্থবির তিষ্যদেব পুত্রের এরূপ দিব্য বিভব দর্শন করে তাঁর অতীত কর্ম ও ভবিষ্যৎ জীবনকাল জানতে চাইলেন। তিষ্যদেবপুত্র পূর্বজীবনের পুণ্যকর্ম ব্যক্ত করে বললেন, "আমার পুণ্যকর্ম অনন্ত আকাশের মত, কাজেই আমার অবস্থানও দীর্ঘকাল, তবে কতদিন তা আমি জ্ঞাত নই।"

অতঃপর ভিক্ষু-সঙ্ঘ ধর্মদেশনা অন্তে প্রস্থান করলেন।

দান দাও, দানের দ্বারা দুর্গতি হতে মুক্তি লাভ করা যায়।

১০.৫ গোল উপাসকের কথা

সিংহল দ্বীপে রোহণ জনপদের সমুদ্রতীরে গোঠ নামক গ্রামে গোল নামে এক খর্বাকায় সদ্ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি ছিলেন। একদা তিনি সমুদ্র উপকূলে দ্বাদশজন প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের অর্হৎ ভিক্ষুকে দেখতে পেয়ে বন্দনা করে স্বগৃহে আনয়ন করে উৎকৃষ্ট খাদ্য-ভোজ্য দ্বারা ভোজন করালেন এবং তাঁর গৃহে প্রতিদিন ভিক্ষান্ন গ্রহণ করার জন্য নিমন্ত্রণ জানালেন। কিন্তু ভিক্ষুগণ অক্ষমতা প্রকাশ করে ধুরবিহারের ভিক্ষুদিগকে দান করার জন্য বললেন। উপাসক আটটি শলাকা দিয়ে স্থায়ীভাবে বাস ও অন্ন গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। ভিক্ষুগণ শলাকা নিয়ে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে গমন করে বয়োজেষ্ঠ ভিক্ষুকে অবহিত করলে আটজন ভিক্ষুকে তথায়

www.pathagar.com

স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য প্রেরণ করলেন। একদিন উপাসক কোনো কার্যোপলক্ষে গ্রামান্তরে যাবার সময় স্ত্রীকে ভিক্ষু-সঙ্ঘের পরিচর্যার ভার দিয়েছিলেন। ভিক্ষুগণ গৃহে আগমন করলে আহার্যাদি পরিবেশন শেষে তিনি ভিক্ষুগণ কোথায় বাস করেন জানতে চাইলেন। ভিক্ষুগণ তারপর থেকে আর তাঁদের গৃহে অন্ন গ্রহণ করতে আসতেন না। উপাসক গৃহে এসে সমস্ত বিষয় অবগত হয়ে দুঃখ প্রকাশ করে স্ত্রীকে ভৎর্সনা করলেন। ভিক্ষুগণ এ বিষয় জ্ঞাত হয়ে কিছুদিন পর পুনরায় আগমন করতে লাগলেন।

পরবর্তী সময়ে স্ত্রীর উপর দান দেবার ভার অর্পণ করে উপাসক ধন অর্জনের জন্য বাণিজ্যে গিয়েছিলেন। সমুদ্র পথে যাবারা সময় তাঁদের তরী ডুবি হয় এবং আরোহীরা মৃত্যুবরণ করে। উপাসকও উত্তাল ঢেউয়ে তলিয়ে যাবার সময় প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের সঙ্ঘস্থবির দিব্যনেত্রে অবলোকন করে জনৈক শ্রামণকে প্রেরণ করেন। শ্রামণ সমুদ্র হতে উপাসককে উত্তোলন করে ঋদ্ধিশক্তি দ্বারা প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের ভোজনশালায় নিয়ে গেলেন। সেই সময়ে দেবরাজ ইন্দ্র দেবপরিষদসহ সেখানে আগমন করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বন্দনা করছিলেন। শ্রামণও গোল উপাসককে দেবরাজের সঙ্গে পরিচয় করে দিলেন। ইন্দ্র উপাসককে দেখে অতীব আনন্দিত হয়ে বললেন, "আপনার দান সর্বত্র ঘোষিত হয়েছে, দেবলোকেও প্রচারিত হয়েছে, আপনি শ্রদ্ধার সাথে দান করে মনোরম বিভবসম্পন্ন আমার নিকট তাবতিংস স্বর্গে আগমন করুন।" এভাবে উপদেশ দিয়ে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে আগমনের কারণ জিজ্ঞেস করে নৌকাডুবির বিষয় অবগত হয়ে বিশ্বকর্মাকে নির্দেশ দিলেন, তিনি যেন নৌকা উত্তোলন করে স্বর্ণাদি রত্ন দ্বারা পূর্ণ করে উপাসককে স্বস্থানে পৌঁছে দেন। বিশ্বকর্মা নির্দেশ অনুযায়ী উপাসককে স্বগৃহে পৌঁছে দিলেন। উপাসক তদবধি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন।

দান দিব্যমার্গ সদৃশ, সর্বদা দান দেবে এবং স্বর্গে গমন করে দিব্য ঐশ্বর্য উপভোগ কর।

১০.৬ মোড়কন্ন দায়িকা কথা

লংকার রোহনে কপ্পকন্দর নদীর সন্নিকটে এরামণি নামে গ্রামের জনৈক মহিলা মোড়কন্ন (A parcel of boild rice) নিয়ে রাজকীয় কাজ উপলক্ষ্যে অনুরাধপুর যাত্রা করছিলেন। মধ্যাহ্ন সময়ে অরণ্যের মধ্যে তিনি গমনকারী এক ক্ষীণাশ্রব স্থবিরকে দেখে বন্দনা করে মোড়কের অন্ন তাঁর পাত্রে দান করে দিলেন। তারপর কন্দরান্তরে প্রবেশ করে বৃক্ষপত্র পরিধান করে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্রখানা ধৌত করে স্থবিরকে দান দিলেন। স্থবির তাঁর প্রসাদ সংবৃদ্ধির জন্য আকাশে উত্থিত হয়ে রাজহংসের মত প্রস্থান করলেন। ইহা দর্শন করে মহিলা আনন্দিত হলেন। সেই সময় সেই কন্দর সন্নিকটে এক বৃক্ষদেবতা তাঁর শ্রদ্ধা সম্পত্তি অবলোকন করে তাঁকে একটি অক্ষয় দিব্য সাটিকপূর্ণ পাত্র প্রদান করলেন। তিনি প্রত্যক্ষভাবে দানের ফলপ্রাপ্ত হয়ে ঘোষণা করলেন ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আগমন করার জন্য। তখনই অরিয়ক বিহার নিবাসী দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু এসে তাঁর সামনে আবির্ভূত হলেন। তিনি

ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বন্দনা করে সব ভিক্ষুকে ত্রিচীবরের জন্য পর্যাপ্ত কাপড় দান করে নিজেও পরিধান করলেন। অতঃপর স্বগৃহে প্রত্যাগমন করে আজীবন বহুবিধ পুণ্যকর্ম সম্পাদনান্তে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

বিজ্ঞগণ "লোকাত্তর সম্পত্তির বিনাশ হয় না" জ্ঞাত হয়ে দানাদি কুশল কর্ম সাধন করেন। তোমরাও দানে রমিত হও।

১০.৭ দ্বিতীয় দম্পতির কথা

সঙ্ঘামাত্যের কাহিনী ঃ অতীতকালে সিংহলের মহাগ্রামের জনৈক ব্যক্তি এক পুত্র ও এক কন্যা রেখে মৃত্যুকালে জ্যেষ্ঠা কন্যার উপর কনিষ্ঠ পুত্রের দায়িত্ব অর্পণ করে মৃত্যুবরণ করে। পুত্রের নাম ছিল সঙ্ঘামাত্য। পিতা মৃত্যুর সময় তার জন্য এক জোড়া বস্ত্র, খড়গ ও মহাছুকিরা রেখে যান। সঙ্ঘামাত্য বয়সক্রমে রূপবান ও শক্তিশালী হয়ে উঠেন। তাঁর সুকর্মের প্রশংসা করে দেবগণ চারবার সাধুবাদ প্রদান করেছিলেন।

(১) একদিন কোট্টগল্লপর্বতবাসী মহানাগস্থবির সমস্ত মহাগ্রামে ভিক্ষাচরণ করে শূন্যপাত্রে প্রত্যাগমন করতে দেখে সঙ্ঘামাত্য স্বগৃহে আহার্য না পেয়ে স্বীয় মহামূল্য মুক্তাহারের বিনিময়ে অন্ন ক্রয় করে স্থবিরের পাত্রে দান করেছিলেন। স্থবির কোনো বৃক্ষমূলে উপবেশন করে বিদর্শন সাধনায় রত হয়ে তৃষ্ণার ক্ষয় সাধন করে আহার্য গ্রহণ করেছিলেন। তখন দুট্ঠগামণি রাজার ছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতা সঙ্ঘামাত্যের দান অনুমোদন করে সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

(২) অন্য একসময় সঙ্ঘামাত্য গোঠসমুদ্রে স্নান করার সময় সহস্র সুবর্ণমাসক (Small gold coins) পূর্ণ একটি দ্রোণি তাঁর শরীরে স্পর্শ করলে সমুদ্রতীরে উত্তোলন করে ঢাকনা খুলে সুবর্ণ রাশি দেখতে পান। তিনি সুবর্ণ রাশি বোনকে দিয়ে বস্ত্র যুগল ও খড়গখানা নিয়ে অনুরাধপুর গমন করেন। সেই সময়ে এক ভিক্ষু তিম্বরু গ্রামে ভিক্ষাচরণ করে খালি পাত্রে প্রত্যাবর্তন করতে দেখে স্বীয় বস্ত্র বিক্রি করত অন্ন ক্রয় করে ভিক্ষুকে দান করেন। তিনিও অন্ন গ্রহণ করে নির্জন স্থানে উপবেশন করত বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে আহার করেছিলেন। তখনও সেই দেবতা আনন্দিত হয়ে তাঁর দানের প্রশংসা করে সাধুবাদ দিয়েছিলেন।

(৩) দেবগিরি বিহারে এক ভিক্ষু দ্বাদশ বর্ষ যাবৎ বাতব্যাধিতে ভোগছিলেন। তিনি শ্রামণকে ঘি সংগ্রহের জন্য নির্দেশ দিলে তিনি গ্রামে ঘি অন্বেষণ করে খালি পাত্র নিয়ে প্রত্যাবর্তন করছিলেন। তখন সঙ্ঘামাত্য শ্রামণের নিকট উক্ত বিয়ষ জ্ঞাত হয়ে মহাছুরিকাখানা বিক্রি করে আট কার্যাপণে ঘি ক্রয় করে দান করেন। শ্রামণ ঘি স্থবিরকে দিয়ে পূর্বোক্ত বিষয় জ্ঞাত করেন। স্থবির ওষুধসহ ঘি ব্যবহার করে সুস্থ হন এবং অবশিষ্ট ঘি দ্বারা বুদ্ধপূজা করেন। অনন্তর তিনি বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলে উক্ত দেবতা অমাত্যের প্রশংসা করে সাধুবাদ প্রদান করেন।

www.pathagar.com

(৪) রাজা দুট্ঠগামণি দেবতার সাধুবাদ শ্রবণ করে সঙ্ঘামাত্যের শ্রদ্ধার বিষয় অবগত হয়ে তাঁকে আনয়ন করার জন্য লোক প্রেরণ করেন। রাজ-অমাত্য চিত্তবাপি সমীপে সঙ্ঘামাত্যের সন্ধান পেয়ে রাজার অভিপ্রায় অবহিত করেন। তিনি রাজধানী যাবার পথে চৈত্য পর্বত বিহার সীমানায় ছিন্ন বস্ত্র পরিহিত একজন ক্ষীণাশ্রব স্থবিরকে দেখে বন্দনা করে স্বীয় পরিধেয় বস্ত্র হতে একাংশ ছিঁড়ে দান করেন। তখন রাজছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতা চতুর্থবার সাধুবাদ দিয়ে তাঁর প্রশংসা করেন। রাজা সঙ্ঘামাত্যকে বিপুল গৌরব ও সম্মান দিয়ে প্রচুর ধনসম্পত্তি প্রদান করেছিলেন। তিনিও তদবধি উপযুক্ত দার গ্রহণ করে সেখানে বসবাস করতে লাগলেন।

সঙ্ঘদত্তার কাহিনী

সঙ্ঘদত্তা ছিলেন অনুরাধপুরে সাত ভাইয়ের সর্ব কনিষ্ঠা। এক সময় অনুরাধপুরে মহামারীর উপদ্রব হলে তাদের কুলপুরোহিত চূলনাগস্থবিরসহ প্রত্যন্ত অঞ্চলে গিয়ে বাস করতে লাগলেন। সাত ভ্রাতা ফলমূল সংগ্রহ করে স্থবির ও কনিষ্ঠাকে প্রতিপালন করতেন। একদা কনিষ্ঠাকে একখানা নতুন বস্ত্র দিয়েছিলেন। পরদিবস স্থবিরকে ছিন্ন চীবর পরিহিত দেখে সঙ্ঘদত্তা স্বীয় বস্ত্রখানা দান করেন। ভিক্ষু ধ্যানানুশীলনের মাধ্যমে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়েছিলেন। কুমারীও সুকৃত দানের বিষয় অনুস্মরণ করায় দানের প্রভাবে দেবরাজের আসন উষ্ণ হয়ে উঠল। দেবরাজ দিব্যনেত্রে তাঁর দানের বিষয় জ্ঞাত হয়ে আটটি ক্ষুদ্র বাক্সে আটখানা অক্ষয় দিব্যবস্ত্র পূর্ণ করে তাঁর শিয়রে রেখে প্রত্যাগমন করলেন। কুমারী সঙ্গে সঙ্গে পুণ্যবিপাক প্রত্যক্ষ করে এক জোড়া বস্ত্র নিজে পরিধান করে প্রত্যেক ভাইকে ও ভিক্ষুকে চীবরের জন্য বস্ত্র দান করেছিলেন, এতেও বস্ত্রের পরিক্ষীণ হয়নি।

একসময় সঙ্ঘামাত্য তিষ্যবাপি উপগত হয়ে উদকক্রীড়া করছিলেন। তখন অকস্মাৎ ঝড়-ঝঞ্ঝা শুরু হয়। সে সময় সঙ্ঘদত্তা সপ্ত ভ্রাতাসহ আশ্রয়খানায় আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, কিন্তু সঙ্ঘদত্তা অতি ধীর স্থির গতিতে যেতে লাগলেন। সঙ্ঘামাত্য এরূপ বিনয়ী, লজ্জাশীলা, বহু লক্ষণযুক্ত কুমারীকে দেখে অনুরক্ত হলেন। অতঃপর কুমারীর ভাইদের অনুমতিক্রমে উভয়ে দাম্পত্যসূত্রে আবদ্ধ হন।

অনন্তর তাঁরা উভয়ে আজীবন দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে মৃত্যুর পর দেবলোকে জন্মগ্রহণ করেন।

দানের দ্বারা প্রাপ্ত সুখ অনন্ত। সংসার মূল উৎপাদনের জন্য দান কর।

১০.৮ সঙ্ঘদত্ত স্থবির কথা

অনুরাধপুরের জনৈক রাজকর্মচারী কোন রাজকীয় কর্মোপলক্ষে মুগ্গায়তন রাজ্যের একটি কৈবর্তগ্রামে গিয়েছিলেন। সেখানকার মানুষেরা তাঁকে মাদক দ্রব্য ও উপাদেয় অন্নব্যঞ্জনাদি দ্বারা সেবা করেছিল। তিনি সকালবেলা অন্ন ভোজন করার জন্য উপবেশন করলে এক ক্ষুধার্ত কুকুরী ঘ্রাণ পেয়ে সেখানে এসে দাঁড়াল। তিনি ক্রুদ্ধ হয়ে প্রথম গ্রাসটি কুকুরীকে আঘাত করার উদ্দেশ্যে জোড়ে নিক্ষেপ করলেন। কুকুরী সেই মাংসযুক্ত অন্নপিণ্ড

www.pathagar.com

তৃপ্তিসহকারে খেল। রাজকর্মচারী অবশিষ্ট অন্ন খাওয়ার সময় অপর-চেতনা উৎপাদন করে ভাবলেন, "আমা কর্তৃক উৎকৃষ্ট খাদ্য কুকুরীকে প্রদত্ত হয়েছে।" তিনি কাজ সমাপ্ত করে প্রত্যাগমন করার সময় চোর কর্তৃক আক্রান্ত হয়ে মৃত্যুবরণ করেন এবং মৃত্যুর পর সেই পুণ্যের প্রভাবে মহালেন বিহারের কাছে একটি গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তখন তাঁর নাম রাখা হয় সজ্ঞদত্ত। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে তিনি মহালেন বিহারে ভিক্ষুর নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করে সদ্ধর্ম চর্চায় রত হন। পরবর্তীকালে সেই গ্রামে অপদেবতার ভয়ের উদ্ভব হলে গ্রামবাসী জীবিকা অর্জনের জন্য অন্যত্র চলে যায়। কিন্তু সজ্ঞদত্ত স্থবির চৈত্য ও বোধিপূজা করার জন্য রয়ে গেলেন। পরদিন ভিক্ষার সময় হলে স্থবির পাত্র-চীবর নিয়ে নিকটস্থ গুহাভিমুখী হয়ে দাঁড়িয়েছিলেন, এমন সময় সেই গুহাদ্বারে অবস্থিত বৃক্ষের অধিষ্ঠিত দেবতা মনুষ্যরূপ ধারণ করে স্থবিরকে আজীবন চতুর্প্রত্যয়াদি গ্রহণের জন্য নিমন্ত্রণ করলেন। দেবতা কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন-পানীয় দ্বারা বার বছর কাটালেন। অনন্তর তিনি একদিন দেবতাকে দিব্য অন্ন-পানীয় প্রাপ্তির কারণ জিজ্ঞেস করলেন। দেবতা তাঁকে পূর্বজন্মে ক্রুদ্ধবশত কুকুরীকে অন্নপিণ্ড দানের বিষয় অবহিত করালেন। স্থবির ভাবলেন, "অহো, প্রহারের জন্য নিক্ষিপ্ত দানের ফল এত মহৎ। শ্রদ্ধাচিত্তে উত্তমপাত্রে দান দিলে না জানি কিরূপ মহৎ ফল হবে।" অতঃপর সজ্ঞদত্ত বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে অচিরে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হয়ে পরম শান্তিপদ নির্বাণ সাক্ষাৎ করলেন।

দানে স্বর্গ ও নির্বাণ লাভ করা যায়। সবসময় দানপরায়ণ হও, চিত্তকে দানের প্রতি রমিত কর।

১০.৯ জনৈক কুমারী কথা

তাম্রপর্ণী দ্বীপে দুবৃষ্টি মহারাজের রাজত্বকালে মহাগঙ্গা ও সেরী সরোবরের অনতিদূরে কারক নামে গ্রামে জনৈক বিত্তশালী ব্যক্তি এক কুমারীকে সহধর্মিণী করে দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। সেই সময়ে উদুম্বর বিহারে ছয়মাস অন্তর আর্যবংস দেশনা অনুষ্ঠিত হত। তখন চারযোজন পরিমিত স্থানে জনগণ সমবেত হয়ে সদ্ধর্ম শ্রবণ ও পূজাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করত। সেই ধর্মাসমাগমে উক্ত উপাসকও অংশগ্রহণের সিদ্ধান্ত নিয়ে স্ত্রীর উপর গৃহের যাবতীয় দায়িত্ব অর্পণ করে সেখানে গমন করলেন। স্ত্রী চিন্তা করলেন, "সকলে ধর্ম শ্রবণ ও পূজা করার জন্য চলে গেল, অথচ আমি গৃহে অবস্থান করছি। ধর্ম আমারও প্রিয়, আমিও স্বর্গ মোক্ষ কামনা করি।" এরূপ চিন্তা করে তিনিও গৃহের দায়িত্ব তাঁর পরিচিত এক মহিলার উপর অর্পণ করে ধর্মাসমাগমে যোগদানের জন্য যাত্রা করলেন। তিনি একাকী সমুদ্র উপকূলে উপনীত হয়ে গঙ্গার অপর পাড়ে যাবার জন্য কোনো নৌকা না পেয়ে সাঁতার কাটতে আরম্ভ করলেন। পথিমধ্যে এক বৃহৎ মৎস্য তাঁকে খাওয়ার জন্য আক্রমণ করল, কিন্তু বহু চেষ্টা করেও তাঁর কোন ক্ষতি করতে পারল না।

অতঃপর তিনি নিরাপদে সমুদ্র উপকূলে উদুম্বর বিহারে গিয়ে চৈত্য ও বোধি বন্দনা করে পঞ্চশীল গ্রহণান্তে ধর্ম শ্রবণ করতে করতে স্রোতাপত্তি ফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন। রাত

www.pathagar.com

প্রভাত হলে তাঁর আগমনের বিষয় স্বামীকে অবহিত করলেন এবং একত্রে স্বগ্রামে প্রত্যাবর্তন করলেন। কিন্তু গৃহাবাসে তাঁর মন আর রমিত হলো না। তিনি একদিন স্বামীকে প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য বিদায় দিতে অনুরোধ করলেন। স্বামীও তাঁর সংসারের প্রতি অনাসক্তভাব দেখে সম্মতি দান করলেন। অনন্তর তিনি মহাগ্রামের নিকটে ভিক্ষু-সঙ্ঘের কাছে উপনীত হয়ে স্বীয় মাতৃ-ভগ্নি সুমনথেরীর নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলেন এবং কর্মস্থান গ্রহণ করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। তাঁর শ্রামণ্যধর্ম গ্রহণ সার্থক হল।

যথাসময়ে সমস্ত তৃষ্ণার বন্ধন ছিন্ন করে নির্বাণ অধিগত কর।

১০.১০ তিষ্যমহানাগ স্থবির কথা

সিংহল দ্বীপে রোহণ জনপদে কুটুম্বিয় নামে একটি বিহার ছিল। সেই বিহারের সঙ্ঘনায়ক ছিলেন তিষ্যমহানাগ স্থবির। একদিন তিনি অমরলেনবাসী অর্হৎ তিষ্য স্থবিরের নিকট গমন করে বন্দনাতে একান্তে উপবেশন করলেন। তিষ্যস্থবির তাঁর সঙ্গে মধুর বাক্য বিনিময়ের পর বললেন, "বন্ধো। তোমার মত শাস্ত্রজ্ঞ ও শ্রদ্ধায় প্রব্রজ্জিতের সাধারণের মত জীবন নির্বাহ করা অনুচিত। প্রাতিমোক্ষ সংবরণশীল ও ইন্দ্রিয় সংরক্ষণীশল অনুশীলন, সমস্ত অকুশল কর্ম, পরিবর্জন, স্মৃতি সম্পন্ন ও আরদ্ধবীর্য হয়ে বাস করা উচিত। শীলে প্রতিষ্ঠিত সুপরিশুদ্ধ শীল পালনে প্রত্যয়ী অচিরে মার্গফল লাভে সক্ষম হন।" এভাবে শীল বিশুদ্ধিকরণ ও প্রতিপালনের উপকারিতা সম্পর্কে বিশদ উপদেশ দান ও সতিপট্‌ঠান সূত্র দেশনা করে তাঁকে কর্মস্থান প্রদান করলেন। তিষ্য মহানাগ স্থবির কর্মস্থান গ্রহণ করে স্থবিরকে বন্দনান্তে স্বীয় বিহারে প্রত্যাবর্তন করার সময় এক উন্মত্ত মনুষ্য হত্যাকারী হস্তী সম্মুখে পথ রুদ্ধ করে দাঁড়াল। ঠিক সেই সময় মহামেঘের সৃষ্টি হয়ে মুষলধারায় বৃষ্টি হতে আরম্ভ করল। স্থবির মৈত্রীভাব পোষণ করে হস্তীর চতুর্পায়ের মধ্যখানে উপবেশন করে সতিপট্‌ঠান সূত্র সাধনা করে আনুপূর্বিক মার্গ পরম্পরায় ধ্যান করতে করতে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হলেন। সেই সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী কম্পিত হলো, দেবগণ সাধুবাদ দিয়ে প্রশংসা করলেন। দেবমনুষ্যগণ তাঁকে পূজা করল। তিনি সদ্ধর্ম দেশনা করলেন। হস্তীও তাঁর প্রতি প্রসন্ন হয়ে ত্রিশ বছর স্থবিরের সেবা করেছিল।

স্থবির যথাসময়ে পরিনির্বাণপ্রাপ্ত হলে জনগণ তাঁর দৈহিক সৎকার সম্পাদনান্তে মন্দির নির্মাণ করেন। হস্তীও আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর তাবতিংস স্বর্গে জন্মগ্রহণ করে।

শীলে প্রতিষ্ঠিত হয়ে শীল প্রতিপালন কর। শীল নির্বাণ প্রাপ্তির সহায়ক।

১১.১ বৃদ্ধমহিলার কথা

রোহণ জনপদের ককুবন্ধ গ্রামে দানাদি সুকর্মে বিমুখ, রুক্ষ ও ঝগড়াটে এক বৃদ্ধমহিলা বাস করত। একদিন মলিয় মহাদেব স্থবির দিব্যনেত্রে জগৎ অবলোকন করে দেখতে পেলেন যে, উক্ত মহিলা অচিরে মৃত্যুবরণ করে নিরয়গামী হবে। আর যদি তিনি (মলিয় মহাদেব স্থবির) সেখানে গমন করেন তাহলে মহিলা তাঁকে এক চামচ যাগূ দান করবে,

এতে সে স্বর্গবাসী হবে। স্থবির তার দান গ্রহণ করার জন্য নিরোধ সমাপত্তি ধ্যানে প্রবিষ্ট হয়ে সপ্তম দিনে ধ্যান হতে উঠে পাত্র-চীবর গ্রহণ করে সেই বৃদ্ধ মহিলার গৃহদ্বারে উপনীত হলেন। মহিলা স্থবিরকে দেখে প্রসন্ন মনে এক চামচ যাগূ পাত্রে দান করল। স্থবির যাগূ নিয়ে গ্রামের বাইরে আহারের জন্য জলাশয়ের নিকটে উপবেশন করলেন। তখন মহাবুদ্ধরক্ষিত স্থবির সমাপত্তি ধ্যান হতে গাত্রোত্থান করে উত্তর কুরু হতে ভিক্ষাচরণ করে ভিক্ষার একাংশ সিংহবোধি স্থবিরের মাধ্যমে মহাদেব স্থবিরের নিকট পাঠালেন। কিন্তু তিনি তাঁর প্রেরিত আহার্য গ্রহণ না করে মহিলার প্রতি অনুকম্পাবশত যাগূই আহার করলেন। সিংহবোধি স্থবির বৃদ্ধ মহিলার পুণ্যের বিপাক জানতে চাইলে মহাদেবস্থবির বললেন, "এই বৃদ্ধা ষাট কল্পব্যাপী দিব্য সম্পত্তি উপভোগ করবে।" সিংহবোধি স্থবির প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে প্রত্যাগমন করে ইত্যাদি বিষয় অবহিত করলে বুদ্ধরক্ষিত স্থবির বললেন, "এই বৃদ্ধা আশি কল্প স্বর্গসুখ ভোগ করবে।" এভাবে ভিক্ষুগণ স্বস্ব দৃষ্ট বিষয় ব্যক্ত করলেন। এটা জ্ঞাত হয়ে মহাসঙ্ঘরক্ষিত স্থবির বললেন, "বুদ্ধ এভাবে কালসীমা অব্যক্ত রেখেছেন।" তিনি উক্ত ভিক্ষুদিগকে দণ্ডকর্ম প্রদান করলেন। ভিক্ষুগণ সুমেরুপাদতল হতে সুবর্ণময় বালুকারাশি এনে প্রিয়ঙ্গু বিহার অঙ্গনে ছিটিয়ে দিয়ে দণ্ডকর্ম মুক্ত হলেন। সেই বৃদ্ধমহিলা সপ্তম দিবসে মৃত্যুবরণ করে দেবলোকে উৎপত্তি হয়।

উত্তম ক্ষেত্রে যেমন উত্তম ফসল প্রাপ্ত হওয়া যায়, তেমনি শ্রেষ্ঠ পাত্রে দান দিলে শ্রেষ্ঠ ফল লাভ করা যায়। কাজেই শ্রেষ্ঠ পাত্রে দান করবে।

১১.২ পঞ্চশত ভিক্ষুর কথা

তাম্রপর্ণী দ্বীপে কম্বলতিষ্য পর্বতে অরিয়াকর নামে একটি বড় বিহার ছিল। পর্বতের ঢালু স্থানে পাঁচশ বাদুড় বিভিন্ন স্থানে আহার্য গ্রহণ করে বাস করত। সেই সময়ে কোনো এক ভিক্ষু সতিপট্‌ঠান সূত্র আবৃত্তি করছিলেন। পাঁচশ বাদুড় ভিক্ষুর স্বরের প্রতি নিমিত্ত গ্রহণ করে অর্থ, অক্ষর কিংবা পদ না জেনে চিত্তকে প্রসন্ন করেছিল। পরবর্তী সময়ে পাঁচশ বাদুড় মৃত্যুবরণ করে সেই বিহারের নিকটস্থ একটি গ্রামে বিভিন্ন গৃহে জন্মগ্রহণ করে। তারা সকলেই সুস্বাস্থ্য ও ধনসম্পদের অধিকারী হয়েছিল। একদিন সেই বিহারে অরিয়বংস দেশনা অনুষ্ঠিত হবার সময় তারা সেখানে উপস্থিত হয়ে শ্রদ্ধাসহকারে শ্রবণ করেছিল। অন্য একদিন তারা মহাসতিপট্‌ঠা সূত্র শ্রবণ করে সকলে গৃহত্যাগ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করল এবং পর্বতের ঢালু স্থানে অবস্থিত বিহারে বাস করতে লাগল। একদিন তাদের মধ্যে একজন বলল, "ভন্তে, এখানে বাদুড়ের গন্ধ লাগছে।" সঙ্ঘস্থবির বললেন, তোমরা পূর্বজন্মে বাদুড়রূপে জন্ম নিয়ে এখানে বাস করতে, তাই এরূপ গন্ধ অনুভূত হচ্ছে।" এভাবে পূর্বজীবন বৃত্তান্ত বললেন। অনন্তর তারা মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রে মনঃসংযোগ করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হলেন।

বাদুড় পর্যন্ত বুদ্ধের বাণী শ্রবণ করে মুক্তির মার্গ পেয়েছিল। তোমরা মানুষ, কাজেই তোমরাও মুক্তির মার্গ অন্বেষণ কর।

www.pathagar.com

১১.৩ দন্তকুটুম্বিকের কথা

সিংহল দ্বীপের উত্তর দিকে নাগকার নামক গ্রামে দন্তকুটুম্বিক নামে জনৈক ধনশালী ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাসম্পন্ন ব্যক্তি বাস করতেন। একদিন তিনি সালিক্ষেত পরিদর্শন করার সময় প্রিয়ঙ্গুদ্বীপবাসী মলিয় মহাদেব স্থবির সাতজন অর্হৎসহ আকাশমার্গে আগমন করে সেই গ্রামদ্বারে অবতরণ করেছিলেন। তিনি তাঁদের সমীপে উপগত হয়ে বন্দনা করে কোন কোন গৃহে ভিক্ষান্ন সহজলভ্য হবে জ্ঞাত করালেন এবং স্বয়ং গৃহঅঙ্গণ দীপ-ধূপ-ঘট ইত্যাদি দ্বারা সজ্জিত ও আসন করে ভিক্ষুদিগকে উপবেশন করালেন। অতঃপর বহুবিধ সুস্বাদু আহার্য পরিবেশন করে ধর্ম শ্রবণ করলেন। তারপর প্রতি দিন আটজন ভিক্ষুর আহার্য গ্রহণের নিমন্ত্রণ করলেন। তদবধি সেই আটজন ভিক্ষু নিয়মিত তাঁর গৃহে এসে আহার্য গ্রহণ করতেন। চার বছর পর ভিক্ষু-সঙ্ঘের আহার্য দানের দায়িত্ব স্ত্রীকে অর্পণ করে তিনি অর্থ রোজগারের উদ্দেশ্য নৌকাযোগে সুবর্ণভূমি যাত্রা করলেন। সাতদিন পর সমুদ্রে প্রবল ঝড়ের সৃষ্টি হলে তাদের নৌকা ডুবে যায় এবং দন্তকুটুম্বিক ব্যতীত সকলে মারা পড়ে। তিনিও ধীরে ধীরে ক্লান্ত হয়ে ডুবে যাচ্ছিলেন, তখন মলিয় মহাদেব স্থবির অন্তর্দৃষ্টিতে দেখতে পেয়ে সিংহবোধি স্থবিরকে জানালেন। স্থবির বাহু প্রসারিত করে অলৌকিকভাবে তাঁকে সমুদ্র থেকে উদ্ধার করে প্রিয়ঙ্গুদ্বীপে আনলেন। সেখানে দ্বাদশ সহস্র ভিক্ষু বাস করতেন। কুটুম্বিক আহারাদি সম্পাদন করে মলিয় মহাদেব স্থবিরকে বন্দনা করলে স্থবির বললেন, "আজ দেব পরিষদসহ দেবরাজ এখানে আগমন করবেন। আপনি আজ এখানে অবস্থান করে তাঁকে দর্শণ করুন।" যথাসময়ে দেবেন্দ্র দেব পরিষদসহ নানাবিধ বর্ণ-গন্ধময় পুষ্প-দীপ-ধূপ ইত্যাদি নিয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে বন্দনান্তে একান্তে উপবেশন করে বাক্যলাপ করতে লাগলেন। তখন স্থবির কুটুম্বিকের গুণ ব্যাখ্যা করলে দেবরাজ তাঁর সঙ্গে বাক্যালাপ প্রসঙ্গে প্রভূত প্রশংসা করলেন। কুটুম্বিকের নৌকা ডুবির বিষয় অবগত হয়ে দেবরাজ বিশ্বকর্মা দেবপুত্রকে সপ্ত নৌকা রত্নপূর্ণ করে তাঁকেসহ স্বগৃহে পৌঁছে দেবার নির্দেশ দিলেন। বিশ্বকর্মা দেবপুত্রও দেবরাজের নির্দেশ অনুযায়ী স্বীয় প্রভাবে সপ্ত রত্নময় নৌকাসহ কুটুম্বিককে পৌঁছে দিয়ে আসলেন। সেই ক্ষণে রাজছত্রে অধিষ্ঠিত দেবতা সাধুবাদ দিয়ে কুটুম্বিকদের প্রশংসা করলেন। রাজা সাধুবাদের কারণ জানতে পেরে তাঁকে প্রভূত ধন-সম্পত্তি প্রদান করেন। অনন্তর তিনি দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করে আয়ুক্ষয়ে মৃত্যুর পর স্বর্গলাভ করেন।

জ্ঞানীরা উত্তমরূপে দানকার্য সম্পাদন করেন এবং পরিশেষে নির্বাণ প্রাপ্ত হন। তোমরাও দান কর, পরম শান্তিকর নির্বাণ অধিগত কর।

তথ্যনির্দেশ

১। কশ্যপবুদ্ধ-কশ্যপবুদ্ধ বারাণসী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা ব্রহ্মদত্ত ব্রাহ্মণ, মাতা ধনবতী ব্রাহ্মণী, অগ্রশ্রাবক তিষ্য ও ভরদ্বাজ, সেবক সর্বমিত্র, অগ্রশ্রাবিকা অতুলা ও উরুবেলা, বোধি নিগ্রোধবৃক্ষ, দেহ ২০ হাত উচ্চ ও আয়ু

২০ হাজার বছর ছিল। তাঁর একটি সভায় ২০ হাজার ভিক্ষু ধর্মজ্ঞান লাভ করেছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব ত্রিবেদ পারদর্শী প্রসিদ্ধ জ্যোতিপাল নামক ব্রাহ্মণ ছিলেন। তিনি তাঁর বন্ধু ঘটিকারের সাথে বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে প্রব্রজ্যা লাভ করেন।

২। বোধিসত্ত্ব– 'বোধি' শব্দের অর্থ জ্ঞান আর 'সত্ত্ব' শব্দের অর্থ জীব। সুতরাং বোধিসত্ত্ব বলতে এমন একটি জীব বা প্রাণীকে বোঝায় যার মধ্যে বোধি বা জ্ঞানের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছে। সম্যক সম্বুদ্ধ দীপংকর অমরাবতী নগরে উপস্থিত হলে সুমেধ তাপস তাঁর পাদমূলে পতিত হয়ে বন্ধুত্ব লাভের প্রার্থনা করলে তিনি ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, ভবিষ্যতে তিনি গৌতম নামে বুদ্ধ হবেন। তদবধি তিনি বুদ্ধত্ব লাভের জন্য সংকল্পবদ্ধ হয়ে ত্রিংশপারমী পূরণে নিবিষ্ট হন। পারমীসমূহ পূর্ণ করতে তাঁকে অসংখ্যবার জন্মগ্রহণ করতে হয়েছে। এসব জন্মের কাহিনীকে জাতক বলা হয় এবং ঐ সময়কার তিনি যে সত্ত্ব রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন তাঁর সেই জীবনকে বোধিসত্ত্ব বলা হয়। অর্থাৎ বুদ্ধ বোধিজ্ঞান লাভের পূর্ব জীবনই হচ্ছে বোধিসত্ত্ব জীবন।

৩। বারাণসী– এটা কাশি জনপদের রাজধানী। এর অদূরে অদূরে ঋষিপতন মৃগদার অবস্থিত। এখানে বুদ্ধ সর্বপ্রথম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের মধ্যে ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র দেশনা করেন। তখন বারাণসী ছিল শিল্প ও বাণিজ্যকেন্দ্র। তখন ইহার সঙ্গে শ্রাবস্তী ও তক্ষশীলার মধ্যে বাণিজ্য চলত। কথিত আছে বারাণসী ছিল কশ্যপবুদ্ধের জন্মস্থান। মৈত্রেয় বুদ্ধও ভবিষ্যতে এখানে জন্ম গ্রহণ করবেন। তখন এটার নাম হবে কেতুমতী।

৪। শিখীবুদ্ধ– ইনি অরুণবতী নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম অরুণক্ষত্রিয়, মাতার নাম প্রভাবতী। অগ্রশাবক অভিভূত ও সম্ভব, সেবক খেমঙ্কর, অগ্রশ্রাবিকা মখিলা ও পদুমা, বোধিতরু পুণ্ডরিকবৃক্ষ। তাঁর দেহ ৩৭ হস্ত উচু, দেহপ্রভা তিনযোজন ব্যাপৃত হত এবং তিনি ৩৭ হাজার বছর জীবিত ছিলেন। তখন বোধিসত্ত্ব অরিন্দম নামক রাজা ছিলেন।

৫। চতুরার্যসত্য– দুঃখ, দুঃখসমূদয়, দুঃখনিরোধ এবং দুঃখনিধোধগামিনী প্রতিপদ (আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ)।

৬। শ্রাবস্তী– উত্তর প্রদেশের অন্তর্গত গোণ্ডা ও বহরাক জেলার অন্তবর্তী, অচিরাবতী নদীর তীরে অবস্থিত। বর্তমানে তা সাহেতমাহেত নামে খ্যাত। এটি বৌদ্ধদের প্রধান তীর্থস্থানের অন্যতম। ভগবান বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে শ্রাবস্তীর নিবিড় সম্পর্ক আছে। এখানে বুদ্ধ পঁচিশটি বর্ষাবাস যাপন করেন। তৎকালীন ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কোশল ছিল অন্যতম এবং এই কোশল জনপদের প্রধান নগরী ছিল শ্রাবস্তী। শ্রাবস্তীতে জেতবন, পূর্বারাম ও রাজকারাম নামক তিনটি সুপ্রসিদ্ধ বৌদ্ধবিহার ছিল। এখানকার সুদত্ত নামে জনৈক শ্রেষ্ঠী জেতবন বিহার

www.pathagar.com

নির্মাণ করে বুদ্ধ প্রমুখ ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান করেন। পালি সাহিত্যে তিনি অনাথপিণ্ডিক নামে অধিক পরিচিত। শ্রাবস্তীর পূর্বারাম বিহার নির্মাণ করেন মহা উপাসিকা বিশাখা। এ বিহারে বুদ্ধ ছয় বর্ষা যাপন করেন। রাজা প্রসেনজিৎ ভিক্ষুণীদে জন্য রাজকারাম বিহারটি নির্মাণ করেছিলেন। প্রসেনজিতের অগ্রমহিষী মল্লিকাদেবী মল্লিকারাম নামে একখানা ধর্মশালা নির্মাণ করান। এখানে ধর্ম আলোচনা হতো।

সম্রাট অশোকের সময়ও শ্রাবস্তীর খ্যাতি ছিল। কুষাণ শাসনামলেও শ্রাবস্তী সমৃদ্ধশালী নগরী ছিল। খ্রিস্টীয় পঞ্চম শতাব্দির প্রথম দিকে চৈনিক পরিব্রাজক ফা-হিয়েন শ্রাবস্তী পরিদর্শন করেন। তিনি এ সময়ে শ্রাবস্তীর ক্ষয়িষ্ণু অবস্থা দেখতে পান। সপ্তম শতকে হিয়েন সাঙও শ্রাবস্তী দর্শন করে মন্তব্য করেন যে, তখন বৌদ্ধধর্মের পূর্ব গৌরব হারিয়ে ফেলেছিল। ১৮৬৩ সালে জেনারেল ক্যানিংহাম সাহেব সাহেত-মহেত খনন কার্য পরিচালনা করেন। তিনি তখন কোসম্বীকুটি আবিষ্কার করেন। ১৮৭৬ খ্রিস্টাব্দে তিনি পুনর্খনন করে গন্ধকুটি আবিষ্কার করেন। ভারত সরকারের পুরাতত্ত্ব বিভাগ ১৯০৭-০৮ এবং ১৯১০-১১ সালে সাহেত-মাহেত খনন কার্য পরিচালনা করেন এবং অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন উদ্ধার করেন।

বর্তমানে সাহেত-মাহেত একটি প্রদিদ্ধ বৌদ্ধতীর্থ। এখানে কেন্দ্র ও রাজ্য সরকার তীর্থযাত্রীদের সুবিধার জন্য অনেক সুব্যবস্থা করেছেন।

৭। জম্বুদ্বীপ– পৃথিবীকে মোটামুটি চারভাবে ভাগ করা হয়েছে, যেমন– উত্তরে কুরু, দক্ষিণে জম্বুদ্বীপ, পূর্বে বিদেহ এবং পশ্চিমে গোদানীয়। সাধারণত অখণ্ডিত ভারতবর্ষ এবং তৎসংলগ্ন চর্তদিকে আরও কিছু কিছু প্রতিবেশী রাষ্ট্র নিয়ে প্রাচীন জম্বুদ্বীপ গঠিত ছিল।

৮। পাটলিপুত্র– এটা মৌর্যসম্রাট অশোকের রাজধানী ছিল। তখনকার মগধের রাজধানী রাজগির থেকে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করা হয়েছিল। এর বর্তমান নাম পাটনা। এখানে মোগ্‌গলিপুত্ত তিষ্য স্থবিরের নেতৃত্বে মৌর্যসম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

৯। পরিনির্বাণ– নির্বাণ ও পরিনির্বাণ সমার্থবোধক। 'নি' উপসর্গের সাথে 'বাণ' শব্দের সহযোগে 'নির্বাণ' পদ সিদ্ধ হয়। 'নি' উপসর্গ দ্বারা অভাব বোঝায় অর্থাৎ 'না' অর্থে প্রযুক্ত হয়। আর 'বাণ' শব্দ দ্বারা বন্ধন বা তৃষ্ণা বোঝায়। অতএব, যে ধর্ম প্রত্যক্ষ করলে লোকের স্বকীয় তৃষ্ণা বা বন্ধন নিরবশেষভাবে ছিন্ন হয় তাকে নির্বাণ বলে। নির্বাণ শান্ত লক্ষণযুক্ত। দুঃখের উপশমতাই এর স্বভাব, অচ্যুতি এর রস বা কৃত্য। নির্বাণ প্রাপ্ত ব্যক্তির পুনর্জন্ম রুদ্ধ। তথা হতে তাঁর চ্যুত হওয়ার কোনো ভয় নেই। এটা অচ্যুত, অনিমিত্ত, অসংযত ও জ্ঞানগম্য। অচ্যুতি অনিমিত্তকতাহেতু এর কোনো পদস্থান নেই। প্রজ্বলিত অগ্নি নির্বাপিত হওয়ার

www.pathagar.com

ন্যায় তৃষ্ণা ক্ষয় প্রাপ্ত বিমুক্ত পুরুষের বিজ্ঞান নিরোধের সাথে চিত্ত বিমোক্ষ প্রাপ্ত হয় এবং তৎসঙ্গে তাঁর পুনর্জন্ম নিরুদ্ধ হয়। নাগার্জুনের ভাষায়–

"অপ্রহীনম্ অসম্প্রাপ্তম্ অনুচ্ছিন্নং অশাশ্বতম্
অনিরুদ্ধম্ অনুৎপন্নম্ এতং নির্বাণং উচ্যতে।"

নির্বাণ পরম সুখকর। নির্বাণের উৎপত্তি কংবা বিলয় নেই। এটা এমন এক অমৃতপদ যা পরম শান্তিদায়ক এবং সুখকর। নির্বাণ অকারণ সম্ভূত, এর উৎপত্তিও নেই, বিনাশও নেই। কাজেই এটা আবহমানকাল বিরাজমান। নির্বাণ দু'প্রকার (১) সোপাদিসেস নির্বাণ ও (২) অনুপাদিসেস নির্বাণ। কোনো ব্যক্তি যখন সাধনা বলে ক্লেশ বা তৃষ্ণার ক্ষয়সাধন করে অর্হত্বফলে উন্নীত হন তখন তিনি সোপাদিসের নির্বাণপ্রাপ্ত হন, আর যখন এরূপ নির্বাণপ্রাপ্ত পুরুষের পঞ্চস্কন্ধের বিলোপ সাধন হয় তখন তিনি অনুপাদিসেস নির্বাণ প্রাপ্ত হন।

১০। কৌশাম্বী– এটা ছিল বৎস (বংশ) রাজ্যের রাজধানী। এটা বর্তমান উত্তর প্রদেশের এলাহাবাদ ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল নিয়ে গঠিত ছিল। বুদ্ধ তাঁর নবম বর্ষাবাসে কৌশাম্বীতে পদার্পণ করেন। কৌশাম্বীরাজ উদয়ন প্রথমে বৌদ্ধধর্মের বিরোধিতা করলেও পরে তিনি ও তাঁর মহিষী শ্যামাবতী বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এখানে ঘোষিতারাম নামে বিহারে বুদ্ধ কয়েকবার অবস্থান করেছিলেন।

১১। ত্রিশরণ– বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণকে ত্রিশরণ বলা হয়।

১২। বিপস্সীবুদ্ধ– ইনি বন্ধুমতি নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা রাজা বন্ধুমা, মাতা বন্ধুমতি। অগ্রশ্রাবক খণ্ড ও তিষ্য, সেবক অশোক, অগ্রশ্রাবিকা চন্দ্রা ও চন্দ্রমিত্রা, বোধি পাটলীবৃক্ষ। তাঁর দেহের উচ্চতা ছিল ৮০ হাত, দেহজ্যোতি সর্বদা ৭ যোজন ব্যাপ্ত হত এবং আয়ুস্কাল ছিল ৮০ হাজার বছর। তখন বোধিসত্ত্ব মহাঋদ্ধিবান অতুল নামক নাগরাজ ছিলেন।

১৩। ধম্মচক্র– সিদ্ধার্থ গৌতম বোধিজ্ঞান লাভের পর বুদ্ধগয়া থেকে সারনাথে উপনীত হন। তিনি সেখানে আষাঢ়ী পূর্ণিমার শুভদিনে তাঁর জ্ঞান-লব্ধ ধর্ম পঞ্চবর্গীয় শিষ্যদের নিকট প্রকাশ করেন। সেই প্রথম প্রকাশিত ধর্মই ধম্মচক্র সূত্র নামে অভিহিত।

১৪। বন্ধুমতী নগর– বিপস্সী বুদ্ধের জন্মস্থান।

১৫। তাবতিংস– ছয়টি কামলোক দেবভবনের অন্যতম। অন্য দেবভবনগুলো হচ্ছে চাতুর্মহারাজিক, যাম, তুষিত, নির্মাণরতি এবং পরিনির্মাণরতি।

১৬। পদুমুত্তর বুদ্ধ– পদুমুত্তর বুদ্ধ হংসবতী নামক নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম আনন্দক্ষত্রিয়, মাতার নাম সুজাতা। তাঁর অগ্রশ্রাবকদ্বয় যথাক্রমে দেবল ও সুজাত, প্রধান সেবক সুমন। অমিতা ও অসমা তাঁর অগ্রশ্রাবিকা, সালবৃক্ষ বোধি। তাঁর দেহের উচ্চতা ৮৮ হাত এবং তাঁর দেহের

www.pathagar.com

আলো ১২ যোজন ব্যাপৃত হত। তখন বোধিসত্ত্ব মহারাষ্ট্রীয় জটিল নামে সন্ন্যাসী ছিলেন।

১৭। অশোক– অশোক মগধের সম্রাট ছিলেন। মহাবংশ মতে অশোক গৌতম বুদ্ধের পরিনির্বাণের ২১৮ বছর পর মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তিনি রাজা বিন্দুসারের পুত্র। কথিত আছে, বিন্দুসার রাজার ষোলজন স্ত্রীর সর্বমোট ১০১ জন পুত্র ছিল। অশোকের মাতার নাম ছিল ধম্মা এবং তিনি ছিলেন অগ্রমহিষী। অশোক যৌবনে অবন্তীরাজ্যের শাসনভার প্রাপ্ত হন। তাঁর পিতার মৃত্যু আসন্ন হলে তিনি পাটলিপুত্রে প্রত্যাবর্তন করে সুমন ও তিষ্য নামে দুই ভাই ব্যতীত সকলকে হত্যা করে সিংহাসন অধিকার করেন। অশোক অবন্তীরাজ্যের রাজধানী উজ্জয়িনীতে অবস্থানকালে বিদিসা মহাদেবী নামে এক শাক্যকুমারীকে প্রধান মহিষীরূপে অভিষেক করেন। তাঁর গর্ভে মহেন্দ্র ও সঙ্ঘমিত্রার জন্ম হয়। অশোক প্রথম জীবনে পিতার ন্যায় আজীবক সম্প্রদায়ের অনুসারী ছিলেন। নিগ্রোধ শ্রামণের নিকট বুদ্ধ বাণী শ্রবণ করে তিনি বৌদ্ধধর্মে দীক্ষিত হয়ে সদ্ধর্ম প্রচার ও প্রসারে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি ৮৪ সহস্র বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেন। মোগ্‌গলি পুত্ত তিস্‌স স্থবিরের নেতৃত্বে তিনি তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতি অনুষ্ঠানের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। সঙ্গীতি শেষে দেশের ভিতরে ও বাইরে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ তাঁর উল্লেখযোগ্য কীর্তি। তিনি শ্রীলঙ্কার রাজা দেবপ্রিয়তিষ্যের সঙ্গে সখ্যতা গড়ে তোলেন এবং শ্রীলঙ্কায় বৌদ্ধধর্ম প্রচারের জন্য তাঁর পুত্র মহেন্দ্র স্থবির ও কন্যা সঙ ঘমিত্রাকে প্রেরণ করেছিলেন। বৌদ্ধধর্ম বিশ্বব্যাপী বিস্তৃতির জন্য তাঁর অবদান সর্বাধিক।

১৮। গাবুত– এক গাবুত দু' মাইলের চেয়ে কিছু কম।

১৯। চন্দ্রভাগা নদী– এটা ভারতের অন্যতম খরস্রোতা প্রসিদ্ধ নদী। কথিত আছে, এর গভীরতা এক লীগ (প্রায় সাড়ে তিন মাইল),এক লীগ বিস্তৃত এবং আঠার লীগ দীর্ঘ ছিল মিলিন্দ প্রশ্ন মতে এটা হিমালয়ে উৎপন্ন দশটি নদীর মধ্যে একটি।

২০। দেবদেহ– এটা শাক্যদের শহরতলী। সিদ্ধার্থের মাতা মহামায়া ও বিমাতা-মাসী মহাপ্রজাপতি গৌতমীর জন্মস্থান। সিদ্ধার্থের জন্মস্থান লুম্বিনী দেবদহের নিকটে ছিল। বুদ্ধ ভ্রমণকালে এখানে অবস্থান করে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে ধর্মোপদেশ প্রদান করেছিলেন। এটা দেবদহ শাক্য ও পক্‌খ স্থবিরের বাসস্থান ছিল।

২১। তক্ষশীলা– এটা গান্ধার রাজ্যের রাজধানী ছিল। জাতক সাহিত্যে জানা যায় যে, তক্ষশীলা ছিল বুদ্ধপূর্বযুগ হতে প্রাচীন ভারতের প্রখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র। বুদ্ধের সময়কালেও এখানে দেশের বহু-স্থান থেকে ছাত্ররা শিক্ষা গ্রহণে আসতেন। কোশলরাজ প্রসেনজিৎ, লিচ্ছবিপ্রধান মহালী, মল্লের রাজকুমার বন্ধুল তক্ষশীলা বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষাগ্রহণ করেন। জীবক ও অঙ্গুলীমালও এখানে বিদ্যাশিক্ষা গ্রহণ করেন। এখানে ত্রিবেদ, আঠার প্রকার বিজ্ঞান, কলা, চিকিৎসা, সঙ্গীত,

www.pathagar.com

আয়ুর্বেদ ইত্যাদি বিভিন্ন বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া হত। ছাত্রদের ভর্তি হবার সময় সাধারণত একজাহার স্বর্ণমুদ্রা ফি দিতে হত। ছাত্ররা শিক্ষকদের গৃহে সদস্য হিসেবে থাকতেন এবং রাত্রিবেলায় শিক্ষাগ্রহণ করতেন। ছাত্ররাও শিক্ষকদের গৃহের যাবতীয় কাজকর্ম করে দিতেন। এটা পাঞ্জাবের অন্তর্গত রাওয়ালপিন্ডি নামক স্থানে অবস্থিত ছিল।

২২। রাজগৃহ– মগধের রাজধানী ছিল। বুদ্ধের সময়ে এখানে বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু রাজত্ব করতেন। পাঁচটি পাহাড়ের মধ্যস্থলে প্রাচীন রাজগৃহ অবস্থিত ছিল। পাহাড়গুলো যথাক্রমে পণ্ডব, গিধ্রকূট, বেভার, ঋষিগিলি এবং বেপুল্ল (বিপুল)। রাজগৃহ বুদ্ধের জীবনের সঙ্গে গভীরভাবে সম্পৃক্ত। বোধিজ্ঞান লাভের এক বছরের মধ্যেই বুদ্ধ রাজগৃহে গিয়েছিলেন। মগধরাজ বিম্বিসার তাঁকে সাদরে গ্রহণ করেন এবং বেণুবনবিহার দান করেন। বুদ্ধ বিভিন্ন সময়ে এখানে কয়েকবর্ষা যাপন করে বহু ধর্মোপদেশ দান করেছিলেন। এখানেই নালন্দার ব্রাহ্মণ সন্তান সারিপুত্র ও মোগ্‌গল্লান বুদ্ধের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের অব্যবহিত পর রাজা অজাতশত্রুর পৃষ্ঠপোষকতায় ও মহাকশ্যপ স্থবিরের নেতৃত্বে প্রথম বৌদ্ধ মহাসঙ্গীত সপ্তপর্ণী গুহায় অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে অন্যান্য উল্লেখ্যযোগ্য স্থানগুলো হচ্ছে কলন্দকনিবাপ বিহার, সীতবন, জীবকের আম্রবন, পিপ্‌ফলিগুহা, উদম্বরিকারাম, মোরনিবাপ, তপোদারাম, ইন্দসালগুহা, লট্‌ঠিবন, মদ্দকুচ্ছি, সুপতিট্‌টচেতিয়, পাসানকচেতিয় এবং সমাগধা পুকুর অন্যতম। বুদ্ধের পরিনির্বাণের সময় এখানে ১৮টি বৃহৎ বিহার ছিল। এছাড়া, রাজগৃহ নিগ্রন্থনাথপুত্র মহাবীরেরও বিচরণক্ষেত্র ছিল। এটা বিহাররাজ্যের পাটনা জেলায় অবস্থিত, এখানে একটি উষ্ণপ্রস্রবণও রয়েছে, যেখানে প্রতিদিন হাজার হাজার পুণ্যার্থী স্নান করেন।

২৩। কোশল– প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে কোশল অন্যতম। বুদ্ধের সময়ে রাজা প্রসেনজিৎ কর্তৃক শাসিত এটা একটি শক্তিশালী জনপদ ছিল। এটা মগধের উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত ছিল। এর রাজধানী ছিল শ্রাবস্তী। পরবর্তী নাম সাকেত বুদ্ধ কোশলে দীর্ঘ সময় অতিবাহিত করে বহু ধর্ম-বিনয় প্রজ্ঞাপ্ত করেন। শ্রাবস্তীতে শ্রেষ্ঠী অনাথপিণ্ডিক ৫৪ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে জেতবন বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এর পূর্বদিকে ছিল মাহাউপাসিকা বিশাখা নির্মিত পূর্বারাম।

২৪। তুল– দারুশাটিক পুত্র কাহিনী, পকীণ্ণবগ্গ : ৫, ধম্মপদট্‌ঠকথা।

২৫। সুমেধ বুদ্ধ– ইনি সুদর্শন নগরে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম সুদত্ত ও মাতার নাম সুদত্তা। অগ্রশ্রাবক শরণ ও সর্বকাম, প্রধান সেবক সাগর, অগ্রশ্রাবিকা রামা ও সুরামা, বোধি মহানীপ নামক বৃক্ষ। তাঁর দেহের উচ্চতা ৮৮ হাত এবং আয়ু ৯০ হাজার বছর। তখন বোধিসত্ত্ব উত্তর নামক মানব ৮০ কোটি ধন ত্যাগ করে প্রব্রজিত হয়েছিলেন।

www.pathagar.com

২৬। কাহিনীটি থেরগাথায় দুকনিপাতে উত্তরথের নামে সংকলিত। সম্ভবত এটা থেরগাথা থেকে গৃহীত হয়েছে।

২৭। চোলরাজ্য- দক্ষিণ ভারতের একটি রাজ্য ছিল। চোল-গণ এক সময় শ্রীলংকা আক্রমণ করে এবং তাদের শাসন প্রতিষ্ঠা করে। তখন তারা বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক ক্ষতিসাধন করেছিল।

২৮। পূর্বে ধতরট্ঠ, দক্ষিণে বিরুলহক, পশ্চিমে বিরূপক্খ এবং উত্তরে বেস্সরণ (কুবের) দেবরাজ অবস্থান করেন।

২৯। নারদবুদ্ধ- চব্বিশজন সম্যক সম্বুদ্ধের মধ্যে ইনি নবম। তিনি ধনবতী নগরীতে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর মাতার নাম অনোমা এবং পিতার নাম সুদেব। তিনি নয় সহস্র বছর গৃহাবাসে ছিলেন। তাঁর স্ত্রীর নাম ছিল জিতসেনা, পুত্রের নাম নন্দুত্তরা। তিনি মহাশোণ বৃক্ষমূলে বোধিজ্ঞান প্রাপ্ত হন। তিনি ৮৮ হাত দীর্ঘ ছিলেন। ৯০ হাজার বছর বয়সে তিনি নির্বাণ প্রাপ্ত হন। ভদ্রসাল ও জিতমিত্র ছিলেন তাঁর অগ্রশ্রাবক এবং উত্তরা ও ফাল্গুনী ছিলেন অগ্রশ্রাবিকা। তাঁর প্রধান সেবক ছিলেন বাসেট্ঠ। বোধিসত্ত্ব জটিল (ঋষি। রূপে হিমালয়ে বাস করতেন।

৩০। পঞ্চঅভিজ্ঞান- পূর্বনিবাসে অভিজ্ঞান, বিদ্যচক্ষু অভিজ্ঞান, পরচিত্তাচারে অভিজ্ঞান, বিবিধ ঋদ্ধিতে অভিজ্ঞান এবং দিব্য-শ্রুতি অভিজ্ঞান।

৩১। অষ্টসমাপত্তি- প্রথম ধ্যান, দ্বিতীয় ধ্যান, তৃতীয় ধ্যান, চতুর্থ ধ্যান, আকাশ অনন্ত্যায়তন, বিজ্ঞাননান্ত্যায়তন, আকিঞ্চন্যায়তন এবং নৈবসংজ্ঞানাসাংজ্ঞায়তন।

৩২। হংসবতী নগরী- পদুমুত্তর বুদ্ধের জন্মস্থান। ভাগীরথী নদী এর পাশ দিয়ে প্রবাহিত।

৩৩। তুল- সীবলী স্থবির, গেরগাথা (গেরগাথা, সম্পাদিত স্থবির, বৌদ্ধ মিশন, রেঙ্গুন, ১৯৩৫ পৃ. ৭৫-৭৯।

৩৪। মহাসেন- প্রাচীন ভারতের একজন রাজা। তাঁর রাজধানী ছিল পাটলীপুত্র। কথিত আছে- তিনি প্রতিদিন একহাজার ভিক্ষু-সঙ্ঘকে আহার্য দান করতেন। উল্লেখ্য যে, এই কাহিনীটি চুলবংস (পৃ. xcii 23 ff.) গ্রন্থেও দৃষ্ট হয়। লেখক এটা সম্ভবত এখান থেকে সংকলন করেছেন।

৩৫। প্রিয়ঙ্গুদ্বীপ- এটা সম্ভবত সিংহলের নিবটবর্তী একটি স্থান-যেখানে ধ্যানসাধনায় রত ভিক্ষুগণ বাস করতেন। মহাবংসমতে (xxxii 55.) এখানে বার সহস্র ভিক্ষু বাস করতেন।

৩৬। স্রোতাপত্তি- বিদর্শন সাধনার মাধ্যমে স্রোতে পতিত হওয়া। ইহা মার্গ ও ফলভেদে দ্বিবিধ। স্রোতাপন্ন সত্ত্ব ক্রমশ উর্ধগতিপ্রাপ্ত হয়ে নির্বাণ লাভে সক্ষম হন।

৩৭। অনুরাধপুর- সিংহলের কদম্ব নদীর তীরে দুই অনুরাধ নামে লোকের দ্বারা পছন্দ করা জায়গায় অনুরাধ গড়ে উঠেছিল এবং অনুরাধ নক্ষত্রপুঞ্জের অধীনে ছিল।

www.pathagar.com

সেজন্যই এর নাম হয়েছিল অনুরাধপুর (মহাবংস ১০, ৭৬ ঐ টীকা ২১৩)। মহাবোধিবংস মতে, এখানে সন্তুষ্ট মনের লোকেরা থাকতেন বলে ইহা অনুরাধপুর নামে পরিচিত হয়েছিল (২৯৩)। রাজা পাণ্ডুকাভয় (খ্রি. পূ: ৩৯৪- ৩৯৪- ৪০৭) এর প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। তিনি উপতিস্‌সগাম হতে তাঁর রাজধানী এখানে নিয়ে আসেন (ম, ব, ১০, ৭৫-৭৭)। তিনি অনুরাধপুরকে সুন্দর করে সাজিয়েছিলেন: এতে ছিল নগরে জল দেবার এক বড় পুকুর, দুটি বড় হ্রদ--জয়বাপী এবং অভয়বাপী, একটি মহাশ্মশান, শিকারী এবং ঝাড়ুদারদের জন্য বিশেষ গ্রাম, বিভিন্ন দেবদেবীর জন্য মন্দির, জৈন, আজীবক, পরিব্রাজক, সন্ন্যাসী এবং ব্রাহ্মণদের ঘর, হাসপাতাল এবং ইঞ্জিনিয়ার ও সহকারী কর্মচারীদের জন্য থাকবার ঘর (ঐ ১০, ৯৭-১০২)। পণ্ডুকাভয় এখানের দেখাশোনার জন্য দিন এবং রাত্রের 'নগর-অধিকর্তা' নিয়োগ করেছিলেন (ঐ ১০, ৮০- ১০২)। তাঁর ছেলে মুটসিব রাজধানীর ডানদিকে মহামেঘবন নামে বিখ্যাত বাগান করেছিলেন (ম, ব, ১১, ২)। এ ছাড়া এখানে নন্দনবন বা জ্যোতিবন নামে অপর একটি বাগান ছিল (ঐ, ১৫, ২, ১১)।

সিংহলের পরের রাজা ছিলেন দেবানংপিয়তিস্‌স। তাঁরই সময়ে ভারত-সম্রাট অশোক তাঁর ছেলে মহেন্দ্রকে অনুরাধপুরে পাঠিয়েছিলেন। সিংহলী রাজা বৌদ্ধধর্মের প্রচারের জন্য অনুরাধপুরে অনেক বৌদ্ধ স্থাপত্যশিল্পের প্রতিষ্ঠা করেছিলেন (ঐ ২০, ১৭)। অশোকের কন্যা সঙ্ঘমিত্রা পবিত্র বোধিবৃক্ষের শাখা মহামেঘবনে রোপন করেছিলেন। দেবানংপিয়তিস্‌স অনুরাধপুরে মহাবিহার, চেতিয়পব্বত, হত্থালহক প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন (ঐ ২০, ৪৮-৫০)।

চোলরাজকুমার এলার খ্রিস্টপূর্ব দ্বিতীয় শতাব্দির মধ্যভাগে সিংহল আক্রমণ করেন এবং অনুরাধপুর অধিকার করে প্রায় ৪৫ বছর শাসন করেছিলেন। তাঁর হাতে বৌদ্ধধর্মের খুবই ক্ষতি হয়েছিল এবং অনুরাধপুর একেবারে ধ্বংস হয়েছিল। কাকবর্ণতিয্যের পুত্র দুট্ঠগামনি (১০১-৭৭ খ্রি. পূঃ) বিদেশীদের হাত হতে দেশকে উদ্ধার করেন। তিনি অনুরাধপুরে মহাস্তূপ, মরিচবট্টি, নয়তলা লৌহপ্রসাদ প্রভৃতি নির্মাণ করেছিলেন। তাঁর ভাই শ্রদ্ধাতিষ্য হিংহাসনে আরোহণ করে অনুরাধপুরে দক্ষিণগিরি বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ম, ব, ৩৩, ৭)।

খ্রি. পূঃ প্রথম শতকের শেষভাগে অনুরাধপুরে পাঁচজন তামিল শাসক প্রায় চৌদ্দ বছর রাজত্ব করেছিলেন। বট্টগামনি অভয় (২৯-১৭ খ্রি. পূঃ) তামিলদের হারিয়ে অনুরাধপুর জয় করেন। তিনি এ নগরে অভয়গিরি বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ম, ব, ৩৩, ৭৮-৮১)। বসবের রাজত্বকালে (১২৭-১৭১ খ্রিস্টাব্দ) অনুরাধপুরের চারিদিকে আঠার কিউবিট উচ্চতা দেওয়াল দেওয়া হয়েছিল (ঐ, ৩৫- ৯৭)। মহাসেনের রাজত্বকাল (৩৩৬-৩৬১ খ্রিস্টাব্দে) ইতিহাসে এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এ সময়ে এর খ্যাতি সিংহলের বৌদ্ধধর্মের প্রধান কেন্দ্র

www.pathagar.com

হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল। মহাসেন এখানে জেতবন বিহার নির্মাণ করেছিলেন (ঐ, ৩৭, ৩৮)। মহাসেনের সময়ে (৪০৯- ৪৩১ খ্রিস্টাব্দে) বিখ্যাত টীকাকার বুদ্ধঘোষ ত্রিপিটকের সিংহলী টীকাগুলি পালিভাষায় অনুবাদ করতে এখানকার মহাবিহারে এসেছিলেন (ঐ ৩৭, ২৪৩-২৪৪)। এ সময়ে বহু বিশিষ্ট লোক বিখ্যাত বৌদ্ধভিক্ষুদের নিকট বিদ্যালাভের জন্য এখানে আসেন।

মহানামের রাজত্বের পর ছয়জন তামিল আক্রমণকারী পঁচিশ বছরের বেশি অনুরাধপুরে রাজত্ব করেছিলেন। তাঁদের হাতে এই দ্বীপ ছারখার হয়ে যায়। এ সময়ে ধাতুসেন (৪৬০-৪৭৮ খ্রিস্টাব্দ) তামিলদের পরাজিত করে সিংহলী শাসন ফিরিয়ে এনেছিলেন। তিনি অনুরাধপুরের উন্নতির জন্য অনেক কাজ করেছিলেন। তিনি এখানে এবং এর কাছে আঠারটি বিহার এবং পুকুর করেছিলেন। তিনি বুদ্ধের এবং বোধিসত্ত্বের মুর্তি দিয়ে রাজধানীকে সাজিয়েছিলেন (ঐ, ৩৮ ৬১- ৭৮)। এর কিছু পরে রাজাদের ষড়যন্ত্র এবং গৃহযুদ্ধের ফলে দেশ এক বিরাট বিপদের মুখে পড়ে। অনুরাধপুরের চারদিকে তামিলগণ দ্বারা বারবার আক্রমণ বন্ধ করা অসম্ভব হওয়ায় নবম শতাব্দীর প্রথমদিকে গোলন্নরুভ-এ নূতন রাজধানী স্থাপিত হয়। এরপর অনুরাধপুর রাজধানী হিসেবে পরিত্যক্ত হয়।

৩৮। প্রতিসম্ভিদা- প্রতি-সম্+ভিদ্ ধাতু নিষ্পন্ন শব্দ অর্থাৎ লোকোত্তর মার্গাদি বিষয়ে বিশেষ বুৎপত্তি। প্রতিসম্ভিদা জ্ঞান চারি প্রকার, অর্থ প্রতিসম্ভিদা, ধর্ম প্রতিসম্ভিদা, নিরুক্তি প্রতিসম্ভিদা ও প্রতিভাণ প্রতিসম্ভিদা।

৩৯। চতুর্প্রত্যয়- অন্ন, চীবর (বস্ত্র), ভেষজ (ঔষধ) ও শয়নাসন (বাসস্থান)।

৪০। দশপারমী- পারমী শব্দের অর্থ পারঙ্গমতা বা পরিপূর্ণতা, পারমিতা। গৌতম বুদ্ধ চারি অসংখ্য লক্ষ কল্প পূর্বে সুমেধ তাপস জীবনে দীপংকর সম্যক সম্বুদ্ধের নিকট বুদ্ধত্ব প্রার্থনা করার পর থেকে বোধিলাভের জন্য পারমী সম্ভার পূর্ণ করতে আরম্ভ কবেন। দশ প্রকার পারমী প্রত্যেকটি তিনভাগে বিভক্ত, যথা- পারমী, উপপারমী ও পরমার্থ পারমী। দশবিধ পারমী হচ্ছে, দান,শীল, নৈষ্ক্রম্য, প্রজ্ঞা, বীর্য, ক্ষান্তি, সত্য, অধিষ্ঠান, মৈত্রী ও উপেক্ষা।

৪১। তুষিত স্বর্গ- ছয়টি দেবলোকের মধ্যে এটা চতুর্থ। চার সহস্র বছর মনুষ্যলোকের সময়ে তুষিত দেবলোকের একদিন। এরূপ চার সহস্র বছর এই দেবলোকের দেবগণের আয়ু। নিয়মানুযায়ী প্রত্যেক বোধিসত্ত্বগণ তুষিত সর্গ থেকে দশ সহস্রবালের দেবগণের অনুরোধক্রমে পৃথিবীতে অবতীর্ণ হন। গৌতম বোধিসত্ত্ব সেতুকেতু নামে তুষিত স্বর্গে ছিলেন। ভবিষ্যৎ মৈত্রেয় বুদ্ধও নথদেব নামে তথায় অবস্থান করছেন।

৪২। মগধ- এটা প্রাচীন ভারতের ষোড়শ মহাজনপদের মধ্যে অন্যতম বৃহত্তম ও শক্তিশালী রাষ্ট্র ছিল। বুদ্ধের সময়ে রাজধানী ছিল রাজগৃহ। তখন মগধের

www.pathagar.com

শাসনকর্তা ছিলেন বিম্বিসার ও তৎপুত্র অজাতশত্রু। সুমঙ্গলবিলাসিনী মতে (১ম খণ্ড, পৃঃ ১৪৮), ইহা ৮০ সহস্র গ্রাম নিয়ে গঠিত ছিল এবং এর পরিধি ছিল তিন সহস্র লীগ। তখন এটা পূর্বদিকে চম্পানদী, দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতমালা, পশ্চিমে সোণ নদী এবং উত্তরে গঙ্গানদী দ্বারা বেষ্ঠিত ছিল। প্রাচীনকালে মগধ শিক্ষা ও বাণিজ্যের কেন্দ্র হিসাবে খ্যাত ছিল এবং শিক্ষা ও বাণিজ্যের জন্য উত্তর-ভারত থেকে বহু লোকের সমাগত হত। বস্তুতপক্ষে বৌদ্ধধর্মের জন্মভূমি মগধরাজ্য এবং এখান থেকে পরবর্তী কালে সমগ্র বিশ্বব্যাপী ছড়িয়ে পড়েছিল। বৌদ্ধসাহিত্যে মগধরাজ্যের নিম্নোক্ত স্থানগুলোর নামোল্লেখ রয়েছে, যথা– একনালা, নালকগ্রাম, সেনাণিগ্রাম, খানুমত, অন্ধকবিন্ধ, মচল, মাতুলা, অম্বলট্ঠিকা, পাটলিগ্রাম, নালন্দা এবং সালিন্দিয়।

৪৩। অসন্ধিমিত্তা– ধর্মাশোকের প্রধান মহিষী। তিনি বৌদ্ধধর্মের একনিষ্ঠ অনুসারী ছিলেন। সম্রাট অশোকের রাজত্বের ৩০তম বর্ষে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। মহাবংসে উল্লেখ আছে, বোধিবৃক্ষের শাখা সিংহলে নিয়ে যাবার সময় তিনি তাঁর সমস্ত অলংকার বৃক্ষের উদ্দেশ্যে দান করেছিলেন এবং বহুবিধ সুগন্ধ পুষ্পাদি দ্বারা পূজা করেছিলেন। কথিত আছে, তাঁর অঙ্গ প্রত্যঙ্গের সংযোগস্থল যখন মাত্র নমিত (বক্র) করতেন তখনই দৃশ্যমান হত, নতুবা দেখা যেত না।

৪৪। নিগ্রোধ শ্রামণ– নিগ্রোধ শ্রামণ বা নিগ্রোধকুমার মৌর্য-রাজ বিন্দুসারের পৌত্র। তাঁর পিতার নাম সুমন এবং মাতার নাম সুমনা। সুমন রাজকুমার কনিষ্ঠ অশোক কর্তৃক নিহত হলে সুমনাদেবী চণ্ডাল গ্রামে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং সেখানে একটি নিগ্রোধ বৃক্ষমূলে নিগ্রোধ কুমারের জন্ম হয়। সপ্তম বর্ষ বয়সে নিগ্রোধকুমার মহাবরুণ স্থবিরের নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন। একদা সম্রাট অশোক তাঁকে দেখে মুগ্ধ হন এবং প্রাসাদে আহ্বান করে তাঁর মুখ থেকে বুদ্ধ বর্ণিত ধর্মপদের অপ্পমাদ বগ্গ শ্রবণ করেন। বস্তুতপক্ষে নিগ্রোধ শ্রামণের আচরণ ও বুদ্ধবাণীই পরবর্তীকালে অশোকের বৌদ্ধধর্ম গ্রহণের পথ সুগম করেছিল। অশোক আজীবন নিগ্রোধ শ্রামণের প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন।

৪৫। তিষ্যমহারাজ (দেবানম্পিয়তিস্স)– সিংহলের রাজা তিষ্যের সময়কাল খ্রি. পূ. ২৪৭-২০৭ পর্যন্ত। তিনি ছিলেন মুটসীবের দ্বিতীয় পুত্র। তিনি মৌর্য সম্রাট অশোকের সমসাময়িক এবং একান্ত সুহৃদ ছিলেন। দেবপ্রিয়তিষ্য তাঁর ভ্রাতুষ্পুত্র মহারিট্ঠকে বহুবিধ উপঢৌকনসহ মগধের রাজধানী পাটলিপুত্রে সম্রাট অশোকের রাজদরবারে প্রেরণ করেছিলেন। অশোক তাঁকে রাজকীয় সম্মান প্রদর্শন করেন এবং বৌদ্ধধর্মীয় চিহ্নসম্বলিত নানাপ্রকার উপঢৌকনসহ পুনঃপ্রেরণ করেন এবং বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার আমন্ত্রণ জানান। পরবর্তীতে অশোক-তণয় মহেন্দ্র স্থবিরের নেতৃত্বে একটি প্রচারকদল সিংহলে গমন করলে রাজা দেবপ্রিয়তিষ্য

www.pathagar.com

সপারিষদ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। তিনি মহামেঘবন নামক স্থানে মহাবিহার নির্মাণ করেন, এটা পরবর্তী সময়ে বৌদ্ধধর্ম চর্চার প্রধান কেন্দ্ররূপে খ্যাতি লাভ করে। এ ছাড়া তিনি চেতিয়পব্বত বিহার, থূপারাম বিহার, হত্থাল্হক বিহার, উপাসিকা বিহার, বেস্সগিরি বিহার, জম্বুকোল বিহার, তিস্সমহাবিহার, পাচিনারাম, পঠমথূপ ইত্যাদি সঙ্ঘারাম ও স্তুপ নির্মাণ করেন। মূলত তাঁর সময়েই সিংহলে বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হয়।

৪৬। বিন্দুসার– মগধের রাজা সম্রাট অশোকের পিতা। তাঁর পিতার নাম চন্দ্রগুপ্ত। তিনি আটাশ বছর রাজ্য শাসন করেন। মৌর্যবংশীয় ধম্মা ছিলেন তাঁর প্রধান মহিষী। অশোক ও তিস্স ছিলেন তাঁর গর্ভজাত। কথিত আছে রাজা বিন্দুসার প্রতিদিন বিভিন্ন সম্প্রদায়ের ষাট সহস্র সন্ন্যাসীকে আহার্য দান করতেন।

৪৭। সুমনাদেবী– রাজা বিন্দুসারের পুত্রবধু, সুমন রাজকুমারের স্ত্রী এবং নিগ্রোধ শ্রামণের মাতা।

৪৮। মহাবরুণ স্থবির– নিগ্রোধ শ্রামণের গুরু।

৪৯। মহেন্দ্র স্থবির– অশোকের পুত্র এবং সংঘমিত্রার ভাই। তিনি বিষ বছর বয়সে অশোকের রাজত্বের চতুর্দশ বছরে মোগ্গলিপুত্ত তিস্স স্থবিরের নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেন। তিনি তিন বছর গুরুর নিকট বৌদ্ধধর্ম শিক্ষা গ্রহণ করেন। তিনি ইট্ঠিয়, উত্তিয়, সম্বল, বদ্ধসাল, সুমন শ্রামণের এবং ভণ্ডকসহ শ্রীলকংকায় গমন করে সিংহলরাজ দেবপ্রিয়তিষ্যসহ বহু সিংহলী জনসাধারণকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দান করেন। তিনি শ্রীলংকায় আজীবন সদ্ধর্ম প্রচারে রত ছিলেন। তাঁর প্রত্যক্ষ উপস্থিতিতে সেখানে বহু বিহার, স্তূপ, চৈত্য ও সংঘারাম নির্মিত হয়েছিল। তিনি দেবপ্রিয়তিষ্যের সহোদর উত্তিয় রাজের রাজত্বের অষ্টম বর্ষে পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৫০। সংঘমিত্রা– অশোকের কন্যা, তাঁর মাতার নাম অসন্ধিমিত্তা। তিনি উজ্জয়িনীতে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তাঁর স্বামীর নাম অগ্নিব্রহ্মা। তাঁদের সুমন নামে এক পুত্র ছিল। অগ্নিব্রহ্মা পরবর্তীতে উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। আঠার বছর বয়সে সংঘমিত্রা অগ্রজ মহেন্দ্রের সঙ্গে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। তিনি সিংহলরাজ তিষ্যের অনুরোধক্রমে বোধিবৃক্ষের শাখাসহ শ্রীলংকায় গমন করেন এবং অনুলাদেবীসহ তাঁর সঙ্গীদের ভিক্ষুণী প্রব্রজ্যায় দীক্ষা দেন। তিনি উপাসিকা বিহারে বাস করতেন, পরে হত্থলহক বিহারে অবস্থান করেন। রাজা উত্তিয়ের রাজত্বের নবম বর্ষে উনষাট বছর বয়সে পরিনির্বাণ লাভ করেন। তাঁর নির্দেশমত বোধিবৃক্ষের কাছে তাঁকে দাহ করা হয়।

৫১। মেগ্গলিপুত্ততিস্স– ইনি পাটলিপুত্রে মোগ্গলি ব্রাহ্মণ পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর ডাক নাম ছিল তিস্স। তিনি প্রথম জীবনে বেদত্রয়ে পারদর্শিতা লাভ করে

www.pathagar.com

সিগ্‌গব নামক স্থবিরের নিকট বুদ্ধ বাণী শ্রবণ করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। চণ্ডবজ্জি স্থবিরের নিকট সুত্ত ও অভিধর্ম পিটক শিক্ষা করেন। তিনি বৌদ্ধধর্ম দর্শনে প্রভূত জ্ঞানের অধিকারী হন। পরবর্তীতে তিনি ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রধান নির্বাচিত হন। তিনি তৃতীয় বৌদ্ধ মহাসঙ্গীতিতে সভাপতিত্ব করেন। এই সঙ্গীতি অশোকারামে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। এখানে তিনি কথাবত্থু নামক গ্রন্থ রচনা করে অন্য তির্থীকদের মতবাদ খণ্ডন করত বিভজ্জবাদ প্রতিষ্ঠা করেন। এই সঙ্গীতি অশোকের রাজত্বের সপ্তদশ বর্ষে অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তখন তাঁর বয়স হয়েছিল বাহাত্তর বছর। মহেন্দ্র স্থবির তাঁর নিকট উপসম্পদা গ্রহণ করেছিলেন। তিনি সঙ্গীতি শেষে সম্রাট অশোকের পৃষ্ঠপোষকতায় ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং বর্হিভারতে ধর্মপ্রচারক প্রেরণ করেন। আশি বছর বয়সে তিনি পরিনির্বাণ প্রাপ্ত হন।

৫২। অনুলাদেবী– সিংহলরাজ মুটসীবের কন্যা এবং উপরাজ মহানাগের স্ত্রী। তিনি পাঁচশ সহচরীসহ মহেন্দ্র স্থবিরের নিকট সদ্ধর্ম শ্রবণ করে স্রোতাপত্তিফলে প্রতিষ্ঠিত হন। সঙ্ঘমিত্রা থেরীকে পাটলিপুত্র থেকে সিংহলে আনয়ন করে তাঁরা ভিক্ষুণী সঙ্ঘে দীক্ষা গ্রহণ করেন। তখন তিনি অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হন এবং তিনিই ছিলেন প্রথম মহিলা অর্হৎ।

৫৩। রোহণ জনপদ– প্রাচীন শ্রীলংকার প্রধান তিনটি প্রদেশের মধ্যে অন্যতম। এটা দ্বীপের দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলে অবস্থিত। এর উত্তর সীমানায় ছিল মহাবালুক নদী। সম্ভবত: রোহণ নামে জনৈক শাক্যরাজকুমার এখানে উপনিবেশ স্থাপন করেছিলেন। এর রাজধানীর নাম ছিল মহাগ্রাম। সিংহলের উত্তরাংশ বিদেশী শাসকদের অধীনে চলে গেলে শাসক ও তাঁদের অনুসারীগণ রোহণে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নির্যাতিত ও নিপীড়িত বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ রোহণ জনপদে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। খ্রিস্টীয় ৬ষ্ঠ শতক পর্যন্ত রোহণ পৃথক রাজ্য ছিল।

৫৪। মহাগ্রাম– রোহণ জনপদের রাজধানী। এখানে দুট্‌ঠগামণি রাজার জন্ম হয় এবং তামিলদের জয় করা পর্যন্ত অবস্থান করেছিলেন। শ্রীলংকার ইতিহাসে এটা একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ স্থান। এখানে দেবপ্রিয় তিষ্যের ভাই মহানাগ বাস করতেন। তিনি এখানে নাগমহাবিহার নির্মাণ করেন। মহাতিষ্য মহাপালি হল নির্মাণ করেন।

৫৫। শ্রদ্ধাতিষ্যরাজা (সদ্ধাতিস্‌স)– তিনি সিংহলরাজ দুট্‌গামণির ভ্রাতা এবং কাকবর্ণতিষ্যের দ্বিতীয় পুত্র। পিতার জীবিতাবস্থায় তিনি দীঘবাপি জেলার প্রশাসক ছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর দুট্‌ঠগামণি সিংহলের রাজা হন। তাঁর মৃত্যুর পর শ্রদ্ধাতিষ্য সিংহাসনে আরোহন করেন এবং ১৮ বছর (খ্রি. পূ. ৭৭-৫৯) রাজত্ব করেন। তিনি লৌহপ্রাসাদ পুনর্মিাণ করেন এবং দক্ষিণাগিরি কল্লকালেন, কলম্বক, পেত্তঙ্গবালিক, বেলঙ্গবিট্‌ঠিক, দুব্বলবাপিতিস্‌সক, দূরতিস্‌সক, মাতুবিহারক,

www.pathagar.com

দীঘবাপি প্রভৃতি বিহার তৈরি করেন। তাঁর লজ্জাতিষ্য ও থূলথন নামে দুই পুত্র ছিল। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক রাজা ছিলেন।

৫৬। জেতবন– শ্রাবস্তীর একটি বিখ্যাত উদ্যান যেখানে সুদত্ত শ্রেষ্ঠী অনাথ পিণ্ডিকারাম নির্মাণ করে বুদ্ধকে দান করেছিলেন। এটা ছিল জেত রাজকুমারের উদ্যান। কথিত আছে, অনাথপিণ্ডিক আঠার কোটি স্বর্ণমুদ্রা এই বাগানে বিছিয়ে জেতকুমার থেকে ক্রয় করে আরও ছত্রিশ কোটি স্বর্ণমুদ্রা ব্যয়ে এক বৃহৎ মুরম্য বিহার নির্মাণ করেছিলেন। এখানে মহাগন্ধকুটি, কবেরিমণ্ডলমাল কোসম্বকুটি এবং চন্দমাল প্রধান অট্টালিকা। রাজা প্রসেনজিতও 'সললঘর' নামে একটি অট্টালিকা নির্মাণ করেছিলেন। প্রধান ফটকে অনাথপিণ্ডিক একটি বোধিবৃক্ষ রোপন করেছিলেন। পরবর্তীকালে এটাকে আনন্দবোধি বলা হত। বিহারের পূর্ব ও পশ্চিমদিকে দু'টি প্রবেশদ্বার ছিল। বুদ্ধ এইবিহারে দীর্ঘ উনিশ বর্ষা যাপন করেন। এর বর্তমান নাম সাহেত।

৫৭। নাগদ্বীপ– প্রাচীন শ্রীলংকার একটি প্রদেশ। এটা শ্রীলংকার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত আধুনিক জাফনা নামে চিহ্নিত। মহাবংস মতে (i, 47) মহোদর ও চূলোদর দুই নাগের বিবাদ মীমাংসা করার জন্য দ্বিতীয়বারের মত বুদ্ধ এখানে এসেছিলেন। এখানে দেবপ্রিয়তিষ্য সর্বপ্রথম একটি বিহার তৈরি করেছিলেন। পরবর্তীকালে এটা বৌদ্ধধর্মের একটি অন্যতম প্রধান কেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল।

৫৮। দুট্ঠগামণি অভয় (১০১–৭৭খৃ. পূ.)– সিংহলের রাজা ছিলেন। তাঁর পিতার নাম কাকবর্ণতিষ্য এবং মাতার নাম বিহারদেবী। কাকবর্ণ ছিলেন মহাগ্রামের শাসনকর্তা। তিনি রাজ্য থেকে শক্তিশালী যোদ্ধা যোগাড় করেছিলেন, তাঁরা গামণির নেতৃত্বে যুদ্ধ করে তামিলদের পরাজিত করেন এবং তামিলরাজ এলারকে হত্যা করে তামিল অধিকৃত রাজ্য পুনঃদখল করেন। তখন রাজধানী ছিল অনুরাধপুর। তিনি তামিলদের জয় করার পর রাজধানী অনুরাধপুর স্থানান্তরিত করেন। অতঃপর বৌদ্ধধর্মের উন্নতিসাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু বিহার, চৈত্য, স্তূপ ইত্যাদি নির্মাণ করেন। মহাবংসে তাঁকে একজন শ্রেষ্ঠ বীররূপে আখ্যায়িত করা হয়েছে। তিনি আটষট্টি বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন।

৫৯। লজ্জিততিষ্য– ইনি সিংহলের রাজা ছিলেন (৫৯-৫০ খ্রি.:পূ.)। তিনি ছিলেন রাজা শ্রদ্ধাতিষ্যের প্রথম পুত্র। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর অমাত্যগণ ও ভিক্ষুগণ কণিষ্ঠ থুলথনকে অভিষিক্ত করেছিলেন। লজ্জিততিষ্য একমাস পর তাঁকে হত্যা করে রাজা হন এবং নয়বছর পনের দিন রাজ্য শাসন করেন। প্রথমে তিনি

www.pathagar.com

ভিক্ষুদের বিরোধী ছিলেন, পরে বৌদ্ধধর্মের প্রতি অনুরক্ত হয়ে অরিট্‌ঠবিহার, কুঞ্জরহীনক বিহার ও লঞ্জকাসনশালা নির্মাণ এবং বহু জনহিতকর কাজ করেছিলেন।

৬০। কাকবর্ণতিষ্য- সিংহলের রোহণজনপদের রাজা। তাঁর পিতার নাম গোঠাভয় এবং মহানাগ ছিলেন তাঁর পিতামহ। তাঁর স্ত্রী ছিলেন কল্যাণীর রাজা তিষ্যের কন্যা বিহারদেবী। তাঁদের দুই পুত্র হচ্ছেন দুট্‌ঠগামণি অভয় এবং শ্রদ্ধাতিষ্য। তিনি রাজ্যের প্রখ্যাত বীর যোদ্ধাদের তাঁর সেনাবাহিনীতে স্থান দিয়েছিলেন। তাঁরা দুট্‌ঠগামণিকে তামিলদের বিজয়ে সাহায্য করেছিলেন। কথিত আছে, তিনি তাঁর চৌষট্টি বছর রাজত্বকালে রাজ্যের বিভিন্নস্থানে চৌষট্টিখানা বিহার নির্মাণ করেছিলেন। তন্মধ্যে তিস্‌সমহারাম, চিত্তল-পর্বতবিহার, মহানুগ্‌গল চৈত্য ইত্যাদি অন্যতম। তাঁর দেহের রং কাল ছিল বলে কাকবর্ণ নামে অভিহিত হয়েছিলেন।

৬১। চিত্তলপর্বত- রোহণ রাজ্যের একটি পর্বত। এখানে কাকবর্ণতিষ্য একটি বিহার তৈরি করেছিলেন। একদা এটা একটি বৌদ্ধধর্মের বৃহৎ শিক্ষাকেন্দ্রে পরিণত হয়েছিল। এর পাশেই ছিল নিঙ্কপোন্নপধানঘর এবং কোটগেরুকপাসাদ- যেখানে সঙ্ঘরক্ষিত বাস করতেন। চিত্তলপর্বত বিহারে একসময় বার সহস্র ভিক্ষু বাস করতেন।

৬২। মিলক্ষ- ম্লেচ্ছ, অনার্য অর্থে ব্যবহৃত।

৬৩। মলয়দেশ- এটা সিংহলের পাহাড়ী একটি দেশ বা অঞ্চল। দুট্‌ঠগামণি অভয় পিতার রোষানল হতে বাঁচার জন্য এখানে লুকিয়ে ছিলেন। এই পাহাড়ী অঞ্চল বর্হিশত্রুর আক্রমণ হতে রক্ষা করার সাহায্য করেছিল। বৌদ্ধধর্মবিদ্বেষী কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম আক্রান্ত হলে ভিক্ষুগণ আত্মরক্ষা করার জন্য প্রধানত মলয় ও রোহণ অঞ্চলে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন। মলয় তখন নিরাপদ আশ্রয়স্থল ছিল। পরবর্তী সময়ে মলয়কে একটি পৃথক প্রদেশে পরিণত করা হয় এবং এর শাসনকর্তাকে মলয়রাজ বলা হত।

৬৪। কল্যাণতিষ্য- কল্যাণীর রাজা, বিহারদেবীর পিতা। তিনি সিংহলরাজ মুটসীবের প্রপৌত্র এবং উত্তিয়ে পৌত্র। উত্তিয় ছিলেন তাঁর কনিষ্ঠ। আলোচ্য কাহিনীতে বর্ণিত ঘটনা খ্রি. পৃ. ৩০৬-৩০৭ এর মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল বলে মনে করা হয়।

৬৫। একাহিনীকে ভিত্তি করেই সম্ভবত: তেলকটাহগাথা রচিত হয়। কথিত আছে, কল্যাণীয় স্থবিরকে তপ্ত তৈলাধারে প্রক্ষিপ্ত করা হলে তিনি বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে অর্হত্ত্বফল প্রাপ্ত হন। তৎপর আটানব্বই (মাতন্তরে একশটি) গাথায় অনিত্য দেশনা করেন। এটা বৌদ্ধ সাহিত্যে একটি অনবদ্য কাব্য হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। কাব্যটি ই-আর গুণেরত্নে কর্তৃক সম্পাদিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে পি.টি.এস থেকে

প্রকাশিত হয়। শ্রীমৎ প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির ১৯১৯ সালে এবং ড. সত্যপাল ভিক্ষু ১৯৮১ সালে এর সানুবাদ বাংলায় প্রকাশ করেন।

৬৬। বিহারদেবী– কাকাবর্ণতিষ্যের স্ত্রী। তাঁর পিতা তিষ্য ছিলেন কল্যাণীর রাজা, দুট্‌ঠগামণি ও শ্রদ্ধাতিষ্য দুজন তাঁর পুত্র। তিনি অত্যন্ত বুদ্ধিমতী মহিলা ছিলেন। অম্বতির্থ ও অনুরাধপুর থেকে তামিলদের বিতাড়িত করার জন্য তিনি পুত্র দুট্‌ঠগামণিকে পরামর্শ দান করেছিলেন।

৬৭। এলাররাজ– অনুরাধপুরের রাজা (খ্রি. পূ. ১৪৫-১০১)। তিনি চোল দেশ থেকে সিংহলে আগমন করে অসেলরাজকে পরাজিত করেন এবং সিংহাসন অধিকার করেন। তাঁর সেনাবাহিনীতে মিত্ত নামে একজন জেনারেল ছিলেন। তাঁর সেনাধ্যক্ষের নাম ছিল দীঘজন্তু। এলাররাজ ও দুট্‌ঠগামণির মধ্যে যুদ্ধে এলার পরাজিত ও নিহত হন। তাঁর মৃতুদেহ রাজকীয় মর্যাদায় সৎকার করা হয়।

৬৮। বেলুসুমন– দুট্‌গামণি রাজার একজন সেনানাক (General)। তিনি গিরিজনপদের অন্তর্গত কুটুম্বিয়ঙ্গণের গৃহপতি বসভের পুত্র। কথিত আছে, রাণী বিহারদেবীর দোহদ উৎপন্ন হলে তিনি এলার রাজার সৈন্যপ্রধান নন্দসারথির শির কর্তৃন করে তাঁর রক্তে দেবীকে স্নান করিয়েছিলেন। বিজিতপুর অধিকার করার জন্য তিনি সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন।

৬৯। দীর্ঘবাপি (দীঘবাপি)– এটা সিংহলের একটি জেলা। বুদ্ধ সিংহলে আগমণ করে এখানে যেস্থানে সাধনায় বসেছিলেন সেস্থানে একটি চৈত্য নির্মাণ করা হয়েছিল। সম্ভবত এটা তামিল রাজ্য ও রোহণ জনপদের মধ্যখানে ছিল। পিতার নির্দেশে শ্রদ্ধাতিষ্য দীঘবাপি শাসন করেছিলেন। তিনি এখানে দীঘবাপি বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করেছিলেন। এটা তিষ্যমহারাম থেকে নয় লীগ দূরে ছিল।

৭০। কপ্‌পকন্দর নদী– এটা রোহণে অবস্থিত ছিল। গাইগার সাহেবের মতে, এটা আধুনিক কুম্বুক্কন ওয়্য (নদী)।

৭১। নন্দিমিত্র– তিনি দুট্‌ঠগামণি অভয়ের একজন অন্যতম প্রধান সেনাপতি এবং এলার রাজার অন্যতম সেনাধ্যক্ষ মিত্রের ভাগিনা ছিলেন। তাঁর দেহে দশহস্তীর শক্তি ছিল। তিনি দুট্‌ঠগামণির পক্ষে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ করে কৃতিত্বের পরিচয় দেন।

৭২। হুন্দরিবাপী– কুলুম্বরি জেলার অন্তর্গত সিংহলের একটি গ্রাম ; বীরযোদ্ধা মহাসোণের জন্মস্থান। মহাবংস টীকা মতে, এটা রোহণে অবস্থিত ছিল।

৭৩। অরিট্‌ঠপর্বত– অনুরাধপুর ও পুলত্থিপুর-এর মধ্যখানে সিংহলের একটি পর্বত। এটা উত্তর মধ্য প্রদেশের আধুনিক হবরণের নিকটস্থ বর্তমান রিটিগল বলে চিহ্নিত। এই পর্বতের পাদদেশে শূরতিষ্য মকুলক বিহার নির্মাণ করেন। এই পর্বতশৃঙ্গে লজ্জিতিষ্য অরিট্‌ঠ বিহার নির্মাণ করেছিলেন। প্রথম সেন এই

www.pathagar.com

পর্বতের উপরে পংশুকুলিক ভিক্ষুদের জন্য একটি সুপ্রশস্ত বিহার তৈরি করেছিলেন।

৭৪। কোটপর্বত– রোহণের একটি পর্বত। এটার কাছেই ছিল কিত্তি গ্রাম। এ' পর্বতের উপরে একটি বিহার ছিল। নাম কোটপব্বতবিহার। এ বিহারেই সেই শ্রামণ বাস করতেন, যিনি পরবর্তীকালে দুট্ঠগামণি রূপে জন্ম গ্রহণ করেছিলেন। ধম্মপদট্ঠকথা মতে (iv, 50) অনুলস্থবির এই বিহারে বাস করতেন দুট্ঠগামণি অভয়রাজার সময়ে। এটার অপর নাম গোটপব্বত বলে মনে করা হয়।

৭৫। গিরি– দক্ষিণ শ্রীলংকার একটি জেলা। এর রাজধানী ছিল মহাগ্রাম। গোঁঠ ইম্বরের জন্মস্থান নিট্ঠুলবিট্ঠিক গ্রাম এবং বেলুসুমনের জন্মস্থান কুটুম্বিয়ঙ্গম গ্রাম এর অন্তর্ভূক্ত ছিল। এটাকে গিরিমণ্ডলও বলা হত।

৭৬। চোলরাজ্য– দক্ষিণ ভারতের পেন্নার নদীর উপকূলবর্তী একটি দেশ। এদেশের অধিবাসীরা চোলা নামে অভিহিত ছিল। মধ্যযুগের এটার রাজধানীর নাম ছিল তাঞ্জুর। সিংহলী বিবরণে উল্লেখ আছে যে, বিশেষ করে লুটতরাজ করার জন্যই চোলাগণ বারবার সিংহল আক্রমণ করত। এর ফলে সিংহলের শান্তি ও উন্নতি বিঘ্নিত হয় এবং সিংহলের সাহিত্য ও শিল্পে ব্যাপক ক্ষতি সাধিত হয়।

৭৭। কাবীর পোতাশ্রয়– তামিলদের (চোলরাজ্যের)´ একটি সমুদ্র বন্দর।

৭৮। সালিরাজকুমার– সিংহলরাজ দুট্ঠগামণির পুত্র। তিনি অশোকমালা নাম্নী চণ্ডালকন্যার পাণিগ্রহণ করেন। কথিত আছে, তাঁর জন্মদিনে সমগ্র সিংহল সালিধানে পূর্ণ হয়েছিল, তাই তাঁর নাম রাখা হয় সালিকুমার। তিনি অত্যন্ত ধার্মিক ছিলেন এবং সবসময় দানাদি পুণ্যকর্ম সম্পাদন করতেন। তিনি সালিপব্বত বিহার তৈরি করেছিলেন।

৭৯। তলঙ্গর– প্রিয়ঙ্গুদ্বীপের একটি স্থান। এটা ধম্মদিন্ন স্থবিরের বাসস্থান ছিল। তলঙ্গরতি-স্সপব্বতের নিকটে অবস্থিত এখানে দেবরকৃতিতলেন নামে একটি গুহা ছিল। মধ্যম নিকায়ের অট্ঠকথা অনুযায়ী তলঙ্গরতিস্সপব্বত রোহণে অবস্থিত ছিল।

৮০। ধম্মদিন্ন স্থবির– তাঁর অপর নাম মহাধম্মদিন্ন স্থবির। তিনি ছিলেন অর্হৎ। তিনি তলঙ্গে (তলঙ্গতিস্সপর্বত) বাস করতেন। সিংহলের দুর্ভিক্ষের সময় রাজা দুট্ঠগামনি তাঁকে যাগু দান করেছিলেন। তিনি দশ সহস্র ভিক্ষু-সঙ্ঘকে এর অংশ দান করেন। ধম্মদিন্নের শিক্ষক ছিলেন উচ্চতলঙ্কের মহানাগ। সদ্ধম্ম সংগ্রহে উল্লেখ আছে যে, ধম্মদিন্ন স্থবিরের মুখে সতিপট্ঠান সুত্ত শুনে একটি অন্ধ সর্প মুক্তিপ্রাপ্ত হয়েছিল। একই কাহিনী আলোচ্য রসবাহিনীতেও রয়েছে, গল্প নং ৯-১।

www.pathagar.com

৮১। তম্বপণ্ণি (তাম্রপর্ণী)- বিজয় সিংহ সিংহলের যেস্থানে প্রথম অবতরণ করেছিলেন সেস্থান তম্বপণ্ণী নামে খ্যাত হয়েছিল। পরবর্তীতে তিনি এখানে তাঁর রাজধানী স্থাপন করেছিলেন এবং সমগ্র সিংহল তম্বপণ্ণী নামে পরিচিত লাভ করেছিল।

৮২। মহাতিত্থ- সিংহলের পশ্চিমে একটি সামুদ্রিক বন্দর। এখানে বিজয় সিংহের স্ত্রী ও সঙ্গীগণ অবতরণ করেছিলেন। পরবর্তীকালে দক্ষিণ ভারতের ভল্লুক, সিংহল আক্রমণকারী তামিলগণও অবতরণ করেছিলেন। এটা সম্ভবত দক্ষিণ ভারত ও শ্রীলংকার মধ্যে যোগাযোগের প্রধান কেন্দ্র.ছিল।

৮৩। চতুর্বিধ অপায়- নরক, তির্যক, অসুর ও প্রেত।

৮৪। জর্জর নদী- সিংহলের একটি নদী, বর্তমান নাম দেদুর ওয়্য। এই নদীর উপর কোট্ঠবদ্ধ নামে বিখ্যাত বাঁধ ছিল, যেটা প্রথম পরাক্রমবাহু পুনর্নির্মাণ করেছিলেন।

৮৫। নাগরিহার- এটা মহানাগ বিহার নামেও পরিচিত ছিল। দেবপ্রিয়তিষ্যের ভ্রাতা মহানাগ কর্তৃক এটা মহাগ্রামের রোহণ জনপদে নির্মিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

চতুর্থ অধ্যায়

প্রাচীন ভারত ও শ্রীলংকার সামাজিক ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা এবং থেরবাদ বৌদ্ধধর্মে পরিত্তদেশনার উৎপত্তি

রসবাহিনী একটি সরস গল্প সংকলন। ধর্মরস পরিবেশনই গল্পগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য। গল্পে কোনো আধ্যাত্মিক জটিল দার্শনিক তত্ত্ব পরিবেশিত হয়নি, বিশেষ করে দানের মাহাত্ম্য প্রচার করা হয়েছে। দানের পাত্র ভিক্ষু-সংঘ, এমনকি মানবেতর প্রাণীও। সাধারণের মধ্যে দান চেতনার উন্মেষ ঘটানোই গল্পকারে প্রধান উদ্দেশ্য। স্মরণযোগ্য যে, গল্পগুলো উপকথা বা উপাখ্যানের শ্রেণীভুক্ত। এখানে বাস্তবমুখী চরিত্র যেমন রয়েছে, অতি প্রাকৃত চরিত্রর সন্নিবেশও করা হয়েছে। কোনো কোনো গল্প কিংবা চরিত্র মনে হবে যেন অতি স্বাভাবিক– আমাদের চোখের সামনে যা হচ্ছে তারই প্রতিফলন, আবার কোনো কোনো চরিত্র যেন অবিশ্বাস্য অতিভৌতিক। উপাখ্যানগুলোর অতিভৌতিক দিক উপেক্ষা করলে ঐতিহাসিক দিক থেকে এ গ্রন্থের গুরুত্ব অপরিসীম। কেননা উপাখ্যানগুলোর মাধ্যমে তৎকালীন ভারত (জম্বুদ্বীপ) ও শ্রীলংকার (সিংহল) সামাজিক রীতি-নীতি, ধর্মীয় আচার-আচরণ ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব জ্ঞাত হওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে G. P. Malalasekara- এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য– "......... They (the stories) are useful to us now, in that they throw new and interesting light on the manners, customs and social conditions in ancient India and Ceylon. Perhaps some contain materials of historical importance hidden in their half-mythical tales". (The Pali Literature of Ceylon. P. 225).

১. প্রাচীন ভারতের সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈকিত অবস্থা

ক. সামাজিক অবস্থা

রসবাহিনীর গল্পগুলোর ভারত অংশে প্রাচীন ভারতের সামাজিক রীতিনীতি ও মানুষের স্বভাব-চরিত্র সম্পর্কে অনেক তত্ত্ব পরিবেশিত হয়েছে। সামাজিক চিত্র অঙ্কনে রসবাহিনীর গল্পকার বহু গল্পে বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয় দিয়েছেন। সমাজের বিভিন্ন স্তরের বিশেষ করে মধ্যবিত্ত ও নিম্নমধ্যবিত্ত শ্রেণীর নরনারীদের প্রাত্যহিক জীবনচর্যা ও দৈনন্দিন জীবনের সুখ-দুঃখ, হাসি-কান্না, প্রেম-বিরহের বাস্তব চিত্র এসব গল্পে গভীরভাবে ফুটে উঠেছে।

www.pathagar.com

তিনজনের কাহিনী (তিন্নং জনানং বত্থু) নামক গল্পে কৃতজ্ঞ আর কতৃঘ্নের বাস্তব চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়।[১] বারাণসীবাসী সজ্জন জনৈক দুর্জন ব্যক্তিকে নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে বাঁচিয়েছিলেন, অথচ সেই ব্যক্তিই তাঁকে সামান্য পুরস্কারের লোভে মৃত্যুমুখে ঠেলে দিতে দ্বিধাবোধ করেনি, কিন্তু তির্যক প্রাণী হয়ে সাপ ও শুকপাখি উপকারী সজ্জন ব্যক্তির প্রাণ রক্ষা করেছিল। ব্যাঘ্রকথা (ব্যাগ্ঘস্‌স বত্থু) গল্পেও অনুরূপ কৃতঘ্ন ব্যক্তির সন্ধান পাওয়া যায়।[২] এই গল্পে পারিবারিক কলহের বিষয় অবগত হওয়া যায়। গল্পের নায়ক বারাণসীবাসী জনৈক দুষ্ট ব্যক্তি স্ত্রীর সঙ্গে বিবাদ করে শ্বাপদসংকুল বনে প্রবেশ করার সময় এক শুক পাখি জীবন রক্ষার উপায় জানিয়ে দিয়েছিল। সে সেই উপায়ে জীবন রক্ষা করেছিল বটে কিন্তু শুক পাখিকে হত্যা করেছিল। গল্পটি রূপকাশ্রয়ী হলেও মনুষ্য চরিত্র বাস্তবধর্মী। বন্ধুর জন্য জীবনদান (সহায়স্‌স পরিচ্চত্ত জীবিতকস্‌স বত্থু) কাহিনীতে আবাল্য বন্ধু সোমব্রাহ্মণ সোমদত্ত ব্রাহ্মণের অপরাধের শাস্তি নিজ স্কন্ধে গ্রহণ করে বন্ধুর জীবন দান করেছিল।[৩] উপকারী বন্ধুর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ এ গল্পের মূল উপজীব্য বিষয়। অনুরূপভাবে ফলকখণ্ডদিন্ন কাহিনীতে উপকারী ব্যক্তির বিপদে জীবনরক্ষা করে প্রত্যুপকারের বিবরণ বর্ণিত হয়েছে।[৪] মিথ্যা অভিযোগে অভিযুক্ত জনৈক ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড থেকে বাঁচিয়েছিলেন জনৈক কৃতজ্ঞ মহিলা, কেননা উক্ত ব্যক্তি কোনো এক সময় প্রসবকালে মহিলাটিকে পানীয় জল দিয়ে তার জীবন রক্ষা করেছিল।[৫] এ যেন উপকারীর প্রতি প্রত্যুপকারের চিত্র। আর অন্য একটি গল্পে দুঃসহ কারাজীবন যাপনকারী বন্ধুর ইচ্ছা পূরণ করতে গিয়ে সৎ বন্ধুকে বার বছর বিনা অপরাধে বন্দিশালায় করুণ জীবন যাপন করতে হয়েছে।[৬] মিত্রদ্রোহী বন্ধুর প্রতি ঘৃণা আবহমান সমাজ ব্যবস্থার একটি বাস্তব প্রতিফলন। মরুত্ত ব্রাহ্মণ কাহিনী (মরুত্ত ব্রাহ্মণস্‌স বত্থু) আর একটি বাস্তব সমাজচিত্র। ব্রাহ্মণ সংসারের প্রতি বীতশ্রদ্ধ হয়ে ঋষি প্রব্রজ্যা গ্রহণ করলে তাঁর স্ত্রী পরপুরুষের সঙ্গে মিলিত হয়ে তাঁকে হত্যা করার চেষ্টা করে। এখানে স্ত্রী চরিত্রের স্বরূপ প্রকাশিত। অথচ ব্রাহ্মণের আশ্রিত একটি কুকুর তাঁকে মৃত্যুর হাত হতে রক্ষা করে।[৭]

শরণস্থবির কথায় (সরণত্থেরস্‌স বত্থু) একটি পরিবারের পূর্ণ চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। গল্পের নায়কের স্ত্রী লোভী, ছলনাময়ী ও পরশ্রীকাতর, নায়ক স্বয়ং স্ত্রৈণ, তাই সে স্ত্রীর কথায় সহোদরাকে গোপন স্থানে নিয়ে গিয়ে হত্যা করার প্রয়াস পেয়েছিল, আর সহোদরা ভ্রাতৃবৎসল। ভাইয়ের কোনো বিপদ হোক সে কামনা করেনি। একদিকে ভাই ও ভ্রাতৃবধূর নিষ্ঠুরতা অন্যদিকে বোনের সহজাত মমতা এ গল্পে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।[৮] অলৌকিকভাবে বোনের জীবন রক্ষা পাবার বিষয়টি বাদ দিলে গল্পটি পুরোপুরি সমাজ জীবনের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ।

রসবাহিনীর অধিকাংশ নারী চরিত্র চারিত্রিক মাধুর্যে মূর্তমান ও প্রোজ্জ্বল। তারা রূপে-গুণে অনন্যা। এরূপ রূপসী নারীদের প্রতি রাজা বা অমাত্যদের কামাসক্তির উদ্রেক ও তাদের অপহরণ করার অপচেষ্টার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। সমাজচিত্রের এ যেন একটি বাস্তব রূঢ় দিক। অনিন্দ্য রূপবতী ও সতী-সাধ্বী রমণী বুদ্ধেনী[৯] ও পাটলিপুত্রনগরের

www.pathagar.com

বোধিরাজকুমারীকে[১০] জোর করে অপহরণ করার অপপ্রয়াস করেন তৎকালীন রাজা। যুদ্ধে নিহত কোশলরাজের মহিষী বিশ্বামিত্রকে বিজয়ী সামন্তরাজ বলপূর্বক বিয়ে করার চেষ্টা করেন। এ যেন এক প্রকার অবলা নারীর উপর অত্যাচার।[১১] পুরুষশাসিত সমাজ ব্যবস্থায় এসব কাহিনী নারীদের ভোগ্যপণ্য হিসেবে ব্যবহার করার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

চণ্ডালকন্যা সুবর্ণলতিকার অপরূপ সৌন্দর্যে বিমুগ্ধ হয়ে জনৈক সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণকুমার বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার কাহিনী তৎকালীন সমাজব্যবস্থায় অসবর্ণ বিবাহের সাক্ষ্য বহন করে।[১২]

রূপদেবীকথা (রূপদেবিয়া বত্থু)[১৩] গল্পটি আর্তমানবতার সেবায় আকর্ষনীয় রূপ লাভ করেছে। গল্পের নায়িকা রূপদেবী ভিক্ষু-সংঘ ও সাধারণ মানুষের সেবায় নিবেদিতপ্রাণ।

প্রাচীন ভারতে সাধু-সন্তের পাশাপাশি চোর-তস্করেরও অবস্থান ছিল। এরা নির্জন গোপনে ওঁত পেতে থাকত এবং সুযোগ বুঝে পথিকের সর্বস্ব কেড়ে নিত। আবার কোনো কোনো গল্পে দলবদ্ধভাবে চুরির কাহিনীও বিবৃত হয়েছে। এসব কাহিনীর মধ্যে অন্যতর ব্যক্তির কথা[১৪] (অঞ্ঞতর মনুস্সস্স বত্থু) ও চোরঘাতক কথা।[১৫] (চোরঘাতকস্স বত্থু) অন্যতম। কিন্তু এসব সমাজ-বিরোধী কর্মে লিপ্ত ব্যক্তিদের দেশের প্রচলিত আইনে শাস্তির বিধান ছিল। শাস্তি অপরাধের তারতম্য অনুসারে বন্দি-জীবন কিংবা মৃত্যুদণ্ড।[১৬] এসব কাহিনী নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারতীয় সমাজ চরিত্রের অবয়ব চিত্র। এসব গল্পের কোনো কোনোটিতে দুর্গম পথ অতিক্রম করে অতিকষ্টে ব্যবসা-বাণিজ্যের চিত্রও ফুটে উঠেছে।[১৭]

বৈচিত্র্যময় রূপকথাধর্মী রসবাহিনীর কাহিনীগুলোতে প্রাচীন ভারতের বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষের দৈনন্দিন জবিনচর্চা, জীবন যাত্রার মান প্রভৃতি সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটি সুস্পষ্ট ধারণা অবগত হওয়া যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবীর মধ্যে শিকারী[১৮] সাপুড়ে[১৯] কাঠুরিয়া[২০] চোর-তস্কর[২১] বণিক,[২২] মজুর,[২৩] শিল্পী[২৪] প্রভৃতি কর্মজীবীর উল্লেখ রয়েছে। সুতরাং গল্পগুলো প্রাচীন ভারতের বাস্তব সমাজচিত্রের একটি দলিল হিসেবে বিবেচ্য হবার যোগ্য। এদিক থেকে গল্পকার সমাজচিত্র অংকনে স্বীয় দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন। কোনো কোনো গল্পে রূপগুণের কিংবা প্রাকৃতিক দৃশ্য ও পরিবেশের হৃদয়গ্রাহী মনোরম বিবরণ পাঠকের অন্তরে একটি অনির্বচনীয় সুখানুভূতি বা আনন্দের আমেজ জাগায়।

খ. ধর্মীয় অবস্থা

রসবাহিনীর ১০৩টি গল্পের মধ্যে ৪০টির উৎপত্তিস্থল বা ঘটনাস্থল জম্বুদ্বীপ বা ভারতবর্ষ। বাকী গল্প সমূহের উৎপত্তিস্থল সিংহল বা শ্রীলঙ্কা। ভারতবর্ষে উৎপন্ন গল্পসমূহে স্বাভাবিকভাবে ধর্মরস বা ধর্মীয় রীতি নীতি পরিবেশনের পাশাপাশি তৎকালীন সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থাও প্রকাশ পেয়েছে। সরাসরি পরিপূর্ণ একটা চিত্র না পাওয়া গেলেও বিক্ষিপ্তভাবে কোনো কোনো গল্পে খণ্ডিত চিত্র লক্ষ্য করা যায়।

www.pathagar.com

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গল্পসমূহের সংকলনকাল বা রচনাকাল ত্রয়োদশ শতকের হলেও বহুগল্পের পটভূমিকা বুদ্ধ-পূর্ব যুগের, এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগের। আবার কোনো কোনো গল্প বুদ্ধের সমসাময়িক কালের পটভূমিকায় রচিত। ধর্মশোণ্ডিককথা (ধম্মসোণ্ডকস্‌স বত্থু) গল্পটি বোধিসত্ত্বের জীবনকাহিনী অবলম্বনে রচিত। তখন পৃথিবীতে কোনো সদ্ধর্ম ছিল না। ধর্ম কি, অধর্ম কি মানুষেরা জানত না। রাজা ধর্মশোণ্ডক সদ্ধর্ম শ্রবণের জন্য সর্বস্ব ত্যাগ করে জীবন দিতেও প্রস্তুত।[২৫] এ গল্পটি প্রাগৈতিহাসিক যুগে ভারতবর্ষের ধর্মীয় পরিস্থিতি নির্দেশে সহায়ক। মহামন্ধাতা একটি বুদ্ধপূর্ব যুগের কাহিনী। কামভোগে প্রমত্ত মহামন্ধাতা রাজার পূর্বজন্মের সুকৃতির ফল, বর্তমান জন্মে কামতৃষ্ণার বশবর্তী হয়ে স্বর্গসুখ হতে বঞ্চিত হওয়ার বিষয় এগল্পে অতি চমৎকারভাবে পরিবেশন করা হয়েছে।[২৬] দেবতিষ্যের পিতামাতা ঈশ্বর বিশ্বাসী ও কৃপণ ছিলেন কিন্তু দেবতিষ্য ছিলেন সদ্ধর্মে আস্থাশীল। পিতামাতার মৃত্যুর পর তিনি সমস্ত সম্পত্তি দান করে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করেন। ত্রিরত্নের প্রতি ও দানের একগ্রতা এবং এর ফলে জন্ম-জন্মান্তরে সুখ সমৃদ্ধি লাভ ও পরিশেষে পরম শান্তিপদ নির্বাণ-লাভ কাহিনীর পরিণতি।[২৭] সাধারণের মধ্যে ধর্মীয় চেতনা উদ্বোধনে গল্পটি অনন্য।

কোনো কোনো গল্পে ঈশ্বর বিশ্বাসী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, বুদ্ধপূর্ব যুগ হতে ঈশ্বরের কল্পনার উদ্ভব হয়েছে। বুদ্ধ ঈশ্বরের অস্তিত্বকে অস্বীকার করেছেন। গল্পে লক্ষ্য করা যায় ঈশ্বরভক্ত আর বুদ্ধভক্তের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা। বুদ্ধের প্রভাবের কাছে ঈশ্বরের প্রভাব ম্লান হয়ে গেছে।[২৮] ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণের ফলে নিশ্চত বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাহিনী সত্যিই রোমাঞ্চকর। শরণ গ্রহণের ফলে ভাইয়ের হাতে বোনের নিশ্চিত মৃত্যুর হাত থেকে অলৌকিকভাবে রক্ষা পাওয়ার কাহিনী ত্রিরত্নের প্রভাবের ফল। গল্পকার পরম অনুভূতি দিয়ে গল্পের চরিত্রগুলো চিত্রায়িত করেছেন। গল্পটির পরিবেশনায় একদিকে বাস্তবধর্মী রূপ প্রকাশ পেয়েছে অন্যদিকে সাধারণকে ধর্মীয় চেতনায় উদ্বুদ্ধ করতে সহায়তা করেছে।[২৯] অবচেতন মনে বুদ্ধের শরণ নিয়েও বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার কাহিনী অতীব হৃদয়গ্রাহী ও ধর্মীয় ভাব-পরিবেশে স্বয়ংসম্পূর্ণ। অহিতুণ্ডিকের কথায় মিথ্যাদৃষ্টিসম্পন্ন সাপুড়ে পরিহাসচ্ছলে বুদ্ধের শরণ নিয়ে জীবন রক্ষা পাওয়ার কাহিনী এই জাতীয়।[৩০]

বৌদ্ধধর্ম মতে, দান দেওয়াই হচ্ছে সুখ সমৃদ্ধি ও স্বর্গ-মোক্ষ লাভের প্রাথমিক দ্বার। বুদ্ধ সাধারণের মধ্যে দানের মাহাত্ম্য বর্ণনার মাধ্যমে ধর্মোপদেশ প্রদান করতেন। আলোচ্য রসবাহিনীর অধিকাংশ গল্পে দানের মাহাত্ন বর্ণিত হয়েছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে দানচেতনার উন্মেষ সাধনই মুখ্য উদ্দেশ্য। দানের পাত্র বুদ্ধপ্রমুখ ভিক্ষু-সংঘ,[৩১] ভিক্ষু-সংঘ,[৩২] ভিক্ষু,[৩৩] শ্রমণ-ব্রাহ্মণ,[৩৪] স্ত্রীলোক,[৩৫] চোর,[৩৬] এমনকি তির্যক প্রাণী কুকুরও।[৩৭] দানের ফলে ভোগ সম্পত্তি বৃদ্ধি করে, দান স্বর্গ লাভ এমনকি বিমুক্তি লাভে ও সহায়ক। দানের মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রকাশে গল্পগুলো গল্পকারের অনবদ্য সৃষ্টি বলা যায়।

www.pathagar.com

এ অংশের কোনো কোনো গল্পে বিভিন্ন ধর্মমতে বিশ্বাসী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়।[৩৮] তারা প্রধানত ঈশ্বরবাদী ও ঈশ্বরের শ্রেষ্ঠত্বে বিশ্বাসী। তখনও চাতুর্বর্ণপ্রথা ছিল এবং তারা স্ব স্ব ধর্মমতে আস্থাশীল ছিল। তবে গল্পে ভিন্ন মতাবলম্বীদের বিস্তৃত কোনো আলোচনা নেই।

কোনো কোনো গল্পে বহুশত কিংবা সহস্র ভিক্ষু-সঙ্ঘকে দান দেওয়ার বিবরণ থেকে অনুমান করা যায় যে, তখন ভারতবর্ষে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক বিস্তার ঘটেছিল।[৩৯] বিপুল ভিক্ষু-সঙ্ঘের অবস্থান এবং রাজা ও সাধারণ মানুষ কর্তৃক দান দেওয়ার পরিবেশ বৌদ্ধধর্মের চরম বিকাশ ও ব্যাপক প্রসারের সাক্ষ্য দেয়।

গল্পগুলোর পটভূমি তৈরির সময়কালে খুব সম্ভব কোনো বুদ্ধ মূর্তি নির্মিত হয়নি। কেননা, কোনো কাহিনীতে বুদ্ধপূজার বিবরণ পাওয়া যায় না। বুদ্ধমূর্তি নির্মিত হওয়ার পূর্বে সাধারণত বোধিবৃক্ষ, বোধিপালঙ্ক, বুদ্ধের উষ্ণীষ, পাত্র, পাদুকা, ধাতু ইত্যাদির পূজা করার রীতি প্রচলন ছিল। বহু গল্পে বোধিবৃক্ষ পূজা,[৪০] পাত্রোৎসব বা পাত্র পূজা[৪১] ধাতু পূজা[৪২] ইত্যাদির বিবরণ রয়েছে।

গ. রাজনৈতিক অবস্থা

রসবাহিনী গল্প সংগ্রহের ভারতবর্ষ অংশের গল্পসমূহে তৎকালীন সময়ে সবিশেষ রাজনৈতিক পরিস্থিতি জানা না গেলেও কোনো কোনো গল্পে কিছু কিছু বিবরণ লক্ষ্য করা যায়, যা থেকে তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা সম্পর্কে মোটামুটি একটি চিত্র তুলে ধরা যেতে পারে। গল্পকারের প্রধান উদ্দেশ্য গল্পের মাধ্যমে সহজ সরল ভাষায় সাধারণের মধ্যে ধর্মরস– বিশেষ করে দানের মাহাত্ম্য বর্ণনা ও নৈতিকতার বিকাশ ঘটানো। গল্পের স্বাভাবিক পরিণতিকে ব্যাহত না করে এবং গল্পের প্রয়োজনের তাগিদে কোনো কোনো গল্পে ঐতিহাসিক পটভূমি কিংবা প্রেক্ষাপট অধিকতর প্রাণবন্ত ও বাস্তবধর্মী করেছে।

প্রাচীনকালে রাজ্যসমূহে বংশানুক্রমিক রাজার পুত্র রাজা হওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। রাজা অপুত্রক হলে মৃত্যুর পর সজ্জিত মঙ্গল রথ ছেড়ে দেওয়া হত, রথ যাকে নির্বাচিত করত দৈবজ্ঞগণ তাঁর ভাগ্যচক্র পরীক্ষা করে তাঁকে রাজা নিযুক্ত করতেন।[৪৩] আধুনিক রাষ্ট্র প্রধানদের মত প্রাচীন রাজ্য প্রধানগণও কোনো কার্যোপলক্ষে বর্হিদেশে গমন করার সময় উপরাজ কিংবা প্রধান আমত্যের উপর দায়িত্বভার অর্পণ করতেন।[৪৪] দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি রাজা প্রত্যাবর্তন কাল পর্যন্ত রাজকীয় কার্য পরিচালনা করতেন।

প্রত্যন্ত রাজ্যে বিদ্রোহ দমন করতে গিয়ে সামন্ত রাজের হাতে কোশাম্বী রাজের মৃত্যু– মাঝে মধ্যে রাজ্যে অশান্তির ইঙ্গিত দেয়।[৪৫] রাজ্যে চুরি, পরদার লঙ্ঘন প্রভৃতি নানা প্রকার অপরাধ কর্মের বিষয় অবগত হওয়া যায়। এসব অপরধের জন্য রাজ্যে শাস্তির বিধান ছিল।[৪৬] তবে অনেক সময় প্রকৃত অপরাধীর সন্ধান না পেয়ে নিরপারধীর শাস্তি

www.pathagar.com

হওয়ার বিবরণও পাওয়া যায়।[৪৭] সম্ভবত: বিচার বিভাগ কিংবা বিচার প্রণালী তত উন্নত ছিল না বলে এরূপ হত।

রাজাগণ সর্বদা নিজের জীবন সম্পর্কে শঙ্কিত থাকতেন, কখন কোন প্রতিদ্বন্দ্বী আক্রমণ করে তাঁকে হত্যা করে রাজ্য কেড়ে নেয়। অনকে সময় নিজের পুত্র কিংবা অমাত্যকেও তাঁরা বিশ্বাস করতেন না।[৪৮] তাই যার থেকে ভয়ের সম্ভাবনা মনে করতেন তাকে হত্যা করতেও দ্বিধা বোধ করতেন না। বৃহৎ রাজ্যের সামন্ত রাজগণও মাঝে মাঝে বিদ্রোহ ঘোষণা করতেন। তখন উভয় রাজায় যুদ্ধ হত।[৪৯] যুদ্ধে অনেকসময় সামন্ত রাজাও বিজয়ী হতেন। বিজিত রাজা বিজয়ী রাজাকে কর দিতে বাধ্য থাকতেন। এছাড়া সামন্ত রাজারা ছিলেন বড় বড় জমিদার শ্রেণীর কিংবা তার চেয়ে কিছুটা শক্তিশালী। তাঁরা সাম্রাজ্যের অধীশ্বরকে করদানে বাধ্য থাকতেন।[৫০]

নানাদিক থেকে তিন ভ্রাতা মধুবণিক (তেভাতিকো মধুবাণিজকানং বত্থু) কাহিনী[৫১] অতি গুরুত্বপূর্ণ। এগল্প থেকে তিনজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি যথা– নিগ্রোধ স্থবির, অশোক ও শ্রীলঙ্কার অধীশ্বর দেবপ্রিয় তিষ্যের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য, তৎকালীন ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থার মোটামুটি একটি চিত্র অবগত হওয়া যায়। অশোক প্রথমজীবনে রূঢ় প্রকৃতির হলেও পরবর্তী জীবনে বৌদ্ধধর্মের পরশমণির স্পর্শে শুধু প্রাচীন ভারতবর্ষে নয়, আধুনিক বিশ্বেও সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ সম্রাট হিসেবে নিজের স্থায়ী আসন গড়ে নিতে সক্ষম হয়েছেন।

গল্পটি ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত ত্রিমুখীধারায় বর্ণিত এক বৈচিত্র্যময় পরিণতি লাভ করেছে। বিন্দুসার রাজার পুত্রবধু স্বামী হারা গর্ভবতী সুমনাদেবীর গোপনে রাজবাড়ি ত্যাগ এবং চণ্ডালগ্রামের এক নিগ্রোধবৃক্ষমূলে সন্তান প্রসবের চিত্র সংবেদনশীল পাঠক মাত্রকেই ব্যথিত করবে। নিগ্রোধবৃক্ষের মুলে জাত সন্তান কালে নিগ্রোধ শ্রমণ নামে খ্যাত মৌর্য সম্রাট অশোকের অশান্ত অন্তরে শান্তির বার্তা শুনিয়ে গল্পের ধর্মরস সঞ্চারে সহায়তা করেছেন। অতঃপর গল্পের পরিণতি ঐতিহাসিক তথ্যের দিকে অগ্রসর হয়েছে। গল্পের এই অংশে অশোকের বৌদ্ধধর্ম সম্প্রসারণে ধাতু নিধান, বিহারাদি নির্মাণ, ধর্মসংস্কার, সদ্ধর্ম প্রচারে ধর্মদূত প্রেরণ ইত্যাদি ঐতিহাসিক বিবরণ গল্পটিকে একটি ঐতিহাসিক কাহিনীতে রূপায়িত করেছে।

কাহিনীর শেষাংশে শ্রীলংকায় ধর্মদূত প্রেরণ একটি ঐতিহাসিক ঘটনা। শ্রীলংকার রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের সঙ্গে সম্রাট অশোকের রাজনৈতিক সম্পর্ক গড়ে উঠে। ঐতিহাসিকদের কাছে গল্পের এ অংশটি অতীব গুরুত্বপূর্ণ। প্রাচীনকাল হতে ভারতবর্ষের সঙ্গে শ্রীংলকার একটা রাজনৈতিক সম্বন্ধ গড়ে উঠার বিবরণ এ গল্পের শেষ পরিণতি।[৫২]

২. প্রাচীন শ্রীলংকার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অবস্থা

ক. সামাজিক অবস্থা

রসবাহিনীর শ্রীলংকা অংশের ৬৩টি গল্পকাহিনীতে প্রাচীন শ্রীলংকার বিভিন্নশ্রেণীর মানুষের সামাজিক অবস্থা, আচার-আচরণ, রীতি-নীতি, স্বভাব-চরিত্র, পরিবেশ-পরিস্থিতি, প্রাত্যহিক

www.pathagar.com

জীবনযাত্রা ইত্যাদি বিষয়ের একটি বাস্তব চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। গল্প সংকলক বা গল্পকার যেহেতু শ্রীলংকার অধিবাসী সুতরাং যুক্তিসঙ্গত কারণে অতিভৌতিক অংশগুলো বাদ দিলে অন্যান্য বিবরণ বাস্তবভিত্তিক হওয়া স্বাভাবিক। কাজেই প্রাচীন শ্রীলংকার মোটামুটি একটি বস্তুনিষ্ঠ চিত্র গল্পগুলোতে আশা করা যায়। এ অংশের গল্পগুলোও বিভিন্নস্তরের মানুষ, ভিক্ষু, শ্রামণ, রাজা, অমাত্য এমনকি তির্যক প্রাণী পশু-পাখিকে ভিত্তি করে রচিত। গল্পের চরিত্রগুলো রূপায়ণ করতে গিয়ে লেখক যেসব সামাজিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক ইত্যাদি বিষয়ের অবতারণা করেছেন তা নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। হাসি-কান্না, হর্ষ-বিষাদ, প্রেম-বিরহ আর সুখ-দুঃখের সংমিশ্রণে রচিত প্রতিটি কাহিনী সুখপাঠ্য ও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে।

বেশ কয়েকটি গল্পে প্রাচীন শ্রীলংকায় চরম দুর্ভিক্ষের বিবরণ রয়েছে। দুর্ভিক্ষে শত শত মানুষের অনাহারে মৃত্যু, গ্রাম অঞ্চল ত্যাগ করে জীবন রক্ষার জন্য অন্যত্র পলায়ন, বিভিন্ন প্রকার রোগে আক্রান্ত মানুষের হাহাকার ইত্যাদি চিত্র আমাদের হৃদয়কে ভারাক্রান্ত করে তোলে। তখন চুরি প্রভৃতি অসামাজিক দুষ্কর্মও বৃদ্ধি পায়। দেবগ্রামের জনসাধারণ দুর্ভিক্ষ ও অমনুষ্য উপদ্রবের কারণে অন্যত্র পলায়ন করলে ঐ গ্রামের পুস্পবাস বিহারে বসবাসরত বৃদ্ধ স্থবির অভয় বোধিবৃক্ষ ও চৈত্য-পূজা করার জন্য বিহার ত্যাগ করেননি, তিনদিন অনাহারে ক্ষুধা-পিপাসায় অতিবাহিত করার পর জনৈক দেবপুত্র তাঁকে আহার্যাদি দ্বারা প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।[৫৩] অভয় স্থবিরের তিনদিন অনাহারে দিনাতিপাত পাঠকমাত্রেরই বেদনার সঞ্চার করে। মহালেন বিহারের ভিক্ষু সঙ্ঘদত্ত স্থবির অনুরূপ দুর্ভিক্ষ ও মহামারীর উদ্ভব হলে অতিকষ্টে কালাতিপাত করার সময় জনৈক দেবপুত্র তাঁকে আহার্যাদি দান দিয়ে প্রাণ রক্ষা করেছিলেন।[৫৪] বখুল পর্বত কথায় (বখুল পব্বতস্স বত্থু) অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অমনুষ্য উপদ্রবে শত শত মানুষের করুণ মৃত্যু এবং জীবন বাঁচানোর জন্য ইতস্তত পলায়নের কাহিনী অতি কঠোর প্রাণেও ব্যথার উদ্রেক করে।[৫৫] বৃক্ষদেবতাকথায় (রুক্খ দেবতায় বত্থু) দুর্ভিক্ষের এক করুণ চিত্র চিত্রায়িত হয়েছে। এক গৃহের লোকেরা সামান্য মাত্র চাল বস্ত্র দ্বারা বেঁধে গরম জলে দিয়ে জলই শুধু পান করত, চালগুলো শুকিয়ে পুনরায় অনুরূপভাবে গরমজলে ভিজিয়ে জল পান করে দিনাতিপাত করত।[৫৬] দুর্ভিক্ষর এই যে চিত্র তা লেখকের লেখনীতে অতি করুণ অথচ বাস্তবতা রূপ পেয়েছে। এছাড়া তম্বসুমন স্থবিরকথা (তম্ব সুমনথেরস্স বত্থু),[৫৭] দম্পতিকথা (জয়ম্পতিকানং বত্থু),[৫৮] শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্য কথা (সদ্ধাদিস্সামচ্চস্স বত্থু)[৫৯] এবং দ্বিতীয় দম্পতিকথা (দুতিয় জয়ম্পতিকানং বত্থু)[৬০]-য়ও শ্রীলংকার বিভিন্ন স্থানের দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও অকালমৃত্যুর নিদারুণ কাহিনী বর্ণিত হয়েছে। দুর্ভিক্ষের করাল গ্রাস থেকে বিত্তবান পরিবারও রেহাই পান নি। দুর্ভিক্ষের কারণে বিত্তশালী অমাত্য তাঁর গৃহের সকল চারক-কর্মকারীকে বিদায় দিয়ে অনাহারে অর্ধাহারে কালযাপনের কাহিনী অতীব মর্মন্তুদ। তাঁর গৃহে অল্পমাত্র অবশিষ্ট চাল দিয়ে রান্না করা অন্ন নিজেরা না খেয়ে জনৈক

www.pathagar.com

ভিক্ষাচারী ভিক্ষুকে দান করে নিজেরা অভুক্ত অবস্থায় বিছানায় ছটছট করা এবং নিজের জানা সত্ত্বেও স্ত্রীকে পাত্রে খাদ্য আছে কিনা দেখার জন্য প্রেরণ– পাঠককে অশ্রুসিক্ত করে।[৬১]

প্রাচীন শ্রীলংকার আর্থ-সামাজিক অবস্থা নির্ণয়ে রসবাহিনীর বহুগল্পে শত শত উপাদান রয়েছে। একদিকে চরম দুর্ভিক্ষ, চুরি, দৈন্যতা অপরদিকে কোনো কোনো গল্পে ধনাঢ্য ব্যক্তি, বণিক, রাজা, অমাত্য ইত্যাদির বিরবণ গল্পগুলোর মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য এনেছে তেমনি তৎকালীন আর্থ-সমাজ কাঠামোর একটি সুস্পষ্ট চিত্রও অঙ্কিত হয়েছে। অভয় স্থবিরকে চীবরের জন্য প্রদত্ত কাপড় হরন্তিক নামে জনৈক চোর প্রায়সময় চুরি করে নিয়ে যেত। একদা দাতা চোরকে ধরে তার পৃষ্ঠে একটি শবদেহ শক্ত করে বেঁধে দিয়ে ছেড়ে দিলে যে অদ্ভুদ দৃশ্যের সৃষ্টি হয় তা অপূর্ব।[৬২] জনৈক রাজকর্মচারীকে চোর কর্তৃক হত্যা করার বিবরণ[৬৩] এবং বিভিন্ন সময়ে দুর্ভিক্ষে শত শত মানুষের মৃত্যু ও দেশান্তর প্রভৃতি তৎকালীন সময়ের আর্থিক দৈন্য ও সমাজ চরিত্রের পরিচয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। কোনো কোনো চরিত্রে দীনতার ছাপ থাকলেও মানবীয় চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে মহীয়ান। নকুল উপাসক দরিদ্র হলেও ধার্মিক।[৬৪] মুগ্ধগুপ্ত ও তার স্ত্রী তিষ্যা অতীব দীন হীন, দারিদ্র্য তাদের জীবনসঙ্গী, তবু তারা পুণ্যব্রতী।[৬৫] গ্রামের বালিকা পরের গৃহে পরিচারিকার কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করলেও ধর্মপরায়ণা।[৬৬] পরের গৃহে পরিচারিকার কাজে নিয়োজিত ধর্মার জীবন কাহিনী লেখক অনুপমভাবে পরিবেশন করেছেন।[৬৭] দম্পতিকথা,[৬৮] নাগকথা[৬৯] ও মেঘবর্ণ কথা[৭০] নামক কাহিনীতে দারিদ্র্যের বিবরণ রয়েছে। এসব দীন চরিত্রের পাশাপাশি বিত্তবান ও বণিক শ্রেণীর কাহিনীও রয়েছে, যাতে ধনী, দরিদ্র, বণিক প্রভৃতি বিভিন্ন স্তরের মানুষের অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যায়। আর্যগালতিষ্য,[৭১] সুরনির্মলকথা[৭২] মহাসোন কথা,[৭৩] গোঠইম্বর কথা,[৭৪] ভরণকথা,[৭৫] বেলুসুমনকথা,[৭৬] খঞ্জদেবকথা,[৭৭] ফুষ্যদেব কথা[৭৮] লভিয়বসভকথা,[৭৯] দাঠাসেনকথা,[৮০] সালিরাজ-কুমারকথা[৮১] নন্দিবণিককথা,[৮২] আম্রামাত্যকথা[৮৩] দুব্বিটিঠ মহাতিষ্যকথা,[৮৪] দন্তকুটুম্বিককথা[৮৫] রাষ্ট্রপুত্র কথা[৮৬] প্রভৃতি কাহিনীতে বণিক ও ধণাঢ্য ব্যক্তিবর্গের জীবন চরিত উপস্থাপন করা হয়েছে। তাঁরা দেশ, সমাজ ও ধর্মের কল্যাণে প্রভুত কাজ করেছেন। তৎকালীন বণিকদিগকে জীবনের ঝুঁকি নিয়ে বাণিজ্যযাত্রা করতে হত। অনেক সময় প্রাকৃতিক দুর্যোগে পড়ে নৌকাডুবিতে প্রভুত যানমালের ক্ষতি হওয়ার বিষয়ও কোনো কোনো গল্প হতে জানা যায়।[৮৭]

কোনো কোনো কাহিনীতে শঠ ও কপটাচারী চরিত্রের সন্ধান পাওয়া যায়। দুব্বিটঠি মহামাত্যকে নাজেহাল ও তাঁর বাড়িতে হলকর্ষণ উৎসবকে পণ্ড করার উদ্দেশ্যে তাঁর এক ঋণগ্রাহী শঠ ব্যক্তি অজ্ঞাতে ভিক্ষু-সঙ্ঘকে নিমন্ত্রণ করে নিজে গা ঢাকা দিয়ে যে অবস্থার সৃষ্টি করে তাও নিন্দার্হ।[৮৮] যদিও অমাত্যের শ্রদ্ধাবতী স্ত্রী ভিক্ষু-সঙ্ঘকে যথাযথ পরিচর্যা করেছিলেন। কিঞ্চিসঙ্ঘার মত দিব্য সুন্দরী, ধর্মপরায়ণা সচ্চরিত্রের অধিকারী কন্যাকে নিষ্ঠুর পিতামাতা ত্যাগ করে যাবার কাহিনী অত্যন্ত মর্মন্তুদ।[৮৯]

www.pathagar.com

রসবাহিনীতে কিছু কিছু প্রেম-বিরহের কাহিনী রয়েছে যা তৎকালীন সমাজ চিত্রের একটি উজ্জ্বল দিক নির্দেশনা দেয়। গল্পকার অত্যন্ত সুনিপুনভাবে এসব গল্প উপস্থাপন করেছেন। অপরূপ রূপসী ষোড়শী তরুণী হেমা অনুরাধপুরে আগত জনৈক বণিকপুত্রের প্রতি আসক্ত হয়ে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হবার কিছুদিন পর বণিকপুত্র মহাতীর্থ প্রত্যাবর্তন করলে হেমা বিরহ-বেদনায় অধীর হয়ে রাত্রির অন্ধকারে বিপদসঙ্কুল দুর্গম পথে একাকী প্রেমিকের নিকট যাত্রা এবং পথিমধ্যে সমুদ্রে নাগরাজের সঙ্গে সাক্ষাৎ, নাগরাজ তার নিকট ধর্মচক্র প্রবর্তন সুত্র শ্রবণান্তে প্রেমিকের নিকট পৌঁছে দেবার বিচিত্র কাহিনী একটি নিরেট প্রেম-গল্প হিসেবে বিবেচ্য হতে পারে।[৯০] সুমনাদেবী তিষ্যের রূপে মুগ্ধ হয়ে তাকে স্বামীরূপে বরণ করে, তিষ্য প্রথমজীবনে অলস ছিল বলে সুমনার মাতা-পিতা রুষ্ট হয়ে তাদের পৃথক করে দেয়, কিন্তু পরবর্তী সময়ে তিষ্যের কর্মদক্ষতা গুণে তাদের দাম্পত্য জীবন পরম আনন্দ ও সুখের হয়েছিল।[৯১] শ্রদ্ধাবতী সুমনা ও মহাগ্রামের জনৈক ব্যক্তির সঙ্গে বিয়ে প্রেম-সংঘটিত হলেও সুমনা সদ্ধর্ম পরায়ণা ছিল বলে স্বামী তাকে ত্যাগ করে, স্বামীগৃহ থেকে সুমনার বিদায়দৃশ্য পাঠকের হৃদয়ে করুণার উদ্রেক করে।[৯২] হোল্লোল গ্রামের মোড়ল কর্মকার চণ্ডালের অনিন্দ্য রূপসী কন্যা অশোকমালার রূপে অভিভূত দুটঠ্‌গামণি অভয়রাজের পুত্র সালিরাজকুমার মাতা-পিতার অজ্ঞাতে তাকে জীবনসঙ্গিনী করেন। অশোকমালা স্বীয় গুণে শ্বশুর-শাশুড়ী ও আত্মীয়-পরিজনকে আপন করে নিয়ে সুখের সংসার গড়ে তোলার যে মনোরম বিরবণ পাওয়া যায় তা গল্পকারের লেখনীতে মুর্ত হয়ে উঠেছে।[৯৩] এছাড়া সিংহলরাজ দুট্‌ঠগামণি অভয়ের পুত্র সালিরাজ কুমার এক চণ্ডালকন্যাকে জীবনসাথী করে অস্পৃশ্যতা ও কৌলিন্যতার বিরুদ্ধে এক চরম কুটারাঘাত হেনেছেন এবং এটা বৈষম্যমূলক সমাজ ব্যবস্থায় এক দুঃসাসিক বিপ্লব হিসেবে বিবেচ্য। লেখক এ গল্পটির মাধ্যমে স্বীয় বৈপ্লবিক চিন্তা ভাবনার প্রতিফল ঘটিয়েছেন। নন্দিবণিক[৯৪] গল্পে গল্পকার এক বৈচিত্র্যধর্মী প্রেমচিত্র অঙ্কন করেছেন। নন্দিবণিকের সতী-সাধ্বী সুন্দরী স্ত্রীর প্রতি রাজকর্মচারী সিব কামান্ধ হয়ে প্রত্যাখ্যাত হওয়া সত্ত্বেও বার বার প্রেম নিবেদন করতে থাকে। অবশেষে স্বামীকে হত্যা করার জন্য সে তান্ত্রিকের আশ্রয় গ্রহণ করে, পরিশেষে বণিকের শীলতেজে তান্ত্রিক ভুত সিবকে হত্যা করে। গল্পটি বাস্তব সমাজব্যবস্থার সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ। লম্পট সিবের একতরফা অযাচিত প্রেম নিবেদন পাটকের মনে ঘৃণা জন্মায় এবং তার মৃত্যুতে স্বস্তি জাগে আর সতীনারী বণিক স্ত্রীর নীতিবাক্য ও অমায়িক ব্যবহার একজন আদর্শ গৃহবধু হিসেবে পাঠক মনে গৌরব ও আনন্দের সঞ্চার করে। এ গল্পটি লেখকের একটি অন্যতম সৃষ্টি। কাককথা কাহিনীটিও একটি রূপকাশ্রয়ী মান-অভিমান মিশ্রিত দ্বান্দ্বিক প্রেম কাহিনী।[৯৫] রাজা কল্যাণতিষ্যের মহিষীর সঙ্গে কনিষ্ঠ উপরাজ উত্তিয়ের পরকীয়া প্রেমের বিষয় রাজা অবগত হলে উত্তীয় ভীত হয়ে পলায়ন করে, কিছুদিন পর কোনো এক যুবককে ভিক্ষুর বেশ ধারণ করিয়া প্রেমিকার জন্য প্রেমপত্র প্রেরণ করলে উক্ত নিরীহ বেশধারী ভিক্ষু রাজপ্রাসাদে নিত্য গমনকারী স্থবিরের সঙ্গে প্রাসাদে গমনকরে রাণীকে পত্র দেবার সময় রাজার কাছে ধৃত হয়, রাজা সেই অধরাধের

www.pathagar.com

জন্য তাকে ও স্থবিরকে প্রাণদণ্ডের আদেশ দেন।[৯৬] লেখক গল্পের এ অংশটি অতি সুনিপুণভাবে উপস্থাপন করতে সক্ষম হয়েছেন।

একচক্ষু শৃগালকথা[৯৭] ও বানরকথা[৯৮] গল্প দু'টি রূপকাশ্রয়ী দুই প্রেক্ষাপটে রচিত নীতিধর্মমূলক গল্প। শৃগালকথায় তার উপকারী রাখাল বালককে অজগর সাপের-গ্রাস থেকে জীবন বাঁচিয়েছে আর বানরকথায় বানরকে শর নিক্ষেপকারী শিকারী অসুস্থ হলে বানর শুশ্রুষা করে সুস্থ করে তোলে। আর শিকারী সুস্থ হয়ে বানরকে হত্যা করে মাংস নিয়ে প্রত্যাবর্তন করে। বানর ও শৃগাল পশু হলেও কৃতজ্ঞ, মানুষ অকৃতজ্ঞ– পশুর অধম। লেখক গল্প দুটির মাধ্যমে অকৃতজ্ঞ মনুষ্য জাতির চরিত্র অতি চমৎকারভাবে প্রস্ফুটিত করতে সক্ষম হয়েছেন।

গর্ভবতী রমণীর বিভিন্ন দোহদ উৎপন্ন হয়ে থাকে। সামাজিক প্রথা অনুযায়ী দোহদ পুরণের নিয়মও রয়েছে। দুট্ঠগামণি অভয়রাজমহিষী বিহারদেবীর দোহদ উৎপন্ন ও পূরণের বিরবণ অনুরূপ সামাজিক প্রথার দৃষ্টান্ত।[৯৯]

শ্রীলংকার সামাজিক উৎসবের মধ্যে হলকর্ষণ উৎসব অন্যতম ছিল।[১০০] এ উৎসব সাধারণত বিত্তবান ব্যক্তিরা পালন করতেন। রসবাহিনীতে আর এক প্রকার উৎসবের বিবরণ পাওয়া যায় তার নাম আর্যবংশ ধর্মদেশনা।[১০১] মূলত আর্যবংশ ধর্মদেশনা উৎসবটি বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপর আলোচনাকে কেন্দ্র করে অনুষ্ঠিত হত। এ উৎসব সাধারণত তিনদিন কিংবা সাতদিন ধরে চলত। বহু দূর-দূরান্ত হতে জনগণ এ উৎসবে সমবেত হত।

দূরাগত অভ্যাগতদের জন্য বিত্তশালী ব্যক্তিরা স্থানে স্থানে বিশ্রামাগার ও আসনশালা নির্মাণ করে বিভিন্ন খাদ্য, অন্ন, পানীয় ও শয়নাসনের ব্যবস্থা করে রাখতেন।[১০২] শ্রীলংকার এরূপ সামাজিক ব্যবস্থা ও ঐতিহ্য মৌর্যসম্রাট মহামতি অশোকের সমাজসেবার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।

গল্পগুলো ধর্মীয় ভাবধারায় রচিত হলেও এখানে উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে স্বীকার করতে হয় যে গল্পকার গল্পের স্বাভাবিক পরিণতির প্রয়োজনে সমাজের বিভিন্ন দিক তুলে ধরেছেন, যাতে শ্রীলংকার প্রাচীন সমাজচিত্রের একটি সুস্পষ্ট ছক পাওয়া যায়। ঐতিহাসিকদিক থেকে এসব তথ্য যেমন অতীব গুরুত্বপূর্ণ তেমনি তাৎপর্যপূর্ণও বটে। গল্পগুলোতে ভিক্ষুশ্রামণের ব্যাপক সমাগম আছে, আছে বিভিন্ন পেশাজীবী মানুষ, যেমন– দিনমজুর, খেটে খাওয়া মানুষ, আছে শিকারী বণিক, অমাত্য, রাজকর্মচারী, সৈনিক ইত্যাদি। এরা স্ব স্ব কর্মক্ষেত্রে কাজ করতে গিয়ে তৎকালীন সমাজচিত্রের একটি অনবদ্য রূপ লেখকের লেখনীতে ধরা পড়েছে।

খ. ধর্মীয় অবস্থা

শ্রীলংকার ধর্মীয় অবস্থা বলতে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার ধর্মীয় বিশ্বাস এবং এসব ধর্মের অবস্থা, মানুষ ও সমাজের মধ্যে ধর্মীয় পরিবেশ ইত্যাদি বোঝায়। শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্মের

www.pathagar.com

প্রচারের পূর্বে কোনো সুসংবদ্ধ ধর্মের অস্তিত্ব সম্পর্কে অবগত হওয়ার যায় না।[১০৩] শ্রীলংকায় রচিত কতিপয় ইতিহাস আশ্রয়ী গ্রন্থ থেকে জানা যায়, এখানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হয় মৌর্য সম্রাট মহামতি অশোকের সময় অনুষ্ঠিত তৃতীয় সঙ্গীতির শেষে। তখন সঙ্গীতির মহানায়ক গোগ্গলিপুত্ততিস্সের পরামর্শক্রমে বিভিন্নস্থানে বৌদ্ধধর্ম প্রচারার্থে নয়টি শক্তিশালী দল প্রেরণ করা হয়েছিল।[১০৪] সে সময় অশোক পুত্র মহেন্দ্রের (মহিন্দ) নেতৃত্বে একটি ধর্মপ্রচারকদল শ্রীলংকায় প্রেরণ করা হয়। সঙ্গে ছিলেন অশোক দুহিতা সঙ্ঘমিত্রাও।[১০৫] খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে শ্রীলংকার রাজা ছিলেন মুটসিবের দ্বিতীয় পুত্র দেবপিয়তিস্স। রাজা পারিষদবর্গসহ কোনো উৎসবের দিনে মৃগয়ার জন্য অনুরাধপুরের পূর্বদিকে মিস্সক পর্বতে (বর্তমান মিহিনতালে) উপগত হলে মহেন্দ্র স্থবিরের সঙ্গে সাক্ষাৎ ঘটে। এর বিবরণ উপাখ্যান আকারে সিংহলী বহু পালি সাহিত্যে দৃষ্ট হয়।[১০৬] উপাখ্যানে উল্লেখ আছে, মহেন্দ্র স্থবির রাজা দেবপ্রিয় তিষ্যের গভীর জ্ঞানের পরিচয় পেয়ে 'চূলহত্থিপদোপমসুত্ত'[১০৭] দেশনা করেছিলেন এবং উক্ত দেশনা শ্রবণ করে রাজা অনুচরবৃন্দসহ বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।[১০৮] অনন্তর রাজার আমন্ত্রণক্রমে মহেন্দ্রস্থবির তাঁর অনুগামী ভিক্ষুসহ অনুরাধপুরে গমন করেন। তাঁর দেশনায় মুগ্ধ হয়ে তখাকার অসংখ্য নর-নারী বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন। রাজা দেবপিয়তিষ্য অনুরাধপুরের দক্ষিণে মহামেঘবনে বিহার নির্মাণ করিয়ে ভিক্ষু-সঙ্ঘের বসবাসের জন্য দান করেন।[১০৯] এই মহামেঘবন মহাবিহার শ্রীলংকার প্রথম বৌদ্ধবিহার এবং এটাই পরবর্তীকালে মহাবিহার সম্প্রদায়রূপে প্রসিদ্ধি লাভ করে।[১১০] এ বিহারের গুরুত্ব সম্পর্কে মন্তব্য করেছেন Walpola Rahula :

"The great of centre of Buddhist cutlure and learning in the island, the strong-hold of the theravada."[১১১] এসময়েই অশোক-দুহিতা সঙ্ঘমিত্রা বুদ্ধগয়ায় যে বোধিবৃক্ষের মূলে বুদ্ধ সম্বোধি লাভ করেছিলেন তার দক্ষিণদিকের একটি শাখা শ্রীলংকায় নিয়ে গিয়েছিলেন এবং এটা মহামেঘবনে রোপণ করা হয়েছিল। এখনো উক্ত বোধিবৃক্ষ লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বীদের বিশেষ শ্রদ্ধার বস্তু হিসেবে পূজিত হয়। এছাড়া বুদ্ধের পবিত্র চিতাভস্ম, বুদ্ধের ভিক্ষা পাত্র, বৌদ্ধশাস্ত্রগ্রন্থ ইত্যাদি ভারতবর্ষ হতে সিংহল দ্বীপে আনয়নের মাধ্যমে এখানে বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক প্রচার ও প্রসার ঘটে। রাজকুমারী অনুলাদেবী পাঁচশ রমণীসহ সংঘমিত্রার নিকট প্রব্রজ্যা গ্রহণ করে শ্রীলংকায় ভিক্ষুণী সঙ্ঘ গঠন ও প্রতিষ্ঠা করেন।[১১২] মহেন্দ্রস্থবির কর্তৃক বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার পর হতে শ্রীলংকায় শিক্ষা, সভ্যতা ও কৃষ্টির দ্রুত বিকাশ লাভ করে।[১১৩]

আলোচ্য রসবাহিনীর একটি উপাখ্যানে উল্লেখ আছে যে, বুদ্ধ জেতবনে অবস্থান কালে পঞ্চমবর্ষে শ্রীলংকার নাগদ্বীপে চুলোদর ও মহোদর নামে দুই যক্ষ মামা-ভাগ্নের বিবাদ মীমাংসার জন্য উপস্থিত হয়েছিলেন। বুদ্ধ তাদের বিবাদ মীমাংসা করে ত্রিশরণে প্রতিষ্ঠা করান।[১১৪] এবিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা হয়ত নেই কিন্তু খ্রি. পূ. তৃতীয় শতকে দেবপ্রিয়তিষ্য মহারাজের সময় শ্রীলংকায় যে বৌদ্ধধর্ম প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে এটা

www.pathagar.com

ঐতিহাসিকদের কর্তৃক স্বীকৃত। অতঃপর শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্মকে বহু বাধাবিপত্তির সম্মুখিন হয়ে বর্তমান অবস্থায় আসতে হয়েছে। আমরা এ পর্যায়ে রসবাহিনীর গল্পগুলোর আলোকে শ্রীলংকার ধর্মীয় অবস্থা সম্পর্কে আলোকপাত করার প্রয়াস পাচ্ছি।

পূর্বেও উল্লেখিত হয়েছে, রসবাহিনীর গল্পগুলোর প্রধান উপজীব্য বিষয় দান ও দানের ফলবর্ণনা। দাতা সাধারণ মানুষ, কোনো কোনো ক্ষেত্রে দেবতা, গ্রহীতা পুতপবিত্র ভিক্ষু-সঙ্ঘ, কোনো কোনো সময় মানবেতর প্রাণী। আবার কোনো কোনো গল্পে ধর্মোপদেশের বিবরণ।

প্রব্রজিতদের প্রধান উদ্দেশ্য তৃষ্ণাকে ধ্বংস করে পরম শান্তিপদ নির্বাণ লাভ। মৃগপোতককথায়[১১৫] (মিগ পোতকস্‌স বত্থু) বর্ষীয়ান ভিক্ষু মহা অভয় স্থবির প্রতিসম্ভিদা মাত্র লাভ করেছিলেন কিন্তু তৃষ্ণা ক্ষয় করে সোপাদর্সেস নির্বাণ লাভ করতে পারেননি, অথচ তাঁরই শিষ্য এবং ভাগিনা শ্রামন্য ধর্মে দীক্ষা নেবার সময় অর্হত্ত্ব ফলে প্রতিষ্ঠিত হন। ভাগিনা-শিষ্যের উপদেশক্রমে অভয়স্থবির অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন। গল্পটি শেষাংশে শ্রামণ্য ও উপসম্পন্ন জীবনের সার্থকতা সম্পর্কে দিকনির্দেশ করে। এ গল্পের শেষাংশে শ্রামণের উপদেশ শ্রবণ করে তাঁর মাতাপিতাসহ পাঁচশ মানবের স্রোতাপত্তিফল প্রাপ্তির বিরবণ থেকে উপলব্ধি করা যায় যে, সাধারণ মানুষও ধর্মানুরাগী ছিলেন।

ভিক্ষুগণ যেমন ছিলেন সদ্ধর্মে নিবেদিতপ্রাণ তেমনি সদ্ধর্মের সমৃদ্ধি সাধনেও তৎপর: প্রগাঢ় আত্মবিশ্বাস সম্পন্ন ভিক্ষুগণ আপন বিমুক্তির সাথে সাথে সাধারণ মানুষের কল্যাণে ছিলেন ব্রতী। আত্মহিত আর পরহিত সাধনই ছিল তাঁদের প্রধান লক্ষ্য। অমাত্য কর্তৃক প্রদত্ত অন্ন গ্রহণ করে তিষ্যস্থবির নামে জনৈক ভিক্ষু বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে অর্হত্ত্বফল লাভের পর আহারকৃত্য সমাপন করে নিজে বিমুক্তিপ্রাপ্ত হন এবং দাতারও পুণ্যবৃদ্ধির সহায়তা করেন।[১১৬] ধর্মা নাম্নী দাসী পরগৃহে পরিচালিকার কাজ করে একটি কাপড় পেয়েছিল, সে ভিক্ষু-সঙ্ঘের প্রতি শ্রদ্ধাচিত্তে কাপড়খানা দান করেছিল। চীবরে পরিণত করে পাঁচশত ভিক্ষু প্রত্যেকে এক একদিন কাপড়খানা পরিধান করে অর্হত্ত্বফলে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিলেন।[১১৭] নকুল উপাসক দ্বাদশ কার্যাপণ যোগাড় করে কন্যাকে মুক্ত করতে যাবার সময় অভুক্ত চূলতিষ্য নামে জনৈক ভিক্ষুকে উক্ত অর্থের বিনিময়ে অন্ন ক্রয় করে দান করেন, স্থবির বিদর্শন প্রবৃদ্ধি করে তৃষ্ণামুক্ত হয়ে উক্ত আহার্য গ্রহণ করে দাতার দানের সার্থকতা প্রতিপাদন করেন।[১১৮] চরম দুর্ভিক্ষের সময় আম্রামাত্য নামে জনৈক ব্যক্তি পরিবারের জন্য রান্নাকরা অল্পমাত্র অন্ন কোনো ভিক্ষাচারী ভিক্ষুকে দান দিয়ে তাঁকে অর্হত্ত্বলাভে সাহায্য করেছিলেন।[১১৯] দ্বিতীয় দম্পতিকথায় (দুতিয় জয়ম্পতিনং[১২০] বত্থু) অনুরূপ বিবরণ রয়েছে। এসব গল্পের মাধ্যমে একদিকে ভিক্ষুদের আধ্যাত্মিক উন্নতি বা পরম নির্বাণ সুখ অধিগতের সাথে সাথে দাতাদের পুণ্যফল প্রবৃদ্ধি কিংবা কোনো কোনো ক্ষেত্রে প্রত্যক্ষ ফলের বিবরণও লক্ষ্য করা যায়।

গল্পকারের তুলিতে নিঃসন্দেহে অতিশয়োক্তি অথবা অতিপ্রাকৃত বিরবণ রয়েছে, তবু এ সব কাহিনী থেকে তৎকালীন শ্রীলংকার একটি ধর্মীয় পরিবেশ ফুটে উঠেছে। যেমন–দানের ফলে অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ড[১২১] বস্ত্রভাণ্ড,[১২২] সর্বকামদমণি,[১২৩] নিধিকুম্ভ,[১২৪]

www.pathagar.com

কামধেনু,[১২৫] পানীয়জল,[১২৬] দিব্য ঔষধি পাত্র[১২৭] প্রভৃতি লাভ অবিশ্বাস্য বটে, কিন্তু গল্পপাঠের সময় মনে হবে যেন দাতাদের এসব প্রাপ্তির প্রয়োজন ছিল। তাই এসব অলৌকিক ঘটনার অবতারণা অবিশ্বাস্য হলেও অপ্রাসঙ্গিক বোধ হয় না।

বহু গল্পে চরম দুর্দিন কিংবা দুর্ভিক্ষের সময়ও নিজে না খেয়ে দান দেওয়ার কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এসব কাহিনীর ঐতিহাসিক ভিত্তি না থাকলেও নিঃসন্দেহে ধর্মীয় ভিত রয়েছে। কেননা ভোগসম্পত্তি লাভ ও প্রবৃদ্ধি এবং মুক্তিলাভের প্রাথমিক স্তর হচ্ছে দান দেওয়া, দানকে বৌদ্ধধর্মে সমধিক গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। তাই বৌদ্ধধর্ম প্রচারলগ্ন থেকে সদ্ধর্মপ্রাণ নর-নারী নির্বিশেষে সামর্থানুসারে দান করার ইচ্ছা বা প্রবণতা ঐতিহাসিকভাবে স্বীকৃত। শ্রীলংকায়ও বৌদ্ধধর্ম প্রচার হবার পর থেকে সাধারণ মানুষ নিজেদের সাধ্যানুসারে দান করতেন। লেখক এসব প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে দর্শন করেছেন। তিনি তাঁর লেখনীতে গল্পাকারে রূপ দিতে গিয়ে স্বাভাবিকভাবে কিছু রূপক ও কিছু অলৌককত্বের আশ্রয় নিয়েছেন। তবে দান দেবার যে একটা শ্রদ্ধাবোধ সাধারণের মধ্যে এক সময় প্রবল হয়ে উঠেছিল একথা স্বীকার করতেই হয়। একদা দুর্ভিক্ষের কারণে দেবগ্রামের জনগণ অন্যত্র জীবিকান্বেষণে গমনকালে বিহারের স্থবির মহাঅভয় চৈত্য ও বোধিবৃক্ষ সেবা করার জন্য অন্যত্র না গিয়ে তিনদিন অনাহারে ছিলেন। তাঁকে অন্ন-পানীয় দিয়ে সেবা করেন এক দেবতা।[১২৮] দেবগণও শীলবান ও পূণ্যবান পুরুষকে সেবা করে থাকেন, এটা তার দৃষ্টান্ত। নাগা নাম্নী দাসীর শ্রদ্ধাবল অপূর্ব। অভুক্ত ষাটজন ভিক্ষুকে অন্নদান করার জন্য সে প্রভুর নিকট হতে অতিরিক্ত কাজ করে দেবার শর্তে ষাট কার্যাপণ সংগ্রহ করে সেই অর্থ দিয়ে অন্ন ক্রয় করে দান করে।[১২৯] তিষ্যা অতি দীনা। স্বামী স্ত্রী দুজনে কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করে। একদা অতি কষ্টে সংগৃহীত মোটা চালের অন্নদান করায় জনৈক বৃদ্ধ ভিক্ষু রুস্ট হওয়ায় তাদের একমাত্র পুত্রকে আট কার্যাপণে বিক্রি করে একটি কামধেনু ক্রয় করল এবং প্রতিদিন ভিক্ষু-সঙ্ঘকে উৎকৃষ্ট খাদ্য দান করতে লাগল। দান দেওয়ার জন্য এমন দৃষ্টান্ত বিরল।[১৩০] ধর্মা নাম্নী দাসী কাজ করে প্রাপ্ত একটি মাত্র কাপড় শ্রদ্ধাসহকারে ভিক্ষু-সঙ্ঘের হাতে দান করে যে তৃপ্তি লাভ করেছেন তা এক সাটিক ব্রাহ্মণের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়।[১৩১] মাতাপিতা কর্তৃক পরিত্যক্ত সুন্দরী তন্বী কিঞ্চিসজ্ঞা পথিমধ্যে আহার্য প্রাপ্ত হয়ে ক্ষুধার্ত সত্ত্বেও প্রথমে ভিক্ষুকে দান করে পরে আহার গ্রহণ করে যে শ্রদ্ধার পরিচয় দিয়েছে তা ধর্মপ্রাণ সকলেরই শিক্ষানীয়।[১৩২] শ্রদ্ধাবতী সুমনা প্রতিদিন দান দিত বলে তাঁর স্বামী রুষ্ট হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেয়, কিন্তু সদ্ধর্মে নিবেদিত সুমনাকে স্বামী ত্যাগ করলেও তিনি সদ্ধর্ম ত্যাগ করেনিন।[১৩৩] দানের প্রতি সাধারণ কিংবা ধনী দরিদ্র সকল শ্রেণীর মানুষ এত আকৃষ্ট হয়ে পড়েছিল যে, অনেক সময় ধনী বা বিত্তবানেরা তো দান দিতেন, দরিদ্ররাও অনেকসময় নিজেরা অভুক্ত থেকে মুক্ত হস্তে দান করার কাহিনী এমনকি স্বীয় পরিধানের বস্ত্র পর্যন্ত[১৩৪] নির্দ্বিধায় দান করার বিররণ যে কোনো ব্যক্তির মনকে আপ্লুত করে তোলে। কোনো কোনো গল্পে দানের পাত্র কুকুর,[১৩৫] কাক[১৩৬] কিংবা আজীবিক।[১৩৭] বলা বাহুল্য, বৌদ্ধধর্ম চেতনা সহকারে দান দেবার জন্য বলে ; দাতা, দানীয়বস্তু ও দানের ক্ষেত্র বিশেষে ফলের তারতম্য হবে মাত্র। বৌদ্ধমতে

www.pathagar.com

ভিক্ষু-সঙ্ঘ পবিত্র পুণ্যক্ষেত্র, এতে দান দিলে বিপুল পরিমাণ পুণ্যসম্পদ প্রাপ্ত হওয়া যায়, পক্ষান্তরে অন্যসব ক্ষেত্রে এমনকি তির্যকক্ষেত্রে দান করলেও পুণ্য সঞ্চিত হবে। গল্পগুলোতে বৌদ্ধিক ভাবধারা অর্থাৎ বৌদ্ধমতবাদ সমূহ প্রতিফলিত হয়েছে। আবার শ্রীলংকার সর্বসাধারণের ধর্মচেতনার দিকটিও উম্মেচিত হয়েছে।

প্রাচীনকালে শ্রীলংকায় বিভিন্ন স্থানে বৌদ্ধধর্ম ও দর্শনের উপর আলোচনা অনুষ্ঠিত হত। বিজ্ঞ ধর্মদেশক ভিক্ষুগণ সে সভায় দেশনা করতেন। বহু দূর দূরান্ত হতে হাজার হাজার নরনারী সদ্ধর্ম শ্রবণের জন্য সমবেত হতেন। জনৈক কুমারীরকথায় (অঞ্ঞঞতরকুমারিকায় বথু) কোনো গৃহের স্ত্রীকে গৃহের দায়িত্ব দিয়ে সকলে ধর্ম শ্রবণ করতে গেলে উক্ত স্ত্রীও অন্য কোনো পরিচারিকার উপর দায়িত্ব অর্পণ করে একাকী দুর্গম পথ অতিক্রম করে গিয়ে ধর্ম শ্রবণের বিবরণ অতি চকমপ্রদ।[১৩৮] জনৈক উপাসিকা পুত্রসহ অনুরূপ ধর্মসভায় ধর্ম শ্রবণ করার সময় তার পুত্র সর্প দংশিত হলে উপাসিকা নীরবে ধর্ম শ্রবণ করেন, কারণ অন্যথায় ধর্ম শ্রবণের ব্যাঘাত ঘটবে, সভাশেষে সত্যক্রিয়া দ্বারা পুত্রকে সুস্থ করে তোলেন।[১৩৯] অনুরূপভাবে এ রকম এক ধর্মসভায় কুড্ডরাজ্যবাসী কোনো স্থবিরও সর্প দংশিত হন এবং সভাশেষে সত্যক্রিয়া করে বিষমুক্ত হন।[১৪০] এসব কাহিনী হতে তৎকালীন শ্রীলংকার ধর্মীয় পরিবেশের একটি সুস্পষ্ট ধারণা জ্ঞাত হওয়া যায়। এসব ধর্মালোচনা আর্যবংশ ধর্মদেশনা নামে কথিত এবং ধর্মালোচনা দীর্ঘদিন ধরে চলত। ফলে সাধারণ মানুষ সদ্ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে উঠেন।

কোনো কোনো গল্পে আজীবক মতাবলম্বীদের বিবরণ লক্ষ্য করা যায়।[১৪১] এতে প্রমাণিত হয় যে, তখন নগন্য সংখ্যক হলেও অন্যমতে বিশ্বাসী মানুষও ছিল। এছাড়া এলার নামক রাজাও বৌদ্ধমতে বিশ্বাসী ছিলেন না।[১৪২] কথিত আছে, তিনি একজন অতি সৎ ও প্রজাবৎসল নৃপতি ছিলেন। তিনি ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সমদৃষ্টি রাখতেন। তিনি ধর্মতঃ চুয়াল্লিশ বছর রাজত্ব করেন।[১৪৩] কিন্তু তাঁর অনুসারী তামিলেরা ছিল বৌদ্ধবিদ্বেষী, এ সময়ে বহু বৌদ্ধবিহার, বৌদ্ধ ধর্মগ্রন্থ ধ্বংস করা হয়, বোধিবৃক্ষ নষ্ট করা হয় এবং বৌদ্ধদের নির্যাতন করা হয়। এর ফলে বহু বৌদ্ধ অন্যত্র পলায়ন করতে বাধ্য হয়।[১৪৪] পরবর্তীতে রাজা দুট্ঠগামণির নেতৃত্বে বৌদ্ধধর্মের পুনর্জাগরণ ঘটে। দুট্ঠগামণি বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও বিকাশের জন্য আজীবন কাজ করেছিলেন। তিনি সমগ্র রাজ্যে ঊনবিংশতি কোটি ধন ব্যয় করে বহু বিহার ও চৈত্য নির্মাণ করান।[১৪৫]

বস্তুতপক্ষে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচারিত হবার পর সিংহলবাসীর শুধু ধর্মীয় জীবনে নয় সাংস্কৃতিক ও সভ্যতার বিকাশের ক্ষেত্রেও বিরাট প্রভাব পড়েছিল।[১৪৬] শিল্প ও সাহিত্যের ক্ষেত্রেও বৌদ্ধধর্মের প্রভাব ও অবদান অনস্বীকার্য। রসবাহিনীর গল্পগুলো প্রমাণ করে যে, প্রাচীন শ্রীলংকা তখন বৌদ্ধধর্মের অন্যতম শ্রেষ্ঠ পীঠস্থানে পরিণত হয়েছিল।

গ. রাজনৈতিক অবস্থা

রসবাহিনীর সিংহলদ্বীপ অংশের কয়েকটি গল্পে ঐতিহাসিক উপাদান রয়েছে যা বৌদ্ধধর্মের ইতিহাসে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। শ্রীলংকার বুদ্ধপূর্ব যুগের ইতিহাস তমসাচ্ছন্ন। খ্রিস্টীয় চতুর্থ

www.pathagar.com

শতকে রচিত ইতিহাসাশ্রয়ী পালি মহাকাব্য দীপবংস ও পঞ্চম শতকে রচিত পালি মহাবংস কাব্যে তথাগত বুদ্ধের তিনবার সিংহল গমনের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। বর্ণনামতে জানা যায়, বুদ্ধত্ব লাভের পর পঞ্চম মাসে[১৪৭] বুদ্ধ সিংহলে গিয়েছিলেন। একদা তিনি মানবকল্যাণ ও দুঃখমুক্তির জন্য বিশ্বব্রহ্মাণ্ড অবলোকন করে দিব্যনেত্রে দেখতে পান যে ভবিষ্যতে সম্রাট অশোকের পুত্র মহেন্দ্র স্থবির লংকায় গমন করে তাঁর ধর্ম প্রচার করবেন। সেখানে ভিক্ষুগণ নিরাপদে জীবনযাপন করতে পারবেন এবং সদ্ধর্ম দীর্ঘস্থায়ী হবে। এজন্য তিনি স্বয়ং আকাশমার্গে গমন করে যক্ষদিগকে অলৌকিক প্রভাবে বিতাড়িত করে দ্বীপকে মনুষ্যবাসের উপযোগী করেন।[১৪৮] তিনি দ্বিতীয়বার শ্রীলংকায় গমন করেন বুদ্ধত্বলাভের পঞ্চমবর্ষে।[১৪৯] পার্বত্য নাগ ও সামুদ্রিক নাগদের মধ্যে যুদ্ধের সূচনা হলে তিনি বিবদমান দু'দলের মধ্যে ঐক্য ও শান্তি স্থাপন করেন। দু'দলই বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে শান্তিতে বসবাস করতে থাকে।[১৫০] তিনি তৃতীয়বার গমন করেন বুদ্ধত্বলাভের অষ্টমবর্ষে[১৫১] কল্যাণীর মণিযক্ষের আমন্ত্রণে সদ্ধর্ম প্রচার করার জন্য।[১৫২] মহাবংসে এটাও উল্লেখ আছে যে বুদ্ধ সিংহলের যেস্থানে প্রথম পদস্পর্শ করেছিলেন সেস্থানে রাজা দুট্ঠগামণি অভয় (রাজত্বকাল খ্রি. পূ. ১৬১-১৩৭) একটি স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করিয়েছিলেন খ্রি. পূ. ১৬৪ অব্দে, যা এখনও স্মৃতি বহন করছে।[১৫৩] অবশ্য এবিবরণের ঐতিহাসিক সত্যতা প্রমাণিত হয়নি।

শ্রীলংকার রাজনৈতিক ইতিহাসে খ্রি. পূ. ৫৪৩ অব্দে বঙ্গবীর বিজয় সিংহের সিংহল বিজয় এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক দিক নির্দেশনা। যেদিন বিজয় সিংহ সাতশজন সঙ্গী (সৈন্য?) সহ সিংহলে পদার্পণ করেন সেদিনই জগৎপূজ্য মহামানব বুদ্ধ মহাপরিনির্বান প্রাপ্ত হন।[১৫৪] বিজয়সিংহের সিংহলে আগমনের পর বহু ভারতীয় নর-নারী তাঁর অনুগামী হয় যারা বৌদ্ধধর্ম সম্পর্কে জ্ঞাত ছিল।[১৫৫] James Gray তাঁর Jinalankara নামক গ্রন্থের ভূমিকায় উল্লেখ করেছেন যে, খ্রি. পূ. ৪২৬ অব্দে বুদ্ধরক্ষিত নামে একজন ভিক্ষু সিংহলে এক ঐতিহ্যশালী গৃহে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। যদিও এর কোনো ঐতিহাসিক ভিত্তি নেই তবু Gray দেখাতে চেয়েছেন যে, মহেন্দ্রের আগমনের বহু পূর্ব হতে সিংহলে বৌদ্ধধর্ম প্রচলিত ছিল।[১৫৬]

বিজয় সিংহ মৃত্যুর পূর্বে তাঁর কনিষ্ঠ সুমিত্রকে সিংহলের রাজত্ব গ্রহণের আহ্বন জানান। সুমিত্র তখন তাঁর পিতার স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন, তাই তাঁর কনিষ্ঠপুত্র পুণ্ডবাসুদেবকে প্রেরণ করেন। বাসুদেবের স্ত্রী ছিলেন শাক্যবংশীয় সুন্দরী রাজকুমারী ভদ্দকচ্চানা। তাঁর সঙ্গে কিছু শাক্যবংশীয় বন্ধু-বান্ধবীও এসেছিল, যারা প্রকৃতপক্ষে বৌদ্ধ ছিল।[১৫৭] বাসুদেব ও ভদ্দকচ্চানা এবং তাঁদের সহযাত্রীরা বৌদ্ধ হলেও তাঁরা সংখ্যায় নগন্য ছিলেন। বিজয় এবং তাঁর উত্তরাধিকারীরা সব ধর্মের প্রতি সমমর্যাদা পোষণ করতেন। সে সময়ে যক্ষদের মন্দিরে পূজা হত, ব্রাহ্মণদের জন্য হল নির্মিত হয়েছিল, অনুরাধপুরে অভয়গিরি নামক স্থানে তীর্থিকদের জন্য তীর্থারাম নির্মিত হয় রাজকীয় পৃষ্টপোষকতায়।[১৫৮] কিন্তু একটি বুদ্ধমন্দির বা বিহার নির্মাণের কোনো ঈঙ্গিত

www.pathagar.com

বংসসাহিত্যে পাওয়া যায় না। সম্ভবত মহেন্দ্রস্থবিরের মহত্ত্বকে প্রোজ্জ্বল করার জন্যই এরূপ কোনো বৌদ্ধ প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ করা হয়নি।[১৫৯]

পুণ্ডকাভয়রাজের পুত্র ছিলেন রাজা মুটসীব। মুটসীবের দ্বিতীয় পুত্র দেবপ্রিয়তিষ্য (দেবপিয়তিস্‌স) ছিলেন বহুগুণসম্পন্ন ও বুদ্ধিমান। মুটসীবের মৃত্যুর পর তিষ্য ৪০ বছর (খ্রি. পূ. ৩০৭-২৬৭) ধর্মত শ্রীলংকায় রাজত্ব করেন।[১৬০] দেবপ্রিয়তিষ্য ছিলেন মগধসাম্রাজ্যের শ্রেষ্ঠ সম্রাট মহামতি অশোকের সমসাময়িক। এই দুই নরপতি পরস্পর মূল্যবান উপঢৌকন বিনিময় করেন এবং পরস্পর গভীর বন্ধুত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হন।[১৬১] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, মহামতি অশোক ইতিপূর্বে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সদ্ধর্মের প্রচার ও প্রসারে ব্রতী হয়েছিলেন। তিনি দূতের মাধ্যমে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করার জন্য দেবপ্রিয়তিষ্যকে অনুরোধ করেন, তিনিও বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেন।[১৬২] এর ফলে অশোক-নন্দন মহেন্দ্র স্থবিরের সঙ্গীসহ সদ্ধর্ম প্রচারে শ্রীলংকায় গমন করার পথ সুগম হয়। অবশ্য মহাবংসের[১৬৩] অন্যত্র এবং রসবাহিনীর তিন ভ্রাতা মধু বণিকের গল্পে[১৬৪] কোনো উৎসবের দিনে দেবপ্রিয়তিষ্য চল্লিশ সহস্র সহচরসহ অনুরাধপুরের অনতিদূরে মিস্‌সক পর্বতের (বর্তমান অম্বট্‌ঠলস্থ মিহিনতলের) শিখরে মৃগয়া করার সময় মহেন্দ্র স্থবির সঙ্গীসহ অলৌকিকভাবে রাজাকে দর্শন দান করেন। রাজা মুগ্ধ হয়ে চল্লিশ সহস্র অনুচরসহ ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করেন। শ্রীলংকার মানুষ দলে দলে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে রাষ্ট্রধর্ম হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান করেন। পরবর্তী সময়ে অশোক-নন্দিনী সংঘমিত্রা বোধিবৃক্ষের দক্ষিণ দিকের একটি শাখা শ্রীলংকায় নিয়ে যান, এটা মহামেঘবনে রোপন করা হয়। এখনও এ বৃক্ষটি লক্ষ লক্ষ বৌদ্ধ জনসাধারণের পরম শ্রদ্ধার বস্তু। পরবর্তীকালে উক্ত বোধিবৃক্ষের চারা অনুরাধপুরের পার্শ্ববর্তীস্থানে উত্তরে তিবক্ক গ্রামে ও জম্বুকোলপট্টনে, কাজরগ্রামে (কটরগ্রাম) ও চন্দনগ্রামে রোপণ করা হয় এবং পুনরায় বত্রিশটি চারা সমগ্র সিংহলদ্বীপে বিতরণ করা হয়।[১৬৫] এভাবে বৌদ্ধধর্ম শ্রীলংকার সর্বত্র বিস্তার লাভ করে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষকতায়। শ্রীলংকায় বৌদ্ধাধর্ম প্রচার শ্রীলংকার ধর্ম, সাহিত্য, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গণে এক বিরাট প্রভাব প্রতিফলিত হয় যা শ্রীলংকার সামগ্রিক সভ্যতার ক্ষেত্রে এক উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রেখেছে।[১৬৬] একথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে, বিশ্বে থেরবাদ বৌদ্ধধর্মের বিকাশের ক্ষেত্রে শ্রীলংকার অবদান সবচেয়ে বেশি। উল্লেখযোগ্য পরিমাণ পণ্ডিত ব্যক্তির (বৌদ্ধভিক্ষু) জন্ম, বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য চর্চা ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে তাঁদের অবদান অনস্বীকার্য।[১৬৭] বলা যায় যে, দেবপ্রিয়তিষ্যরাজের সময়কালে (খ্রি. পূ. ১৬১-১৩৭) শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্মের গোড়াপত্তন হয়। G. P. Malalasekera- এর মন্তব্য এখানে উল্লেখযোগ্য, 'It was a period of unbroken peace, devoted entirely to the social and moral welfare of the country. The king had lived sufficiently long to see the accomplishment of the task upon his which he had whole heart- the permanent establishment of Buddhism as the national faith.[১৬৮]

দেবপ্রিয়তিষ্যের মৃত্যুর সময় শ্রীলংকার উত্তরে পিহিটি থেকে দক্ষিণে রোহণ পর্যন্ত প্রতিটি নগর, গ্রাম, বিহার সর্বত্র বৌদ্ধধর্মের প্রচার ও চর্চা হত। তন্মধ্যে কোনো কোনো

www.pathagar.com

বিহার বা পরিবেণ বৌদ্ধধর্মের প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে উঠেছিল।[১৬৯] সাধারণ জনগণ ধর্মত: সুখে জীবনযাপন করত।

তিষ্যের মৃত্যুর পর তাঁর ভ্রাতা উত্তিয় রাজ্যাভিষিক্ত হন। তাঁর রজত্বকালের অস্টমবর্ষে মহেন্দ্র স্থবির এবং নবমবর্ষে সঙ্ঘমিত্রা পরিনির্বাণ লাভ করেন। উত্তিয়ের পর মহাসিব ও পরে সূরতিষ্য রাজা হন। সূরতিষ্য বৌদ্ধধর্মে নিবেদিত প্রাণ ছিলেন। তিনি শ্রীলংকার বিভিন্ন স্থানে পাঁচশটি বিহার নির্মাণ করান। তাঁর রাজত্বকালে শ্রীলংকা তামিল আক্রমণকারীদের কর্তৃক আক্রান্ত হয়। তামিল আক্রমণকারীরা রাজাকে হত্যা করে[১৭০] এবং দেশের বৃহত্তর অংশে হত্যা ও নির্যাতন চালায় এবং এর সংস্কৃতি ও সভ্যতাকে ধ্বংস করে ফেলে। তামিলগণ নিজেদের সঙ্গে আনীত হিন্দুসভ্যতা বিস্তার করতে থাকে। তারা নির্বিচারে ভিক্ষু শ্রামণ ও সাধারণ মানুষকে হত্যা করে, সমস্ত সাহিত্য পুড়ে ফেলে, শিক্ষাকেন্দ্র ধ্বংস করে দেয়।[১৭১] এভাবে শ্রীলংকার প্রায় অংশে বিশৃংখলা ও অশান্তির দাবানল জ্বলতে থাকে। প্রায় পঁচিশ বছর কাল এভাবে চলার পর হঠাৎ চোলদেশিয় এলারের নেতৃত্বে এক বিশাল সশস্ত্র বাহিনী সিংহল আক্রমণ করে। তারা রাজাকে হত্যা করে এবং এলার শাসনভার গ্রহণ করেন। এলার দীর্ঘ চুয়াল্লিশ বছর দেশ শাসন করেছিলেন। এলার ব্যক্তিগতভাবে সুশাসক ছিলেন বটে, কিন্তু তাঁর অনুচরেরা ছিল নিষ্ঠুর, তারা বৌদ্ধদের ও বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক ক্ষতি করতে থাকে।[১৭২] যারা তামিলদের অত্যাচার সহ্য করতে পারে নাই কিংবা তামিলদের বশ্যতা স্বীকার করে নাই তারা সিংহলের দক্ষিণাংশে রোহণ জনপদে অবস্থান গ্রহণ করেন। সিংহলীদের রাজধানী রোহণ জনপদের মহাগ্রাম নামক স্থানে স্থাপন করা হয় এবং কাকবর্ণতিষ্যরাজ এ অঞ্চল শাসন করতে থাকেন।[১৭৩]

আলোচ্য রসবাহিনী গ্রন্থে কাকবর্ণতিষ্যরাজ ও তাঁর পুত্র দুট্ঠগামণি অভয়রাজের রাজত্বকালে তামিলদের সঙ্গে যে যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল তার উপর ভিত্তি করে বেশ কয়েকটি কাহিনী রয়েছে। এ কাহিনীগুলোতে কিছু কিছু অতিশয়োশক্তির বা বর্ণনার লালিত্য দৃষ্ট হলেও ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বলা যায়। গল্পকার গল্পই বলেছেন। এতদ্‌সত্ত্বেও যেহেতু ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গের দেশরক্ষা কিংবা যুদ্ধ-বিগ্রহ গল্পের বিষয়বস্তু এবং ঐতিহাসিক ব্যক্তিবর্গ এর মূল চরিত্র, কাজেই সঙ্গতভাবে সেই সময়কার রাজনৈতিক পরিবেশ ও পরিস্থিতি গল্পগুলোতে বিধৃত হয়েছে। বিশেষ করে কাকবর্ণতিষ্যরাজের সময়ে তামিলদের আক্রমণ, অত্যাচার, উৎপীড়ন, ভিক্ষুদের হত্যা, বিহার ধ্বংস ধর্মগ্রন্থ পুড়িয়ে ফেলা ইত্যাদি চরম আকার ধারণ করেছিল। এদিকে দেশপ্রেমিক সিংহলী যোদ্ধারা মহাগ্রামে সমবেত হতে লাগলেন। দশজন মহাযোদ্ধাসহ[১৭৪] বহু বীরযোদ্ধা এবং চতুরঙ্গ বাহিনী একত্রিত হলো। এরূপ মহাশক্তিশালী বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তিষ্যরাজ্য তামিল আক্রমণে সাহস করলেন না। অসম বীরসাহসী দুট্ঠামণি প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয়বার যুদ্ধযাত্রার অনুমতি প্রার্থনা করেও ব্যর্থ হলেন।[১৭৫] অতঃপর কুমার গামণি উপহাস করে পিতার নিকট স্ত্রী অলংকার প্রেরণ করে জানালেন, রাজা নিশ্চয়ই মহিলা, পুরুষ নহেন, তাঁকে এসব অলংকারে শোভা পাবে।[১৭৬] পুত্রবৎসল

www.pathagar.com

রাজা কাকবর্ণ আশংকিত ছিলেন যে, যুদ্ধে শক্তিশালী তামিলদের সঙ্গে হয়ত গামণির পক্ষে জয়লাভ করা অসম্ভব, কিংবা মৃত্যুও হতে পারে। তাই তিনি দুর্ধর্ষ তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধের অনুমতি দান করেননি। গল্পকারের বলার ভঙ্গি অতি স্বাভাবিক বলা যায়, কারণ কোনো পিতা পুত্রকে এরূপ ভয়ানক বিপদের মুখে ঠেলে দিতে চান না। কিন্তু দুট্‌ঠগামণির মাতা বিহারদেবী পুত্রের এরূপ বীরত্বপূর্ণ কার্যকলাপকে সমর্থন করতেন এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ দান করতেন। পিতা কাকবর্ণ তিষ্যের মৃত্যুর পর গামণি মাতৃদেবীর সঙ্গে পরামর্শ করে তামিলদের সঙ্গে যুদ্ধ অবতীর্ণ হন। গল্পে দুট্‌ঠগামণি একজন দক্ষ ও সাহসী বীর যোদ্ধা। তিনি একজন দক্ষ সেনানায়কও বটে। পিতা কাকবর্ণ অল্প বয়সে তাঁকে যুদ্ধবিদ্যাদি বিভিন্ন প্রকার শিক্ষায় সুশিক্ষিত করে গড়েছিলেন। পিতার মৃত্যুর পরপরই তিনি বিশাল পরাক্রমশালী সৈন্যবাহিনী ও দশজন সুদক্ষ সেনানায়কসহ তামিলদের দমন করার জন্য যুদ্ধ শুরু করেন। গল্পকার অতি চমৎকারভাবে যুদ্ধক্ষেত্রে সেনাধ্যক্ষদের রণকৌশলতার বিবরণ দিয়েছেন। গল্পের লক্ষ্যকে গতিশীল ও প্রাণবন্ত করার জন্য কিছু অবিশ্বাস্য রকমের ক্ষমতার বিবরণ থাকলেও মূল অভিষ্ট থেকে সরে পড়েননি। দুট্‌ঠগামণি স্বয়ং নিজহস্তে অসি নিয়ে তামিলরাজ এলারের সঙ্গে যুদ্ধ করেছেন। এলাররাজও রণকৌশলে দক্ষ, সমানে সমান মুখোমুখি যুদ্ধ। গামণির দশ মহাসেনাধ্যক্ষের নেতৃত্বে বিশাল সুদক্ষ বাহিনী তামিল সেনাদের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। তাদের প্রচণ্ড আক্রমণের মুখে তামিল সেনারা টিকে তাকতে পারল না, শত শত সেনা হতাহত হল। এলাররাজও দুট্‌ঠগামণির তরবারির আঘাতে মৃত্যুবরণ করলেন।[১৭৭] গল্পকথকের লেখায় এই ইতিহাস আশ্রয়ী গল্পটি অত্যন্ত প্রাণবন্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। পড়তে পড়তে মনে হবে যেন পাঠকের সামনেই এসব ভয়ঙ্কর যুদ্ধ সংঘটিত হচ্ছে।

শ্রীলংকার রাজনৈতিক ইতিহাসে এটা একটি উল্লেখযোগ্য বিজয়। তামিলদের দমনে উপরোল্লিখিত দশজন সেনানায়কদের নিয়েও গল্পকার পৃথক গল্প রচনা করেছেন। এসব গল্পে প্রত্যেক সেনানায়কের বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধের কাহিনী লেখক সহজ সরল ভাষায় বিবৃত করেছেন। বার বছরের নন্দিমিত্র একদা অনুরাধপুরে মামার বাড়ি গিয়ে তামিলদের কর্তৃক অত্যাচার ও বুদ্ধশাসনের ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি প্রত্যক্ষ করে দুট্‌ঠগামণির সঙ্গে তামিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন, নন্দিমিত্রের বীরত্বপূর্ণ কাহিনী লেখক অতি নিপুনভাবে গল্পে উপস্থাপন করেছেন।[১৭৮] অসম দৈহিক শক্তির অধিকারী সুরনির্মল অন্যতম সেনানায়ক হিসেবে তামিল দমনে রাজা গামণিকে সাহায্য করার বিবরণ স্বদেশপ্রীতির অনুরাগ জন্মায়।[১৭৯] অনুরূপভাবে মহাশক্তিধর মহাসোনও যুদ্ধে রণকৌশলতার পরিচয় দান করেন।[১৮০] দেশরক্ষার জন্য স্বেচ্ছাপ্রণোদিত গোঠইম্বরের যুদ্ধে অংশ গ্রহণ ও বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালনের কাহিনী দেশপ্রেমিকদের নিঃসন্দেহে উদ্বুদ্ধ করবে।[১৮১] থেরপুত্র অভয় দেশরক্ষার জন্য শ্রামণ্যধর্ম ত্যাগ করে যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করেন। গল্পকার এটার মাধ্যমে সাধারণ মানুষ থেকে ভিক্ষুশ্রামণ পর্যন্ত যে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ ছিলেন তা ব্যক্ত করার প্রয়াস পেয়েছেন।[১৮২] ভরণ নামক জনৈক শক্তিধর ব্যক্তিও যুদ্ধে অংশ গ্রহণ করে অপূর্ব দক্ষতার পরিচয় দান করেন।[১৮৩] অশ্ব পরিচালনায় সুনিপুণ

www.pathagar.com

বেলুসুমন কিভাবে তামিল সৈন্যদের দমনে রাজা দুট্ঠগামাণকে সাহায্য করেছিলেন তার প্রাণবন্ত বিবরণ দিয়েছেন গল্পকার।[১৮৪] খঞ্জদেব নামক সেনানায়ক তামিল দমনে যে বীরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন লেখক সযত্নে তা পাঠকসমাজে উপস্থাপন করেছেন।[১৮৫] ধনুর্বিদ্যায় পারঙ্গম অসম দৈহিক শক্তির অধিকারী ফুষ্যদেব দুট্ঠগামণি অভয়রাজের সঙ্গে তামিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে যে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছিলেন গল্পকারের লেখনীতে তা মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে।[১৮৬] অসিবিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন লভিয় বসভ। গামণিরাজের পক্ষে তামিল দমনে তাঁর অসি চালনার বিবরণ চমৎকার।[১৮৭] প্রবল দৈহিক শক্তির অধিকারী দাঠাসেন তামিলদের অত্যাচার উৎপীড়নের বিষয় অবগত হয়ে স্বেচ্ছাপ্রণোদিত হয়ে দেশরক্ষায় এগিয়ে আসেন। লেখকের তুলিতে দেশপ্রেমের অনুভূতি লক্ষনীয়।[১৮৮]

উল্লেখিত কাহিনীগুলো রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত। এ গল্পগুলোর মাধ্যমে প্রাচীন শ্রীলংকার রাজনৈকিত পরিস্থিতি বিশেষ করে কাকবর্ণতিষ্য ও তাঁর পুত্র দুট্ঠগামণি অভয়রাজ্যের (খ্রি. পূ. ২য় শতক) রাজত্বকালে দারুণ বিশৃংখলা, যুদ্ধ বিগ্রহের একটি সুস্পষ্ট চিত্র পাওয়া যায় যা ইতিহাসাশ্রয়ী মহাকাব্য মহাবংসেও উল্লেখ রয়েছে। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসবাহিনীর গল্পগুলোর মুখ্য উদ্দেশ্য গল্পের মাধ্যমে ধর্মরস পরিবেশন ও দানের মাহাত্ম্য প্রচার করা। কিন্তু উল্লিখিত গল্প কয়টিতে এছাড়াও প্রাধান্য পেয়েছে সদ্ধর্মকে রক্ষা ও সংরক্ষণ করার জন্য রাজন্যবর্গের প্রয়াস বর্ণনা। এসব বর্ণনা করতে গিয়ে সঙ্গতভাবেই তৎকালীন রাজনৈতিক পরিস্থিতির একটি রূপ পাঠকের কাছে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। তামিলদমনের পর দেশের পরিস্থিতি শান্ত ও স্বাভাবিক হয়ে আসে, সাধারণ মানুষ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলে। শ্রীলংকার ধর্মীয় ইতিহাসেও নবঅধ্যায়ের সূচনা ঘটে। ব্যাপকভাবে বুদ্ধচর্চা ও বিহার চৈত্য নির্মাণ আরম্ভ হয়।[১৮৯]

৩. পরিত্ত (পরিত্রাণ বা সুত্ত) দেশনার উৎপত্তি ও বিকাশ ঃ

বর্তমান থেরবাদী বৌদ্ধদের নিকট পরিত্ত (পরিত্রাণ বা সুত্ত) দেশনা একটি অতি জনপ্রিয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান। এ অনুষ্ঠানের ব্যাপক প্রচলন রয়েছে থেরবাদ বৌদ্ধসমাজে। তবে পরিত্তদেশানার উৎপত্তি কবে থেকে তা সঠিকভাবে জানা যায়নি। আমরা আলোচ্য অংশে পরিত্তদেশনার উৎপত্তি, বিকাশ, প্রক্রিয়া ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করার প্রয়াস পাচ্ছি।

ক. পরিত্ত দেশনার উৎপত্তি ও বিকাশ

পরিত্ত বা সুত্তের রচনার সূচনা সম্পর্কে আচার্য বেণীমাধব বড়ুয়া বলেন, "যখন কালক্রমে বৌদ্ধগৃহস্থ সমাজ গঠিত হয় সেই সময় হইতেই প্রচলিত হিন্দু বা আর্যগৃহ্য মন্ত্রের অনুকরণে পালি ও মিশ্রিত ভাষায় বৌদ্ধ পরিত্রাণসূত্রের রচনা আরম্ভ হয়।[১৯০] তিনি মনে করেন যে, পরিত্রাণসূত্রগুলো বৈদিকমন্ত্রের অনুকরণ বা রূপান্তর।[১৯১] বৌদ্ধধর্মের দুটো

দিক একটি লৌকিক বা জাগতিক অপরটি লোকোত্তর বা পরমার্থিক। পরিত্ত দেশনা লৌকিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। ত্রিপিটকের অন্তর্গত যেসকল সুত্ত বা পরিত্তকে আভ্যন্তরীণ প্রমাণে গুপ্তি, রক্ষা বা পরিত্রাণ নামে অভিহিত করা যেতে পারে এগুলো সংখ্যায় খুব স্বল্প। কিন্তু পিটক বর্হিভূত পরবর্তীকালের বৌদ্ধগ্রন্থে পরিত্রাণের সংখ্যা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছে, ত্রিপিটকের যে সকল সূত্র প্রকৃতপক্ষে নামের অযোগ্য সে সমস্ত সূত্রও কালক্রমে পরিত্রাণ, ধারণী অথবা মন্ত্রৌষধ হিসেবে পরিগণিত হয়েছে, ত্রিপিটকে পাওয়া যায় না এমন অনেকে জাতককথা, দেবারধনা এবং ত্রিরত্নের স্তুতি ও মহাত্ম্য অনেক পরবর্তীকালের রচনা বৌদ্ধ পরিত্রাণের সংখ্যা বর্ধিত করেছে, সাথে সাথে সনাতন হিন্দু বা আর্যভাবাপন্ন গৃহস্থের কৃতাকৃতকর্মের অনুকরণে বাহ্য প্রক্রিয়া এবং দেবদেবীর পুজার্চ্চনা লৌকিক বৌদ্ধধর্মে স্থান লাভ করেছে।[১৯২] এর ফলে পরবর্তী পালি সাহিত্যে পরিত্ত-সঙ্গহ এবং বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্যে অসংখ্য ধারণী সংগ্রহ রচিত হয়েছে। নীতিপ্রধান বৌদ্ধধর্মে ক্রমান্বয়ে ভক্তিবাদ প্রবেশ করে এবং পর্যায়ক্রমে এটা একটি মন্ত্রবাদ, দেববাদ ও নামবাদে পর্যবসিত হয়। বস্তুতপক্ষে নীতিবাদ ক্রমান্বয়ে পশ্চাতে সরে মন্ত্রপাঠ, পূজার্চ্চনা প্রভৃতি তান্ত্রিকতা ও আনুষ্ঠানিকতা সামনে এসে সনাতন হিন্দু বা আর্য-গৃহ্য ধর্মের সঙ্গে সামঞ্জস্য ও সমতা আনয়ন করতে গিয়ে এত মন্ত্র-তন্ত্র, দেবদেবীর পূজার্চ্চনা ও বিভিন্ন প্রকার মিথ্যাদৃষ্টি বৌদ্ধ-সাহিত্য তথা লৌকিক বৌদ্ধধর্মে স্থান পেয়েছে, চণ্ডীপাঠ ও পরিত্রাণ-পাঠ আপাতদৃষ্টিতে সমান হয়ে পড়েছে, অলক্ষিতে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ শ্রমণবেশে ব্রাহ্মণ হয়ে পড়েছেন।[১৯৩]

খ্রি. পূ. প্রথম শতকে রচিত[১৯৪] মিলিন্দপ্রশ্ন নামক সুপ্রসিদ্ধ গ্রন্থে পরিত্রাণপাঠ সম্পর্কে একটি মনোজ্ঞ আলোচনা আছে। এখানে পরিত্ত-সুত্র হিসেবে রতন সুত্ত, করণীয় মেত্তাসুত্ত, খন্ধ পরিত্ত, মোর পরিত্ত, ধজাগ্গ পরিত্ত, আটানাটিয় পরিত্ত, অঙ্গুলিমাল পরিত্ত প্রভৃতির নামোল্লেখ রয়েছে।[১৯৫] রাজা মিলিন্দের প্রশ্নের উত্তরে ভদন্ত নাগসেন পরিত্তদেশনা বা পরিত্রাণ আবৃত্তির উপযোগিতা, প্রয়োজনীয়তা ও কার্যকারিতা সম্পর্কে যুক্তিসঙ্গত ব্যাখ্যা ও অভিমত প্রদান করেছেন। মিলিন্দ প্রশ্নে বলা হয়েছে, "That by the power of the Parittas the snake stops biting the thief or dacoit atonce leaves the place without doing any harm, a musty elephant becomes pacified, conflagration becomes extinguished, poison becomes ineffective the murderer become subdued instantly."[১৯৬]

খ্রি. পূ. ৩য় ও ৪র্থ শতকে রচিত ১৯৭ ত্রিপিটকান্তর্গত বিখ্যাত কাব্যগ্রন্থ ধর্মপদে উপদেশ দেওয়া হয়েছে, ভয়ে সন্ত্রস্ত মনুষ্যগণ বন, পর্বত, উদ্যান, বৃক্ষ, চৈত্য, প্রভৃতি বহুবিধ আশ্রয় গ্রহণ করে, কিন্তু এসব শরণ নিরাপদ কিংবা উত্তম নহে, এরূপ আশ্রয় গ্রহণে কেউ সমস্ত দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে পারে না। যিনি বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘের শরণ গ্রহণ করেন, দুঃখ, দুঃখসমুদয়, দুঃখ-নিরোধ, দুঃখ-নিরোধকারক আর্য অষ্টাঙ্গিক মার্গ– এই চতুরার্যসত্য প্রজ্ঞা দ্বারা সম্যকরূপে দর্শন করেন, তাঁর পক্ষে এসব শরণ-জ্ঞানই নিরাপদ,

www.pathagar.com

ক্ষেমংকর এবং শ্রেষ্ঠ আশ্রয়। কারণ এই শরণ গ্রহণ করেই যাবতীয় দুঃখ থেকে মুক্তি লাভ সম্ভব।[১৯৮] যথাসময়ে ধর্ম যাচ্না এবং ধর্ম শ্রবণ করা শ্রেষ্ঠ মঙ্গল রূপে বুদ্ধ উল্লেখ করেছেন।[১৯৯]

পরিত্রাণ-সূত্রের উৎপত্তি সম্পর্কে ডঃ বি.এম. বড়ুয়া বলেছেন, "বৌদ্ধসাহিত্যে পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব ও সমাবেশ বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পরবর্তী, অনূন্য একশত বৎসর পরবর্তী। মিলিন্দ প্রশ্নে যে সকল সূত্র স্পষ্টতঃ পরিত্রাণ নামে অভিহিত হইয়াছে উহাদের একটিও বুদ্ধের পরিনির্বাণের একশত বৎসর পূর্ববর্তী বৌদ্ধগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়।"[২০০] এখানে উল্লেখ্য যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের একশ বছরের পরবর্তী সময়ে কোনো বৌদ্ধগ্রন্থ রচিত হবার কোনো নির্ভরযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায়নি। বলা হয়ে থাকে যে, বুদ্ধের মহাপরিনির্বানের পর সমগ্র বুদ্ধবচন (ত্রিপিটক) প্রখর স্মৃতিধর স্থবিরগণ শিষ্য পরম্পরা স্মৃতিতে ধারণ করে রাখতেন। এ প্রক্রিয়া অন্তত ত্রিপিটক সংকলিত হওয়ার সময়কাল পর্যন্ত চলেছিল। বর্তমানে পরিত্রাণ সূত্র হিসেবে পঠিত সবকটি পরিত্ত বা সুত্তই সংকলিত পিটকগ্রন্থে কিংবা জাতকট্ঠকথায় দৃষ্টি হয়। তাই ড. সুকোমল চৌধুরী যথার্থই বলেছেন, "Parittas are nothing but some Pali suttas collected from various canonical texts and Jataka commentaries. So Parittas are Buddha-vecana ('Words of Buddha')[২০১]

কেননা পিটককান্তর্গত বাণীসমূহ বুদ্ধবচন রূপে স্বীকৃত। কাজেই পরিত্তসমূহ ও বুদ্ধবচন।

পরমত্থজ্যোতিকা, পরমত্থদীপনী, জাতকট্ঠকতা প্রভৃতি ভাষ্যগ্রন্থে পরিত্তদেশনায় পঠিত সুত্তসমূহের উৎপত্তির বিবরণে জ্ঞাত হওয়া যায় যে, বুদ্ধ স্বয়ং সুত্তসমূহ দেশনা করেছেন কিংবা প্রয়োজনবোধে দেশনা বা আবৃত্তি করার জন্য তাঁর শিষ্যদের নির্দেশ দিয়েছেন। প্রতিটি সুত্তদেশনার পিছনে এক বা একাধিক অলৌকিক ঘটনা রয়েছে। যেমন, বৈশালীতে 'রতন সুত্ত' দেশনার ফলে অনাবৃষ্টি, দুর্ভিক্ষ ও অমনুষ্যের উপদ্রব থেকে বজ্জিগণ রক্ষা প্রাপ্ত হন। 'করণীয় মেত্তাসুত্ত' আবৃত্তির ফলে যক্ষের উপদ্রব নিরসন হয়েছিল এবং ভিক্ষুগণ সমাহিতচিত্তে সাধনায় আত্মনিয়োগ করতে সক্ষম হন। এ অধ্যায়ের শেষাংশে পরিত্ত দেপনায় পঠিত সুত্তসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণে উৎপত্তি ও কার্যকারিতা সম্পর্কে আলোকপাত করা হয়েছে।

বৌদ্ধরা বিশ্বাস করে যে বুদ্ধের প্রতিটি বাণী অত্যন্ত প্রয়োজনীয় এবং যথার্থ ফলদায়ক। পূর্ণ মনোযোগ সহকারে যদি পাঠক পরিত্তদেশনা করেন এবং শ্রোতাগণ অনন্যমনে শ্রবণ করেন তাহলে নিশ্চয়ই আশানুরূপ ফল প্রাপ্ত হবে। অর্থ হৃদয়ঙ্গম করতে পারলে এর ফল আরও কার্যকর হবে।[২০২] কারণ বৌদ্ধদের বিশ্বাস– ত্রিপিটকের বাণীসমূহ বুদ্ধ-বচন। বুদ্ধ এবং বুদ্ধশিষ্যদের বহু অলৌকিক (Miracles) ঘটনা বা কাহিনী বৌদ্ধসাহিত্যে বর্ণিত হয়েছে। বলা হয়েছে–

"এবং অচিন্তিয়া বুদ্ধ বুদ্ধধর্ম্মা অচিন্তিয়া,
অচিন্তিয়েসু পসন্নানং পিপাকো হোতি অচিন্তিয়ো।"[২০৩]

www.pathagar.com

জিনপঞ্জরগাথার[২০৪] উৎপত্তির বিবরণে জানা যায়- কোনো ব্রাহ্মণ সস্ত্রীক একমাত্র পুত্রসন্তানসহ একসময় বুদ্ধের নিকট উপস্থিত হয়ে বুদ্ধকে বন্দনা করেন। বুদ্ধ ব্রাহ্মণ ও তাঁর স্ত্রীকে আর্শীবাদ করলেন কিন্তু পুত্রটিকে আর্শীবাদ করলেন না। বুদ্ধ বললেন, "এক সপ্তাহের মধ্যে ছেলের মৃত্যু হবে।" ব্রাহ্মণ সন্তানের জীবন রক্ষার জন্য বুদ্ধের নিকট কাতর প্রার্থনা করলেন। বুদ্ধ বললেন, "তুমি তোমার গৃহপ্রাঙ্গণে একটি সুসজ্জিত মণ্ডপ নির্মাণ করে ১৬ জন ভিক্ষুর জন্য আসন সজ্জিত কর, তারপর ভিক্ষুদিগকে আহ্বান করে পরিত্রাণ পাঠ করাও।" বুদ্ধের আদেশ অনুযায়ী ব্রাহ্মণ সব ব্যবস্থা করে ১৬ জন ভিক্ষু নিমন্ত্রণ করে সপ্তাহব্যাপী পরিত্রাণ পাঠ করালেন, সপ্তাহ পর স্বয়ং বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বাড়িতে পদার্পণ করে সারারাত জিনপঞ্জরগাথা ও অন্যান্য সূত্র পাঠ করলেন। অষ্টমদিনে ছেলেটি বুদ্ধকে বন্দনা করলে বুদ্ধ আর্শীবাদ করলেন, "দীর্ঘায়ু হও"। বুদ্ধ বললেন, তার আয়ুষ্কাল হবে একশ বিশ বছর। তাই তার নাম হলো দীর্ঘায়ুকুমার।

এসব ঘটনা থেকে স্পষ্টত প্রমাণিত হয় যে পরিত্তদেশনার উৎপত্তি বুদ্ধের সময়কাল থেকে এবং এর প্রধান স্রষ্টা স্বয়ং তথাগত বুদ্ধ। বুদ্ধের সময়কালে হয়ত পরিত্ত দেশনার ব্যাপক প্রচলন হয়নি। বৌদ্ধ সমাজ যখন ক্রমান্বয়ে সুসংগঠিত হয়ে উঠে তখন পাশাপাশি হিন্দুধর্মের অনুকরণে হয়ত অন্যান্য ধর্মীয় অনুষ্ঠানের মত পরিত্তদেশনা অনুষ্ঠানেরও ব্যাপক প্রচলন শুরু হয়। আমরা পূর্বেও উল্লেখ করেছি যে, বৌদ্ধধর্মের দুটি দিক, ব্যবহারিক বা লৌকিক এবং পরমার্থিক বা লোকোত্তর। পরিত্তদেশনা ব্যবহারিক বৌদ্ধধর্মের সঙ্গে সম্পৃক্ত। উপরোক্ত আলোচনার প্রেক্ষিতে সঙ্গতভাবে বলা যায় যে, পরিত্তদেশনার উৎপত্তি বুদ্ধের জীবদ্দশায় এবং তাঁর প্রত্যক্ষ নির্দেশ ও তত্ত্বাবধানে। তবে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের প্রায় শতবর্ষ পরে বৌদ্ধ সমাজ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এর পরিপূর্ণ বিকাশ লাভ ঘটে।

খ.'পরিত্ত' শব্দের অর্থ

পালি 'পরিত্ত' শব্দের সংস্কৃত রূপ 'পরিত্র' বা 'পরিত্রাণ' যার অর্থ সংরক্ষণ বা নিরাপত্তা। পরিত্ত বা সুত্ত সমার্থকবোধক শব্দ। বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্ত বা সুত্তের অর্থ করা হয়েছে যে কল্যাণময় মন্ত্রের প্রভাবে মানুষ চতুর্দিকের নানাবিধ বিঘ্ন বিপত্তি, রোগ, ভয়, অন্তরায় ইত্যাদি সকল প্রকার দুঃখ হতে ত্রাণ বা রক্ষা পেতে পারে তাই পরিত্ত (পরিত্রাণ) বা সুত্ত (সূত্র)।[২০৫]

আত্মার্থ পরার্থাদি ভেদে লৌকিক লোকাত্তর অর্থের সূচনা করে বলে সূত্র। শ্রোতাদের অভিপ্রায় অনুসারে সুষ্ঠু উক্ত বলে বলে সূত্র। বপিত শষ্যের ন্যায় শ্রবণে সুফল প্রসুত হয় বলে সূত্র।[২০৬] অতএব, পরিত্ত বলতে বুদ্ধ-ভাষিত সুত্ত-রূপ মন্ত্রৌষধের প্রভাবে মানুষের যাবতীয় দুঃখ, ভয়, উপদ্রব, রোগ ইত্যাদি থেকে উপশম কারক সূত্র দেশনা বোঝায়।

ভারত (জম্বুদ্বীপ) ও শ্রীলংকায় বিশেষ করে থেরবাদ বৌদ্ধদেশে পরিত্তদেশনার আনুষ্ঠানিকতায় কিছু ভিন্নতা থাকলেও মূল উদ্দেশ্য-আদর্শ এবং সুত্তদেশনা ও শ্রবণ পদ্ধতি

www.pathagar.com

প্রায় একই রকম। ভারতীয় থেরবাদী বৌদ্ধরা পরিত্ত অনুষ্ঠানকে সাধারণত ফারিক বলে। ফারিক শব্দটি কর্মী ফরা (বুদ্ধ) হতে উদ্ভুত বলে মনে করা হয়।[২০৭] ইহা ছাড়া এ অনুষ্ঠানকে 'মঙ্গলসূত্র' বা 'সূত্রপাঠ' নামেও অভিহিত করা হয়ে থাকে। শ্রীলংকায় পরিত্ত শব্দটি পিরিত বা পিরিথ হয়েছে।[২০৮] থেরবাদী বৌদ্ধদের কাছে পরিত্তদেশনা অনুষ্ঠান একটি অতি জনপ্রিয় ধর্মীয় উৎসব হিসেবে বিবেচ্য।

পরিত্ত দেশনার প্রক্রিয়া

পরিত্তদেশনা সাধারণত ব্যক্তিগতভাবে কোনো পরিবারে অনুষ্ঠিত হয়। পরিত্ত শ্রবণকারীর গৃহ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে একটি ছোট মণ্ডপ প্রস্তুত করা হয়। মণ্ডপে এক বা একাধিক আমন্ত্রিত ভিক্ষুর জন্য আসন প্রজ্ঞাপ্ত করে সম্মুখে পূর্ণকুম্ভে কদলিপত্র, অশ্বত্থ বৃক্ষের ও আম্রবৃক্ষের পল্লব ইত্যাদি সহ 'মঙ্গলঘট' সজ্জিত করা হয়। একটি থালায় চাল, নারকেল, কদলি ইত্যাদি দিয়ে একটি থারাপঁই বা ধর্মপূজারও আয়োজন করা হয়। আমন্ত্রিত ভিক্ষুগণ নির্ধারিত আসনে উপবেশন করলে পরিবারস্থ সদস্য, আত্মীয়-পরিজন ও পাড়া-প্রতিবেশীরা তাঁদের সম্মুখে মুখোমুখি সংযতভাবে করজোড়ে উপবেশন করে। একটি সাদা সুতো (পিরিত নূল) ঘটের গলদেশ পরিবৃত করে সমাগত জনগণের চতুর্দিকে অথবা গৃহের চতুর্দিকে পরিমণ্ডল করে পরিত্তদেশক ভিক্ষুর হাতে দেওয়া হয়। অনন্তর ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণান্তে পরিত্তদেশনার জন্য প্রার্থনা করা হয়, 'সর্বধিক বিঘ্ন বিপত্তি দূরীভূত হবার জন্য, সকল প্রকার সম্পত্তিলাভের জন্য সর্ববিধ দুঃখ, ভয়, রোগ বিনাশ হবার জন্য মঙ্গলময় পরিত্রাণ পাঠ করুন।[২০৯] অনন্তর ভিক্ষু সরল ব্যাখ্যান্তে পরিত্তদেশনা আরম্ভ করেন। প্রয়োজনীয় পরিত্তদেশনা সমাপ্ত হলে পূর্ণঘট থেকে জল চতুর্দিকে ছিটিয়ে দেওয়া হয় এবং শ্রোতাদের হাতে অথবা গলায় সুতো ছিঁড়ে বেঁধে দেওয়া হয়।[২১০] গ্রামবাসী সম্মিলিতভাবে স্থানীয় বিহারেও এই প্রকার পরিত্তদেশনা অনুষ্ঠানের আয়োজন করে।

শ্রীলংকায় মহাপিরিত নামে এক প্রকার পরিত্তদেশনা অনুষ্ঠান করা হয়। এ প্রকার পরিত্ত নূনতম ৮, ১০, ১২ জন ভিক্ষু একদিন দেশনা করেন। এটা দেশনার জন্য পরিত্তমণ্ডপ (পিরিত মণ্ডপের) নির্মাণ করা হয় এবং মণ্ডপ সুসজ্জিত করা হয়। পরিত্তদেশনাকারী ভিক্ষুদের জন্য যুগল চেয়ার দেওয়া হয়, ভিক্ষুগণ পূর্ব অথবা উত্তরমুখী হয়ে উপবেশন করেন। অন্যভিক্ষুদের জন্য আসনের ব্যবস্থা থাকে। পিরিতমণ্ডপের উপরে সাদা চাঁদোয়া টাঙানো হয়। মণ্ডপের চারদিকে নারকেল তৈলের বাতি ও জলপূর্ণ ঘট সন্নিবেশ করা হয়। মণ্ডপের বাইরে চারদিকে জনসাধারণ মাদুরে উপবেশন করে। তখন ঢাক বাজিয়ে অনুষ্ঠানের ঘোষণা দেওয়া হয়। অতঃপর একজন ব্যক্তি মাটির কলসি জলপূর্ণ করে মণ্ডপে রাখেন। একজন বুদ্ধের ধতুপাত্র মাথায় করে বাদ্য বাজনা সহকারে এনে মণ্ডপের ভিতরে রাখেন। সেই সময় ভিক্ষুগণও তাদের সঙ্গে এসে মণ্ডপে প্রজ্ঞাপ্ত আসনে উপবেশন করেন। এখানে ধাতু বুদ্ধের, পিরিত পোত' (পরিত্ত) ধর্মের এবং আবৃত্তিকারী

www.pathagar.com

সঙ্ঘের প্রতিনিধিত্ব করেন।[২১১] এখানে ত্রিরত্নের সমন্বয় ঘটে। অনুষ্ঠানের প্রারম্ভে ভিক্ষুগণ স্বাগত আহ্বান জানান। অনন্তর ভিক্ষুগণ সুবাসিত জলে হাত ধৌত করে শুষ্ক চালের গুঁড়ো ছিটিয়ে দেন। দেবতা আমন্ত্রণের পর এই অনুষ্ঠানের তাৎপর্য ব্যাখ্যা করে দেশনা করা হয়। পরিত্তদেশনার ন্যায় (মঙ্গলসূত্র বা পিরিত) এই অনুষ্ঠানেও দেবতা আমন্ত্রণ করে সুত্ত আবৃত্তি শুরু হয়। মহাপিরিত বা মহামঙ্গল সুত্ত দেশনা সন্ধ্যায় আরম্ভ করে পরদিন সকালে সমাপ্ত করা হয়। এই প্রকার পরিত্তদেশনার জন্য অতি সুশোভিত ও সুসজ্জিত অস্থায়ী মণ্ডপ তৈরি করা হয় ; আবার কোনো কোনো বিহারে স্থায়ী মণ্ডপ থাকে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পরিত্তদেশনা সপ্তাহকাল পর্যন্ত বিরামহীনভাবে চলতে থাকে। আটানাটিয় সুত্তের আবৃত্তির পর পরিত্তদেশনা সমাপ্ত হয়।[২১২]

ঘ. রসবাহিনীতে বর্ণিত পরিত্রাণ দেশনার ফল

ত্রিপিটকান্তর্গত ও ত্রিপিটক বর্হিভূত বৌদ্ধসাহিত্যে প্রচুর পরিমাণ গল্প-কাহিনী দৃষ্ট হয় যে, ত্রিরত্নের শরণাপন্ন কিংবা পরিত্ত শ্রবণকারী নিশ্চিত বিপদ হতে অলৌকিকভাবে অব্যাহতি প্রাপ্ত হয়েছেন। এমনকি তির্যক প্রাণী পর্যন্ত পরিত্রাণের প্রভাবে মুক্তি লাভে সক্ষম হয়েছে। রসবাহিনীতেও এরূপ বেশ কয়েকটি অতি চমৎকার কাহিনী রয়েছে। কোনো এক ঘরসর্প চোখে আঘাতপ্রাপ্ত হয়ে যন্ত্রণায় ছটফট করার সময় ধর্মদিন্ন নামে জনৈক স্থবির সাপের প্রতি দয়াপরবশ হয়ে মহাসতিপট্‌ঠান সূত্র দেশনা করেন। সর্প একাগ্র মনে সূত্রের স্বরের প্রতি প্রসন্নচিত্ত উৎপাদন করে এবং মৃত্যুর পর দুট্‌ঠগামণি রাজ্যের এক অমাত্যের পুত্ররূপে জন্মগ্রহণ করে বহু বিভবের অধিকারী হয়।[২১৩] তাম্রপর্ণিদ্বীপের কম্বলাতিষ্য পর্বতে পাঁচশ বাদুড় নিকটস্থ বিহারের কোনো ভিক্ষুর মহাসতিপট্‌ঠান সূত্রের আবৃত্তি শ্রবণ করে মুক্তি লাভ করেছিল।[২১৪]

কোসাম্বীরাজের মহিষী বিশ্বামিত্রা ত্রিরত্নের শরণাপন্না। কোনো এক যুগে কোসাম্পবীরাজ নিহত হলে বিজয়ীরাজা বিশ্বামিত্রাকে স্বীয় রাণী করার ইচ্ছা ব্যক্ত করেন। সতী-সাধ্বী রাণী অস্বীকৃতি জানালে রাজা ক্রুদ্ধ হয়ে তাঁকে জ্বলন্ত অঙ্গারে নিক্ষেপ করেন। রাণী ত্রিরত্নের প্রভাবে অগ্নিদগ্ধ হননি।[২১৫] শরণস্থবির মাতৃগর্ভে থাকাকালে তাঁর মাতা ভাই কর্তৃক আক্রান্ত হন। গভীর অরণ্যে ভ্রাতা বোনকে হত্যা করতে উদ্যত হলে তিনি মৈত্রীচিত্তে বুদ্ধের শরণ গ্রহণ করে জীবনে বেঁচে যান।[১১৬] জনৈক যক্ষ আশ্রিত ব্যক্তি ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ করে কিভাবে যক্ষের হাত হতে রক্ষা পেয়েছে তার লোমহর্ষ কাহিনী বিবৃত হয়েছে যক্ষবঞ্চিত কাহিনীতে।[২১৭] নন্দিবণিক সস্ত্রীক ত্রিরত্নে শ্রদ্ধাশীল। বণিক দূরদেশে বাণিজ্যে গমন করলে কোনো রাজকর্মচারী সুন্দরী বণিক-পত্নীকে হরণ করার জন্য ভৌতিক প্রক্রিয়ার সাহায্যে বণিককে হত্যা করতে চাইলে ত্রিশরণে শরণাগত বণিক কিভাবে বেঁচে গিয়েছিলেন এবং উক্ত দুশ্চরিত্র রাজকর্মচারীর করুণ মৃত্যু হয়েছিল তার মনোরম কাহিনী পাঠকের অন্তর শ্রদ্ধায় আপ্লুত হয়ে উঠে।[২১৮] শরণাগত উত্তর শ্রামণকে মিথ্যা চুরির অভিযোগে শূলে দেওয়া হলে স্বয়ং মহাকারুণিক বুদ্ধ উপস্থিত হয়ে তাঁকে

www.pathagar.com

ধর্মোপদেশ প্রদান করেন এবং উত্তর শ্রামণের অর্হত্ত্বপ্রাপ্ত হয়ে মুক্তিলাভে সক্ষম হন।[২১৯] কোনো ব্যাধ বুদ্ধকর্তৃক দেশিত ধর্মশ্রবণ করেছিল বলে কোনো সময় সমুদ্রক্রীড়া করতে গিয়ে ব্যাধ নাগরাজ কর্তৃক আক্রান্ত হলে সে ধর্ম শ্রবণের বিষয় স্মরণ করে মুক্তি লাভ করে।[২২০] অনুরূপভাবে হেমাসুন্দরীও ধর্মচক্র প্রবর্তন সূত্র প্রকাশের ফলে নাগরাজের সাহায্য লাভে সক্ষম হয়।[২২১] ধর্ম (সুত্ত) শ্রবণরতা অনিন্দ্যরূপসী কাঞ্চনদেবীর প্রতি আসক্ত হয়ে কোনো নাগরাজ তাকে কুণ্ডলাকারে বেষ্টিত করে কাঞ্চনদেবী ধর্মস্মরণ করলে সত্যক্রিয়ার প্রভাবে নাগরাজের বন্ধন হতে মুক্তি লাভ করে।[২২২] কোন মিথ্যাদৃষ্টি সম্পন্ন সাপুড়ে অবহেলাচ্ছলে 'নমো বুদ্ধায়' বলে সর্পের আক্রমণ হতে রক্ষা পাবার কাহিনী বিবৃত হয়েছে অহিগুণ্ঠিক কথায়।[২২৩] জনৈক মহিলা বালকপুত্রসহ ধর্ম শ্রবণ করার সময় বালকপুত্রকে সর্পদংশন করে, ধর্মদেশনা শেষে সত্যক্রিয়া করে মহিলা পুত্রকে সুস্থ করার কাহিনী অতি চমৎকার।[২২৪] অনুরূপভাবে জনৈক ভিক্ষুও ধর্ম শ্রবণ করার সময় সর্প দংশিত হলে সত্যক্রিয়ার দ্বারা বিষমুক্ত হন ।[২২৫] ধর্মের এরূপ অলৌকিক শক্তি নিঃসন্দেহে লৌকিক বৌদ্ধধর্মকে সমৃদ্ধ করেছে। রসবাহিনী তথা অন্যান্য বৌদ্ধ সাহিত্যের অনুরূপ হাজারো কাহিনী প্রমাণ করে যে, বুদ্ধের সময়কাল হতে আরম্ভ করে বর্তমান অবধি বৌদ্ধধর্মের অনুসারীদের মধ্যে ত্রিরত্নের শরণ গ্রহণ ও ধর্ম (সুত্ত) শ্রবণের মাধ্যমে বেশি মঙ্গল সাধন সম্ভব- এরূপ দৃঢ় বিশ্বাস বদ্ধমুল হয়ে গড়ে উঠেছে। ফলে থেরবাদী বৌদ্ধদের মধ্যে পরিত্তদেশনা একটি জনপ্রিয় ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে পরিগণিত হয়েছে।

ঙ. পরিত্রাণ দেশনায় দেশিত সুত্তসমূহ

পরিত্রাণ সূত্রগুলোতে ত্রিরত্নের গুণ ও মাহাত্ম্য বর্ণিত হয়েছে। নানাবিধ ভয়, দুঃখ, অশান্তি, উপদ্রব, রোগ, শোক, অন্তরায় নিবারণ ও সর্ববিধ মঙ্গল-বিধানের জন্য পরিত্রাণসূএগুলো পঠিত হয়।[২২৬] প্রত্যেক সূত্রপাঠ শেসে পরিত্রাণ পাঠক সত্যবাক্যের প্রভাবে নিজের এবং অপরের মঙ্গল কামনা করেন।[২২৭] পরিত্রাণসূত্র অনুষ্ঠান করার সময় সাধারণত সূত্র শ্রবণকারীরা গৃহে কিংবা নির্ধারিত স্থানে সুসজ্জিত মঙ্গলঘট স্থাপন করে এক বা একাধিক পরিত্রাণ সূত্র পাঠক ভিক্ষুকে আমন্ত্রণ করেন। ভিক্ষু নির্ধারিত আসনে উপবেশন করলে শ্রবণকারীরা ত্রিশরণসহ পঞ্চশীল গ্রহণান্তে ভিক্ষুর নিকট সকল প্রকার দুঃখ উপশমকারক ও সর্বপ্রকার মঙ্গলকর পরিত্তসুত্ত দেশনা করার জন্য প্রার্থনা করেন। অতঃপর ভিক্ষু পরিত্তদেশনার প্রারম্ভে পৃথিবীস্থ সুমেরু ও অন্তরীক্ষবাসী, আকাশবাসী, সংক্ষেপে দশসহস্রচক্রবালবাসী বৌদ্ধধর্মানুরাগী দেবতাগণকে নির্দিষ্টস্থানে সমাগত হয়ে ধর্মশ্রবণ, ধর্মসভা ও ধর্মোৎসবের রক্ষণাবেক্ষণ, মনুষ্যজাতির প্রতি মৈত্রীভাব পোষণ ও করুণা বিতরণের জন্য সাদরে আহ্বান করা হয়।[২২৮] অনন্তর সূত্রপাঠক একাগ্রচিত্ত হয়ে সুর ছন্দে পরিশুদ্ধ উচ্চারণ সহযোগে পরিত্তসুত্ত আবৃত্তি আরম্ভ করেন। সাধারণত নিম্নলিখিত সুত্তসমূহ পরিত্রাণ সূত্র হিসেবে পঠিত হয়।

১। মঙ্গল সুত্ত- এটা খুদ্দক নিকায়ের খুদ্দকপাঠের অন্তর্গত, সামগ্রিক কল্যাণ কামনায় সাধারণত এ সূত্র পঠিত হয়। বুদ্ধ শ্রাবস্তীর জেতবন বিহারে অবস্থানকালে জনৈক

দেবপুত্র কর্তৃক দেব মনুষ্যগণের মঙ্গলের উপায়সমূহ জিজ্ঞাসিত হলে তিনি আটত্রিশ প্রকার মঙ্গলবিষয় ব্যক্ত করেন।

২। রতন সুত্ত– এটা পালি সুত্তপিটকের অন্তর্গত খুদ্দকপাঠ ও সুত্তনিপাতের সুত্ত। এই সুত্ত সাধারণত রোগ, দুর্ভিক্ষ, অমনুষ্য উপদ্রব ও মহামারী হতে রক্ষা পাবার জন্য পঠিত হয়। বুদ্ধের সময়কালে সমৃদ্ধশালী বৈশালীতে এক সময় অনাবৃষ্টির কারণে দুর্ভিক্ষ, নানাবিধ রোগ ও মহামারীর উদ্ভব হলে বহুলোক অকালমৃত্যু বরণ করে, ফলে অমনুষ্যভয়ের সৃষ্টি হয়। বৈশালীবাসী কর্তৃক আমন্ত্রিত হয়ে তথাগতবুদ্ধ সশিস্য তথায় উপগত হন এবং বুদ্ধের নির্দেশক্রমে আনন্দ পাত্র হতে জল সিঞ্চন করতে করতে রতন সুত্ত পাঠ করেন, সঙ্গে সঙ্গে মুষলধারায় বৃষ্টি বর্ষিত হয়ে বৈশালী অনাবৃষ্টি আদি উপদ্রব হতে রক্ষা প্রাপ্ত হয়।

৩। করণীয়মেত্তা সুত্ত– সাধারণত অমনুষ্যের উপদ্রব নিরসনে পঠিত। এটাও পালি খুদ্দক পাঠ এবং সুত্তনিপাত গ্রন্থের অন্তর্গত। কোনো এক সময় পাঁচশ ভিক্ষু হিমালয়ের পার্শ্বে বর্ষাব্রত পালনকালে সেখানকার বৃক্ষদেবতারা বীভৎস রূপ ধারণ করে তাঁদিগকে ভয় প্রদর্শন ও বিভিন্নভাবে উৎপীড়ণ করতে থাকলে ভিক্ষুগণ ভীত হয়ে বুদ্ধের নিকট উপনীত হন এবং সমস্ত বিষয় বুদ্ধকে অবহিত করেন। বুদ্ধ তাঁদেরকে করণীয় মেত্তা সুত্ত শিক্ষা দিয়ে নির্দেশ দিলেন, 'ভিক্ষুগণ তোমরা পুনরায় সেখানে গমন করে এই সুত্ত পাঠ করবে, এতে তোমরা যক্ষভয় হতে মুক্ত হবে এবং তোমাদের কর্মস্থানও হবে।'

৪। সুপুব্বণ্হ সুত্ত– এ সুত্তটি অঙ্গুত্তরনিকায়ের (১ম ভাগ) অন্তর্গত। এটা গ্রহজনিত দোষ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য পঠিত হয়ে থাকে। কারুণিক বুদ্ধ শ্রাবস্তীতে অবস্থান কালে এই সুত্তের মাধ্যমে সকাল দুপুর বিকালবেলায় কিভাবে সুখে বাস করা যায় সে সম্পর্কে উপদেশ দিয়েছিলেন।

৫। বোজ্ঝঙ্গ সুত্ত– এটা সংযুক্ত নিকায়ের অন্তর্গত। সকল প্রকার রোগ হতে মুক্তি পাবার জন্য এই সুত্ত পাঠ করা হয়। মোগ্গল্লান স্থবির এবং কশ্যপ স্থবির অসুস্থ হলে তথাগত বুদ্ধ এই সুত্ত পাঠ করে সুস্থ করেছিলেন। একদা স্বয়ং বুদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়লে চুন্দস্থবিরকে এটা পাঠ করতে বলেন। চুন্দস্থবিরের সুত্ত আবৃত্তির পর তিনি সুস্থ হন।

৬। খন্ধ পরিত্ত– এ সূত্র বিনয় চুল্লবগ্গ ও জাতকে সন্নিবেশিত আছে। এটা সাধারণত বিষধর সর্প, সরিসৃপ ও জীবজন্তুর আক্রমণ থেকে রক্ষা পাবার জন্য পঠিত হয়ে থাকে। জনৈক ভিক্ষু সর্প দ্বারা দংশিত হলে মৃত্যুবরণ করলে ভগবান বুদ্ধ এটা দেশনা করেছিলেন।

৭। মোর পরিত্ত– এটা খুদ্দক নিকায়ের জাতক গ্রন্থের (জাতক নং ১৫৯) অন্তর্গত। এটার দুই অংশ, প্রথম অংশ প্রাতঃবেলায় এবং দ্বিতীয় অংশ সন্ধ্যাবেলায় আবৃত্তি করে সমস্ত দিবারাত্রি বিপদমুক্ত থাকা যায়। বোধিসত্ত্ব ময়ূর জন্মে এই পরিত্ত পাঠ

www.pathagar.com

করে সারা দিনরাত নির্বিঘ্নে কালযাপন করতেন। জনৈক ভিক্ষু কোনো নারীর রূপে মোহিত হয়ে স্বীয় ব্রহ্মচর্য ব্রত ভঙ্গ করলে বুদ্ধ এই সূত্তটি দেশনা করেছিলেন। এটা আবৃত্তিকারী সর্বদা বিপদমুক্ত থাকেন বলে এটাকে 'ব্রহ্মমন্ত্র' বলা হয়।[২২৯]

৮। অঙ্গুলিমাল পরিত্ত– এটা মধ্যম নিকায় ২য় ভাগ গ্রন্থের অন্তর্গত। পূর্ণগর্ভবতী রমণীর গর্ভস্থ সন্তান সুখে প্রসব হবার জন্য এটা পঠিত হয়। কুখ্যাত নরঘাতক অঙ্গুলিমালকে বুদ্ধ দমন করে ভিক্ষুধর্মে দীক্ষা দান করার পর তিনি সত্যক্রিয়া দ্বারা জলপড়া প্রদান করতেন। এতে গর্ভবতী রমণীর সুখে প্রসব হত।

৯। আটানাটিয় পরিত্ত– সূত্রটি দীর্ঘনিকায় ৩য় ভাগের অন্তর্গত। সাধারণত এটা দুষ্ট গ্রহ অথবা অমনুষ্যের উপদ্রব হতে রক্ষা পাবার জন্য পাঠ করা হয়। একদা চর্তুমহারাজিক দেবগণ বুদ্ধকে অবহিত করেন যে, ভিক্ষু-ভিক্ষুণী ও উপাসক-উপাসিকাগণ দৈত্য-পিচাশাদি দ্বারা উৎপীড়িত হবার কারণে ধ্যান-সমধি করতে সক্ষম হচ্ছেন না। তখন বুদ্ধ এই পরিত্ত দেশনা করেছিলেন।

১০। বট্টক পরিত্ত– এটা জাতকগ্রন্থের (জাতক নং ৩৫) অন্তর্গত, অগ্নি নিরোধক মন্ত্র হিসেবে পঠিত হয়। বোধিসত্ত্ব বট্টককুলে জন্মগ্রহণ করেছিলেন। তিনি তখন উড়তে পারতেন না, এমন সময় জঙ্গলে দাবানল জ্বলে উঠলে তাঁর মাতাপিতা পলায়ন করে, তিনি সত্যক্রিয়ার দ্বারা সেই দাবানল হতে রক্ষা পেয়েছিলেন।

১১। ধজাগ্গ পরিত্ত– এটা সংযুক্ত নিকায়ের প্রথম ভাগের অন্তর্গত। যে কোনো বিপদের সময় এসূত্র পাঠ করা যায়। বুদ্ধ এই সুত্তে ত্রিরত্নের শরণাগত সর্বত্র বিপদ থেকে মুক্ত থাকে বলে অভিহিত করেছেন।

উপরোক্ত পরিত্তগুলো ছাড়াও পরিত্রাণ অনুষ্ঠানে মহাজয়মঙ্গলগাথা, জয়মঙ্গল অট্ঠগাথা, জিনপঞ্জরগাথা পরাভবসুত্ত, বসলসুত্ত, তিরোকুড্‌ড সুত্ত, নিধিকুণ্ডসুত্ত, সীবলীপরিত্ত ইত্যাদি কাল ও অবস্থাভেদে পাঠ করা হয়।

পরিত্রাণসূত্র সাধারণত কোনো মাঙ্গলিক কর্মের প্রারম্ভে যেমন গৃহপ্রবেশ, অন্নপ্রাশন, বিবাহ অনুষ্ঠান, সন্তানের জন্মদিন, কেহ রোগাক্রান্ত হলে অথবা কারো মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলে কিংবা কোনো বিপদের আশংকা করলে পাঠের ব্যবস্থা করা হয়। এছাড়া গ্রহশান্তি করার জন্যও পরিত্তদেশনার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে। এটাকে নবগ্রহ সূত্রপাঠ (সুত্তদেশনা) বা নবরত্নসূত্র বলে।

বর্তমান থেরবাদী বৌদ্ধদের মধ্যে পরিত্তদেশনা সর্বাধিক জনপ্রিয় পারিবারিক ও সামাজিক ধর্মীয় অনুষ্ঠান হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

তথ্যনির্দেশ

১. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, তিন ব্যক্তির কথা, গল্প নং ১.৩ দ্রষ্টব্য।

২. প্রাগুক্ত, ব্যাঘ্রকথা, গল্প নং ২.৫ দ্রষ্টব্য।

৩. প্রাগুক্ত, বন্ধুর জন্য জীবনদান কথা, গল্প নং ২.১০ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

৪. প্রাগুক্ত, গল্প নং ২.৬ দ্রষ্টব্য।
৫. প্রাগুক্ত, পানীয় দাতার কথা, গল্প নং ২.৯ দ্রষ্টব্য।
৬. প্রাগুক্ত, চোরের বন্ধুর কথা, গল্প নং ২.৭ দ্রষ্টব্য।
৭. প্রাগুক্ত, মরুত্তব্রাহ্মণ কথা, গল্প নং ২.৮ দ্রষ্টব্য।
৮. প্রাগুক্ত, শরণস্থবিরকথা, গল্প নং ১.৬ দ্রষ্টব্য।
৯. প্রাগুক্ত, বুদ্ধেনীকথা, গল্প নং ১.৪ দ্রষ্টব্য।
১০. প্রাগুক্ত, বোধিরাজকন্যা কথা, গল্প নং ৪.৯ দ্রষ্টব্য।
১১. প্রাগুক্ত, বিশ্বমিত্রাকথা, গল্প নং ১.৭ দ্রষ্টব্য।
১২. প্রাগুক্ত, সুবর্ণতিলককথা, গল্প নং ৪.২ দ্রষ্টব্য।
১৩. প্রাগুক্ত, রূপদেবীকথা, গল্প নং ১.১০ দ্রষ্টব্য।
১৪. প্রাগুক্ত,গল্প নং ২.২ দ্রষ্টব্য।
১৫. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৩.৬ দ্রষ্টব্য।
১৬. প্রাগুক্ত, গল্প নং ২.২, ২.১০, ৩.৬ দ্রষ্টব্য।
১৭. প্রাগুক্ত, বুদ্ধধর্মকথা, গল্প নং ১.৯ দ্রষ্টব্য।
১৮. প্রাগুক্ত, মৃগলুব্ধক কথা, গল্প নং ১.২ দ্রষ্টব্য।
১৯. প্রাগুক্ত,অহিগুণ্ঠিককথা, গল্প নং ১.৫ দ্রষ্টব্য।
২০. প্রাগুক্ত,ব্যাঘ্রকথা, গল্প নং ১.৫ দ্রষ্টব্য।
২১. প্রাগুক্ত, চোরের বন্ধুর কথা, গল্প নং ২.৭, চোরঘাতককথা, গল্প নং ৩.৬ ও উত্তর শ্রামণের কথা, গল্প নং ৩.৪ দ্রষ্টব্য।
২২. প্রাগুক্ত, শ্রদ্ধোপাসক কথা, গল্প নং ৩.৭, মরুত্তব্রাহ্মণকথা, গল্প নং ২.৮ দ্রষ্টব্য।
২৩. প্রাগুক্ত, কৃপণকথা, গল্প নং ৩.৮, দরিদ্রকথা, গল্প নং ৪.৩ দ্রষ্টব্য।
২৪. প্রাগুক্ত, মহামান্ধাতাকথা, গল্প নং ১.৮ দ্রষ্টব্য।
২৫. প্রাগুক্ত, ধর্মশৌণ্ডিককথা, গল্প নং ১.১ দ্রষ্টব্য।
২৬. প্রাগুক্ত, মহামন্ধাতাকথা, গল্প নং ১.৮ দ্রষ্টব্য।
২৭. প্রাগুক্ত, দেবপুত্র কথা, গল্প নং ৩.৯ দ্রষ্টব্য।
২৮. প্রাগুক্ত, কাবীরপট্টকথা, গল্প নং ৩.৫, পাদপিটিকায় কথা, গল্প নং ৩.৩ মিথ্যাদৃষ্টিকের কথা, গল্প নং ৩.২ দ্রষ্টব্য।
২৯. শরণস্থবির কথা, গল্প নং ১.৬ দ্রষ্টব্য।
৩০. প্রাগুক্ত, গল্প নং ১.৫ দ্রষ্টব্য। তুলনীয়, যক্ষবঞ্চিত কথা, গল্প নং ৩.১।
৩১. প্রাগুক্ত, মহামন্ধাতা (১.৮), বুদ্ধবর্মবণিক (১.৯), নন্দীরাজ (২.১), সীবলীস্থবির (৩.১০) শাখমাল পূজিকা (৪.৫) গল্প দ্রষ্টব্য।
৩২. প্রাগুক্ত, তিন ভ্রাতা মধুবণিক (৪.৮) বিষমলোমকুমার (২.৩) কপণ (৩.৮), মহাসেন (৪.১), ইন্দ্রগুপ্ত (৪.৪) মোরিয় ব্রাহ্মণ (৪.৬) ও পুত্রকথা (৪.৭) গল্প দ্রষ্টব্য।
৩৩. প্রাগুক্ত, পাদপিঠিকায় (৩.৩) ও দেবপুত্র (৩.৯) কথা দ্রষ্টব্য।
৩৪. প্রাগুক্ত, বুদ্ধেনীর কথা (১.৪) দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

৩৫. প্রাগুক্ত, পানীয়দাতা (২.৯) দ্রষ্টব্য।

৩৬. প্রাগুক্ত, অন্যতরব্যক্তির কথা (২.২) দ্রষ্টব্য।

৩৭. প্রাগুক্ত, কুণ্ডলী কথা (৪.১০) দ্রষ্টব্য।

৩৮. প্রাগুক্ত, অহিগুণ্ঠিকের কথা, গল্প নং ১.৫, মিথ্যাদৃষ্টিকের কথা, গল্প নং ৩.২, পাদপীঠিকায় কথা, গল্প নং ৩.৩, কাবীরপট্টন কথা, গল্প নং ৩.৫, সুবর্ণতিলক কথা, গল্প নং ৪.২।

৩৯. প্রাগুক্ত, মহাসেন রাজার কথা, গল্প নং ৪.১, তিন ভাই মধুবণিকের কথা, গল্প নং ৪.৮।

৪০. প্রাগুক্ত, বুদ্ধেনীর কথা, গল্প নং ১.৪, দরিদ্রকথা, গল্প নং ৪.৩, পুত্রকথা গল্প নং ৪.৭, বোধিরাজ কথা, গল্প নং ৪.৯, কুণ্ডলী কথা, গল্প নং ৪.১০ দ্রষ্টব্য।

৪১. প্রাগুক্ত, কাঞ্চনদেবী কথা, গল্প নং ২.৪ দ্রষ্টব্য।

৪২. প্রাগুক্ত, পাদপিঠিকায় কথা, গল্প নং ৩.৩ দ্রষ্টব্য।

৪৩. প্রাগুক্ত, নন্দীরাজ কথা, গল্প নং ২.১ দ্রষ্টব্য।

৪৪. প্রাগুক্ত, ধর্মশৌণ্ডিক কথা, গল্প নং ১.১ ও মহাসেন রাজার কথা, গল্প নং ৪.১ দ্রষ্টব্য।

৪৫. প্রাগুক্ত, বিশ্বমিত্রা কথা, গল্প নং ১.৭ দ্রবষ্টব্য।

৪৬. প্রাগুক্ত, বন্ধুর জীবনদান কথা, গল্প নং ২.১০ ও চোর ঘাতক কথা, গল্প নং ৩.৬ দ্রবষ্ট্য।

৪৭. প্রাগুক্ত, পানীয়দাতার কথা, গল্প নং ২.৯ ও উত্তর শ্রামণের কথা, গল্প নং ৩.৪ দ্রষ্টব্য।

৪৮. প্রাগুক্ত, বিষমলোমকুমার কথা, গল্প নং ২.৩ দ্রষ্টব্য।

৪৯. প্রাগুক্ত, বিশ্বমিত্রা কথা, গল্প নং ১.৭ দ্রষ্টব্য।

৫০. প্রাগুক্ত, ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির কথা, গল্প নং ৪.৪ ও তিন ভ্রাতা মধুবণিক কথা, গল্প নং ৪.৮ দ্রষ্টব্য।

৫১. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৪.৮।

৫২. অনুরূপ বিবরণ সমন্ত পাসাদিকা, অট্‌ঠকথা ও পালি অন্যান্য গ্রন্থে দৃষ্ট হয়।

৫৩. প্রাগুক্ত, অভয় স্থবির কথা, গল্প নং ৫.৮ দ্রবষ্ট্য।

৫৪. প্রাগুক্ত, সজ্মদত্ত স্থবির কথা, গল্প নং ১০.৮ দ্রবষ্ট্য।

৫৫. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৫.১০ দ্রষ্টব্য।

৫৬. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯,১০ দ্রষ্টব্য।

৫৭. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৬.২ দ্রষ্টব্য।

৫৮. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.৯ দ্রষ্টব্য।

৫৯. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৫.৬ দ্রষ্টব্য।

৬০. প্রাগুক্ত, গল্প নং ১০.৭ দ্রষ্টব্য।

৬১. প্রাগুক্ত, আম্রামাত্য কথা, গল্প নং ৯.৭ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

৬২. প্রাগুক্ত, অরণ্য মহাভয় স্থবির কথা, গল্প নং ৫.৪ দ্রষ্টব্য।

৬৩. প্রাগুক্ত, সজ্মদত্ত স্থবির কথা, গল্প নং ১০.৮ দ্রষ্টব্য।

৬৪. প্রাগুক্ত, নকুল উপাসক কথা, গল্পনং ৯.৬ দ্রষ্টব্য।

৬৫. তিষ্যাকথা, গল্প নং ৬.৫ দ্রষ্টব্য।

৬৬. প্রাগুক্ত, গ্রাম্যবালিকা কথা, গল্প নং ৬.৭ দ্রষ্টব্য।

৬৭. প্রাগুক্ত, ধর্মাকথা, গল্প নং ৬.৮ দ্রষ্টব্য।

৬৮. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.৯ দ্রষ্টব্য।

৬৯. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৫.৯ দ্রষ্টব্য।

৭০. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৮.৮ দ্রষ্টব্য।

৭১. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৬.৬ দ্রষ্টব্য।

৭২. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৭.৫ দ্রষ্টব্য।

৭৩. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৭.৬ দ্রষ্টব্য।

৭৪. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৭.৭ দ্রষ্টব্য।

৭৫. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৭.৯ দ্রষ্টব্য

৭৬. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৭.১০ দ্রষ্টব্য।

৭৭. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৮.১ দ্রষ্টব্য।

৭৮. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৮.২ দ্রষ্টব্য।

৭৯. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৮.৩ দ্রস্টব্য।

৮০. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৮.৪ দ্রষ্টব্য।

৮১. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৮.৬ দ্রষ্টব্য।

৮২. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.৫ দ্রষ্টব্য।

৮৩. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.৭ দ্রষ্টব্য।

৮৪. প্রাগুক্ত, গল্প নং ১০.৩ দ্রষ্টব্য।

৮৫. প্রাগুক্ত, গল্প নং ১১.৩ দ্রষ্টব্য।

৮৬. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৮.১০ দ্রষ্টব্য।

৮৭. প্রাগুক্ত, গোল উপাসক কথা, গল্প নং ১০.৫ ও দন্তকুটুম্বিক, কথা গল্প নং ১১.৩ দ্রষ্টব্য।

৮৮. প্রাগুক্ত, দুব্বিটিঠ মহামাত্য কথা, গল্প নং ১০.৩ দ্রষ্টব্য।

৮৯. প্রাগুক্ত, কিঞ্চিসজ্জা কথা, গল্প নং ৬.৯ দ্রষ্টব্য।

৯০. প্রাগুক্ত, হেমা সুন্দরীর কথা, গল্প নং ৯.৩ দ্রষ্টব্য।

৯১. প্রাগুক্ত, আর্যগালতিষ্যকথা, গল্প নং ৬.৬ দ্রষ্টব্য।

৯২. প্রাগুক্ত, শ্রদ্ধাবতী সুমনার কথা, গল্প নং ৬.১০ দ্রষ্টব্য।

৯৩. প্রাগুক্ত, সালিরাজকুমার কথা, গল্প নং ৮.৬ দ্রষ্টব্য।

৯৪. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.৫ দ্রষ্টব্য।

৯৫. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.২ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

৯৬. প্রাগুক্ত, কাকবর্ণতিষ্য মহারাজ কথা, গল্প নং ৭.২ দ্রষ্টব্য।

৯৭. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.৪ দ্রষ্টব্য।

৯৮. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৯.৮ দ্রষ্টব্য।

৯৯. প্রাগুক্ত, দুট্ঠগামণি অভয়মহারাজকথা, গল্প ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

১০০. প্রাগুক্ত, দুব্বিটিঠ মহাতিষ্য কথা, গল্প নং ১০.৩ দ্রষ্টব্য।

১০১. প্রাগুক্ত, কুড্ডরাজ্যবাসী কথা, গল্প নং ৫.৩, জনৈক কুমারীর কথা, গল্প নং ১০.৯, পঞ্চশত ভিক্ষুর কথা, গল্প নং ১১.২ দ্রষ্টব্য।

১০২. প্রাগুক্ত, চুল্লগল্প কথা, গল্প নং ১০.১ দ্রষ্টব্য।

১০৩. Hazra, K. L. History of the Theravada Buddhism in South East Asia, Delhi, 1982, P. 50

১০৪. দীপবংস, ৮ম, ১-১৩, মহাবংস, ১২শ, ৩.১০।

১০৫. রায়, শরৎকুমার– বৌদ্ধভারত, কলিকাতা ১৯৩৯, পৃঃ ৬৬-৬৭।

১০৬. রসবাহিনী প্রাগুক্ত, তিন ভ্রাতা মধুবণিকের কথা, গল্প নং ৪.৮, সুমঙ্গলবিলাসিনী-11, pp. 611-15, দীপবংস, মহাবংস ইত্যাদি।

১০৭. মজ্ঝিম নিকায়, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১৭৪-৮৪, উক্ত সুত্তটিতে ত্রিরত্ন (বুদ্ধ, ধর্ম ও সঙ্ঘ) ও বৌদ্ধভিক্ষুদের আদর্শজীবন সম্পর্কে বর্ণনা রয়েছে।

১০৮. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, দীপবংস, ১২শ, ৫ম ; মহাবংস, ১৪শ, ২২তম।

১০৯. হালদার (দে), মণিকুন্তলা– বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, কলিকাতা ১৯৯৬, পৃ. ৩৬৩।

১১০. দীপবংস, ১৩শ, ৩৬।

১১১. History of Buddhism in Ceylon, Ibid, PP. 52-53

১১২. বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস, প্রাগুক্ত, পৃ. ৩৬৩-৩৬৪।

১১৩. Rahuala, Walpola, History of Buddhism in Ceylon, Colombo, 1966, P. 59.

১১৪. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, নাগকথা, গল্প নং ৫.৯. দুট্ঠগামণি অভয়মহারাজ কথা, গল্প নং ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

১১৫. প্রাগুক্ত, গল্প নং ৫.১ দ্রষ্টব্য।

১১৬. প্রাগুক্ত, শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্য কথা, গল্প নং ৫.৬ দ্রষ্টব্য।

১১৭. প্রাগুক্ত, ধর্মাকথা, গল্প নং ৬.৮ দ্রষ্টব্য।

১১৮. প্রাগুক্ত, নকুল উপাসক কথা, গল্প নং ৯.৬ দ্রষ্টব্য।

১১৯. প্রাগুক্ত, আম্রামাত্য কথা, গল্প নং ৯.৭ দ্রষ্টব্য।

১২০. প্রাগুক্ত, গল্প নং ১০.৭ দ্রষ্টব্য।

১২১. প্রাগুক্ত, বত্থুলপর্বতকথা, গল্প নং ৫.১০, ধর্মদিন্নস্থবিরকথা, গল্প নং ৮.৯, অম্রামাত্যকথা, গল্প নং ৯.৭, বৃক্ষদেবতা কথা, গল্প নং ৯.১০ দ্রষ্টব্য।

১২২. প্রাগুক্ত, কিঞ্চিসজ্ঝা কথা, গল্প নং ৬.৯, শ্রদ্ধাবতী সুমনার কথা, গল্প নং ৬.১০

www.pathagar.com

চুল্লগল্ল কথা, গল্প নং ১০.১, মোড়কন্নদায়িকা কথা, গল্প নং ১০.৬ দ্রষ্টব্য।

১২৩. প্রাগুক্ত, ব্যাধকথা, গল্প নং ৯.২, হেমাসুন্দরী কথা, গল্প নং ৯.৩ দ্রষ্টব্য।

১২৪. প্রাগুক্ত, উত্তরোলীয় কথা, গল্প নং ৬.১ দ্রষ্টব্য।

১২৫. প্রাগুক্ত, তিষ্যকথা, গল্প নং ৬.৫ দ্রষ্টব্য।

১২৬. প্রাগুক্ত, গ্রাম্যবালিকা কথা, গল্প নং ৬.৭, শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্য কথা, গল্প নং ৫.৬ দ্রষ্টব্য।

১২৭. প্রাগুক্ত, ধর্মাকথা, গল্প নং ৬.৮ দ্রষ্টব্য।

১২৮. প্রাগুক্ত, অভয়স্থবিরথা, গল্প নং ৫.৮ দ্রষ্টব্য।

১২৯. প্রাগুক্ত, নাগকথা, গল্প নং ৫.৯ দ্রষ্টব্য।

১৩০. প্রাগুক্ত, তিষ্যাকথা, গল্প নং ৬.৫ দ্রষ্টব্য।

১৩১. প্রাগুক্ত, ধর্মাকথা, গল্প নং ৬.৮ দ্রষ্টব্য।

১৩২. প্রাগুক্ত, কিঞ্চিসজ্ঝা কথা, গল্প নং ৬.৯ দ্রষ্টব্য।

১৩৩. প্রাগুক্ত, শ্রদ্ধাবতী সুমনার কথা, গল্প নং ৬.১০ দ্রষ্টব্য।

১৩৪. প্রাগুক্ত, মোড়কন্নদায়িকা কথা, গল্প নং ১০.৬ দ্রষ্টব্য।

১৩৫. প্রাগুক্ত, চুল্লনাগ স্থবির কথা, গল্প নং ৮.৭ সজ্মদত্ত স্থবির কথা, গল্প নং ১০,৮ দ্রষ্টব্য।

১৪৬. প্রাগুক্ত, কাককথা, গল্প নং ৭.১ দ্রষ্টব্য।

১৩৭. প্রাগুক্ত, পণ্ডরঙ্গ কথা, গল্প নং ১০.২ দ্রষ্টব্য।

১৩৮. প্রাগুক্ত, গল্প নং ১০.৯ দ্রষ্টব্য।

১৩৯. প্রাগুক্ত, ধর্মসুত উপাসিকা কথা, গল্প নং ৫.২ দ্রষ্টব্য।

১৪০. প্রাগুক্ত, কুড্ডরাজ্যবাসী স্থবির কথা, গল্প নং ৫.৩ দ্রষ্টব্য।

১৪১. প্রাগুক্ত, পণ্ডরঙ্গ কথা, গল্প নং ১০.২ দ্রষ্টব্য।

১৪২. Malalasekara, G. P. The Pali Literature of Ceylon, Colombo 1958, P.P. 226

১৪৩. Mahavamsa, xxi, vv 10- 12

১৪৪. রসবাহিনীর গল্প নং ৭.৩ থেকে ৮.৫ পর্যন্ত দ্রষ্টব্য, Mahavamsa, Chap, xxii, vv, 11 ff. The Pali Literature of Ceylon, ibid pp. 226 ff.

১৪৫. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, দুট্‌ঠগামণি অভয় মহারাজকথা, গল্প নং ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

১৪৬. Ruhala, Walpala, Ibid, P. 59.

১৪৭. Malalasekara, The Pali Literature of Ceylon, ibid P. 13-14 রসবাহিনীতে নবম মাসে বুদ্ধের শ্রীলংকা গমন উল্লেখ আছে, গল্প নং ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

১৪৯. চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ, বৌদ্ধসাহিত্য (ড: সুকোমল চৌধুরী সম্পাপিদত), কলিকাতা, ১৯৯৫. পৃ. ১৩৫।

১৪৯. Malalasekara, ibid.

১৫০. বৌদ্ধসাহিত্য, প্রাগুক্ত ; রসবাহিনী, নাগকথা, গল্প নং ৫.৯ দ্রষ্টব্য। এখানে চূলোদর

www.pathagar.com

ও মহোদর নামে দুই মামা-ভাগ্নের বিবাদের বিবরণ উল্লেখ আছে।

১৫১. Malalasekara, ibid.

১৫২. বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাগুক্ত, দীপবংস, ১ম অধ্যায়, মহাবংস।

১৫৩. The Pali Literature of Ceylon, ybid, P.P. 14-15.

১৫৪. Mahavamsa vi. v 47. Dipavamsa, ix, v, 21, refers the event to the time of the Prinibbana. The Samanta Pasadika assigns if to the same year as the death of the Buddha (Loc. cif) quoted from the Pali Literature of Ceylon, ibid P. 10.

১৫৫. The pali Literature of Ceylon, ibid, P. 18.

১৫৬. Jinalankara, Ed. with notes and Translation by Games Gray, London, 1894, Intro. PP. 7.8

১৫৭. The Pali Literature of Ceylon, ibid, p.p. 18-19.

১৫৮. Mahavamsa, x vv. 98-102.

১৫৯. The Pali Literature of Ceylon, ibid, PP. 18-19.

১৬০. Barthemy Saint-hilare, J; Buddhism in India and Srilanka, New Delhi, 1975, P. 129.

১৬১. The Pali Literature of Ceylon, ibid, pp. 19-20.

১৬২. Mahavamsa, xi, vv 34-6.

১৬৩. Mahavamsa, xiv. vv. 1 foll.

১৬৪. গল্প নং ৪.৮ দ্রষ্টব্য।

১৬৫. History of Buddhism in Ceylon, ibid, P. 85.

১৬৬. Ibid, P 59

১৬৭. Rhys Dvids, T. W. Buddhist India, Delhi, 1971, P.P. 303-4

১৬৮. The Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 30.

১৬৯. Ibid, p-30.

১৭০. Mahavamsa, xv 212-14

১৭১. The Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 31.

১৭২. Ibid. রসবাহিনী, দুট্ঠগামণি অভয়রাজকথা, গল্প নং ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

১৭৩. Mahavamsa, Chap. xxii, vv. 11 ff.

১৭৪. নন্দিমিত্র, সুরনির্মল, মহাসেন, গোটইম্বর, থেরপুত্রাভয়, ভরণ, বেলুসুমন, খঞ্জদেব, ফুষ্যদেব ও লভিয়াবসভ। রসবাহিনী, গল্প নং ৭.৩ দ্রষ্টব্য।

১৭৫. দুট্ঠগামণি অভয়মহারাজ কথা, গল্প নং ৭.৩ তুল. মহাবসংস।

১৭৬. প্রাগুক্ত, তুল. মহাবংস, xxiv, v. 4.

১৭৭. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত। The Pali Literature of Ceylon, ibid, P-34.

১৭৮. প্রাগুক্ত, নন্দিমিত্র কথা, গল্প নং ৭.৪ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

১৭৯. প্রাগুক্ত, সুরনির্মল কথা, গল্প নং ৭.৫ দ্রষ্টব্য।

১৮০. প্রাগুক্ত, মহাসেন কথা, গল্প নং ৭.৬ দ্রষ্টব্য।

১৮১. প্রাগুক্ত, গোঠইম্বর কথা, গল্প নং ৭.৭ দ্রষ্টব্য।

১৮২. প্রাগুক্ত, থেরপুত্রাভয় কথা, গল্প নং ৭.৮ দ্রষ্টব্য।

১৮৩. প্রাগুক্ত, ভরণ কথা, গল্প নং ৭.৯ দ্রষ্টব্য।

১৮৪. প্রাগুক্ত, বেলুসুমন কথা, গল্প নং ৭.১০ দ্রষ্টব্য।

১৮৫. প্রাগুক্ত, খঞ্জদেব কথা, গল্প নং ৮.১ দ্রষ্টব্য।

১৮৬. প্রাগুক্ত, ফুষ্যদেব কথা, গল্প নং ৮.২ দ্রষ্টব্য।

১৮৭. প্রাগুক্ত, লভিয়বসভ কথা, গল্প নং ৮.৩ দ্রষ্টব্য।

১৮৮. প্রাগুক্ত, দাঠাসেন কথা, গল্প নং ৮.৪ দ্রষ্টব্য।

১৮৯. প্রাগুক্ত, কাকবর্ণতিষ্য কথা, গল্প নং ৭.৩ দ্রষ্টব্য, তুল The Pali Literature of Coylon, ibid, P 34-36.

১৯০. জগজ্জ্যোতি Dr. B. M. Barua Birth Centenary Commemoration Volume (Ed by-H.B. Chowdhury) কলকাতা, ১৯৮৯, বৌদ্ধ সাহিত্যে পরিত্রাণ সূত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মে ইহার বিশেষত্ব। পৃ. ১৭।

১৯১. প্রাগুক্ত।

১৯২. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৯।

১৯৩. প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮-১৯।

১৯৪. Davids, Mrs, Rhys, Milinds- Question. P.5

১৯৫. মহাস্থবির, ধর্মাধার, (অনু) মিলিন্দ প্রশ্ন (২য় সংস্করণ) কলিকাতা, ১৯৭৭, পৃ. ১৫৭-১৬২।

১৯৬. PTS. Edition, P 152. Quoted from Contemporary Buddhism in Bangladesh, (2nd edition) Calcutta 1987. P. 117. by Dr. Sukomal Chaudhuri.

১৯৭. বৌদ্ধ সাহিত্য, প্রাগুক্ত, পৃ. ৬৪-৬৫।

১৯৮. বহুং বে সরণং যন্তি পব্বতানি বনানি চ,
আরাম রুক্খ চেত্যানি মনুস্সা ভয়তজ্জিতা।
নেতং খো সরণং খেমং নেতং সরণমুত্তমং
নেতং সরণমাগম্ম সব্বদুক্খা পমুচ্চতি।
যো চ বুদ্ধঞ্চ ধম্মঞ্চ সরণং গতো,
চত্তারি অরিয়সচ্চানি সম্মপঞ্ঞায় পস্সতি।
দুক্খং দুক্খসমুপ্পাদং দুক্খস্স চ অতিক্কমং
অরিয়ঞ্চট্ঠাঙ্গিকং মগ্গং দুক্খূপসমগামিনং।
এতং খো সরণং খেমং এতং সরণমুত্তমং
এতং সরণমাগম্ম সব্ব দুক্খা পমুচ্চতি। (বুদ্ধগ্গ, ১০-১৪)

১৯৯. খুদ্দকপাঠ, মঙ্গলসুত্ত।

২০০. জগজ্জ্যোতি, প্রাগুক্ত, পৃ. ১৮।

২০১. Contemporary Buddhism in Bangladesh, ibid. P. 118.

২০২. Ibid, P. 118

২০৩. সীবলী পরিত্তং।

২০৪. সদ্ধর্ম রত্নমালা (সংকলিত) ধর্মপাল মহাথের, (৩য় সংস্করণ) ১৯৭৬, কলিকাতা, পৃ. ১৬৬-১৬৭।

২০৫. পরিসমন্ততো তায়টি রক্খতীতি পরিত্তং।

২০৬. মহাথবির, রাজগুরু ধর্মরত্ন (অনু) ; মহাপরিনিব্বান সুত্তং, ১৯৪১, চট্টগ্রাম, পৃ. ১৮০।
অথানং সূচনতো সুবুত্ততো সবণতো চ সূদনতো,
সুত্তানা সুত্ত স-ভাগতো চ সুত্তন্তি অক্খাতং।

২০৭. Contemporary Buddhism in Bangladesh, P. 117.

২০৮. Silva Lynn De, Buddhism beliefs and Practices in Sri-Lanka (2nd edition) 1980, Colombo, P 111.

২০৯. বিপত্তি পটিবাহায় সব্বসম্পত্তি সদ্ধিয়া
সব্বদুক্খ-বিনাসায় সব্বভয়-বিনাসায়,
সব্বরোগ-বিনাসায় ভবে দীঘায়ুদায়কং
চিত্তং উজুং করিত্বান পরিত্তং ব্রুথ মঙ্গলং।

২১০. Buddhism beliefs in India and Srilanka, ibid P. 111.

২১১. Ibid, P.P. 114-115.

২১২. Ibid, p. p. 111-118.

২১৩. রসবাহিনী, ঘরসর্প কথা, গল্প নং ৯.১ দ্রষ্টব্য, তুল সদ্ধর্ম সংগ্রহ, পৃ. ৮৮-৮৯।

২১৪. রসবাহিনী, পঞ্চশত ভিক্ষুর কথা, গল্প নং ১১.২ দ্রষ্টব্য, তুল সদ্ধর্মসংগ্রহ পৃ. ৭৮-৭৯।

২১৫. রসবাহিনী, বিশ্বমিত্রা কথা, গল্প নং ১.৭ দ্রষ্টব্য।

২১৬. রসবাহিনী, শরণস্থবির কথা, গল্প নং ১.৬ দ্রষ্টব্য।

২১৭. রসবাহিনী, গল্প নং ৩.১ দ্রষ্টব্য।

২১৮. রসবাহিনী, নন্দিবণিক কথা, গল্প নং ৯.৪ দ্রষ্টব্য।

২১৯. রসবাহিনী, উত্তরশ্রামণ কথা, গল্প নং ৩.৪ দ্রষ্টব্য।

২২০. রসবাহিনী, ব্যাধকথা, গল্প নং ৯.২ দ্রষ্টব্য।

২২১. রসবাহিনী, হেমাসুন্দরীর কথা, গল্প নং ৯.৩ দ্রষ্টব্য।

২২২. রসবাহিনী, কাঞ্চনদেবী কথা, গল্প নং ২.৪ দ্রষ্টব্য।

www.pathagar.com

২২৩. রসবাহিনী, গল্প নং ১.৫ দ্রষ্টব্য।

২২৪. রসবাহিনী, ধর্মসুত উপাসিকার কথা, গল্প নং ৫.২ দ্রষ্টব্য।

২২৫. রসবাহিনী, কুড্ডরাজ্যবাসী স্থবির কথা, গল্প নং ৫.৩ দ্রষ্টব্য।

২২৬. জগজ্জ্যোতি, প্রাগুক্ত।

২২৭. এতেন সচ্চবজ্জেন হোতু মে/তে জয়মঙ্গলং।

২২৮. জগজ্জ্যোতি, প্রাগুক্ত।

২২৯. Contemporary Buddhism in Bangladesh, ibid, P-120.

www.pathagar.com

পঞ্চম অধ্যায়
উপসংহার

১। রসবাহিনী বর্ণনার গুরুত্ব ঃ

পরবর্তী সময়ে রচিত কিংবা সংকলিত পালি সাহিত্য ভাণ্ডারে রসবাহিনী একটি ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। জাতক, পেতবত্থু, বিমানবত্থু, থেরগাথা, থেরীগাথা, অপদান, ধম্মপদট্‌ঠকথা প্রভৃতি পালি গ্রন্থের গল্প-উপাখ্যানের মত রসবাহিনীর ঘটনাসমূহ পদ্য-গদ্যে বর্ণিত হলেও এটা পিটক পরবর্তীকালে সংকলিত একটি সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র প্রকৃতির গল্পসংকলন। লেখক চিরাচরিত নিয়মানুযায়ী বর্ণিত বিষয় প্রথমে গদ্যে ও পরে পদ্যে উপস্থাপন করেছেন বটে, কিন্তু বর্ণিত বিষয়বস্তুর ভাবপরিবেশ ভিন্নতর। এর কোনো কাহিনীর প্রধান চরিত্রের বর্তমান জীবনের সঙ্গে অতীত জীবনের যোগসূত্র দেখানো হয়েছে, আবার কোনোটি শুধুমাত্র বর্তমান জীবনকাহিনীকে গল্পাকারে উপস্থাপন করা হয়েছে।

রসবাহিনী একটি সহজবোধ্য গল্প সংকলন। সাধারণ মানুষ গল্প-উপাখ্যান শুনতে পছন্দ করে। সিংহল, মায়ানমার (বার্মা) প্রভৃতি বৌদ্ধ দেশে দিনান্তে বিশ্রাম করার সময় জাতক-কাহিনী কিংবা ধর্মীয় উপাখ্যান শ্রবণ একপ্রকার নিত্যকর্ম। সিংহলবাসী এখনও জাতক বা অন্যান্য ধর্মীয় কাহিনীর ন্যায় রসবাহিনীর গল্পগুলো শ্রদ্ধার সঙ্গে শ্রবণ করে এবং বিহার কেন্দ্রিক শিক্ষায়তনে এর ব্যাপক পঠন-পাঠন হয়ে থাকে[১]। এটার কিছু সংখ্যক কাহিনী অতি সাধারণ এবং সাদামাটা। আর কিছু সংখ্যক কাহিনী পাঠে প্রাচীন ভারত ও শ্রীলংকার জনসাধারণের জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ, স্বভাব-চরিত্র, সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক অনেক তথ্য অবগত হওয়া যায়[২]। কাজেই প্রাচীন ভারত ও শ্রীলংকার সামাজিক, ধর্মীয় ও রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রসবাহিনীর গল্পগুলোর যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। গল্প-কাহিনী ইতিহাস নয় বটে, কিন্তু এতে বেশ কয়টি ইতিহাস আশ্রয়ী কাহিনী (Historical Legend) রয়েছে যেগুলোর গুরুত্ব অপরিসীম। M. Winternitz রসবাহিনীর গল্পগুলোকে আধুনিক পালি সাহিত্যে অতি গুরুত্বপূর্ণ সংকলনরূপে অভিহিত করেছেন।[৩]

রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে রচিত প্রথম যোদ্ধাবর্গ (৭ম বর্গ), দ্বিতীয় যোদ্ধাবর্গ, (৮ম বর্গ), বিষমলোমকুমার কথা (গল্প নং ২.৩), ইন্দ্রগুপ্ত কথা (৪.৪), শাখমাল পূজিকার কথা (৪.৫), মধুবণিক তিন ভ্রাতার কথা (৪.৮), শ্রদ্ধাতিষ্য অমাত্যের কথা (৫.৬), কিঞ্চিসজ্ঝার কথা (৬.৯) প্রভৃতি কাহিনী অতীত গুরুত্বপূর্ণ। এসব কাহিনীর মাধ্যমে

www.pathagar.com

ভারতবর্ষ ও শ্রীলংকার তৎকালীন বৌদ্ধধর্মের অবস্থার সঙ্গে রাজনৈতিক পরিস্থিতি সম্পর্কেও বিস্তৃত জ্ঞাত হওয়া যায়। সুতরাং এসব কাহিনীকে ঐতিহাসিক উপাখ্যান (Historical Legends) হিসেবে অভিহিত করা যায়। জম্বুদ্বীপে উৎপন্ন কাহিনীগুলোর মধ্যে মধুবণিক তিন ভ্রাতার কাহিনী এবং শ্রীলংকায় উৎপন্ন কাহিনীগুলোর মধ্যে দুঠ্‌ঠগামনি অভয় রাজের কাহিনী সর্বাপেক্ষা অধিক গুরুত্বপূর্ণ। মগধরাজ বিন্দুসারের পুত্র অশোক। তিনি একশজন ভ্রাতাকে হত্যা করে মগধের সিংহাসনে আরোহণ করেন। তাঁর জ্যেষ্ঠভ্রাতা সুমন কুমারের পুত্র ন্যগ্রোধকুমার। তিনি শ্রামণ্যধর্মে দীক্ষিত হয়ে সদা উদ্বিগ্নচিত্ত সম্রাট অশোকের মনে সাম্য আনয়ন করতে সক্ষম হন। পরবর্তীকালে সেই চণ্ডাশোক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে সমগ্র ভারতবর্ষে ধর্মরাজ্য প্রতিষ্ঠা করেছিলেন এবং দেশের ভিতরে ও বাইরে ধর্মদূত প্রেরণ করে বৌদ্ধধর্ম প্রচার করেছিলেন। তাঁর সময়ে শ্রীলংকায় তৎপুত্র মহেন্দ্র স্থবিরের নেতৃত্বে প্রচারকদল প্রেরিত হয়েছিল। তখন শ্রীলংকার নরপতি ছিলেন দেবপ্রিয়তিষ্য। দূতের মাধ্যমে উভয়রাজার মধ্যে বন্ধুত্ব স্থাপিত হয়। শ্রীলংকায় বৌদ্ধধর্ম চিরস্থিতি লাভ করে। এই কাহিনী থেকে সমগ্র জম্বুদ্বীপে চুরাশি হাজার বিহার, চৈত্য ও ধাতু প্রতিষ্ঠা করার বিবরণ জ্ঞাত হওয়া যায়। এছাড়া তৃতীয় সঙ্গীতির মাধ্যমে বুদ্ধ শাসন শোধন করার ব্যবস্থা করা হয় সম্রাট অশোকের ব্যবস্থাপনায়। এরপর তিনি তাঁর পুত্র মহেন্দ্র ও কন্যা সঙ্ঘমিত্রাকে বুদ্ধশাসনে দান করেন। উপাখ্যানাকারে পরিবেশিত হলেও এসব ঐতিহাসিক বিবরণ নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ। এরূপ বিবরণ দীপবংস,[৪] মহাবংস,[৫] সমন্তপাসাদিকা,[৬] অবদানশতক[৭] প্রভৃতি গ্রন্থেও রয়েছে। সম্ভবত গল্পকার উপরোক্ত গ্রন্থ থেকে উপাদান সংগ্রহ করে কাহিনী রচনা করেছেন।

শ্রীলংকায় উৎপন্ন রাজনৈতিক বা ঐতিহাসিক কাহিনীগুলোরও মূল ভিত্তি দীপবংস,[৮] মহাবংস[৯] ও সমন্তপাসাদিকা।[১০] সিংহলরাজ দুট্‌ঠগামণি অভয় (১০১-৭৭ খৃঃ পূঃ)[১১] ছিলেন প্রাচীন শ্রীলংকার একজন শক্তিশালী যোদ্ধা শাসক। তখন চোল রাজ্যের অধিবাসী এলার অনুরাধপুরে রাজত্ব করতেন। তিনি ছিলেন তামিল। তাঁর তামিল সেনাবাহিনীরা শ্রীলংকার বৌদ্ধধর্মের ব্যাপক ক্ষতি সাধন করেছিল। মহাবংস[১২] মতে তামিলসেনারা শ্রীলংকার ব্যাপক ক্ষতি সাধন করে। এ প্রসঙ্গে G. P. Malalasekera বলেন, ".... From among the large concourse of foreigners who had come to Ceylon from Jambudipa, twoTamils, sons of a horse-dealer, seized the Kingdom and slew the King. Thus began those perodic all invansion of the Tamil hords from the continent which later rendered desolate the grater part of the island and all but completely destroyed its cutlure and civilization. It is true that the Tamils (or the Malabors, as they are frequently called) brought with them a certain amount of civilizing influence in the form of Hindu culture;

www.pathagar.com

but the destruction they wrought was immense. They pulled down all public buildings, put to death the monks, and bunt whatever literary records felt into their hands."[১৩]

রাজা এলার ব্যক্তিগতভাবে মহৎ শাসক ছিলেন,[১৪] কিন্তু তাঁর অনুসারী তামিল সেনারা ছিল অত্যন্ত নিষ্ঠুর প্রকৃতির। শ্রীলংকার রাজধানী অনুরাধপুর এলার রাজার নেতৃত্বাধীনে চলে যাওয়ায় সিংহলীগণ রোহণ অঞ্চলের মহাগ্রামে রাজধানী স্থাপন করেন। তখন সেখানকার রাজা ছিলেন কাকবর্ণতিষ্য। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর পুত্র দুট্‌ঠগামণি অভয় সিংহাসনে আরোহণ করে হৃতরাজ্য অনুরাধপুর পুনরুদ্ধারে সচেষ্ট হন। এব্যাপারে তাঁর মায়ের প্রেরণা ছিল অফুরন্ত। পিতা ইতিপূর্বেই দেশের বিভিন্ন স্থান থেকে বীর যোদ্ধাদের সংগ্রহ করে সেনাবাহিনীকে সমৃদ্ধ করেছিলেন। তাঁদের মধ্যে নন্দিমিত্র, সূরনির্ম্মল, মহাসোণ, গোঠইম্বর, থেরপুত্রাভয়, ভরণ, বেলুসুমন, খঞ্জদেব, ফুষ্যদেব ও লভিয় বসভ ছিলেন প্রধান। উল্লেখ্য যে, এই দশসেনা প্রধানদের অসম বীরত্বের বিবরণ সম্বলিত পৃথক পৃথক কাহিনী আলোচ্য রসবাহিনীতে সংকলিত হয়েছে। পিতার জীবিতাবস্থায় দুট্‌ঠগামণি অত্যাচারী তামিলদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য পিতাকে অনুরোধ করেছিলেন[১৫]। কিন্তু পিতা দুর্ধর্ষ তামিলদের পরাজিত করা অসম্ভব মনে করে যুদ্ধে অগ্রসর হননি। এ নিয়ে পিতা-পুত্রের মধ্যে অসন্তোষেরও সৃষ্টি হয়। পিতার মৃত্যুর পর তিনি উপরোক্ত সেনাপ্রধানসহ বিপুল সৈন্যবাহিনী নিয়ে এলার রাজার বিরুদ্ধে যুদ্ধে অবতীর্ণ হন। যুদ্ধে এলার রাজা পরাজিত ও নিহত হন। যুদ্ধের বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক কিছু অতিশয়োক্তি করেছেন। তবে কাহিনীগুলো ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে রচিত। তাই এগুলোর গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

এছাড়া রসবাহিনীর অধিকাংশ কাহিনী ধর্মীয় ভাব-পরিবেশে রচিত। বুদ্ধেণির কথা (১.৪), একজন ব্যক্তির কথা (২.২), যক্ষ বঞ্চিত কথা (৩.১), কাবীর পট্টন কথা (৩.৪) চোরঘাতক কথা (৩.৬), পুত্রকথা (৪.৭) সিরিনাগ কথা (৫.৫), গ্রাম্য বালিকার কথা (৬.৭), কাককথা (৭.১), রাষ্ট্রপুত্র কথা (৮.১০), ঘরসর্পকথা (৯.১) ইত্যাদি কয়েকটি কাহিনী বাদ দিলে অন্যান্য কাহিনীগুলো বৌদ্ধধর্মের প্রচার, প্রসার ও বিকাশের ক্ষেত্রে অতীব গুরুত্বপূর্ণ। এসব কাহিনীর মূল লক্ষ্য দানের মাহাত্ম্য এবং দানের প্রভাবে ঐহিক পারত্রিক সুখ সমৃদ্ধি প্রাপ্তির বিবরণ। এসব বিবরণ দিতে গিয়ে লেখক কোনো কোনো ক্ষেত্রে এমনসব অবিশ্বাস্য রকমের ঘটনার অবতারণা করেছেন যা কল্প-কাহিনী বা রূপকথা হিসাব অভিহিত করা যায়। কাহিনীগুলো বিবৃত করতে গিয়ে লেখক স্বাভাবিকভাবে তৎকালীন ভারতবর্ষ ও শ্রীলংকার সামাজিক ও বৌদ্ধধর্মের পরিস্থিতি সম্পর্কে বিবৃত করেছেন, যা ভারতবর্ষ ও শ্রীলংকার বৌদ্ধধর্ম ও সমাজের ইতিহাস জানার জন্য যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ সহায়তা দান করতে পারে। কাহিনীগুলো থেকে সমাজের বিভিন্ন শ্রেণীর পেশাজীবী ও কর্মজীবী, অর্থনৈতিক অবস্থা, দুর্ভিক্ষ, সাধারণ মানুষের সুখ-দুঃখ,

www.pathagar.com

প্রেম-বিরহ, ভিক্ষু-সঙ্ঘের অবস্থা, বিভিন্ন বিহার, বৌদ্ধধর্মের প্রতি জনসাধারণের অনুরাগ ইত্যাদি বিষয় অবগত হওয়া যায়।

রসবাহিনীর গল্পগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো– প্রতিটি গল্পের শেষে একটি করে উপদেশবাণীর সংযোজন। ফলে পাঠক ও শ্রোতাদের কাছে গল্পগুলো অধিকতর আকর্ষণীয় ও হৃদয়গ্রাহী হয়ে উঠেছে।

এখানে রসবাহিনীর উপদেশমূলক কয়েকটি গাথার দৃষ্টান্ত অনুবাদসহ উদ্ধৃত হলো ঃ

ইতি তনুতরকালং সাধু ধম্মং সুণিত্বা,
অধিগত বিভবানং অনুভাবং সুণিত্বা,
ভববিভবসুখং ভো পত্থয়ন্তা কুসীতং,
জহথ সুণথ ধম্মং দুল্লভং দুল্লভস্‌সাতি।[১৬]

অল্পক্ষণের জন্য হলেও সদ্ধর্ম শ্রবণ করে এবং অধিগত বিভবের পরিমাণ জেনে আলস্যহীন হয়ে দুর্লভ সুখদায়ক ধর্মকে জান এবং তা গ্রহণ করে ভব-বিভব সুখ লাভ করুন।

এবম্বিধম্পি কুসলং মনুজো করিত্বা।
পস্‌সেতি দিব্ববিভবং মুনিবণ্ণনীয়ং,
মন্ত্বান ভো দদথ দানবরং সুসীলে,
সদ্ধায় সুদ্ধমনসা'স্‌স বিসেসভাগী'তি।[১৭]

এভাবে একাগ্রচিত্তে কুশলকর্ম করলে বুদ্ধবর্ণিত দিব্য-বিভব লাভ করা যায়। শ্রদ্ধার সাথে পরিশুদ্ধ চিত্তে সৎপাত্রে দান কর, এতে বিশেষ ফল লাভ করা সম্ভব।

এবম্বিধং সুচরিতং সুমনো করিত্বা,
ভাগিস্‌স নেকবিভবস্‌স ভবাভবেসু,
তুম্হেহপি ভো সুচরিতং বিভবানুরূপং,
কত্বান নিব্বুতিপদং করতাং করোথা'তি।[১৮]

বিশুদ্ধচিত্তে এরূপ সুচরিত কর্ম করলে জন্মজন্মান্তর বহু বিভবের ভাগী হওয়া যায়। ওহে, তোমরাও অনুরূপ সুচরিত কর্ম সাধন করে নিবৃত্তিপদ লাভে সচেষ্ট হও।

এবং অসাধুজন সঙ্গসমন্নিবাসং সঞ্চজ্জ সাধুসুচিসজ্জন সঙ্গমেন,
দানাদিনেক কুসলং পরিপূরয়ন্তা সগ্‌গাপবগ্‌গবিভবং অভিসম্ভুনাথা'তি।[১৯]

এভাবে অসাধুর সঙ্গে সহবাস বর্জন করে সজ্জনের সঙ্গে বসবাস করে দানাদি কুশলকর্ম সম্পাদন করত স্বর্গাদি বিভব প্রাপ্ত হও।

নন্দের নন্দিতমনা উপকারকেন
পাণং পি দেন্তি সজনা ইতি চিন্তয়িত্বা,
মিত্তদ্দুমা ভবথ ভো উপকরকস্‌স
পসংসিয়া ভবথ সাধুজনেহি নিচ্চংতি।[২০]

www.pathagar.com

কিঞ্চিৎ নন্দিতচিত্ত ব্যক্তিরা (কৃতজ্ঞ) উপকারী কর্তৃক 'সজ্জন' চিন্তা করে প্রাণ পর্যন্ত দান করেন, মিত্রদ্রোহী হবে না। সজ্জন ব্যক্তিগণ কর্তৃক উপকারীরা সর্বদা প্রশংসা প্রাপ্ত হয়।

মনোপাসাদেন'পি অপ্পপুঞ্ঞং এবং মহন্তং ভবতী'তি ঞত্বা,
মা অপ্পপুঞ্ঞন্তী'তি পমজ্জথম্ভো সরাথ দেবিং ইধ লাজদায়িং।[২১]

প্রসন্ন মনে কৃত অল্প পুণ্যও মহৎ ফল প্রদান করে– ইহা জ্ঞাত হয়ে অল্প পরিমাণ পুণ্যকর্ম সম্পাদনেও প্রমত্ত না হয়ে করা উচিত।

এবমে্হা সো পমুদিতমনো ভিক্খু সুত্বান ধম্মং
পাপেসাঘাং বিসমতি ভুসংতস্স ধম্মানুভাবা,
সুত্বা ধম্মং ভজথ ভবনা কিচ্চং অঞ্ঞপ্পভায়,
তং বো সগ্গে দদতি বিভবং মোক্খমগ্গঞ্চ কামং।[২২]

এভাবে ভিক্ষুগণ প্রমোদিত চিত্তে ধর্ম শ্রবণ করে সদ্ধর্মের প্রভাবে পাপের অন্তসাধন করেন, ধর্মশ্রবণ করে ধ্যান কর, স্বর্গে বিভব লাভ কিংবা মোক্ষলাভ কিসের প্রভাবে সম্ভব।

যো বে গুণাধার জন্তু জাতং অপ্পম্পি সদ্ধায় দদাতি দেয্যাং
সো পেচ্চ সংসার মহাবিদুগ্গে সম্পত্তি নাবায় পতিট্ঠামেতী'তি।[২৩]

যিনি শ্রদ্ধার সঙ্গে গুণসম্পন্ন ব্যক্তিকে অল্পপরিমাণেও দান করেন তিনি পরজন্মে অপরিমিত সম্পত্তি প্রাপ্ত হন।

এবং নরা অপ্পধনা দলিদ্ধ-বড্ঢেত্ব সদ্ধিং রতনত্তয়ম্পি,
লভন্তি সম্পত্তি মনুতমগ্গং বড্ঢেথ তস্মা রতনেসু সদ্ধং।[২৪]

অল্প ধন বিশিষ্ট দরিদ্র হলেও ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা প্রবৃদ্ধি করলে মনুষ্যদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ লাভ করা যায়, তাই ত্রিরত্নের প্রতি শ্রদ্ধা বর্ধিত কর।

বিহায় পাপং নরকো'পগামিং কত্বান মুঞ্ঞং সুগতপ্পসত্থং
বিন্দন্তি ভোগং সতরামরেসু এবম্পি ধীরা বলবা ভবন্তি।[২৫]

পাপকর্মদ্বারা নরক এবং পুণ্যকর্ম দ্বারা স্বর্গ প্রাপ্ত হয়, ভোগরমণ পরিহার করে পণ্ডিত ব্যক্তিগণ শক্তিসম্পন্ন হয়ে থাকেন।

কত্বান এবং কুসলং সুধিমা পত্বান দেবেসু মনোরমেসু
হোতী'তি নাগো'ব বলেনুপেতো তথাবিধে বো কুসলে রমথা'তি।[২৬]

এমন কুসলকর্ম সম্পাদন কর যদ্দারা দেবগণের নন্দিত স্থান লাভ করা যায়। নাগের ন্যায় শক্তিশালী হবার জন্য সেইরূপ কুশল কর্মে রমিত হও।

এবংবিধং সগ্গসিরিং চ থামং ন হোতি পাপাভিরতস্স যস্মা,
তস্মা সুচারিতং চরথপ্পমত্তা সগ্গা পবগগ্গেসু সিরিং সরন্তা'তি।[২৭]

পাপে রত ব্যক্তির পক্ষে কখনও স্বর্গীয় শ্রী সম্পদ লাভ সম্ভবপর নহে, সুতরায় স্বর্গীয় শ্রী লাভের জন্য অপ্রমত্ত হয়ে সুন্দররূপে বিচরণ কর।

এবংবিধ পুঞ্ঞ ফলোদয়াবহং

যো পুঞ্‌ঞকম্মং হি করেয্য সোভনং
স জাতি সগ্‌গং চ পবগ্‌গ সম্পদং
করোথ তুম্‌হে'পি তথাবিধং সুভং ।[২৮]

পুণ্যকর্মের ফল প্রদান এরূপই হয়। যিনি উত্তম পুণ্যকর্ম সম্পাদন করেন তিনি স্বর্গে গমন করেন এবং প্রচুর সম্পত্তি প্রাপ্ত হন, তোমরাও সেইরূপ কল্যাণময় পুণ্যকর্ম সম্পাদন কর।

অসঙ্খ কপ্‌পান'পি মথকস্মিং কতপুঞ্‌ঞকম্মম্পি ন নস্‌সন্তী'তি,
মন্ত্বান পুঞ্‌ঞস্‌স বিপাকমি'চ্ছতা জহাথ দিবসং কুসলেন ধীরা'তি ।[২৯]

পুণ্যকর্ম অসংখ্যকল্প অবধি বিনাশপ্রাপ্ত হয় না, পণ্ডিতগণ পুণ্যকর্মের বিপাক জ্ঞাত হয়ে সর্বদা কুশল কর্মে রত থাকেন।

যো বে জনো বত্ততি সাধুধম্মে
ধম্মানুপেতং কথং কথেতি,
ধম্মদ্ধজো ধম্মধরো চ হোতি
দেবা'পি তং ধম্মঠিতং অবেন্তি ।[৩০]

যে ব্যক্তি উত্তমধর্ম অনুশীলন করেন, ধর্মানুরূপ কথা বলেন, তিনি ধর্মধ্বজ ও ধর্মধারী হন এবং দেবগণও তাঁর ধর্ম গ্রহণ করেন।

এবম্পি সন্তো ভবভোগ সম্পদং লভন্তি দানেন পরিত্তকেন,
তুম্‌হে'পি দানে অথ সীলসঞ্‌ঞমে অত্তং নিবসেত্বা পয়াথ নিব্বুন্তী'তি ।[৩১]

এভাবে দানের দ্বারা ভবভোগের সম্পত্তি লাভ করা যায়, তোমরাও দানে ও শীল সংযমে আত্মনিয়োগ করে নির্বাণ লাভ কর।

করোথ মা মিত্তদুহিং কদাচি কতঞ্‌ঞু মা হোথ কতং সরাথ,
সগ্‌গাবহং ভো কুসলং করোথ অনিন্দিতা হোথ অনাগতেসু ।[৩২]

মিত্রদ্রোহী হবে না, কখনও অকৃতজ্ঞ হবে না, উপকারীর উপকার স্মরণ কর, স্বর্গাবহ কুশলকর্ম সম্পাদন কর এবং ভবিষ্যতে অনিন্দিত (প্রশংসিত) হও।

এবং হি নানাগুণ ভূসনা জনা গুণানুভাবেন উপেন্তি সগ্‌গং,
পূরেথ ভস্মা গুণমেব কেবলং গুণং তি সব্বথ পসন্থমেবা'তি ।[৩৩]

নানাগুণে গুণান্বিত ব্যক্তিগণ গুণের প্রভাবে স্বর্গে জন্মগ্রহণ করেন, তাই গুণে গুণান্বিত হও, গুণই সর্বত্র প্রশংসিত হয়।

ঞত্বান দেহম'চিরং খনভঙ্গুর'ন্তি
সম্পত্তি নাম মনুজস্‌স চ নস্‌সতী'তি,
সগ্‌গাপবগ্‌গ বিভবং মধুরন্তি এবং
দানাদি নেক কুসলেসু যনেস্য ধীরো'তি ।[৩৪]

পণ্ডিত ব্যক্তি 'এ দেহ ক্ষণভঙ্গুর, সমস্ত মনুষ্য সম্পত্তি বিনাশপ্রাপ্ত হয়' ইহা জ্ঞাত হয়ে স্বর্গারোহণের জন্যও বিপুল সুখ ভোগের জন্য দানাদি বহু কুশল কর্ম সম্পাদন করেন।

www.pathagar.com

গেহে ধনে এ্ঞাতিমিত্তে সুহজ্জে বিহায় রাগং নবযোব্বনে'ব,
পঞ্ঞায় সঙ্খারগতং বিদিত্বা পপ্পোন্তি নিব্বানপুরং সপঞ্ঞ'তি।[৩৫]

নবযৌবন, গৃহ, ধন, জ্ঞাতিমিত্র ও বন্ধু ত্যাগ করে প্রজ্ঞার দ্বারা সংস্কার ক্ষয়শীল জ্ঞাত হয়ে নির্বাণ প্রাপ্ত হও।

জাতকের ন্যায় রসবাহিনীর কয়েকটি গল্পে পশু-পাখির মুখে লেখক ভাষা দিয়েছেন। বিষয়টি অস্বাভাবিক হলেও ঘটনার ভাব-পরিবেশ গল্প কথনের উদ্দেশ্যের ক্ষেত্রে স্বাভাবিক বলে পাঠকগণ মেনে নিতে পারেন। কারণ এসব গল্পে নীতিশিক্ষার দিকটাই প্রবল। যেমন- তিন ব্যক্তির কাহিনীতে[৩৬] কোনো সৎ ব্যক্তি বনে গিয়ে দেখল, এক পাহাড়ের গভীর খাদে তিনটি প্রাণী যথাক্রমে একটি শুক, একটি সর্প ও একজন মানুষ পড়ে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ছে। আর ঐ সৎ মানুষটি তাঁদের প্রাণ বাঁচাল। পরবর্তীতে উক্ত মানুষটিই তাঁর জীবন সংশয়ের কারণ হয়ে দাঁড়াল। তখন শুক ও সর্প তাঁকে বিপদ থেকে রক্ষা করল। এই যে কৃতজ্ঞ তির্যক প্রাণী এবং কৃতঘ্ন মানুষের চরিত্র গল্পে বিধৃত হয়েছে তা কথাসাহিত্যের চিরাচরিত নিয়মকে অনুসরণ করেছে। তাই পাঠকের কাছে তির্যক প্রাণিদের কথোপকথন স্বাভাবিক বলেই মনে হয়। ফলে উপাখ্যান বা কথাসাহিত্য হিসেবে এসবের গুরুত্ব অধিক বৃদ্ধি পেয়েছে।

কোনো কোনো গল্পের অবিশ্বাস্য রকমের অলৌকিকত্ব প্রয়োগ করা হয়েছে। এসব কাহিনী সম্পূর্ণরূপে রূপকথার পর্যায়ভুক্ত। এ জাতীয় গল্প রসবাহিনীতে সংকলন না হলে এর গুরুত্ব আরও বৃদ্ধি পেত। এদের মধ্যে অফুরন্ত খাদ্যভাণ্ড[৩৭], জলপাত্র[৩৮], ধন-ভাণ্ডার[৩৯], বস্ত্রভাণ্ড[৪০] এবং সর্বকামদমণি[৪১] অন্যতম।

উপরোক্ত আলোচনার নিরিখে বলা যায় যে, রসবাহিনী পালি সাহিত্যভাণ্ডারে একটি স্বতন্ত্র ও ব্যতিক্রমধর্মী সংযোজন। পালি সাহিত্যামোদীদের নিকট এটার গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

২। রসবাহিনীর সাহিত্যিক ও ভাষাগত রচনাশৈলী

রসবাহিনীর ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। জটিল, দুর্বোধ্য ও দীর্ঘসমাজবদ্ধ শব্দের ব্যবহার খুব কমই দৃষ্ট হয়। স্বল্পশিক্ষিত ব্যক্তিও এর গল্পসমূহের মর্মোপলব্দি করতে সমর্থ হবে। পূর্বেও উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসবাহিনীর গল্পগুলো শ্রীলংকায় ব্যাপক প্রচলন ছিল। কোনো এক সময় গল্পগুলো সিংহলী ভাষায় সংকলিত হয়। পরবর্তীতে রটঠপাল নামে জনৈক ভিক্ষু এটাকে পালি ভাষায় রূপান্তর করেন।[৪২] রট্‌ঠপাল স্থবিরের অনুবাদ ছিল অতি দুর্বল, অশুদ্ধ ও পুনরুক্তি দোষে প্রদুষ্ট। বেদেহ স্থবির এসব ত্রুটিমুক্ত করে বিশুদ্ধ পালি ভাষায় রূপদান করেন। বেদেহ স্থবির রসবহিনীর প্রস্তাবনা গাথায় বলেছেন ঃ

"তত্থ তত্থূপ্পন্নানি বত্থূনি অরহাপুরে,
অভাসুং দীপভাষায় ঠপেসুং পুরাতনা।
মহাবিহারে ভঙ্কুত্তবঙ্কপরিবেণবাসিকো

www.pathagar.com

রট্ঠপালোতি নামেন সীলাচারগুণাকরো।
হিতায় পরিবত্তেমি পজানং পালিভাসতো
পুনরুত্তাদি দোসেহি তমাসি সব্বমাকুলং
অনাকুলং করিস্সামি তং সুনাথ সমাহিতা।"[৪৩]

সুতরাং বেদেহ স্থবিরই রসবাহিনীর বিশুদ্ধ আবরণে আবৃত করেছিলেন।[৪৪] কিন্তু এটার মূল সংগ্রাহক ছিলেন রট্ঠপাল স্থবির। তিনি এমন সব গল্প-কাহিনী সংগ্রহ করেছিলেন যেগুলো স্বয়ং অর্হৎ ভিক্ষুদের দ্বারা কথিত ও প্রচারিত বলে সমাজে বহু ব্যক্তির শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অর্জন করতে সমর্থ হয়েছিল।[৪৫]

উল্লেখ্য যে, রসবাহিনীর গল্পগুলোর কোনো ধারাবাহিকতা নেই। প্রত্যেকটি গল্প স্বতন্ত্র ও স্বয়ংসম্পূর্ণ।[৪৬] ফলে এগুলোর সংস্কার সাধন করতে গিয়ে সামগ্রিকভাবে বিশুদ্ধিকরণ সম্ভব হয়নি, কিছু কিছু ত্রুটি রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে M. Winternitz- এর মন্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "Inspite of this 'improvement' it is still bad Pali with prose and verses alternating and is worded in a carelessly handled style. Several of the legends are outright silly, although even for the Buddha worshippers certainly it is very edifiying."[৪৭]

তবে রসবাহিনীর অধিকাংশ গল্পই তত্ত্ব সমৃদ্ধ এবং ধর্মীয় ভাবপরিবেশে সমৃদ্ধ। কোনো কোনো গল্প অতি সাধারণ এবং সাদাসিদে। যেমন- অহিগুণ্ঠিক (সাপুড়ে) কথা (১.৫), যক্ষবঞ্চিত কথা (৩.১), মিথ্যাদৃষ্টিক কথা (৩.২), এ তিনটি এবং ধর্মসুত উপাসিকার কথা (৫.২) ও কুড্ডরাজ্যবাসী স্থবির কথা (৫.৩) দুটির বক্তব্য বিষয় প্রায় একই। আর এই জাতীয় কিছু কিছু কাহিনী অতি সাধারণ পর্যায়ভুক্ত। কিন্তু অধিকাংশ গল্প সুখপাঠ্য এবং পাঠকের মনে অনাবিল আনন্দ দানে সমর্থ। কারণ গল্প শ্রবণ প্রবৃত্তি মানুষের সহজাত। বুদ্ধের অন্যতম বৈশিষ্ট্য গল্পের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে ধর্মরস পরিবেশন করে উদ্বুদ্ধ করা। জাতক সাহিত্য তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। রসবাহিনীর গল্পগুলোও তার ব্যতিক্রম নয়। উল্লেখ্য যে, গল্পের মাধ্যমে পরিবেশিত তত্ত্ব মানুষের অন্তরে সাধারণত বেশি রেখাপাত করে, ফলে বিষয়টির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। তাছাড়া গল্পগুলোর আর একটি বৈশিষ্ট্য হলো- বক্তব্য বিষয়টি প্রথমে গদ্যে ও পরে পদ্যে পরিবেশন করা। জাতক, থেরগাথা, থেরীগাথা প্রভৃতি গ্রন্থে বিবৃত বিষয়ের ন্যায় রসবাহিনীর গল্পগুলোও গদ্যে-গদ্যে পরিবেশিত। পদ্যাংশটি প্রায় ক্ষেত্রে গদ্যাংশেরই পুনরাবৃত্তি মাত্র। এটা ছিল সেসময়ের সাহিত্য রচনার বৈশিষ্ট্য। রসবাহিনীর রচনাকারও সেই একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। পদ্যাংশ সুরসহযোগে পাঠ করার সময় পাঠকের মনেও আনন্দের সঞ্চার করে। এর কাহিনীগুলো সহজবোধ্য এবং সুখপাঠ বলেই জাতক সাহিত্যের ন্যায় রসবাহিনীও বিশেষ করে শ্রীলংকায় জনপ্রিয়তা অর্জন করেছে। G.P. Malalasekera- এর ভাষায়, "The book is very widely used us an elementary Pali reader in temple-schools even to this day. The free and easy flow of language makes its pleasant reading, while the wealth of its descriptions furnishes the students with a capious vocabulary."[৪৮]

www.pathagar.com

আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, রসবাহিনীর ভাষা সরল ও সহজবোধ্য। জটিল ও দুর্বোধ্য শব্দের ব্যবহার খুব কম, গাথা বা পদ্যাংশের ভাষা ও ভাব সবক্ষেত্রে একরূপ নয়, কোথাও ভাষা নির্দোষ, সরল, সহজ, দায়িত্বপূর্ণ ও হৃদয়গ্রাহী। আবার কোথাও ভাষা জটিল এবং ভাবের দৈন্যে নিকৃষ্ট। কোনো কোনো পদ্যাংশের ভাষা, ভাব, ছন্দ, উপমা, রূপক, প্রবচন ও রচনা উৎকৃষ্ট শ্রেণীর, আবার কোনো কোনো ক্ষেত্রে নিম্নমানের। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, গল্পকারের প্রধান উদ্দেশ গল্প পরিবেশন করা, গল্পের মাধ্যমে সাধারণের মধ্যে দান, দানের ফল তথা কর্ম ও কর্মফলের মাহাত্ম্য প্রচার করা। এদিক থেকে গল্পকার সার্থক। ভাষার কিছু দুর্বলতা লক্ষ্য করা গেলেও গল্পকারের মুখ্য উদ্দেশ্য সার্থক হয়েছে।

রসবাহিনীর সম্পাদক বেদেহ স্থবির ছিলেন কবিভাবাপন্ন ব্যক্তি। তাই তাঁর সম্পাদনায় বেশকিছু গল্পে কবিত্বপূর্ণ ভাবাবেগময় বিবরণ লক্ষ্য করা যায়। এখানে কয়েকটি উদাহরণ উদ্ধৃত হলো ঃ

কোশাম্বীরাজ[৪৯] যুদ্ধে নিহত হলে তাঁর মহিষী বিশ্বমিত্রাকে বিজিত রাজা বিয়ের প্রস্তাব দেন। বিশ্বমিত্রা সেই প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে যে আবেগময় গাথা ভাষণ করেন তা অতি চমৎকার।

তিনি বলেন,

কত্বান সো' ভিসেকং মং অত্তনো হদয়ং বিয়,
পালেসি তং সরন্তস্‌সা সোকগ্‌গি দহতে মনং।
সোকগ্‌গিনা পদিত্তাহং সোকে সোকং কথং খিপে,
জলন্তগ্‌গিম্‌হি কো নাম পাললং পক্‌খিপে বুধো।

কাবীরপট্টন বত্থুতে[৫০] বুদ্ধের মহিমা বর্ণনা করতে লেখক বলেছেন,

বত্তিংস লক্‌খন ধরো সুনক্‌খত্তো ব চন্দিমা,
অনুব্যঞ্জন সম্পন্নো সালরাজা ব ফুল্লিতো।
রং সি জালপরিক্‌খিতো দিত্তো ব কণকাচলো,
ব্যাসপ্‌পভা পরিবুতো সতরংসি দিবাকরো।
সোণ্ণাননো জিনবরো সমণীব সিলোচ্চয়ো,
করুণাপুণ্ন হদয়ো বিবট্টো বিয় সাগরো।
লোকবিস্‌সুত কিত্তী ব সিনেরূ'ব গুণত্তমো,
যস্‌সা বিততো ধীরো আকাস সদিসো মুনি।
অসঙ্গ বিত্তো সব্বত্থ অনিলিবিয় নায়কো,
পতিট্‌ঠা সব্বভূতানং মহীব মুনিসুত্তমো।
অনুপলিত্ত লোকেন তোয়েন পদুমং যথা,
কুবাদগচ্ছদহনো অগ্‌গিক্‌খন্ধো ব সোভতি।
অগদো বিয় সব্বত্থ কিলেস বিসনাসকো,

গন্ধমাদন সেলো'ব গুণগন্ধবিভূসিতো।
গুণানং আকরো ধীরো রতনানং ব সাগরো,
সিন্ধু'ব বনরাজীনং কিলেসমলহারকো।
বিজয়ী'ব মহাযোধো মারসেনপ্পমদ্দনো,
চক্কবত্তী'ব সো রাজা বোজঝঙ্গ রতনিস্সরো।

সম্রাট অশোকের আমন্ত্রণক্রমে ইন্দ্রগুপ্ত স্থবির[৫১] মগধরাজ্যে আগমণকালে নগরীকে অপরূপ সাজে সজ্জিত করা হয়েছিল। লেখক সজ্জিত নগরীর চমৎকার বর্ণনা দিয়েছেন ;

ধোতমুক্তা সমা ভাসা ওকিরিত্বান বালুকা,
উস্সাপিতা তত্থ তত্থ দুস্সোতরণ পন্তিয়ো।
কলধোত হেমরণ্ডাদী-নানাতোরণ পন্তিয়ো,
তথাপুপ্ফমযাকেন তোরণুপরি তোরণা।
তেসু তেসু চ ঠানেসু সজ্ঝতা কুসুমগ্গিকা,
তথেব গন্ধতেলেহি দীপিতা দীপপন্তিয়ো।
পদুমুপ্পল-সন্নীর পুপ্ফপল্লব' অলঙ্কতা
ঠপিতা ঘটমলোয়ো পুণ্ন সুগন্ধবারিহি।
মগ্গস্স উভতো পস্সে বনং আসিং সমাকুলং,
কেনবো উগ্গতা তত্থ মন্দ-মন্দ-সমীরণং।
অবৃয়ন্তা'ব সোভন্তি ব্রহ্মোরগ সুরাদয়ো,
নাগ-চম্পক-পুন্নাগ-কেতকি-বকুলাদিহি।
মালাদামেহি নেকেহি মগ্গং আসি বিচিত্তকং,
পত্থরিত্বা পাদপটে সিত্তসম্মট্ঠ ভূমিয়ং।
লাজাদি পঞ্চপুপ্ফানি বিকিরিংসু মনোরমং
অলঙ্কারিত্ব হত্থস্স কুসুমাভরণাদিহি।
নচ্চন্তি চতুরা নারী রসভাব নিরন্তরা,
কংসবংসাদি পগ্গয্হ বজ্জেন্তা নেকাতন্তিয়ো।
থয়ন্তি মধুরং গীতং গায়ন্তেত্থ লয়ানবিতং,
মগ্গো সো সাধুবাদেহি ভেরিনং নিনদেহি চ।
তথা পুণ্নঘটে গয্হ পদুমুপ্পলসঙ্কুলে,
অট্ঠমঙ্গলমুগ্গয্হ তিট্ঠন্তি পমদা তহিং।

লেখক দুটি গাথায় বোদিরাজকুমারীর[৫২] যে সৌন্দর্য ব্যক্ত করেছেন তা অপূর্ব-
নীলধম্মিল্লভারা সা বিসলায়তলোচনা,
সোণ্নদোলাভ সবণা সামা সুভ পয়োধরা।

www.pathagar.com

সতরংসীহি সম্মিস্স সঞ্ঞঝাম্বু দসমাধরা,
তুঙ্গনাসা নীল ভমু হাসভাসা মনোরমা।

বীরযোদ্ধা দাঠাসেন[৫৩] যুদ্ধাবসানে প্রব্রজ্যা গ্রহণের নিমিত্ত অর্হতের সন্ধান জানতে চাইলে চোলরাজ্যের জনগণ তাঁকে অর্হতের বাসস্থানের যে প্রাকৃতিক বর্ণনা দিয়েছেন তা কবি-লেখক বেদেহ স্থবিরের লেখনীতে মূর্ত হয়ে ফুটে উঠেছে। কিছু উদাহরণ,

ইতো উত্তরতো যত্থ দিস্সতে'য়ং মহানগো,
ময়ূরগীব সঙ্কাসো নীলোভাসো মনোরমা।
লবুজম্ব জম্বুরম্ভাদি তরুরাজি বিরাজিতা,
নাগ চম্পক পুন্নাগ ফুল্ল পাদপমুজ্জলো।
... ...
যথা'নন্তা সকুন্তানং মধুরালপ নিস্সিতং,
নেক নিজ্ঝর নিগ্ঘোসং দেব দুন্দুভি সন্তিহং।
যত্থ পব্বত কুটেসু নচ্চন্তি সিখিতো মুদা,
কেকা নাদেহি দেবানম'ব্ভন্তে'ব সমন্তনো।
কিলেসারি রণে সরণো সো'যম্পব্বত বারণো,
যতীনং তিদসানং'ব রণে রাবণ বারণো।
যতে' বারণ দন্তগ্গে নচ্চন্তি সুরসুন্দরী,
যহিং নচ্চন্তি সেলগ্গে তথা সাখাসু মঞ্জরী।
... ...
নদী কন্দর বাহাহি সরসি কামিনী যহিং,
আলিঙ্গিতা'ব সোভন্তি ধরাধর নরাধিপং।
তিট্ঠন্তি ফুল্লিতা যত্থ কপ্পূরা'গরা চন্দনা,
দেবঙ্গনাহি সঞ্জন্ন ছায়ানন্দন সন্নিভা।
ফলিতো তাল হিন্তাল সিন্দি সততীর ঘোন্টকা,
সলিলা যত্থ নচ্চন্তি মনুঞ্ঞঞা মালুতেরিতা।
বুদ্ধ পঙ্কজ কল্হারা কেরা উপ্পল মালিনী,
পোক্খর রঞ্ঞো বিরাজেন্তি রসবন্তা যহিং সদা।

লেখক লৌহকূট বিহারের[৫৪] প্রাকৃতিক দৃশ্যের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতুলনীয়। যেমন,--

ইতো উত্তরো পস্সম্হি লোহকূটব্হ পব্বতো,
বিহারো রমণীয়ো'সি বিতরাগানামা'লয়ো।
পূব্ব পশ্চিম পস্সে চ তত্থ দক্খিণ উত্তরে,

চত্তারো পব্বতা আসুং মহন্তা রত্তাময়া।
তেসু পব্বত পাদেসু নানা ফলধরা দুমা,
বাতেরিতা'তি সোভন্তি নীলোভাসা মনোরমা।
চম্পকা নাগ পুন্নাগাসালা চ সল্লা'গরু,
সীতলগ্‌গন্ধিকা নীপা অসোক বকুলাদিকা।
নানা বণ্ণেহি পুপ্‌ফেহি পুপ্‌ফিতা দেবগন্ধিকা,
তিট্‌ঠন্তি ওকিরন্তা তে মধুকিঞ্জক্‌খরেণ বো।
তালহিন্তাল সন্নীর রম্ভ পূহাগ পন্তিয়ো,
বিরোচমানা তিট্‌ঠন্তি বিহারো পবনে তহিং।
ধোতমুত্তা ভবন্নুহি সখনা মালকাবলি,
বিভন্তা তথা সোভন্তি দুদ্ধ সাগর সন্নিভা।

... ...

পদুমুপ্‌পল সুগন্ধি ফুল্ল মুদ্দালকেহি চ,
সমাকুলা পোক্‌খরঞ্ঞো একতিংসতি মণ্ডিতা।

... ...

হিংসলরাজ দুট্‌ঠগামণির পুত্র সালিরাজকুমার[৫৫] উদ্যানক্রীড়া করতে গিয়ে দিব্য-রূপলাবণ্যময়ী রূপসী তন্বী চণ্ডাল কন্যাকে দেখে মুগ্ধ হন। লেখক সালিরাজকুমারের মুখ দিয়ে চণ্ডালকন্যার রূপের যে বর্ণনা দিয়েছেন তা অতি চমৎকার। একজন সত্যিকারের কবির পক্ষেই এরূপ বর্ণনা সম্ভব। যেমন–

পাদাতে প'দুমা'কারা সুরত্তা মৃদু কোমলা,
হেমমোরস্‌স গীব'াব জঙ্ঘা নেত্ত রসায়না।
ভদ্দ তে পীবরা উরু হেম রম্ভো'পমা সুভা,
হত্থেন পমিতব্বং তে মজ্ঝিমঙ্গং বিরাজতি।
তরঙ্গভঙ্গিং সাধেতি ভদ্দে তে রূপ সাগরে,
বলিত্তয়'মবিচ্ছিন্নং রোমরাজিং বিরাজিতং।
উরোরূভাতি সোভন্তি ভদ্দে তে রূপসাগরে,
সোণ্ণবুব্বুল কঞ্চন্দ সমা উত্তর সাগরে।
বাহু সোভন্তি তে ভদ্দে পাণিপল্ললঙ্কতা,
কপ্‌পলতায় সঞ্জাতা পারোহা'র মহব্ভুতা।
বত্তসারাদি চন্দে তে ভাস রংসি বিমিস্‌সিতো,
বিকাসয়তি মে ভদ্দে মনোকেরব কাননং।
পক্ক করক জীবানং পন্তী'র দন্ত পন্তিয়ো,
ভাসমানায় তে ভদ্দে রত্তোট্‌ঠং সুবিমিস্‌সিতা।
সিঙ্গার মন্দিরে বদ্ধ কেতু'র হেম যট্‌ঠিয়ং
চিল্লী বল্লী বিরাজন্তি অব্ভেন্তো বিয় কামকে।

www.pathagar.com

নীলবেল্লিত ধম্মিল্লং তাপিঞ্জ পুপ্ফকোপমং।
সেবিতং মালতী মালা দামোনা'তি মনোরমং।

বেদেহ স্থবির দ্বিতয়ি দম্পতি[৫৭] কাহিনীতে কাব্যে নারী চরিত্র অঙ্কন করেছেন অতি চমৎকারভাবে। কি রকম নারী গ্রহণযোগ্য এবং কি রকম নারী পরিত্যাজ্য তার বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন আলোচ্য কাহিনীতে।

অগ্রণযোগ্য নারী চরিত্র বর্ণনা করেছেন এভাবে,–
যা কঞ্ঞা দেবকঞ্ঞা'ব হোতি সব্বঙ্গ সোভনা,
তস্সাবে দুগ্গুণা হোতি তেহি রূপং পিথীয়তি।
উত্তরোট্ঠে কপোলে চ উরু জজ্ঞাসু বাহুসু,
সা বে পতিং বিনাসেতি যস্সা হোন্তি তনূরুহা।
স লালামহতী কণ্হা'ধরা কুলদ্বিজা খরা,
খল্লাটা চ কলারা চ যা সা দুক্খস্স ভাগিনী।
কাণা কেকরা অন্ধ বিসমক্খি মধুপিঙ্গলা,
নিক্খন্ত বুব্বুলাকার নেত্তা সা বিধবা ভবে।
খরস্সরা চ যা হোতি পিসুনা মিত্তদোহিকা,
কলহপ্পিয়া কোটমনা সা ভরিয়া মচ্চুসাদিসা।
চোরী'র কঠিনা সা নু সুরাপায়ী মুসা রতা,
উন্নলা কেলিসীলা ব সা কঞ্ঞা বিধবা সিয়া

... ...

আর সচ্চরিত্র নারীর আচরণ হবে এরূপ,–
ভোজনে সয়নে গমনে ভয়ে ব্যাধি উপদ্দবে,
সমাচিত্তা সদা হোতি সা হোতি পতিপূজিকা।
মাতাপিতুসু ভাতাদি সস্সু সসুরাদি ঞাতকে,
সাদরেন উপট্ঠাতি সা হোতি কুলনন্দিনী।
দাসকম্ম করে কম্মে যা ধম্মেন নিয়োজতি,
নিক্খিত্ত দণ্ড ফরুসা সা হোতি জনরঞ্জনী।
যা দানাভিরতা হোতি ভীসু বত্থুসুমামাকিা,
সীলাচার গুণুপেতা ভরিয়া ধম্মচারিনী।
ভূমিং অকম্পয়ং যাতি যাতি কঞ্ঞা সনিং সনিং,
দিসং যা না'বলোকেতি ন পক্খলতি ভূমিয়ং
সা পি কঞ্ঞা বরারোহা বরিতব্বা বরেনি'ধা'তি।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তসমূহে দেখা যায়, লেখক একজন উঁচুস্তরের কবিও বটে। প্রতিটি কবিতায় যে সৌন্দর্য্যবোধের পরিচয় পাওয়া যায় তা আধুনিক কবিতার সঙ্গে তুলনা করা

www.pathagar.com

যেতে পারে। প্রতিটি কবিতায় বক্ষ্যমান বিষয়টিকে অতি সুস্পষ্টভাবে ছন্দে উপস্থাপন করা হয়েছে, এ কারণে আলোচ্য রসবাহিনীর প্রায় সবকয়টি কবিতাই কাব্যিক মূল্যে অসাধারণ হয়ে ফুটে উঠেছে। কবি-লেখক-বৈয়াকরণ বেদেহ স্থবিরের পরশস্পর্শে এটি একটি কাব্যে পরিণত হয়েছে।

রসবাহিনীর গল্পে প্রচুর সমাসবদ্ধ শব্দ লক্ষ্য করা যায়, তবে শব্দগুলো ছোট ছোট এবং বোধগম্য। সংস্কৃত সাহিত্যের ন্যায় কিছু কিছু দীর্ঘ ও দুর্বোধ্য সমাসবদ্ধ শব্দও কোনো কোনো গল্পে দৃষ্ট হয়। কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া হলো- সুফুল্লিতনেকলতাকুলাকুলে (ধম্মসোণ্ডক বত্থু), দসবস্‌সসহস্‌সাযুকেসুমনুসেসু (নন্দিরাজস্‌স বত্থু), সুভাসুভ।' মিস্‌সিতসীতবাতো (চোর সহায়স্‌স বত্থু), লোকপজ্জোতকস্‌সা'হং (সাখামালপূজিকায় বত্থু), হয়গজরথমলক্যা (তেভাতিক মধুবাণিজকানং বত্থু), অসীতিহত্থা'কাসমব্‌ভুগ্‌গন্ত্বা (দাঠাসেনস্‌স বত্থু), পব্বতা'মভিরূহিতুম'সক্কোন্তো (ঐ), পটিচ্ছজেতু' মসক্‌কোন্তো (জয়ম্পতিকানং বত্থু), বিসালায়তনীলক্‌খা (চূল্লগল্ল বত্থু), নিসিন্নাসনবট্‌ঠায় (দন্তকুটুম্বিকস্‌স বন্ধু) ইত্যাদি। এ ছাড়া সংস্কৃত সাহিত্যে বহুল ব্যবহৃত কিছু কিছু শব্দ এখানে কোনো কোনো পদ্যাংশে প্রয়োগ করা হয়েছে। যেমন- বিম্বাধরা, চারুপয়োধরা (চূল্লগল্ল বত্থু-১০১), জম্বুরম্ভাদি তরুরাজি, তালহিন্তাল সণ্ণীর (দাঠাসেনস্‌স বত্থু ৮.৪), মালতীমালা, তুঙ্গনাসা (সালিরাজকুমারস্‌স বত্থু ৮.৬), নীলায়তা বিসালক্‌খা, পঙ্কজকানন (কিঞ্চিসজ্ঝায় বত্থু ৬৯) ইত্যাদি।

রসবাহিনীর গল্পগুলোর অন্যতম বৈশিষ্ট্য হচ্ছে- এর অধিকাংশ কাহিনী নাতিদীর্ঘ। ফলে গল্প কথক এবং শ্রোতা উভয়ে ধৈর্যহীন হয়ে পড়েন না। পরিমিত সময়ের মধ্যে কহাতব্য কাহিনী সমাপ্ত হয়। অবশ্য এখানে কয়েকটি খুব ছোট আবার কয়েকটি খুব বড় কাহিনীও রয়েছে। যেমন- অঞ্ঞতর মনুস্‌সস্‌স বত্থু (২.২), মরুত্তব্রাহ্মণস্‌স বত্থু (২.৮), মিগপোতকস্‌স বত্থু (৫.১), মহাসোণস্‌স বত্থু (৭.৬), ভরণস্‌স বত্থু (৭.৯), খঞ্জদেবস্‌স বত্থু (৮.১), রট্‌ঠিক পুত্তস্‌স বত্থু (৮.১০), সিলত্তস্‌স বত্থু (৯১.) ইত্যাদি খুব ছোট আকারের গল্প। তেভাতিক মধুবাণিজকানং বত্থু (৪.৮) কাকববণ্ণতিস্‌স মহারঞ্ঞো বত্থু (৭.২), দুট্‌ঠগামণি অভয় মহারঞ্ঞো বত্থু (৭.৩) ইত্যাদি কয়েকটি গল্প অনেক বড়।

সর্বসাকুল্যে বলা যায় যে, আলোচ্য গ্রন্থে ভাষাগত কিছু ত্রুটি থাকলেও তা নগণ্য, কিন্তু সামগ্রিকভাবে এটা একটি সার্থক উপাদেয় গল্প বা উপাখ্যান সংকলন। প্রতিটি কাহিনী জাতকের মতই পাঠকের মনে রেখাপাত করে। গুটি কয়েক গল্পের বিষয়বস্তু অতি সাধারণ এবং সাহিত্যের পর্যায়ভুক্ত করার অনুপযোগী বটে, আবার আরও কয়েকটি কাহিনীর মধ্যে পারস্পরিক মিল রয়েছে, এসব কাহিনী ব্যতীত অন্য সকল কাহিনী ধর্মরস ও কর্মরসে সমৃদ্ধ এবং এসবের প্রত্যেকটির বিষয়বস্তুর গভীরতা যেমন রয়েছে সাহিত্যের গুণগত মানও রয়েছে। উপরন্তু প্রতিটি গল্পের শেষে সংযোজিত উপদেশবাণীসমূহ সর্বকালে সার্বজনীন। অতএব, পরবর্তী পালি সাহিত্যের ইতিহাসে 'রসবাহিনী' একটি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণ ব্যতিক্রমধর্মী, সার্থক ও অনন্য সাধারণ বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক গল্প বা উপাখ্যান সংকলন- একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়।

তথ্যনির্দেশ

১. Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 225—The Book (Rasavahini) is very widely used as an elementary Pali reader in temple-school even to this day. The free and easy flow of language makes it pleasant reading. While the wealth of its descriptions furnishes the student with a copious vocabulary.

২. History of Pali Literature, Vol. 11, ibid, P. 63. This work throws much light on the manners, customs and social conditions of ancient India and Ceylon. It contains materials of historical importance ...; Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 225.

৩. A History of Indian literature, Vol. 11, ibid, P. 216.

৪. Chaps. i. v, vi, vii, xi, etc.

৫. Chaps. v, xi, xx etc.

৬. PP. 35 ff.

৭. ii, 200 ff.

৮. Chaps. xviii, 53; six 1 ff.

৯. Chaps. xxii–xxxii.

১০. i, 102.

১১. Malalasekera. G.P., Dictionary of Pali Proper Names Vol. 1, Munshiram Manoharlal Publishers Pvt. Ltd. 1995, P. 1093.

১২. xxi, vv, 10–12.

১৩. The Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 31.

১৪. Mahavamsa, xxi, v, 14, Rasavahini, ibid P. 163 ff.

১৫. Dictionary of Pali Proper Names, ibid, P. 1093.

১৬. মিগলুদ্দকস্‌স বত্থু (১.২), পৃ. ৮।

১৭. অঞ্ঞতর মনুস্‌সস্‌স বত্থু (২.২), পৃ. ৩২।

১৮. বিসমলোমমাস্‌স বত্থু (২.৩), পৃ. ৩৪।

১৯. চোর সহায়স্‌স বত্থু (২.৭), পৃ. ৪২।

২০. সহায়স্‌স পরিচ্চত্ত জীবিতকস্‌স বত্থু (২-১০), পৃ. ৪৬।

২১. সদ্ধোপাসকস্‌স বত্থু (৩.৭), ৬৩।

www.pathagar.com

২২. কুড্ডরজ্জবসিখেরস্‌স বত্থু (৫.৩), পৃ. ১০৯।

২৩. উত্তরোলিয় বত্থু (৬.১), পৃ. ১২৮।

২৪. তিস্‌সায় বত্থু (৬.৫), পৃ. ১৩৮।

২৫. সুরনিম্মলস্‌স বত্থু (৭.৫), ১৯০।

২৬. ভরণস্‌স বত্থু (৭.৯), পৃ. ২০১।

২৭. বেলুমুসনস্‌স বত্থু (৭.১০), পৃ. ২০৩।

২৮. দাঠাসেনস্‌স বত্থু (৮.৪), পৃ. ২১৫।

২৯. ধম্মদিন্নথেরস্‌স বত্থু (৮.৯), পৃ. ২৩৪।

৩০. হেমায় বত্থু (৯.৩), পৃ. ২৪১।

৩১. নকুলস্‌স বত্থু (৯.৬), পৃ. ২৪৯।

৩২. বানরস্‌স বত্থু (৯.৮), পৃ. ২৫২।

৩৩. চূলগল্ল বত্থু (১০.১), পৃ. ২৬৭।

৩৪. পুটভত্তদায়িকায় বত্থু (১০.৬), পৃ. ২৭৮।

৩৫. অঞ্ঞতর কুমারিকায় বত্থু (১০.৯), পৃ. ২৮৯।

৩৬. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, পৃ, ৮-১০।

৩৭. প্রাগুক্ত, ধম্মদিন্নথের বত্থু, পৃ. ২৩২-৩৪, অম্বামচ্চস্‌স বত্থু, পৃ. ২৪৯-২৫১।

৩৮. প্রাগুক্ত, চূলতিস্‌স বত্থু, পৃ. ১৩৩-১৩৫, গামদারিকায় বত্থু, পৃ. ১৪৪-১৪৬।

৩৯. প্রাগুক্ত, উত্তরোলিয় বত্থু, পৃ. ১২৬-১২৮।

৪০. প্রাগুক্ত, কিঞ্চিসজ্ঝায় বত্থু, পৃ. ১৪৯-১৫৩।

৪১. প্রাগুক্ত, হেমায় বত্থু, পৃ. ২৩৯-২৪১।

৪২. A History of Indian Literature, ibid, P. 216. "The book was written orginally in Sinhalese language, then translated by a certain monk named Ratthapala into Pali ..."

৪৩. রসবাহিনী, প্রাগৃক্ত, পৃ. ১।

৪৪. The Pali Literature of Ceylon, ibid, P. 225.

"Vedaha, who was of poetic temperament, and therefore, loved beauty of diction, was not satisfied with such and intertistic presentation of these homely stories, and he procided to clothe them in a new garb."

৪৫. বড়ুয়া, রবীন্দ্র বিজয় ; পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮৮, পৃ. ২৭১।

৪৬. The Pali Literature of Ceylon, ibid. P. 225.

www.pathagar.com

৪৭. A History of Indian literature, Vol. 11, ibid, P. 205.

৪৮. The Pali literature of Ceylon, ibid. P. 225.

৪৯. রসবাহিনী, প্রাগুক্ত, বেস্সামিত্তায় বত্থু, পৃ. ১৮।

৫০. প্রাগুক্ত, পৃ. ৫৭-৫৮।

৫১. প্রাগুক্ত, ইন্দগুত্তথেরস্স বত্থু, পৃ. ৮১-৮২।

৫২. প্রাগুক্ত, বোধিরাজধীতায় বত্থু, (পৃ. ১০২।

৫৩. প্রাগুক্ত, দাঠাসেনস্স বত্থু, পৃ. ২১২-২১৩।

৫৪. প্রাগুক্ত, পৃ. ২১৪-২১৫।

৫৫. প্রাগুক্ত, সালিরাজকুমারস্স বত্থু, পৃ. ২২১-২২২।

৫৬. প্রাগুক্ত, চূল্লগল্ল বত্থু, পৃ. ২৫৬-২৬৭।

৫৭. প্রাগুক্ত, দুতিয় জয়ম্পতিকানং বত্থু, পৃ. ২৮৩-২৮৪।

www.pathagar.com

গ্রন্থপঞ্জি

বাংলা ও অনুবাদ গ্রন্থ

কবিরাজ, গোপীনাথ : ভারতীয় সাধনার ধারা, কলিকাতা, ১৯৬৮।

ঘোষ, ঈষাণচন্দ্র : জাতক, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, করুণা প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৩৮৪-১৩৮৬ বাং।

ঘোষ, মহেশচন্দ্র : বুদ্ধপ্রসঙ্গ, বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রহ, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৬৩ বাং।

চৌধুরী, বিনয়েন্দ্রনাথ : বৌদ্ধসাহিত্য (সম্পাদনা, ডঃ সুকোমল চৌধুরী), মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৬।

চৌধুরী, সুকোমল : বাংলাদেশে বৌদ্ধধর্ম ও সংস্কৃতি, কলিকাতা ১৩৮০ বাং।
: মহামানব গৌতম বুদ্ধ, মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৬।

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ : বৌদ্ধধর্মে ভক্তিবাদ, ১৩১৮ বাং, ধর্ম, ১৩১১ বাং, ধম্মপদং, ১৩১২, বুদ্ধদেব, ১৩৬৩ বাং।

ঠাকুর, সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত : বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৯০১।

দত্ত, অক্ষয়কুমার : ভারতীয় উপাসক সম্প্রদায়, কলিকাতা, ২য় সংস্করণ, ১৩৬৩ বাং।

দত্ত, সুকুমার : মহাপরিনির্বাণের কথা, ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, ভারতবর্ষ।

দাশগুপ্ত, নলিনীনাথ : বাঙ্গালায় বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৩৫৫ বাং।

দাশগুপ্ত, শশীভূষণ : বৌদ্ধধর্ম ও চর্যাগীতি, কলিকাতা, ১৩৭১ বাং।

দাস, আশা : জাতকের পটভূমিকায় বাংলা লোকসাহিত্য, কলিকাতা, ১৯৯৫।
ষড়কেশধাতুবংশ (অনু.), মহাবোধি বুক এজেন্সী, কলিকাতা, ১৯৯৪।

বন্দ্যোপাধ্যায়, অনুকুলচন্দ্র : বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম, কলিকাতা, ১৯৮৯।
: বৌদ্ধসাহিত্য ও শিক্ষা-দীক্ষার রূপরেখা, কলিকাতা, ১৯৭৮।

বন্দোপাধ্যায়, বিশ্বনাথ : পালি ও প্রাকৃত সাহিত্যের ইতিহাস, কলিকাতা, ১৩৭৯ বাং।

বন্দোপাধ্যায়, হরিশ্চন্দ্র : বঙ্গীয় শব্দকোষ, নূতন দিল্লী, সাহিত্য একাদেমী, ১৩৭৩ বাং।

বসু, মলয় : বাংলা সাহিত্যের রূপকথা চর্চা, কলিকাতা, ১৯৮০।

www.pathagar.com

বড়ুয়া, গিরিশচন্দ্র	ঃ	ধম্মপদ, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৮।
বড়ুয়া, দীপংকর শ্রীজ্ঞান	ঃ	বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস (সদ্ধর্ম সংগ্রহ, অনু.), কলিকাতা, ১৯৯৭।
	ঃ	বাঙালি বৌদ্ধদের ইতিহাস, ধর্ম ও সংস্কৃতি, বাংলাদেশ পালি সাহিত্য সমিতি, চট্টগ্রাম, ২০০৭।
বড়ুয়া, বেণীমাধব	ঃ	বৌদ্ধসাহিত্যে পরিত্রাণসূত্রের উদ্ভব ও লৌকিক বৌদ্ধধর্মে ইহার প্রভাব, জগজ্জ্যোতি (Dr. B.M. Barua Birth Centenary Commemoration Volume), কলিকাতা, ১৯৮৯।
	ঃ	প্রার্থনা ও উপাসনা, ঐ।
	ঃ	বৌদ্ধসমাজ গঠনের ধারা, ঐ।
	ঃ	বৌদ্ধ গ্রন্থকোষ, কলিকাতা, ১৯৩৬।
বড়ুয়া, রবীন্দ্রবিজয়	ঃ	পালি সাহিত্যের ইতিহাস, ১ম-২য় খণ্ড, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৮২-১৯৮৮।
বড়ুয়া, সুনন্দা	ঃ	বাংলা সাহিত্যে বৌদ্ধ উপাখ্যান, বাংলা একাডেমী, ঢাকা, ১৯৯৩।
বড়ুয়া সুধাংশুবিমল	ঃ	বাঙালী বৌদ্ধদের পূজাপার্বণ ও উৎসব, মাসিক বসুমতী, পৌষ, ১৩৭০ বাং।
	ঃ	রবীন্দ্রনাথ ও বৌদ্ধ সংস্কৃতি, কলিকাতা, ১৩৩৬ বাং।
বাগচী, প্রবোধচন্দ্র	ঃ	বৌদ্ধধর্ম ও সাহিত্য, কলিকাতা, ১৩৯৫ বাং।
ভিক্ষু অনোমদর্শী ও প্রজ্ঞালোক মহাস্থবির	ঃ	ধম্মপদ (সানুবাদ), কলিকাতা, ১৯৫৩।
ভট্টাচার্য, আশুতোষ	ঃ	বাংলার লোক সাহিত্য, ১ম-৬ষ্ঠ খণ্ড, কলিকাতা, বুক হাউস, ১৯৬২-১৯৭৮।
ভট্টাচার্য, বিনয়তোষ	ঃ	বৌদ্ধদের দেবদেবী, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, কলিকাতা, ১৩৬২ বাং।
ভট্টাচার্য, মহামহোপাধ্যায় কমলকৃষ্ণ	ঃ	কথা সরিৎসাগর (অনু.), ১ম-২য় বসুমতী সাহিত্য মন্দির, কলিকাতা।
ভিক্ষু, জ্যোতিপাল	ঃ	উদানং (সানুবাদ), রেঙ্গুন, ১৯৩০।
ভিক্ষু, শীলভদ্র	ঃ	থেরীগাথা (অনু.), মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ৯৫০।
	:	দীর্ঘনিকায় (অনু.), মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা।
মহাস্থবির, ধর্মকীর্ত্তি	ঃ	ধম্মপদট্‌ঠকথা (অপ্‌পমাদবগ্‌গ) সানুবাদ, পাকিস্তান বৌদ্ধধর্ম প্রচার সংসদ, চট্টগ্রাম, ১৯৬৯।
মহাস্থবির, ধর্মাচার	ঃ	মিলিন্দ প্রশ্ন (অনু.), ধর্মাধার বৌদ্ধ গ্রন্থ প্রকাশনী, কলিকাতা, ১৯৮৭।
	ঃ	ধম্মপদ (সানুবাদ), কলিকাতা।

www.pathagar.com

	ঃ	বুদ্ধের ধর্ম ও দর্শন, কলিকাতা, ১৯৭৪।
মহাস্থবির, জিনবংশ	ঃ	ধম্মপদট্‌ঠকথা (অনু.), চিত্তবর্গ, ১৩৯৩ বাং, পণ্ডিতবর্গ, ২৫২৭ বুঃ।
	ঃ	জরাবর্গ ১৩৯৫ বাং, ভিক্ষুবর্গ, ১৩৯৫ বাং, ব্রাহ্মণবর্গ, ১৩৯২ বাং।
	ঃ	পেতবথ্থু (প্রেতকাহিনী অনু.), চট্টগ্রাম, ১৩৬৫ বাং।
মহাস্থবির, শীলালংকার	ঃ	ধম্মপদট্‌ঠকথা (সানুবাদ), যমকবগ্‌গ, মহাবোধি সোসাইটি, কলিকাতা, ১৯৬২।
	ঃ	বিমানবথ্থু, (অনু.), রেঙ্গুন।
মুচ্ছুদ্দী, দ্বারিকামোহন	ঃ	দাঠাবংস (সানুবাদ), রেঙ্গুন, ১৯৩৫।
রাজগুরু, ধর্মরত্ন মহাস্থবির	ঃ	মহাপরিনিব্বান সুত্তং (সানুবাদ), চট্টগ্রাম, ১৯৪১।
শাস্ত্রী, হরপ্রসাদ	ঃ	রচনা সংগ্রহ (৩য় খণ্ড), পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষদ, কলিকাতা, ১৯৮৪।
লাহা, বিমলাচরণ	ঃ	সৌন্দরনন্দ কাব্য (অনু.), গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এন্ড সন্স, কলিকাতা, ১৩২৯ বাং।
স্থবির	ঃ	থেরগাথা (অনু.), রেঙ্গুন, ১৯৩৫।

Pali Books

Anguttara Nikaya, Vols. I–VI, ed. R. Morries. E. Hardy, C.A.F. Rhys Davids, PTS. London, 1885–1910.

Anguttara Nikata, Vols. I–V, ed. Bhikkhu J. Kasyap, Nalanda Deva Nagai Pali Series, Bihar, 1960.

Chakesadhatuvamsa, ed. Minayeff, JPTS. 1885.

Culavamsa, ed. Wilhelm Geiger. PTS. London, 1925–1927.

Dathahavamsa ed. and trans. B.C. Law. Lahore, 1925.

Dathavamsa ed. and trans. by Coomarswami, JPTS. 1984. P. 109 ff.

Dhammapada Atthakatha, Vols. I–V, ed. H. Smith, H.C. Norman, L.S. Talaing, PTS. London, 1906–1915.

Digha Nikaya, ed. T.W. Rhys Davidis and J.E. Carpenter, Vols. 1–3, London, 1885–1910.

Dipavamsa, ed. H. Oldenberg, London, 1879.

Dipavamsa and Mahavamsa, ed. W. Geiger, London, 1879.

Jataka, vol. I-VII, ed. Fausboll, PTS. London, 1877-1897

Jataka (with commentary) Vols. I–VI, ed. Fausboll, PTS. London, 1962.

Jinacarita, ed. and Trans. by W.H.D. Rouse, JPTS,P. 1 ff, 1904–5.

Jinakalamali, ed. A.P. Buddhadatta mahathera, London, 1962.

www.pathagar.com

Jinalankara, ed. and Trans by Games Gray, London, 1894.

Mahavamas, ed. W. Geiger, PTS. London, 1908.

Mahavamsa, ed. Sumangala and Batuvantudeva, Colombo, 1905.

Majjhima Nikaya Vols. I–IV, ed. V. Tranckner, R. Chalmers, Mrs. Rhys Davids, London, 1888–1925.

Manorathapurani (Anguttra Nikaya Atthakatha), Vols. I–V, ed. M. Walleser, H. Kopp, PTS. London, 1924-1956.

Manorathapurani 1, Ekanipata, ed. M. Walleser, PTS. London, 1924.

Milindapanha, ed. V. Trenckner, London, 1928.

Papancasudani (Majjhima Nikaya Atthakatha), Vols. I–V, ed. J.H. Woods, D. Kosambi, I. B. Herner, PTS. London, 1922–1938.

Paramattha Jotika (Khuddapatha Atthakatha), I, ed. H. Smith from a collection by Mabel Hunt, PTS. London, 1915.

Paramattha Jotika (Suttanipata Atthakatha), II, ed. H. Smith, PTS. London, 1916–1918.

Paramattha Jotika, ed. Welipitiya Dewananda Thera and revised Mahagoda Sri Nanissara Thera, Colombo, 1922.

Paramattha Dipani (Peta-Vatthu Atthakatha), ed. e. Hardy, PTS. London, 1994.

Paramattha-Dipani (Vimana-Vaatthu Atthakatha), ed. E. Hardy, PTS. London, 1901.

Paramattha-Dipani (Therigatha Atthakatha), ed. E. Muller, PTS. 1893.

Paramattha-Dipani (Udana–Atthakatha), ed. F.L. Woodward, PTS. 1926.

Peta-Vatthu, ed. J. Minayeff, PTS. London. 1888.

Rasavahini, (Sihalese Script), ed. K. Nanavimała Thera, Pub. by Hunasena, Colombo, 1961.

Saddhamma Sangaho, ed. N. Saddhananda, PTS. London, 1890.

Samantapasadika (Vinaya Atthakatha), I–VII, ed. J. Takakusu and Assisted by M. Nagai. PTS, London, 1924–1927.

Samjutta Nikaya, I–VI, ed. L. Fee and Mrs. Rhys Davids, PTS. London, 1884–1904.

Saratthappakasani (Samjuttan-nikkaya Atthakatha), I–II, ed. F.L. Woodward, PTS, London, 1929–1937.

Sumangalavilasini, ed. T.W. Rhys Davids and J.E. Carpenter, W. Stede, PTS, London, 1866.

Theragatha, ed. H. Oldengerg, R. Pischel, PTS, London, 1883.

www.pathagar.com

Therigatha, ed. H. Oldeberg, R. Pischel, PTS, London, 1883.
Thupavamsa, ed. Dharmaratana, Colombo, 1896.
Udana, ed. Paul Steinthel, PTS, London, 1885.
Vimanvatthu, ed. H. Hardy. PTS, London, 1901.

English Books and Journals

Adikaram, E.W. — The Early History of Budhism in Ceylon, Colombo, 1953.
Banerjee, A.C. — Buddhism in India an Abroad, Calcutta, 1973.
Bapat, P.V. (edited) — 2500 years of Buddhism, Delhi, 1956.
Barua, B. M. — A History of Pre- Buddhistic Philosophy, Calcutta University, Calcutta, 1921.
Buddhadatta and Buddhaghosa : "Their Contemporaneity and age, University of Ceylon Review, Vol. III, Colombo, 1945.
Barua, D.K. — Viharas in Ancient India, Calcutta, 1971.
Barua, R.B. — Some Importance Festivals of he Buddhists of East Pakistan, JASP. 1965.
Barua, S.B. — Buddhist Festival in Bengal. The Modern Review, March, 1966.
Bechert, H. — Contemporary Buddhism in Bengal and Tripura, Educational miscellany. Vol. IV, Nos. 3 and 4, 1967–68.
Bhandarkar, D.R. — Asoka, Calcutta, 1955.
Lectures on the Ancient History of India, Calcutta, 1919.
Bode, M.H. — The Pali Literature of Burma, London, 1909.
Brahmachari, Silananda — The Eternal Massage of Lord Buddha, (A study of Dhammapada), Calcutta, 1982.
Burlingame, E. W. — Buddhist Legends, Vols. 28–30. Harvard Oriental Series, Cambridge, MSS. U.S.A. 1921.
Buddhist Parables, yale University, 1922.
Cave, H.W. — Book of Ceylon, London, 1908.

Ruined cities of Ceylon, London, 1897.

Chaudhury, B.N. — Life and works of Buddhadatta, Journal of the Deptt. of Pali, Calcutta University, Vol. IV, 1987–88.

Chaudhuri, Sukomal — Living Buddhists of Bangladesh, Young East (New Series), Vol. 7, No. 3, Summer, 1981.

Contemporary Buddhism in Bangladesh, Calcutta, 1987.

Codrington, H.W. — History of Ceylon, London, 1926.

Conze, E. — A Short History of Buddhism, Bombay, 1927.

Coomarswamy, A.K. — Dipavamsa and Mahavamsa (Eng. Trans.) London, 1908.

Cunha, J. Gersonda — Memoir on the History of the Tooth relic of Ceylon, JBRAS, XI, 1975, P. 115 ff.

De, Gokul Das — Significance and Importance of Jataka, Calcutta University, Calcutta, 1981.

De Silva, L.A. — Buddhism, Beliefs and Practices in Srilanka, Ceylon, 1974.

Dutt, N. — Early History of the spread of Buddhism and Buddhist Schools, New Delhi, 1930 (rep.).

Dutt., S. — Buddhist Monks and Monasteries of India, London, 1962.

Eitel, E.J. — Buddhism in its Historical and popular Aspect, London, 1873.

Forchammer, E. — Report on Pali Literature of Burma, Govt. of India Publication, 1879.

Geiger, W. — Mahavamsa (Eng. translation), Colombo, 1912, rep. 1950.

Culture of Ceylon in Mediacval Times. (ed. Heinz Bechert), Wiesbaden, 1960.

"The Trustworthiness of the Mahavamsa" Indian Historical Quarterly, VI, 1930.

Godakumabara, C.E. — The Culavamsa, Journal of the Royal

www.pathagar.com

Asiatic Society, Ceylon branch, XXXVIII, Colombo, 1949.

: Sinhalese Literature, Colombo, 1855.

Gray, J. Buddhaghosuppatti or the Historical Romance of the Rise and Career of Buddhaghosa, London, 1892.

Halder (De.), Manikuntala History of Buddhism, Calcutta, 1989.

Gunasekera, M.B. A contribution to the History of Ceylon, translated from the Pujavaliya, Colombo, 1895.

Hardy, R. Spence Manual of Buddhism, London, 1880.

Commentary on Petavatthu, PTS. London, 1896.

Hazra, K.L. Studies on Pali Commentaries Delhi, 1991.

Harner, I. B. Women under Primitive Buddhism, George Routledge and sons Ltd. London, 1930.

Joshi, Lalmoni Studies in the Buddhistic Culture in India : during the 7th and 8th centuries A.D. Delhi, 1967.

Kern, H. Manual of Indian Buddhism, Delhi, 1970.

Kosambi, Dharmananda The Culture a Civilization of Ancient India : In Historical outline, New Delhi, 1977.

Lanerolle, Julius de. 'Place-names of Ceylon' Journal of the Royal Asiatic Society, Ceylon branch, XXXI, No. 83, Colombo, 1930.

Law, B.C. A History of Pali Literature, Vol. II, Vanarasi, 1974.

The life and works of Buddhaghosa, Delhi, 1976.

Buddhaghosa, Journal of the Bomby Branch of Royal Asiatic Society, Bombay, Monograph Series.

The Buddhist conception of Sprits

www.pathagar.com

(Legends from the Petavathu Commentary), 1923.

A manual of Buddhist Historical traditions, Calcutta university Publication, Calcutta, 1941.

Samantapasadika, Indian Culture, Vol. XII, July 1945, June 1946, Nos. 1–4 Calcutta.

: Heaven and hell in Buddhist Perspective, Sonarpur, Vanarasi, 1973.

On the Chronicles of Ceylon, Calcutta, 1947.

Historical Geography of Ancient India, Paris,1954.

A note on Saratthappakasani, Indian Culture, Vol. XII, 1945–1946.

Women in Buddhist Literature, Colombo, 1927.

Thupavarnsa (Tr. into Eng.), Calcutta, 1946.

Mahathera, Narada — The Buddha and his Teachings, 3rd ed. Colombo, 1977.

Majumdar, R.C. — Ancient India, Motilal Banarasidas, Banaras, 1952.

Malalasekera, G.P. — The Pali Literature of Ceylon, 1st Published 1928, reprinted, Colombo, 1958.

Martin South Won. — Buddhism in life : Anthropological study of Religion and Sinhalese practice of Buddhism (Manchaster University Press) 1983.

Mehta, Ratilal N. — Pre-Buddhist India, Bombay, 1939.

Mendis G.C. — The Early History of Ceylon, Calcutta, 1935.

The chronology of the Pali chronicles of Ceylon, University of Ceylon review, V, Colombo, 1947.

www.pathagar.com

Mookherjee, R.K. : Asoka, London, 1928.

Mukhopadhyaya, Bandana Life in Ancient Indian, Calcutta, 1996.

Muller, E. Commentary on the Therigatha, London, 1892.

Ancient Inscriptions of Ceylon, London, 1883.

Nicholas, C.W. "The Territorial Divisions of Ceylon from Early Times to the Twelfth Century" University of Ceylon review, IX, Colombo, 1951.

Nickolas, C.W. and Paranavitana, S. : A concise History of Ceylon, Colombo, 1962.

Oldenberg, H. and Rhys Davids, T.W. Sacred Books of the East, (Tr. of Vinaya Pitak), Oxford, 1881–85.

Paranavitana, S. The Chronology of Ceylon Kings, Mahasena Mahinda V; Epigraphia Zeylanica, V. Colombo, 1955.

Parker, H. : Ancient Ceylon, London, 1909.

Perera, H.R. Buddhism in Ceylon, its past and present, The Wheel Publication No. 100, Kendy, 1966.

Rahula, Walpola History of Buddhism in Ceylon, Colombo, 1966.

Ray, H.C. and Paranavitana, S. :History of Ceylon, Vols. 1, 2 Parts, Colombo, 1959, 1960.

Rhys Davids, T.W. Buddhist India, London, 1903.

Buddhist Birth Stories, George Routledge and Sons Ltd. 1925.

Buddhist Suttas, Sacred Books of the East, XI, Frowde, 1881.

Vinaya Texts, Sacred Books of the East, XII, XVII, XX, Frowde, 1881–1885.

Dialogues of the Buddha, 3 Vols. Frowde, 1900–1921.

www.pathagar.com

	Buddhism; its History and Literature, Putman, 1896.
	: Early Buddhism, Delhi, 1976.
	: Milindapanha (Eng. translation), SBE, Vols. 35–36.
Rhys Davids, Mrs. C.A.F.	Psalms of the Brethren, London.
Saha, Kshanika	Buddhism and Buddhist Literature in Central Asia, Calcutta, 1970.
Saint-Hilare, J Barthelemy	Buddhism in Indian and Srilanka, New Delhi, (rep.) 1975.
Seneviratana, John M.	The Story of the Sinhalese 2 Vols. Colombo, 1923.
Sharma, R.S.	Light on early Indian Society and Economy, Bomby, 1966.
	Perspectives in Social and Economic History of Early India, Delhi, 1983.
Smith, V.A.	Early History of India, Clarendon press, 4th ed. 1924.
	Asoκa (Rulers of India Series), London, 1909.
Srivastave, Balaram	Trade and Commerce in Ancient India, Vanarasi, 1968.
Thapar, Romila	Asoka and the Decline of the Mauryas, Delhi, 1973.
Thomas, E.J.	The life of Buddha and Legend and History, London, 1975.
Tripati, R.S.	History of Ancient India, Benaras, 1942.
Turnour G.	Epitome of the History of Ceylon, Colombo, 1823.
Venkatesvara, S.V.	: Indian Culture through the ages. Vol. 1, London, 1928.
Verma, V.P.	Early Buddhism and its Origin, New Delhi, 1973.
Wagle, N.	Society at the time of Buddha, Bombay, 1966.
Wijesinha, L.C.	Mahavamsa (Eng. Trans.) Colombo, 1909.

www.pathagar.com

Wijesekera, N. D. The People of Ceylon, Colombo, 1951.

Winternitz, M. A History of Indian Literature,· Vols. 11, Delhi, 1977.

Woodward, F.L. Commentary of the Udana, London, 1926. Kined sayings (translated), PTS. London.

Dictionaries and Encyclopaedia

Appiha, K.A. and Gates : The dictionary of Global Culture, 1997.

Buddhaatta Mahathera, A.P. : Concise Pali-English Dictionary, Colombo, 1949.

Childers, R. C. A dictionary of the Pali Language, Trubner and Co. London, 1875.

Humphrey, Christmas A Popular Dictionary of Buddhism, 1962.

Ling, T.O. A Dictionary of Buddhism, 1972.

Malalasekera, G.P. Dictionary of Pali Proper, Names 1972. Vols. 1, 11, Delhi, 1995.

: Encyclopedia of Buddhism, 1956.

March, A.C. : A glossary of Buddhist Terms, 1937.

Murthy, K. K. : A Dictionary of Buddhist Terms and Terminologies, 1991.

Nanatilaka and Nanaponika : Buddhist Dictionary, (Revised) 1980.

Prebish, Charles, S. : Historical Dictionary of Buddhism, 1993.

Rhys Davids, T.W. and Stede, W. : Pali-English dictionary, PTS., London, 1921–25.

The Seeker's glossary of Buddhism, New York, U.S.A., 1997.

www.pathagar.com

www.pathagar.com